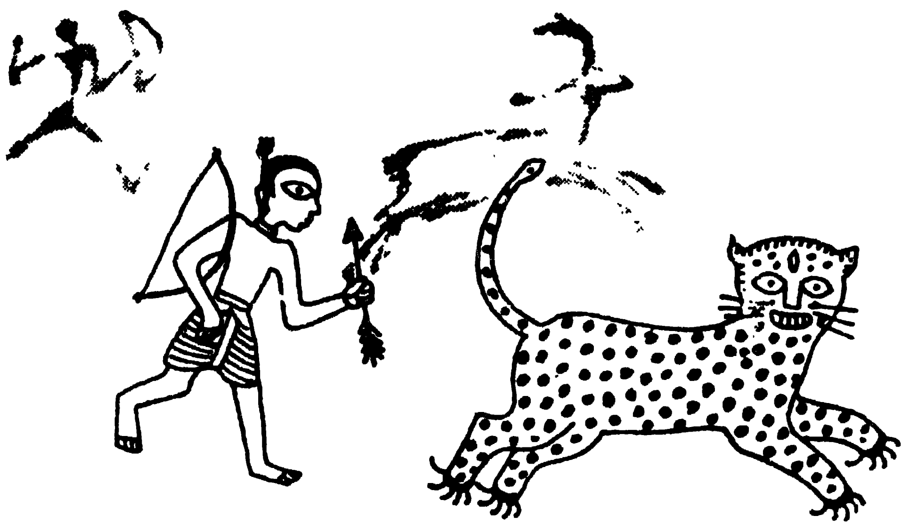
জিম করবেট অমনিবাস

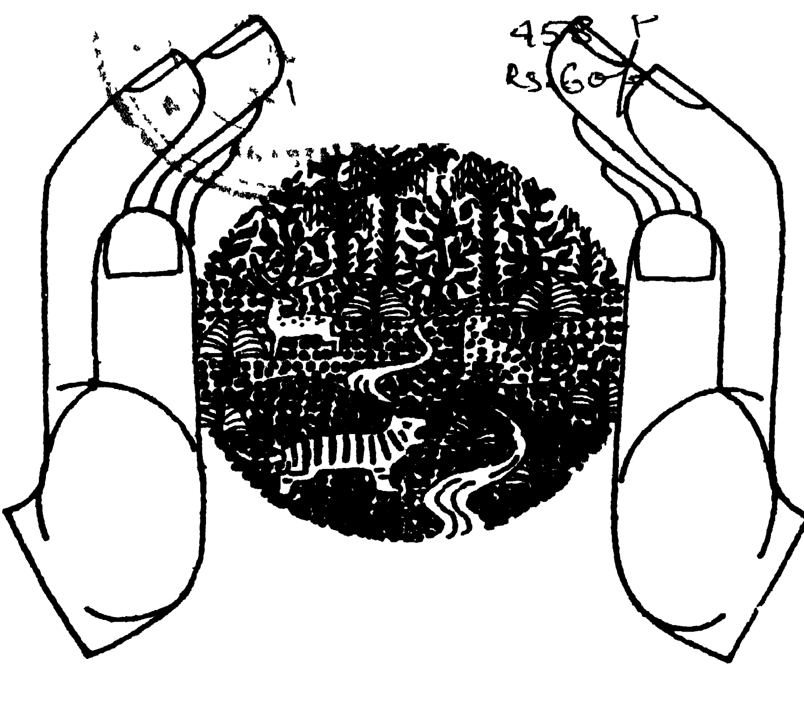


জিম করবেট
অমনিবাস

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

১

মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত



করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন কলকাতা-৯

জিম করবেট অমনিবাস
সংকলনটি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি
প্রেসের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
প্রিণ্ট-ও-গ্রাফ
৯-সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা-৭৩

অলংকরণ ও প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

গ্রন্থনকারী
ডিলাক্স বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬ পাটোয়ার বাগান লেন
কলকাতা-৯

জিম করবেট : পরিচিতি

(১৮৭৫—১৯৫৫)

এডোয়ার্ড জেম্‌স করবেট, আমাদের কাছে যিনি জিম করবেট নামে পরিচিত। তিনি ১৮৭৫ সালে নৈনিতালে জন্মগ্রহণ করেন। করবেটের পিতা ছিলেন আইরিশ। জিম পিতামাতার অষ্টম সন্তান। পিতা ক্রিস্টোফার গার্নি সাধারণ সরকারী কাজ করতেন। নৈনিতালে তিনি 'গার্নি হাউস' নামে যে বাড়ি তৈরি করেন, করবেট সেখানেই জন্মান। সে সময়ে নৈনিতালে তীব্র শীত পড়ত। পার্বত্য শহরের সকল গৃহস্থ ভারতীয়-শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দার মত করবেট পরিবারের আরেকটি শীতাবাস ছিল। তা নৈনিতাল থেকে পনের মাইল দূরে তেহ্‌রি রাজ্যের অন্তর্গত কালাধুঙ্গি নামে একটি ছোট গ্রাম। সেখানে করবেটদের কিছু জমিজমা ছিল, চাষবাস হত। নৈনিতাল ছিল গ্রীষ্মাবাস। ১৯২৪ সালে করবেটের মা মৃত্যুকালে 'গার্নি হাউস', করবেটের দিদি ম্যাগিকে দানপত্রে দিয়ে যান। করবেট ও ম্যাগি কেউই বিয়ে করেন নি এবং তাঁরা দুজন আজীবন পরস্পরের সঙ্গী ছিলেন। কালাধুঙ্গির বাড়িটি এখন উত্তরপ্রদেশ সরকারের চেষ্টায় 'করবেট মিউজিয়াম'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। নৈনিতালের 'গার্নি হাউস' বর্তমানে শ্রীযুক্তা কলাবতী বর্মার মালিকানায়।

করবেট নৈনিতালের স্কুলে লেখাপড়া করেন এবং ১৮৯৫ সালে বেঙ্গল অ্যান্ড নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়েতে এক সময়-শর্তাধীন কাজ নেন। তখনো রেলওয়ে ইঞ্জিনে খনিজ কয়লার বদলে কাঠও ব্যবহার হত। সেই কাঠ কাটানো ও সরবরাহের জন্য করবেট চলে যান ভাবরের জঙ্গলে। সময়-শর্তাধীন কাজ শেষ হলে করবেট ফুয়েল ইন্‌স্‌পেক্‌টর, মালগাড়ির গার্ড, সহকারী গুদাম-রক্ষক, সহকারী স্টেশনমাস্টার ইত্যাদি নানা রকম কাজ করেন। অতঃপর মোকামাঘাটে ব্রডগেজ থেকে মিটারগেজে মাল চালানের কণ্ট্রাক্‌টারীর কাজ পান ও প্রশংসনীয় যোগ্যতায় একুশ বছর এই কাজ করে ১৯১৫/১৬ সালে অবসরগ্রহণ করেন।

এইখানে কাজ করতে করতেই তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন। কুমায়ুন অঞ্চল থেকে পাঁচ হাজার সেনা রংরুট করেন, ফ্রান্স ও ওয়াজিরিস্থানে যান এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মেজর পদে উন্নীত হন। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধে তালিম দেন এবং উন্নীত হন লেফটেনাণ্ট কর্নেল পদে।

কর্মজীবনেই তিনি তাঁর প্রথম নরখাদক, চম্পাবতের বাঘিনীকে মারেন

১৯০৭ সালে। তাঁর শেষ নরখাদক শিকার থাক্-এর বাঘিনী, ১৯৩৮ সালে। অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আন্দোলনে বিশের দশক থেকেই তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্যের। ভারতের সকল, এমন কি সংরক্ষিত অরণ্যেও তাঁর ছিল নির্বাধ প্রবেশাধিকার।

১৯৪৭ সালে করবেট ও ম্যাগি নভেম্বরে 'গার্নি হাউস' শ্রীযুক্ত পি. কে. বর্মাকে বিক্রি করে দেন এবং চলে যান আফ্রিকার কেনিয়ার অন্তর্গত নিয়েরিতে। সেখানে গিয়েও করবেট বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আন্দোলন করেন ও পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৫৫ সালের ১৯শে এপ্রিল নিয়েরিতে শেষ বই 'ট্রি টপ্স' শেষ করার তের দিন বাদে করবেটের মৃত্যু হয়। সেন্ট পিটার্স অ্যাংলিকান চার্চ সিমেট্রিতে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়।

গ্রন্থকার হবার বাসনা করবেটের কোনদিনই ছিল না। বন্ধু ও অনুরাগীদের উপরোধে তিনি 'ম্যানইটার্স অফ কুমায়ুন' লেখেন, বই বেরোয় ১৯৪৬ সালে। সঙ্গে সঙ্গে বইটি বিশ্বপরিচিতি লাভ করে। এরপর প্রকাশকের পীড়াপীড়িতে 'ম্যান ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ' (১৯৪৮) ; 'মাই ইন্ডিয়া' (১৯৫২) ; 'জঙ্গল লোর' (১৯৫৩) ; 'দি টেম্প্‌ল টাইগার অ্যান্ড মোর ম্যানইটার্স অফ কুমায়ুন' (১৯৫৪) বেরোয়। তাঁর প্রথম বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যাঁদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে সেই ভারতীয় সেনাদের চক্ষু চিকিৎসাকল্পে দান করে যান। অপর বইগুলির গ্রন্থস্বত্বভোগী তাঁর প্রকাশ-সংস্থা অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেসের কর্মীবৃন্দ।

আমরা এই স্মারক অমনিবাস প্রকাশের কাজে মূল প্রকাশক অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেসের কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাই অফিসের কাছে সর্ব পর্যায়ে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য। ধন্যবাদ জানাই অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দিরকে। এই সংস্থা, এই প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত তিনটি বই বিষয়ে অনুমতি দিয়ে আমাদের সহায়তা করেছেন করবেটকে শ্রদ্ধা জানাতে। জাতীয় গ্রন্থাগারের মূল ও সংবাদপত্র শাখা করবেট বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে প্রভূত সহায়তা করে ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। বন্ধুবান্ধব বহুজন, বিশেষ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বপর্যায়ে সহায়তা করেছেন। এই খণ্ডের তিনটি বই সংশোধন, পরিমার্জনা, ও অন্যান্য কাজে সহায়তা করেছেন ধন্যবাদার্হ পিনাকী ভট্টাচার্য, নবারুণ ভট্টাচার্য এবং শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য বনপাল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে বইটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। করবেট পার্কের মানচিত্র ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলীও তাঁরই সৌজন্যে প্রাপ্ত। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। শিল্পী খালেদ চৌধুরী ছবি এঁকে বইটিকে সুন্দর ও সম্মানিত করেছেন।

পরিশেষে, রুদ্রপ্রয়াগের চিতা প্রসঙ্গে Leopard-এর বাংলায় আমরা 'চিতা

শব্দ ব্যবহার করেছি। কারণ দুটি। প্রথম, শিকারী চিতা প্রাণীটি এখন ভারতে বিলুপ্ত। দ্বিতীয়, 'চলন্তিকা' অভিধানে Leopard, Panther, Hunting Cheetah, তিনটি প্রাণীকেই 'চিতা'ও বলা হয়েছে।

জিম করবেটের জীবন, কর্ম, শিকার এবং বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে তাঁর ভূমিকা, এর বিস্তৃত পরিচয়বাহী এক বিস্তারিত নিবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

এই গুরুদায়িত্ব কতটা পালন করা গেছে, জানি না। তবে প্রভূত পরিশ্রমের ফল এ গ্রন্থ পাঠকের আশীর্বাদ ধন্য হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। প্রকাশককে ধন্যবাদ, তাঁরা বইটি সম্ভব করতে সর্বপর্যায়ে প্রভূত কষ্টস্বীকার করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী

ভূমিকা

এই বইয়ের ভূমিকা আমরা "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ" বলেও শুরু করতে পারি, কারণ গল্পগুলি সবই হিমালয়ের পটভূমিকায় রচিত। আবার গল্প বললেও ঠিক বলা হল না, কারণ যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু সত্য ঘটনাই নয় প্রত্যক্ষদর্শীর নিজস্ব বিবরণী, আবার ঘটনাবলীও বহুলাংশে তিনিই নিয়ন্ত্রিত করেছেন। পূর্বে এ দেশে যে সব শিকার কাহিনী বেরিয়েছে, শ্রেণী হিসাবে এগুলি তার থেকে স্বতন্ত্র ত বটেই, উচ্চমানেরও।

এখানে হিমালয়ের কিছু বর্ণনা দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধহয়। সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তী এই বিশাল গিরিশ্রেণীর বর্ণনা সংক্ষেপে দেওয়া সহজ নয়, কারণ পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা, আর উচ্চতায় পাঁচশো ফুট থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ শিখরে পাঁচ মাইল খাড়াই এই হিমালয় পর্বতমালা। ফলে এক অঞ্চলের আবহাওয়া, গাছপালা, এমন কি নৈসর্গিক দৃশ্যও অন্য অঞ্চল থেকে আসমান-জমিন ফারাক। যেমন, ১৩—১৫ হাজার ফুট থেকে আরম্ভ হয় চির তুষার অঞ্চল। তা থাকে সারা বছরই বরফে ঢাকা। যে জন্য সেখানে কোন উদ্ভিদ জন্মাতেই পারে না। পূর্বাঞ্চলের হিমালয়ে, যা দ্রাঘিমার মানে বেশি 'দক্ষিণী' (আসাম, বাংলা, পূর্বনেপাল, সিকিম, ভুটান ইত্যাদি অঞ্চলে), সেখানে হিমরেখা পাওয়া যাবে সতের হাজার ফুটের কাছাকাছি, যা কুলু বা বদরীনাথে প্রায় তের হাজারের কাছে দেখা যাবে। কাশ্মীরের অমরনাথের রাস্তায় গেলে আরো নিচে হিমরেখার দর্শন মিলবে, কেননা এই অঞ্চলটি হিমালয়ের অনেক উত্তরের দ্রাঘিমায় অবস্থিত। হিমরেখার নিচে ত অনেকখানি পরিসর জুড়ে একটি অঞ্চল দেখা যাবে, যা হল প্রকৃতিদেবীর 'খাশ্ বাগিচা'। বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এখানে (১২—১৬ হাজার ফুটে) বর্ণাঢ্য ফুলের মেলা বসে যায়, যেজন্য এই অঞ্চলকে বিখ্যাত ইংরেজ পর্বতারোহী Smythes বলেছেন, "Valley of flowers" বা ফুলের রাজ্য, যা অন্য কেউ অভিহিত করেছেন "Valley of the gods" বলে। মনে হবে, প্রকৃতি যেন আপন খেয়ালেই সেখানে সবুজ জমির উপর নানা রং দিয়ে আগাগোড়া হিমালয়ের বুক জুড়ে বিচিত্র রঙে আর নকশায় বিরাট একটি কার্পেট ফেঁদেছেন, যা আবার ফুস মন্তরে হেমন্তকালের শেষেই উধাও হয়ে যায়। এই অবিশ্বাস্য ফুলবাগানের নিচ থেকে শুরু হয় বৃক্ষ আর গুল্মরাজ্য। বৃক্ষের মধ্যে প্রধান হল ভূর্জপত্র এবং গুল্মের মধ্যে রোডোডেনড্রন, যার নেপালী নাম হল গুরাঁশ। এখান থেকে (১০—১২ হাজার ফুট) নিচে

এমনে সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে নানা সরল বর্গীয় গাছের, যারা হল ফার, স্প্রুস্, দেওদার, পাইন। ফার হল সর্বোচ্চ স্তরের গাছ, আর পাইন নেমে যায় ৪-৫ হাজারফুট পর্যন্ত, কাশ্মীরে অবশ্য হাজার ফুটের নিচেও পাইন দেখাই যাবে। পূর্ব হিমালয়ে, বিশেষত কোশী নদীর পূর্বে, পাইন আর দেওদার দেখা যাবে না, আর স্প্রুস্ও সেখানে কমই। তার বদলে দেখা যাবে নানা জাতের ওক আর নানা রঙের রোডোডেনড্রন।

এই উঁচু পাহাড়ের বনে যে সব জীবজন্তুর দেখা মেলে তা হল, জংলী ছাগল বা থাড়্, জংলী ভেড়া বা ভড়াল, ভালুক, গেছো ভাম, তুষার চিতা, কাকর হরিণ (মৈমনসিংহের ভাষায় খাউট্যা হরিণ)। হাংগুল ইত্যাদি। কেঁদো বাঘও যে এই উঁচু পাহাড়ে ছটকে মাঝে মাঝে এসে পড়ে না এমন নয়। তবে এখানে আনাগোনা কম (অবশ্য কালিম্পংয়ের পাহাড়ে ১০ হাজার ফুটেও পাব্‌ডন্ডী অর্থাৎ হাতি চলার রাস্তা দেখা যায়)—তারা ঘুরে বেড়ায় অপেক্ষাকৃত নিচের বনে। যেখানে আছে শাল আর বাঁশ বন, আর প্রচুর জল আর শর ঘাস। বাঘেরও দেখা মিলবে সেখানে বেশি করে। বাঘের প্রধান খাদ্য হল বন্যবরাহ, চিতল, সম্বর, বারশিঙা, কাকর ইত্যাদি জাতের হরিণ। বাঘ ছাড়া শ্বাপদের মধ্যে আছে শলথ ভল্লুক। হাতি অবশ্য পূর্বাঞ্চলেই বেশি, আর গঙ্গার পশ্চিমে এদের দেখাই যাবে না বড় একটা। এই ত গেল হিমালয়ের গাছপালা আর জীবজন্তুর মোটামুটি খবর।

গল্পগুলি হল সব বাঘ নিয়ে—তথা নরখাদক বাঘ নিয়ে। বাঘগুলি নর-খাদক না হলে অবশ্য এই ভূমিকারও কোন প্রয়োজন ছিল না। বাঘগুলি হয়ে পড়েছিল মনুষ্যজাতির শত্রু। তাই তাদের মরতে হল। ভবিষ্যতে আবার এ ধরণের গল্প লেখার পটভূমি রচিত হবে কি না কে জানে—কারণ ভারতে ব্যাঘ্রকুলের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে ৫০-৬০ বছর আগেও যেখানে ভারতে কম করে ৪০ হাজার বাঘ ছিল, এখন তা হাজারের নিচে নেমে এসেছে। তাই আজ বাঘের জন্যই বিশেষ করে অভয়ারণ্যের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে—এমন কি এ ব্যাপারে প্রাণীরক্ষার বিশ্বসংস্থাও সক্রিয় সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। ভারতের বাইরে বনে শ'খানেক বাঘ এখন আছে কি না সন্দেহ।

হরিণ, শুয়োর হল বাঘের স্বাভাবিক আহার, তা ছেড়ে বাঘ মানুষকে তাড়া করবে কেন? এ নিয়ে অবশ্য অনেক মত আছে। যে বাঘ মানুষখেকো নয়, সে মানুষ দেখলেই সরে পড়বে। জঙ্গলে হঠাৎ এমনি বাঘের সামনে পড়ে, ভয় পেয়ে বাঘের দৌড় দেখে (যদি অবশ্য তা দেখার মত মানসিক অবস্থা থাকে কারো) অনেকের হাসিই পাবে—কারণ জঙ্গলের রাজার এটা শোভা পায় না। যাই হোক, এটাই হল জঙ্গলে আইন—অপরিচিত কিছু দেখলে তা এড়িয়ে

যাওয়াই বন্য প্রাণীর স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু না চাইলেই তা হবে না এ নিয়ম আর কোথায়? মানুষ শিকার করে হরিণ আর বরা, যা হল বাঘের মুখের খাবার—আর সেখানে টানাটানি পড়লেই তাকে বিকল্প ব্যবস্থায় নামতে হবে, আর তখনি শুরু হয় গোলমাল। প্রথম প্রথম বাঘের খাবায় ঘায়েল হয় গৃহ-পালিত গরুমোষ—আর তা মারতে গিয়ে বাঘ আসে মানুষের সংস্পর্শে। অনেক সময়ে এ জন্য তারা নিহতও হয়—আবার অনেক সময়ে আত্মরক্ষার্থে মানুষও জখম করে ফেলে। একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে বাঘের যেন মেজাজই বদলে যায়—আর যখন সে দেখে যে এই জীবটি, যাকে সে ভয় করে এতদিন এড়িয়ে এসেছে, সে আত্মরক্ষায় এতই অক্ষম, যে তার নিজেরই আফশোস হয়, কেন আগে থেকে মানুষের পেছনে সে ধাওয়া করেনি। হরিণ-বরা ধরতে রীতি-মত দৌড়াদৌড়ি আর কসরৎ করতে হয়—মামুলি পোষা গরুও বেশ খানিকটা দৌড়তে পারে আত্মরক্ষার জন্য—কিন্তু মানুষ ত স্রেফ তাদের গর্জন শুনেই কুপোকাৎ। তাই বাঘ একবার মানুষখেকো হলে অন্য আহারে তার এক রকম যেন অরুচিই এসে যায় বলতে গেলে; যদিও মানুষ না পেলে অবশ্যই অন্য আহারও সে গ্রহণ করে। কেউ কেউ আবার বলেন যে মানুষের রক্ত না কি বেশি লোনা তথা বেশি লোভনীয়। তবে সবই অনুমান।

বলা হয়েছে বাঘ স্বাভাবিক আহার না পেলে মানুষের দিকে ঝোঁকে ঘটনা পরম্পরায়—কিন্তু এ ব্যাপারে কার্যকারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে অন্যান্য ঘোরা পথেও। যেমন, বুড়ো বাঘ। সে আর তখন দৌড়ে গিয়ে হরিণ বরা ধরতে পারে না—হয়ত বা গরুকে ঘায়েল করাও তার শক্তির বাইরে, তখন হঠাৎ বেপরোয়া হয়েই হয়ত খিদের জ্বালায় মানুষ মেরে ফেলে—আর একবার মানুষটি মারলেই তার যেন দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, যে এর চেয়ে সোজা শিকার দুনিয়ায় আর নেই। তবে বুড়ো বাঘই যে মানুষখেকো হবে, আর কেউ নয়, এমন কথা বলা চলে না। বেশির ভাগ মানুষখেকোর ইতিহাস হল জখম হওয়া বাঘ থেকে। নবীন বা কাঁচা শিকারীর হাতে গুলি খেয়ে সুস্থ, সবল, জোয়ান বাঘ হয়ে পড়ে খোঁড়া বা কানা বা অন্যভাবে অপটু। কারও হয়ত চোয়ালে গুলি লেগে সেটি অচল হয়েছে। এ সব বাঘকে তখন বাঁচতে হলে বিকল্প শিকারের যোগাড় দেখতে হয়, এবং স্বাভাবিকভাবে মানুষই এসে পড়ে তার খাদ্যতালিকায়। অনেক সময়ে আবার বাচ্চা বয়সেই মানুষের মাংসের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে—তার মানুষখেকো মা যখন শিকার করে তাকে খাইয়েছে। অবশ্য এ সব বাচ্চা বাঘ বড় হয়ে শুধরে যেতেও পারে। এই সংস্পর্শদোষে সে ছোট থেকে আর মানুষকে ভয় করতে শেখেনি বা তাকে বর্জিত খাদ্যের কোঠায়ও রাখেনি। সে যাই হক, মানুষখেকো হলেই, অলিখিত আইন অনুসারে বাঘের ওপর মৃত্যু-দণ্ড জারী হয়, তবে সেটা কবে কার্যকরী হবে তা নির্ভর করে কৌশলী

শিকারীর ওপর। আবার অন্য কারণে অক্ষম হয়ে, যেমন খিদের জ্বালায় শজারু মারতে গিয়ে থাবায় কাঁটা ফুটিয়ে বা বরাহের দাঁতে বা হরিণের শিংয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে জখম হয়েও শেষটায় বাঘ মানুষখেকো হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষখেকো বাঘ সম্বন্ধে আরো ২-৪টি তথ্য জানা দরকার। কারণ তখন তাদের বুদ্ধিবৃত্তি বা কর্মতৎপরতা এমনই বৃদ্ধি পায়, সাধারণ জংলী বাঘের মধ্যে তা দেখা যাবে না বড় একটা। এরা যেন বেশ চালাক হয়ে ওঠে আর মনুষ্য চরিত্র ও তাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে এদের একটা মোটামুটি ধারণা এসে যায়। যেমন, সন্ধ্যার ঝোঁকে ঝরনার ধারে ২-১টি মানুষ আসবেই জল নিতে আর তখন তাকে ধরা সহজ। তেমনি, গরুর পালের তদারকী করতে ২-১টি বালক থাকবেই, তাকেও ধরতে পারলে মন্দ হয় না। অথবা এক দল মেয়ে জঙ্গলে ঘাস কাটতে আসবে সকালে, বা ফিরে যাবে বিকেলে, এদের একটিকে ধরলেই হবে—বাকি সব তখন চোঁ চাঁ পালাবে। মানুষের সম্বন্ধে এত জ্ঞান এদের হওয়ায় রুদ্রপ্রয়াগের চিতা বাঘটি ১২৫টি লোক মেরেছিল এবং আট বছর কেদার-বদরী যাত্রীদের রাস্তায় দাপটে চালিয়েছিল ত্রাসের রাজ্য। চম্পাবতের মানুষখেকোটি ত ৪৩৫টি মানুষই মেরেছিল। মধ্যপ্রদেশে একবার একটি বাঘ মানুষখেকো হয়ে খালি ডাকরানার মারত—অর্থাৎ রানারের ঘণ্টার ঠুং ঠুং আওয়াজ পেয়েই সে জংলী রাস্তার ধারে ঘাপটি মেরে বসে থাকত। শেষে শিকারীরা তাকে বাগে আনতে রানারের ঘণ্টা নিয়ে পায়ে হেঁটে যেতেই তার দেখা পেল এবং গুলি করল।

কথায় বলে বাঘের গল্প, ভূতের গল্প আর সাপের গল্প—এর আরম্ভ হলে আর শেষ নেই। তবু মানুষখেকো বাঘের আখ্যায়িকা ঠিকমত উপলব্ধি করতে হলে বাঘের সম্বন্ধে অন্য দু একটি কথা জানা দরকার। প্রথমত আকার। অনেক শিকারীকে (যাঁরা বেশির ভাগ বাঘ মুখেই মেরে থাকেন) ১০-১২ ফুট বাঘের কথা বলতে শোনা যাবে—তবে জেনে রাখা ভাল যে ১০ ফুট বাঘ বড় একটা দেখা যায় না। সাড়ে ন ফুট বাঘ বেশ বৃহৎ ব্যাপার। অবশ্য মাপ দিয়েই বাঘের ছোট বড় বিচার করা সব সময়ে সম্ভব হয় না, কারণ শরীরের দৈর্ঘ্যের অর্ধেকই হল লেজ। কোন বাঘের লেজ ছোট হয়, আর কারো বা বড়। কাজেই বাঘই যদি সাড়ে ন ফুট হয়। তবে যে বাঘের লেজ ছোট, সে নিশ্চয় আকারে বড় হবে। বাঘ মেরে সেটিকে উবু করে মাটিতে শুইয়ে লেজটি টান করে মাটির উপর রেখে, নাকের ডগায় আর লেজের শেষে দুটি কাঠি পুঁতে, কাঠি দুটির মাঝের দূরত্ব মাপা হয়। এই হল measurement between pags এবং এই হল বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাঘের মাপ। অবশ্য ভি-আই-পি-রা কেউ বাঘ মারলে আগেকার দিনে বিশেষ ধরণের মাপের ফিতা কেউ কেউ ব্যবহার করতেন, যা দিয়ে ৯ ফুট বাঘকে সম্মানিত অতিথির খাতিরে হয়ত সাড়ে ন ফুট বাঘ বলে

ঘোষিত হত। এটা অবশ্য আজকাল বড় একটা করা হয় না। বাঘের ঘ্রাণশক্তি খুবই কম—অর্থাৎ ঘ্রাণ দিয়ে এরা শিকার তল্লাস করে না, বা পারে না, তবে শিকার করে সেটা লুকিয়ে রেখে রাত্রের অন্ধকারে খুঁজবার সময়ে ঘ্রাণশক্তির ব্যবহার অবশ্যই করে। তবে বাঘের চোখের দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তি দুটিই অত্যন্ত প্রখর—আর এ দুটিই হল তার শিকার ধরার প্রধান অস্ত্র। তারপর আছে তার সামনের দুটি পা—আর দাঁত, যা এর সব শক্তির উৎস। বাঘের থাবার ঘায়ে বড় বড় মোষ ঘায়েল হয়, আর তার চোয়ালের এমনই জোর যে বেশ বড় জন্তুকে মেরে মুখে করে বেশ দূরে নিয়ে যেতে পারে, যেমন বেরালে ইঁদুর ধরে নিয়ে যায়। অবশ্য জন্তুর ওজন বেশি হলে টেনে নিয়েও যেতে হয়। অনেক সময়ে শিকার করে সবটা একসঙ্গে না খেয়ে পাতাকুটো দিয়ে ঢেকে রেখে দেয় পরে খাবার জন্য। তাই বাঘ শিকার করায় প্রকৃষ্ট পন্থা হল মড়ি kill খুঁজে বের করা, আর চুপচাপ লুকিয়ে থেকে বাঘের প্রতীক্ষা করা। এই মড়ির কাছে ফিরে আসার অভ্যাসের জন্যই বাঘ মারা পড়ে। তবে বাঘ খুব সন্দিগ্ধচিত্ত, একটু গোলমাল বুঝলে সে মড়ির কাছে আসে না সহজে। মানুষখেকো বাঘ স্বভাবত চতুর হয়, এবং অনেক সময়ে সে তাই মড়ির কাছে ফিরে আসে না। গুলি খেয়ে জখম হলে বাঘ হয়ে ওঠে অসম্ভব হিংস্র এবং তার পেছনে যাওয়া মানে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সমুখীন হওয়া বলা চলে—অথচ যে কোন সুযোগ্য শিকারীর উচিত কাজ হল, বাঘকে জখম করলে তাকে খুঁজে শেষ করে ফেলা, তা নইলে অন্য নিরীহ লোক অজান্তে তার বলি হয়ে পড়ে। কাজেই শখের শিকারী অনেক সময়ে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। বাঘের আর একটি অভ্যাস হল, কোণঠাসা হলে (বা এমনিতেও ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা—সহজ cover ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে না, যে জন্য শিকারীকে বাঘের পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে সম্ভাব্য লুকাবার জায়গাগুলির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। আহত বাঘ এবং বাচ্চাসহ বাঘিনী অতি ভয়ংকর বস্তু এবং এদের কাছাকাছি এসে পড়লে প্রাণে বাঁচা দায়।

পায়ে হেঁটে বাঘ শিকার করা কেবলমাত্র অতি দক্ষ শিকারীর পক্ষেই সম্ভব : আর এর জন্য চাই অমিত সাহস, অসীম ধৈর্য ও কর্মক্ষমতা, নির্ভুল হাতের টিপ, এবং মুহূর্তের মধ্যে তাক করে গুলি ছোঁড়ার ক্ষমতা—তাই সাধারণ শিকারীরা হাতির পিঠে চড়ে বা গাছের উপরে মাচানে বসে শিকার করেই পরিতৃপ্ত হন। ঝানু মানুষখেকোর পেছনে দৌড়াতে হলে কিন্তু পায়ে হেঁটেই শিকার করে পরিতৃপ্ত হতে হয়। কর্বেটের শিকার কাহিনীর মধ্যে এসব গুণের পরিচয় অহরহই পাওয়া যাবে। আবার বনে বনে ঘুরে বাঘ শিকার করতে হলে শিকারীকে জানতে হবে বনের ভাষা—যা বোঝা যাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর শ্রবণ-শক্তির সাহায্যে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে—কেতাবে তা মিলবে না। শিকারীকে

বাঘের জানান দেয় বনের নানান পশু পাখি, যেমন হয়ত গাছের উপরে শোনা গেল ময়ূরের কেকাধ্বনি বা বাঁদরের কিচির মিচির, অথবা কাকার হরিণের খেউ ডাক, শিকারীর কাছে এর অর্থ হল, ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় আহারের খোঁজে বেরিয়েছেন এবং সম্ভবত কাছাকাছিই আছেন। সম্বরের 'ঘং' আওয়াজও এরই জানান দেয়—যাতে অন্য জীবজন্তুরা সাবধান হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে অনেকে ফেউ ডাকের সঙ্গে পরিচিত—ফেউ কোন স্বতন্ত্র জীব নয়, সাধারণ শেয়াল—ভয় পেলে অমনি ডাকে, বনাঞ্চলে অবশ্য ফেউ ডাকের অর্থ হল, কাছাকাছি বাঘ ঘুরঘুর করছে এবং সেটা শেয়াল মশাই-এর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সাপে যখন ব্যাং ধরে তখন ব্যাং এক অদ্ভুত ধরণের আওয়াজ করে—যা গ্রামের লোক মাত্রেই শব্দ শুনে বুঝতে পারে। বাঘে হরিণ মারলে তার (হরিণের) বৈশিষ্ট্য আর্তরব লক্ষণীয়। শিকারী এই সব আওয়াজ শুনে অনেক কিছু জানতে পারেন। তাই কর্বেট বনের পথে ডাকাতদের ধাওয়া করতে গিয়ে রাত্রে সঙ্গীদের সঙ্গে যখন অনাহারে রাত কাটাচ্ছেন, তখন দূরে এমনই আওয়াজ শুনে বলে উঠলেন, মাংসটা নিয়ে এলে হয়—তখন অন্যেরা ভাবলেন সাহেব বুঝি পাগল হয়ে গেছেন ক্ষিদের জ্বালায়। আসলে উনি নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে নিকটেই একটি বাঘ সবে হরিণ মেরেছে খুঁজলে লাশ পাওয়া যাবে যা তাদের শিবিরের খাদ্যাভাব মেটাতে পারবে।

সুন্দরবনে বাঁদরের কিচিমিচি শুনে গাছের তলায় বাঘ এসে হাজির হয়—কারণটি মজারই বলতে হবে, কারণ বাঁদরের কিচিমিচি শুনে গাছের নিচে জড় হয় হরিণ,—পাতা খাবার জন্য,বাঁদরেরা পাতা ফল যত না খায় নষ্ট করে তার চেয়ে বেশি, তাই হরিণের আবির্ভাব, আর বাঘও জেনেছে যে বাঁদর কিচ্‌মিচ্‌ করলে সেখানে হরিণ এসে জোটে, সুতরাং সেখানটা একবার দেখলে ক্ষতি কি! শিকারীরাও এর সুযোগ নেয়। মানুষে বাঁদরের কিচিমিচি নকল করে—পাতা ছিঁড়ে নিচে ফেলে অনেক সময় গাছের নিচে বাঘ হরিণ ইত্যাদি আনতে সমর্থ হয়। প্রজনন ঋতুতে বাঘ আওয়াজ দিয়ে অন্য বাঘের সন্ধান করে তাই সে সময়ে হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে বাঘের ডাক নকল করেও অনেক সময়ে আর একটি বাঘ কাছাকাছি ডেকে আনা যায়। সুন্দর বনে এটি প্রায়ই পরখ করে অনেকে দেখেছেন, এমন কি শিকারও করেছেন কেউ কেউ।

বাঘ মানুখেকো হলেই তার আচার আচরণ সাধারণ জঙ্গুলে বাঘ থেকে একটু স্বতন্ত্র হয়ে যায়—যার মধ্যে প্রধান হল সে লোকালয়ের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে এবং মানুষকে একদমই ভয় পায় না, এবং তক্কে তক্কে থাকে কখন কাকে ধরবে। অবশ্য এরা তখন সাধারণত সকালে বা সন্ধ্যেয় আক্রমণ করে এবং প্রায়ই যারা একলা পড়ে তাদের দিকেই লক্ষটা রাখে বেশি করে। আবাব বেশি সাহসী হয়ে পড়লে দিনের বেলায়ও বেরিয়ে পড়ে। রুদ্রপ্রয়াগের

মানুষখেকো চিতাটি এমনি ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল যে সে অঞ্চলের অধিবাসীরা রোজই স্বেচ্ছায় কার্ফু পালন করত—বিকেল থেকে সকাল পর্যন্ত। বিকাল হলেই পড়ি কি মরি করে, সবাই গৃহে আশ্রয় নিত আর দরজা জানলা শক্ত করে বন্ধ ক'রে রাখত, প্রসঙ্গক্রমে সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘের কথায় আসা যেতে পারে—এখানে প্রত্যেকটি বাঘই মানুষখেকো—অর্থাৎ বাগে পেলে ছাড়বে না, তবে তেমন ত্রাসের সঞ্চার করে না—মানুষ বলি হয় অসতর্কতার জন্যই। গত একশ বছরের নজীরে সেখানে কোন বনকর্মী বাঘের পেটে গিয়েছে বলে জানা যায়নি। এরাও শিকার ধরে সকাল সন্ধ্যেয়—আর একলা পেলে। তাই বোধহয় প্রবাদ যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়—অর্থাৎ সন্ধ্যায় বাঘের দেখা—সাপের লেখা বাঘের দেখা—অর্থাৎ কপালে থাকলে দেখা হবেই। নৌকাতে সাঁতরে গিয়ে (বাঘ বিশেষ সন্তরণ পটু) দলে ঘুমন্ত একটি মানুষকে ধরে নিঃশব্দে জঙ্গলে ফিরে যেতে পারে—এও দেখা গিয়েছে, তবে কর্বেটের মানুষখেকোদের মত গ্রামে গ্রামে ঘুরে ত্রাসের সঞ্চার করতে দেখা যায় না, আবার এও দেখা গিয়েছে, যে বনে প্রচুর হরিণ আর বরা থাকা সত্ত্বেও মানুষ ধরার আকর্ষণ এদের খুবই—অর্থাৎ স্বাভাবিক আহার বা শিকার নেই বলেই যে মানুষের উপর আসক্তি, তা নয়। আবার বাঘের হাতে প্রত্যক্ষভাবে মারা না পড়লেও পরোক্ষভাবে মানুষ মারে। আঁচড়ে আছে বিষ যাতে গ্যাংগ্রীন হয়ে লোক মরে। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা কথাটা মোটেই রূপক নয়।

যাই হোক মোদ্দা কথা হচ্ছে যে মানুষখেকো বাঘ মারাটা সহজ নয়—আর অনেক সময় সাপুড়েও যেমন সাপের কামড়ে মারা যায়, তেমনি অনেক ঝানু শিকারীও মানুষখেকো (man eater) মারতে গিয়ে বাঘের বলি হয়ে পড়ে। কাজেই কর্বেট সাহেবের এ বিষয়ে কৃতিত্ব অসাধারণ—বার বার তিনি বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন—সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীর দুঃখ দুর্দশা দূর করতে, এবং প্রায় ২৫-৩০টি মানুষখেকো বাঘ মেরে—বিশেষ করে গাড়োয়াল আর কুমায়ুন জেলায় শেষ করেছিলেন—ব্যাপারটা অনেকটা পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার মতই। একসময়ে ষাট হাজার কেদার-বদরী তীর্থযাত্রী বাঘের ভয়ে ভয়ে অতি অস্বস্তিতে ভ্রমণ করত—৭-৮ বছর ধরে দুটি চিতা ৫২৫টি লোককে ভবসিন্ধু পার করে দিয়েছিলেন—তখন কর্বেট এই দানবদুটিকে মেরে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছিলেন।

মানুষখেকোর পশ্চাদ্ধাবন সাহসের কাজ-ত' বটেই—কিন্তু এর জন্য চাই সদাজাগ্রত চক্ষু কর্ণ। কোথায় কাঁটার আগায় একটু হলদে লোম, কোথাও ঝোপের গায়ে এক টুকরো সুতো, কোথাও রাস্তার ওপরে এক ফোঁটা রক্ত, বা একটা পাতা ঝুলে পড়েছে, এসব দেখেই (যা অন্য লোকের চোখেই

পড়বে না) ঠিক করতে হবে বাঘ কোন দিকে গেছে। আর তাকে হতে হবে ব্যাঘ্র জ্যোতিষী বা ব্যাঘ্র পদরেখাবিদ্‌—অর্থাৎ থাবার ছাপ দেখে ধরতে হবে সে বাঘ, না বাঘিনী না চিতা না ছোক্‌রা বাঘ। বাঘিনী হলে সঙ্গে বাচ্চা আছে কিনা। এসব না জানলে মারার পরিকল্পনাটা ঠিক হবে না—থাবার ছাপ কত পুরনো—সাধারণ দুলকি চালে হেঁটেছে না দৌড়েছে—সবই নির্ভুলভাবে জানতে হবে—এবং অভিজ্ঞ শিকারী কাছে অবশ্য এটা সমস্যাই নয়। অনেক সময় শিকারের টোপের আঘাত দেখেও বলা যায় যে এটি আনাড়ী বাঘের কাণ্ড, না ঝানু বাঘের, বাঘের না বাঘিনীর, না চিতার, যে বাঘটির পেছনে ধাওয়া করতে হবে তার ইতিবৃত্ত এই ভাবে জানতে পারলে শিকার করার সুবিধা হয়। ২-৩টি থাবার ছাপ থাকলে, যার পিছনে দৌড়নো হচ্ছে সেটি ওর মধ্যে আছে কিনা দেখতে হবে। অবশ্য এই ধরণের সামগ্রিক বিদ্যা যা খানদানী শিকারীর আয়ত্তে (ব্যাঘ্র-দর্শন), তা এককালে আদিম মানুষের সকলেরই ছিল। কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়ার এক জেল থেকে কয়েকটি দুর্ধর্ষ খুনে পালায়। সন্ধানী কুকুর দিয়ে কোন কিনারা করা গেল না—কারণ রাস্তার অনেকটা ছিল পাথরের ওপর দিয়ে। শেষে কর্তৃপক্ষ ওখানের আদিম বুশমেন জাতির (যাদের বিশিষ্ট হাতিয়ার, বুমেরাং এর কথা আমরা জানি) দুটি লোক যোগাড় করে এদের ধরা গেল। এরা পাথরের ওপর কোথায় একটু কুটো বেঁকে গেছে বা বালুকণা সরে গেছে—ইত্যাদি দেখেই পথের নিশানা পেয়েছিল। অর্থাৎ চিহ্ন রেখে গিয়েছিল খুনেরা—তবে তা দেখার চোখ চাই তো।

কর্বেটের পশু পাখির স্বভাব সম্বন্ধে ছিল সম্যকজ্ঞান (না থাকলে ভাল শিকারী হতে পারতেনই না), কারণ বাল্য জীবন তাঁর কেটেছে হিমালয়ের পাদদেশে, শালবনে যেখানে পশু-পাখি বাঘ ভাল্লুক এবং হরিণের সঙ্গে তাঁর হয়েছে সাক্ষাৎ পরিচয়। তিনি সেখানে শিখেছেন পশু পাখীর বিভিন্ন ডাকের অর্থ। কর্বেট সাহেবের প্রকৃতি কিভাবে তাকে একবার খুব সাহায্য করেছিল তা সংক্ষেপে বলি : বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই তাঁর প্রথম বার বিলেত যাবার সৌভাগ্য হয়। সেখানে পৌঁছেই সন্ধ্যায় পুরান অভ্যাস মত হাঁটতে বেরিয়েছেন, কিন্তু ফিরবার সময় গোল বাধল—কারণ ৫ মাথার একটি রাস্তা বেছে নিতে হবে। পাঁচটি ঘুরে তিনি একটি বেছে নিলেন কারণ অবচেতন মনে লক্ষ করেছিলেন রাস্তায় বেশ চাল ছিল। অন্য কোন লোকের পক্ষে এটি লক্ষ করা সম্ভব হত কিনা জানি না। পরবর্তী জীবন মানুষখেকোদের শেষ করে তিনি গাড়োয়াল—কুমায়ুনে জনমানসে প্রায় 'ত্রাহি মধুসূদন' হয়ে পড়েছিলেন—বিশেষত ব্যাঘ্রভীত পল্লীবাসীর কাছে। তাই, যখন এই অঞ্চলে, অভয়ারণ্য স্থাপিত হল তখন দেশের লোক পরে নাম দিল কর্বেট পার্ক।

এখানে হল হরিণ আর বাঘের বেঁচে থাকার মত কিছু বন। অবশ্য, সম্প্রতি রামগঙ্গা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কল্যাণে এর বেশ খানিকটা জায়গা জলমগ্ন হবে—যার জন্য লোকসান বুঝবে হরিণ গোষ্ঠী—কারণ সমতল তৃণভূমির বেশির ভাগটাই যাচ্ছে, আর তাতে বাঘের আহার্যও কমবে, তবু ত' অভয়ারণ্য রইল, যা ভবিষ্যৎ বন্য প্রাণীর শেষ আশা ভরসার নিকেতন।

বলা হয়েছে বাঘের দেশ হল হিমালয়ের পাদদেশের শালবন—হরিদ্বার থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সব অঞ্চল (নেপালের তরাই অঞ্চলও এরই মধ্যে।) তাই হরিদ্বারের কাছে গঙ্গার ধারের বনের ছবির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদী প্রাদেশিক বনাঞ্চল এক রকমই লাগবে—একই হিমালয়ের অংশ সন্দেহ নেই। এখানেও দেখা যাবে গাছের আগায় ময়ূর, যে বাঘ দেখে ডাক শুরু করে, অন্য পশু পাখিদের সাবধান করে দিতে। এখানে আছে নানা জাতের ফিঙে—যারা দেখা যাবে, অনেক সময়ে চিল-বাজপাখির পেছনে ধাওয়া করেছে—ওরা হয়ত এদের বাসার বেশি কাছে ঘোরাফেরা করছিল। আবার ফিঙের এই জঙ্গী স্বভাবের জন্য ছাতারে বগেড়ি, ফুৎকি ছোট ছোট পাখির দল এদের বাসার আশে পাশে বাসা বাঁধে আত্মরক্ষার জন্য। শীতের দিনে দেখা যাবে অদ্ভুত লাল-কাল রঙের সাতসয়ালী বা আলতাপরী। আছে নানা জাতের বুলবুল, ভগীরথ। মাঝে মাঝে চমকে দিয়ে শোনা যাবে ক্যাঁক্‌কো ক্যাঁক্‌কো রাজ ধনেশের ডাক। গাছের সুউচ্চ ডালে হয়ত বাঘা ঠোঁট ওয়ালা সাদা কাল পাখি দেখতে পাওয়া যাবে। কপাল ভাল থাকলে দেখা যাবে নীল পরী। নীল আভা, যেন কোন উচ্চ স্তরের রং ব্যবসায়ীর মূর্তিমান বিজ্ঞাপন। ঘন জঙ্গলে দেখা যাবে শা বুলবুল, যার হাত খানেক লম্বা সাদা লেজ অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর। বহু রকমের কাঠঠোকরা আর মাছরাঙাও দেখা যাবে। কোথাও জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত ফলসা রঙের চার ফুট খাড়াইয়ের বক, গুড়ি মেরে দেড় ফুট হয়ে তপস্বীর মত চুপ করে জলে দাঁড়িয়ে আছে ঠায়, একটি ছোট মাছের দ্বারা ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষায়। আর অবশ্য আছে রঙ-এর ফোয়ারা ছড়ান ময়ূর আর বনমোরগ। কখন বা তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে সবুজ রঙের নরুন পাখির দিকে—ডালে বা দড়িতে সারি দিয়ে বসে থাকে—ডাইভ দিয়ে পোকা ধরে—উড়ন্ত অবস্থায় মনে হয় যেন কেউ ডার্ট (Dart) ছুঁড়ছে। সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বাংলার তরাই হরিদ্বার অঞ্চলের চেয়ে কম আকর্ষণীয় বা রমণীয় নয়। এখানেও আছে সৌন্দর্যের ফাঁকে ফাঁকে হাতি, গউর বা ভারতীয় বাইসন ভাল্লুক আর বাঘের দল। তবে অবশ্য মানুষখেকো নেই।—আছে কেঁদো বাঘ। অনেক সময় নানা কারণে কোন বাঘের হাতে মানুষ যে মারা পড়ে না এমন নয়, তবে তারা ঠিক মানুষখেকো হয়ে দাঁড়ায় না বড় একটা। অনেকের ধারণা সুন্দরবনের বাঘ বিরাট আর তারা হল রয়্যাল বেঙ্গল। অবশ্য রয়্যাল

বেঙ্গল কথাটি কোন শিকারীর উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত—আসলে এরকম কোন কথা নেই। আর কাদায় হাঁটতে হয় তথা শিকার ধরে বেঁচে থাকতে হয় বলে সুন্দরবনের বাঘ হিমালয়ের বাঘের চেয়ে আকার বা ওজনে খাটো। তরাই অঞ্চলের বাঘ বাস্তবিকই রাজকীয়।

করবেটের শিকার কাহিনীর মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় হল তিনি কত দক্ষ শিকারী ছিলেন আর কত ছিল তাঁর কষ্টসহিষ্ণুতা আর ধৈর্য—যা না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই উচ্চমানের শিকারী হতে পারতেন না। তবে শিকার তিনি করতেন সাধারণ লোকের জীবন বিপদমুক্ত করতে—অর্থাৎ মানুষখেকোদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে। আসলে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল অর্থাৎ Conservationist, এতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ উচ্চস্তরের শিকারীদের অনেকেই নাম করা Conservationist হয়েছেন—জীবজগতে পরস্পরের প্রতি যে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধ রয়েছে তার আসল রূপ তারাই শেষে উপলব্ধি করতে পারেন।

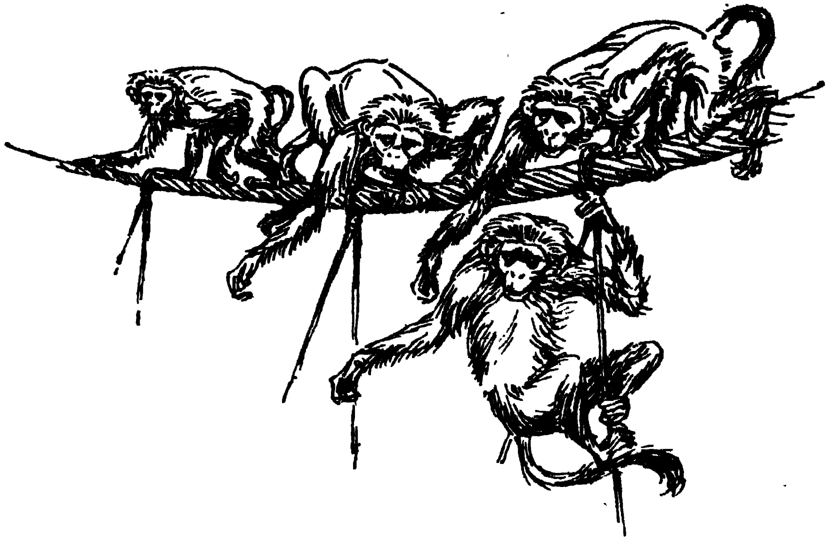
করবেট জাতে সাহেব (শ্বেতকায়) হলেও ছিলেন নিম্নবিত্ত ঘরের, পড়া স্কুলেই শেষ, এবং বাল্যকাল কেটেছে নৈনিতালের তরাই অঞ্চলের বনে, সাধারণ, দরিদ্র কুমায়ুনীদের সঙ্গে—যাদের সঙ্গে তার শেষ পর্যন্ত ছিল অন্তরের টান, এবং যাদের জন্য তিনি জীবন বিপন্ন করে বার বার মানুষ-খেকোর পিছনে ঘুরেছেন। তাদের যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যও করতেন। জীবন সংগ্রামে পাথেয় ছিল বিহার মোকামা ঘাটে রেলের ফেরী স্টিমারে কয়লা বহনের তদারক করা। মাহিনা সামান্যই, তবু মেহনতী মানুষ যারা তার সঙ্গে কাজ করছে—তাদের দুঃখ কষ্ট দেখলে তিনি তার স্বল্প সঞ্চয় বার বার উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। তাঁর মানবিকতা সত্যই উচ্চ মার্গের। এমনকি তার শিকার কাহিনীর লব্ধ রয়্যালটি, পুস্তক প্রকাশনী সংস্থার মেহনতী মানুষদের জন্য দান করে গেছেন।

তিনি এদেশকে এবং এদেশের জনসাধারণকে আপন বলেই জেনেছিলেন। তবে শেষ বয়সে কেন আফ্রিকায় স্থায়ী বসবাস করলেন কে জানে! করবেট ছিলেন অকৃতদার। সঙ্গে থাকতেন তাঁর দিদি—আর তিনিও বিবাহ করেননি। কারও মতে যে কোন কারণেই হোক স্বাধীন ভারতের কোন কোন সামাজিক পরিবর্তনকে তিনি মেনে নিতে পারেননি—এবং যার জন্য ভাইকেও দেশ ছেড়ে যেতে হল হয়ত। আবার কারও কারও অনুমান তিনি যুদ্ধের জন্য প্রচুর কুমায়ুনী আর গাড়োয়ালী সৈন্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন—যাদের মধ্যে অনেকে আর ফিরে আসেননি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাকে ভালবাসে এমন সব শত শত গৃহস্থের কাছে তাঁর রোজ মুখ দেখাতে বেদনায় দুঃখে বুক ফেটে যেত—যা সইতে না পেরে শেষটায় 'দেশত্যাগী' হলেন বুঝি!

কর্বেটের স্মৃতি ব'য়ে কর্বেট পার্ক রইল—রামগঙ্গা পরিকল্পনায় কিছুটা ডুবলেও বাকিটা যে সগৌরবে টিকে আছে তা নয়। কর্বেট ছিলেন naturalist এবং তাঁর জীবন কেটেছে এই অঞ্চলেই সেদিক দিয়ে অভয়ারণ্যের নাম সার্থক। কর্বেটের শিকারী হিসেবে এবং পর্যবেক্ষক হিসেবে রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতার অবিস্মরণীয় কাহিনীটি আবার স্মরণ করা যেতে পারে। বাঘ আজ এক জায়গায় লোক মারে ত' অন্যদিন মারে দশমাইল দূরে, আজ অলকনন্দার এপারে ত' কাল ওপারে, ৫০০ বর্গমাইল পাহাড়ী এলাকা জুড়ে সে চালিয়েছে তার কঠিন শাসন। একে চট করে হদিশ করাই (মারা ত' অনেক দূরের কথা) মস্ত শক্ত কাজ। কিন্তু পর্যবেক্ষণের সাহায্যেই তিনি কর্মপন্থা ঠিক করে ফেললেন। একদিন দেখলেন যে একজায়গায় মানুষ মেরে বাঘটি অলকনন্দার অন্যপাড়ে যায়নি—কর্বেট সিদ্ধান্ত করলেন যে বাঘটি পুল দিয়ে পার হয় (অন্যরা অনুমান করত সে সাঁতার দিয়ে অলকনন্দার পার হয়—যা ছিল কর্বেটের কাছে একদম অবিশ্বাস্য—কারণ অলকানন্দার ফেনিল জলরাশি তার খরস্রোতের সম্যক পরিচয় দিতে অন্ততঃ কার্পণ্য করে নাই)। যাই হোক, সেই পুলের মুখে প্রতীক্ষা করে তিনি বাঘের হদিশ শেষ পর্যন্ত পেলেন এবং সেই সূত্র ধরেই তাকে শেষ করলেন। সব পড়ে মনে হবে হয়ত যেন তিনি গেলেন আর এক একটি বাঘ খুঁজে মেরে ফেললেন। এর কারণ হল, তিনি তবু বলেছেন সেই সব শিকার কাহিনীর কথা যেগুলিতে তিনি হয়েছেন সফল—যার তিনগুণ ক্ষেত্রে হয়ত খুনের কিনারাই করতে পারেননি। তাছাড়া কোন কোনটিতে মাসাধিক বা আরও বেশি সময় কেটে গেছে। গল্পের আকর্ষণের জন্য হয়ত সময়টা চোখে পড়েনি। এর পিছনে যে একটি মানুষের দিনের পর দিন কতখানি কষ্ট বরণ থাকতে পারে তা কি আমাদের মনে হবে? হলে অবশ্য লেখকের রচনা সার্থক। বলে রাখা ভাল খুব কম শিকার কাহিনীই আছে যার আকর্ষণ এই সব আখ্যায়িকার চেয়ে বেশি॥

কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী॥
(মুখ্য বনপাল : পশ্চিমবঙ্গ)

রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতা



১

তীর্থপথ

আপনি যদি ভারতের রোদে-পোড়া সমতল-অধিবাসী হিন্দু হন, সকল সৎ হিন্দুর মত আপনারও যদি কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের অতি প্রাচীন দেবপীঠে তীর্থযাত্রার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনাকে তীর্থযাত্রা শুরু করতে হবে হরিদ্বার থেকে। তীর্থযাত্রা সঠিক সম্পন্ন করলে যে পুণ্যফল হবার কথা, তা সম্পূর্ণ পেতে হলে আপনি অবশ্যই হরিদ্বার থেকে কেদারনাথের পথের সবটুকু খালি পায়ে হেঁটে যাবেন। সেখান থেকে পাহাড়ী পথে হেঁটে যাবেন বদ্রীনাথ।

পবিত্র হর-কি-প্যারী কুণ্ডে অবগাহন করে শুদ্ধশুচি হয়ে, হরিদ্বারের অসংখ্য দেবপীঠ ও মন্দির দর্শন করবেন আপনি, সেগুলির ভাণ্ডারে আপনার যথাসাধ্য দক্ষিণাও জমা হবে। পবিত্র কুণ্ডের উপরে তীর্থ-পথের সংকীর্ণতম অংশে সার দিয়ে যে কুষ্ঠীরা বসে আছে, তাদের কাছ-বরাবর একটি পয়সা ছুঁড়ে দিতে ভুলবেন না। ওই গলা-পচা নুলোগুলো একদিন স্বাভাবিক হাতই ছিল। যদি এতে ত্রুটি করেন, তবে ওরা আপনাকে শাপশাপান্ত করবে। যে পর্বত-গুহা ওদের কাছে 'ঘর', সেখানে—অথবা বেচারাদের দুর্গন্ধ নোংরা ঝুলিতে যদি আপনার স্বপ্নাতীত ঐশ্বর্যও লুকনো থাকে, তাতেই বা কি এসে যায়? অমন হতভাগ্যদের শাপশাপান্ত এড়িয়ে যেতে পারলেই সবচেয়ে ভাল। সামান্য কয়টা তামার পয়সা দিলেই তো অভিশাপ আপনাকে স্পর্শও করতে পারবে না।

প্রথা-ধর্ম অনুসারে একজন সৎ হিন্দুর যা-যা করা দরকার, সবই আপনার করা হল এখন। এবার আপনি স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ, শ্রমসাধ্য তীর্থযাত্রা শুরু করতে পারেন।

হরিদ্বারের পর প্রথম যে দর্শনীয় জায়গায় পৌঁছবেন, তা হৃষীকেশ। এখানে আপনার সঙ্গে কালাকমলী-ওয়ালাদের প্রথম পরিচয় হবে। প্রতিষ্ঠাতা কাল কম্বল পরতেন বলে এঁদের এই নামে ডাকা হয়। তাঁর শিষ্যদের অনেকে এখনো কাল কম্বলের পোশাক বা ঢিলে আলখাল্লা পরেন। কোমরে বাঁধা থাকে ছাগলের লোমে-বোনা দড়ি। পুণ্য কাজের জন্যে দেশ জুড়ে এঁদের খ্যাতি আছে।

তীর্থ-পথে অন্য যে-সব ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, তাদের কোনোটি সে-খ্যাতি দাবি করার অধিকার রাখে কি-না আমি জানি না। তবে কালাকমলী-ওয়ালারা যে সে-দাবি করতে পারেন তা আমি নিজে জানি। সে দাবি ন্যায্য। এঁদের প্রতিষ্ঠিত বহু দেবপীঠ ও মন্দিরে যে প্রণামী-দর্শনী পান, তা দিয়ে এঁরা হাসপাতাল, ঔষধ-বিতরণ কেন্দ্র, তীর্থযাত্রা-নিবাস, স্থাপনা ও পরিচালনা করেন। গরিব-দুঃখীকে খেতে দেন।

হৃষীকেশ পিছনে রইল। এবার আপনি পৌঁছবেন লছমনঝোলায়। এখানে তীর্থ-পথ, একটা ঝোলা-পুল বেয়ে গঙ্গার ডানদিক থেকে পেরিয়ে চলে গেল বাঁদিকে। ঝোলা-পুলের উপর বাঁদরদের জমায়েতকে খুব সাবধান! এরা হরিদ্বারের কুষ্ঠীদের চেয়েও নাছোড়বান্দা। মিঠাই অথবা ছোলাভাজা ভেট দিয়ে এদের তুষ্ট করতে ভুলে যান যদি তাহলে লম্বা, সরু পুলটা পেরনো কঠিন হবে, যন্ত্রণাও ভোগ করতে হবে শরীরে।

গঙ্গার বাঁ-তীর ধরে চড়াই-পথে তিনদিন হেঁটে আপনি গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরে পৌঁছে গেলেন। ইতিহাস, ধর্ম ও বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে জায়গাটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। সুউচ্চ পর্বতমালায় ঘেরা প্রশস্ত, উন্মুক্ত এক অধিত্যকার কোলে অবস্থিত জায়গাটির সৌন্দর্যও অপরিসীম। দুটি বিশ্বযুদ্ধে যে গাড়োয়ালী সৈন্যরা অমন অসম-সাহসে লড়ে; তাদের পূর্বপুরুষরা এখানেই গুর্খা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে শেষবারের মত বিফল সংগ্রাম করেছিল।

১৮৯৪ সালে, গোহ্না হ্রদের বাঁধ ভেঙে, গাড়োয়ালীদের প্রাচীন নগরী শ্রীনগর, সমস্ত রাজপ্রাসাদ-টাসাদসুদ্ধ নিশ্চিহ্ন করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এটি গাড়োয়ালবাসীদের গভীর সন্তাপ। গঙ্গার এক উপনদী বিরেহি গঙ্গার উপত্যকায় এক ধস নামার ফলে বাঁধটির সৃষ্টি। বাঁধটির তলভূমি ১১,০০০ ফুট চওড়া, উপরিস্থিত ২,০০০ ফুট চওড়া, গভীরতা ৯০০ ফুট। মাত্র ছ' ঘণ্টার মধ্যে এক লক্ষ কোটি ঘন-ফুট জল বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে যায়। এমন সঠিক সময়-

মত বাঁধটি ভাঙে, যে হরিদ্বার অবধি গঙ্গার উপত্যকা বিধ্বস্ত করে, প্রতিটি সেতু ভাসিয়ে বন্যা বয়ে যায়, কিন্তু মৃত্যু হয় মাত্র একটি পরিবারের। বিপজ্জনক এলাকা থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সরিয়ে নিয়ে যাবার পরও, ওরা ওখানেই ফিরে গিয়েছিল।

শ্রীনগর থেকে ছাতিখাল, চড়াই-পথটি অত্যন্ত খাড়াই। তবে গঙ্গা-উপত্যকা ও কেদারনাথের ওপরে চির তুষাররাজ্যের মহান সৌন্দর্য আপনাকে সব কষ্ট ভুলিয়ে দেবে।

ছাতিখাল থেকে একদিনের পথ। তারপরই সামনে দেখুন গোলাবরাই। সার-সার ঘাসের ছাউনি-দেওয়া তীর্থযাত্রীদের থাকার ঘর, পাথরে তৈরি একটি এক-কামরা বাড়ি, পানীয় জলের একটি আধার। একটি ছোট্ট কাকচক্ষু পার্বত্য নদী এই বিশাল, প্রকাণ্ড জলাধারে জল যোগায়। পাইনগাছের চারা দিয়ে তৈরি সার-সার নালা বসিয়ে, পাহাড়ের গা দিয়ে, গ্রীষ্মে সন্তর্পণে নদী থেকে জলাধারে জল নামিয়ে আনা হয়। বছরের অন্যান্য ঋতুতে, শেওলা ও মেডেন-হেয়ার ফার্নে ঢাকা পাথরের ওপর দিয়ে, উজ্জ্বল সবুজ জলজলতা ও আকাশ-নীল স্ট্রৌবিলান্থ ফুলের ভিতর দিয়ে মহানন্দে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁধনহারা জল।

যাত্রীশালার একশো গজ পিছনে পথের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে একটি আমগাছ।

এই গাছটি, এটির ওপরে গোলাবরাই যাত্রীশালার মালিক পণ্ডিতের দোতলা বাড়িটি স্মরণযোগ্য। আমাকে যে কাহিনী বলতে হবে, ওদের এক বিশেষ ভূমিকা আছে।

আরো দু-মাইল হাঁটুন সমতল পথে। এখন বহুদিনের মত এই আপনার সমতল পথে শেষ হাঁটা। এবার আপনি রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছে গেলেন। আমার তীর্থযাত্রী বন্ধু, এখানেই আমাদের পরস্পরের কাছে বিদায় নিতে হবে। আপনার পথ চলে গেল অলকনন্দা পেরিয়ে মন্দাকিনীর বাঁ-তীর ধরে চড়াই পথে কেদারনাথে। আমার পথ গেছে পাহাড়গুলির ওপারে নৈনিতালে, আমার বাড়িতে।

অত্যন্ত খাড়া-চড়াই, অবিশ্বাস্য বন্ধুর এক পথ আপনার সামনে। এ-পথে আপনার মত লক্ষ-লক্ষ তীর্থযাত্রী হেঁটেছে। সাগরাঙ্কের চেয়ে উঁচু কোনো জায়গার বাতাসে আপনি বুক ভরে নিঃশ্বাস নেন নি। নিজের বাড়ির ছাতের চেয়ে উঁচু কোনো জায়গায় আপনি ওঠেন নি। নরম বালির চেয়ে শক্ত কোনো কিছু মাড়ায় নি আপনার পা। আপনি খুবই কষ্ট পাবেন।

এমন অনেক সময় আসবে যখন একটু নিঃশ্বাসের জন্যে হাঁপাতে-হাঁপাতে আপনি অত্যন্ত কষ্টে পাহাড়ের খাড়াই ভেঙে উঠবেন। বন্ধুর শিলা, তীক্ষ্ণ

ধার ফাটা-চটা মাটি, বরফজমাট পথ বেয়ে চলতে গিয়ে আপনার পা ফেটে রক্ত পড়বে। যে সম্ভাব্য লাভের সন্ধানে চলেছেন, তা এই যন্ত্রণার মূল্যের যোগ্য কি-না, এ প্রশ্ন আপনি নিজেই নিজেকে করবেন। তবু, সৎ হিন্দু বলে, আপনি কষ্ট করে হাঁটতেই থাকবেন। মনকে এই বলে বোঝাবেন, বিনাকষ্টে পুণ্যলাভ হয় না। ইহজীবনে যত বেশি কষ্ট করা যায়, পরকালে তত বেশি সুখ মেলে।





২

নরখাদক

হিন্দীতে "সঙ্গম"কে বলা হয় "প্রয়াগ"। কেদারনাথ থেকে নেমে এসেছে মন্দাকিনী, বদ্রীনাথ থেকে অলকনন্দা। রুদ্রপ্রয়াগে এসে দুটি নদী মিলেছে। এরপর থেকে দুটি নদীর মিলিত জলধারা সকল হিন্দুর কাছে "গঙ্গা মায়ী", এবং পৃথিবীর অন্য সর্বত্র "দি গ্যাঞ্জেস" নামে পরিচিত।

চিতা বা বাঘ, যাই হ'ক না কেন, যখন কোনো জানোয়ার নরখাদক হয়ে দাঁড়ায়, শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে কোনো জায়গার নামে তার নামকরণ করা হয়। একটি নরখাদককে ওই যে নাম দেওয়া হল, তার মানে কিন্তু সবসময়ে এই নয়, যে ওই বিশেষ জায়গাটিতেই জন্তুটির নরখাদক-জীবন শুরু হয়েছে, অথবা ওর সব শিকারই ওই একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ। কেদারনাথ তীর্থের পথে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বার মাইল দূরে একটি ছোট গ্রামে যে চিতা নরখাদক-জীবন শুরু করে, বাকি জীবনটা যে 'রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতা' নামেই তার পরিচয় থাকবে, এ খুবই স্বাভাবিক।

বাঘরা যে-কারণে নরখাদক হয়, চিতারা তা হয় না। আমাদের জঙ্গলের সকল জন্তুর মধ্যে চিতা সবচেয়ে সুন্দর, সাবলীল। জখম হলে, বা কোণঠাসা হলে সাহসে সে কারো চেয়ে কম যায় না। তবে এরা এমন মড়াখেকো, যে খিদের

জ্বালায় জঙ্গলে যে মড়া পায়, তাই খায়। ঠিক আফ্রিকার জঙ্গলের সিংহদের মত। এ-কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জাই করছে।

গাড়োয়ালের অধিবাসীরা হিন্দু, তাই তারা মৃতদেহ দাহ করে। দাহ অবশ্যই কোনো নদী বা ঝরনার ধারে হয়, যাতে ছাইগুলো ভেসে গঙ্গায় গিয়ে পড়ে, অবশেষে সমুদ্রে। গ্রামগুলো বেশির ভাগই উঁচু পাহাড়ের ওপর, এবং নদী বা ঝরনা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে বহু নিচে, উপত্যকার মধ্যে। কাজেই বোঝাই যায়, ছোট গ্রামে শবদাহের লোকজন যোগাড় করা বেশ কষ্টকর। কারণ শববাহক ছাড়াও জ্বালানী কাঠ যোগাড় করা ও বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেও লোক থাকা দরকার।

স্বাভাবিক সময়ে শবকৃত্যের কাজ নিখুঁতভাবেই সমপন্ন করা হয়। কিন্তু যখন রোগ মহামারীর আকারে পাহাড় ছারখার করে চলে যায়, যখন সদ্‌গতির ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে অনেক কম সময়ে তাড়াতাড়ি মানুষ মরতে থাকে, তখন গ্রামে একটি অত্যন্ত সহজ উপায়ে শবকৃত্য করা হয়। মৃতের মুখে একটি জ্বলন্ত কাঠকয়লা গুঁজে দিয়ে, পাহাড়ের কিনারা অবধি বয়ে নিয়ে গিয়ে শবটি নিচের উপত্যকায় ফেলে দেওয়া হয়।

স্বীয় এলাকায় স্বাভাবিক শিকারে ঘাটতি পড়লে, এই মৃতদেহগুলি পেলে পরে একটি চিতা খুব তাড়াতাড়ি মানুষের মাংসের স্বাদে আসক্ত হয়ে পড়ে। মড়ক চলে গেলে আবার সব কিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তখন খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল দেখে চিতাটি অত্যন্ত স্বাভাবিকতায় মানুষ মারতে শুরু করে। ১৯১৮ সালে দেশ জুড়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার মড়ক দেখা দেয়। ভারতে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা পড়ে। এ মড়কে কঠিন মূল্য দিতে হয় গাড়োয়ালকে। এই মহামারীর শেষেই গাড়োয়ালের নরখাদক আত্মপ্রকাশ করে।

১৯১৮ সালের ৯ই জুন, বেঁজি গ্রামে রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতা প্রথম মানুষ মারে, নথিতে লেখা আছে। সর্বশেষ যে মৃত্যুর জন্য নরখাদকটি দায়ী, তা ১৯২৬ সালের ১৪ই এপ্রিল ভৈঁসোয়ারা গ্রামে ঘটে। সরকারী নথিতে লেখা আছে। এই দুটি তারিখের অন্তর্বর্তী সময়ে একশো পঁচিশ জন মানুষ মারা পড়ে।

তখন গাড়োয়ালে যে সরকারী কর্মচারীরা কাজ করছিলেন, যে-অঞ্চলে নরখাদকটি ঘুরছিল, সেখানে যে অধিবাসীরা ছিলেন, তাঁরা এই একশো পঁচিশ জন মৃতের সংখ্যা সঠিক বলে কতটা দাবি করেন তা আমি জানি না। তবে আমি নিজে জানি এ সংখ্যা সঠিক নয়। আমি যখন ওখানে ঘুরছি তখন কিছু-কিছু মানুষ নিহত হয়। সরকারী নথিতে সে হিসাব দেখানো হয় নি।

যতগুলি মানুষের মৃত্যুর জন্য নরখাদকটি সত্যিই দায়ী, হিসাবে সে-সংখ্যা কম দেখানোর জন্য, গাড়োয়ালের অধিবাসীরা দীর্ঘ আট বছর ধরে যে-যন্ত্রণা

সহ্য করেছে, তাকে আমি খাটো করছি না। ওটি সর্বকালের সবচেয়ে খ্যাত নরখাদক চিতা বলে গাড়োয়ালের লোকরা দাবি জানায়, জানোয়ারটির সে খ্যাতিও আমি কিছুতেই হ্রাস করতে চাই না।

যাই হ'ক, নিহত মানুষের সংখ্যা যাই হয়ে থাকুক, গাড়োয়ালী এ দাবি করতে পারে যে এই চিতাটি চিরকালের সকল জীবিত প্রাণীর মধ্যে সর্বাধিক প্রচার-প্রখ্যাত প্রাণী। আমার জানা আছে, যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, মালয়, হংকং, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীলণ্ড এবং ভারতের অধিকাংশ সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজে চিতাটির কথা উল্লেখ করা হয়।

সংবাদপত্রে এই প্রচার ছাড়াও, যে ষাট হাজার তীর্থযাত্রী বছর-বছর কেদার-নাথ ও বদ্রীনাথের দেবপীঠ দর্শনে যায়, তারা এই নরখাদকের গল্প ভারতের সর্বত্র বয়ে নিয়ে যায়।

নরখাদক দ্বারা নিহত বলে কথিত যে-কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই একটি সরকারী নিয়ম আছে। নিহত হবার পর যত তাড়াতাড়ি হয়, নিহতের আত্মীয় বা বন্ধুরা গ্রাম-পাটোয়ারীর কাছে গিয়ে রিপোর্ট দাখিল করবে। সেটি পেলেই পাটোয়ারী ঘটনাস্থলে যাবে। ও পৌঁছবার আগে নিহতের দেহ খুঁজে না পেয়ে থাকলে, ও নিজে তল্লাসীর লোকজন যোগাড় করবে। সেই দলের সহায়তায় পাটোয়ারী নিহতকে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালাবে।

ও পৌঁছবার আগে যদি মড়া খুঁজে পাওয়া যায়, যদি তল্লাসী-দল মড়া খুঁজে পায়, পাটোয়ারী তখনি সরেজমিন তদন্ত করবে। এটি খুনের কেস নয়, সত্যিই নরখাদকই একে মেরেছে, এ বিষয়ে নিজে নিশ্চিত হবার পর, তবে নিহতের জাত-ধর্ম অনুযায়ী পাটোয়ারী, শব সৎকার বা সমাধিদানের অনুমতি দেবে আত্মীয়দের।

ও-অঞ্চলে নরখাদকটির কার্যকলাপ বিষয়ে ওর যে সরকারী-খাতা আছে, তাতে এই হত্যার ঘটনা যথাসময়ে নথিভুক্ত হবে। জেলার প্রশাসনিক মুখ্য ডেপুটি-কমিশনারের কাছে ঘটনাটির একটি সম্পূর্ণ বিবরণী দাখিল করা হবে। তিনিও একটি রেজিস্টার রাখেন। তাতে নরখাদকটির প্রত্যেক নরহত্যার কথা নথিভুক্ত করা হয়।

শিকারকে বহু দূর বয়ে নিয়ে যাওয়া নরখাদকদের একটা বদ অভ্যাস। কাজেই মাঝে-মধ্যে এমনও হয়, যে মৃতদেহ, অথবা তার কোনো অংশই পাওয়া গেল না। সে ক্ষেত্রে কেসটি আরো তদন্ত-সাপেক্ষ থাকে। সংশিলষ্ট নরখাদকটিকে ওই মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে ধরা হয় না। নরখাদক যখন মানুষ জখম করে, জখমের ফলে যদি লোকজন মারা পড়ে, তখনো সে মৃত্যুগুলির কারণ নরখাদকটি, তা দেখানো হয় না।

অতএব দেখা যাচ্ছে, নরখাদকগুলির নরহত্যার হিসাব নথিভুক্ত করার জন্য গৃহীত নিয়ম যথাসম্ভব ভালই। তবু, এই অস্বাভাবিক জানোয়ারগুলির মধ্যে কোনো একটিকে, শেষ অবধি যতগুলি মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে ধরা হল—তার চেয়ে বেশি মানুষ সে মেরেছে, এও এভাবে সম্ভব। বিশেষ করে, বহু বছর ধরে যখন সে হানা দিতে থাকে, তখন।





৩

সন্ত্রাস

"সন্ত্রাস" শব্দটা দৈনন্দিন তুচ্ছ ব্যাপারে অত্যন্ত সাধারণ ও সার্বিকভাবে ব্যবহার হয়। ফলে, প্রয়োজনের সময়ে এর প্রকৃত অর্থ প্রকাশে শব্দটি অক্ষম হলেও হতে পারে। তাই, নরখাদক যেখানে হানা দিয়ে ফিরছিল, গাড়োয়ালের সেই পাঁচশো বর্গ মাইলের পঞ্চাশ হাজার অধিবাসী এবং ১৯১৮ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে প্রতি বছর যে ষাট হাজার তীর্থযাত্রী ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করেছিল, তাদের কাছে সন্ত্রাস—প্রকৃত সন্ত্রাসের সংজ্ঞা কি, আমি আপনাদের তার সামান্য ধারণা দিতে চেষ্টা করব। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে অধিবাসী ও তীর্থযাত্রীদের সন্ত্রাসের কারণটা বোঝাব।

রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতা যা জারী করে, তার চেয়ে কঠোরতর কোনো সান্ধ্য-আইন কোনোদিন বলবৎ করা হয় নি, এমন অমোঘতায় মান্য করাও হয় নি।

দিনের আলোয় ওই এলাকার জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবেই চলত। পুরুষরা দূরের বাজারে কেনাবেচার জন্যে, কিংবা কাছের গ্রামে বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যেত। মেয়েরা পাহাড়ের গা থেকে ঘরের চাল ছাইবার, বা গরুর ঘাস কাটতে যেত। বাচচারা স্কুলে যেত। নইলে ছাগল চরাতে বা শুকনো কাঠ কুড়োতে জঙ্গলে যেত। গ্রীষ্মে তীর্থযাত্রীরা হয় একা, নয় দল বেঁধে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের দেবপীঠে যাওয়া-আসা করত তীর্থপথে।

সূর্য যখন পশ্চিম দিগন্তে পেঁাছত, ছায়া দীর্ঘ হতে থাকত, তখন এলাকা-

টির সকল মানুষের গতিবিধি ব্যবহারে একটি অতি আকস্মিক, লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিত।

যে পুরুষরা ধীরেসুস্থে বাজারে অথবা কাছের গ্রামে গিয়েছিল তারা দ্রুত ফিরে আসত ঘরে। ঘাসের মস্ত বোঝা পিঠে মেয়েরা পাহাড়ের খাড়াই-ঢাল বেয়ে হুড়মুড় করে নামতে থাকত। যে বাচ্চারা স্কুল থেকে ফেরার সময়ে পথে, অথবা ছাগলের পাল, অথবা শুকনো কাঠ নিয়ে ফিরতে দেরি করছে, মা-রা গভীর উৎকণ্ঠায় তাদের ডাকাডাকি করত। পথে, শ্রান্ত তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে যে স্থানীয় বাসিন্দার দেখা হত, সেই তাদের তাড়াতাড়ি যাত্রীশালায় চলে যেতে বলত।

রাত নামার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত এলাকায় থমথম করত এক অশুভ নৈঃশব্দ্য। কোথাও কোনো গতিবিধি, কোনো আওয়াজ নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের সবাই বন্ধ দরজার পিছনে। বহু ক্ষেত্রে বাড়তি দরজা লাগিয়ে তারা অধিকতর নিরাপত্তা খুঁজত। বাড়ির ভিতরে ঠাঁই পাবার ভাগ্য যে তীর্থযাত্রীদের হয় নি, তারা যাত্রীশালায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকত। কি বাড়ির ভিতরে, কি যাত্রীশালায়, সবাই সেই ভয়ঙ্কর নরখাদক সাড়া পাবার ভয়ে চুপ করে থাকত। দীর্ঘ আট বছর ধরে গাড়োয়ালের বাসিন্দা ও তীর্থযাত্রীদের কাছে সন্ত্রাস শব্দের সংজ্ঞা ছিল এই।

আমি এবার কয়েকটি ঘটনার দৃষ্টান্ত দেব। দেখাব এ সন্ত্রাসের কারণ কি।

একটি চোদ্দ বছরের অনাথ ছেলেকে চল্লিশটা ছাগলের তদারকীর চাকরি দেওয়া হয়। ছেলেটি অনুন্নত, অস্পৃশ্য শ্রেণীর। প্রতি সন্ধ্যায় ও যখন ছাগল নিয়ে ফিরত, ওকে খেতে দেওয়া হত। তারপর ছাগলগুলোর সঙ্গে একটি ছোট ঘরে বন্ধ করে রাখা হত। ঘরটা ছিল লম্বা সার-বাঁধা কয়েকটি দোতলা বাড়ির একতলায়, ছেলেটির মনিব, ছাগলগুলোর মনিব যে-ঘরে থাকত, তার ঠিক নিচে। ঘুমের মধ্যে পাছে ছাগলগুলো ওর গায়ে এসে পড়ে, সেইজন্য ছেলেটি ঘরের ভিতরের বাঁ-কোণটি বেড়া বেঁধে ঘিরে নিয়েছিল।

এই ঘরে শুধু একটি দরজা, কোনো জানলা ছিল না। ছেলেটি আর ছাগলগুলি নিরাপদে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লে পরে ছেলেটির মনিব দরজা টেনে শেকল বন্ধ করত। পাল্লার সঙ্গে আঁটা শেকলের মুখটা চৌকাঠে বসানো আংটায় গলিয়ে দিত। শেকলের মুখ যাতে না খোলে, সে-জন্যে আংটার ভিতর এক-টুকরো কাঠের গোঁজ ঢোকানো হত। আরো নিরাপত্তার জন্য ছেলেটি ঘরের ভিতর দিকে একটা পাথর গড়িয়ে এনে দরজার গায়ে ঠেকিয়ে রাখত।

ছেলেটির মনিব বলে, যে-রাতে ছেলেটিকে ওর পূর্বপুরুষরা ডেকে নেয়, সে-রাতেও দরজা যথারীতিই বন্ধ ছিল। ওর কথার সত্যতাকে সন্দেহ করার

কোনো কারণ পাই নি আমি। দরজার গায়ে অনেকগুলি নখের গভীর আঁচড় ওর উক্তিকে সমর্থনই করে। এও সম্ভব যে আঁচড়ে দরজা খোলার চেষ্টা করার সময়ে আংটার মুখের কাঠের গোঁজটা খুলে ফেলে চিতাটা। তারপর পাথরটা ঠেলে সরিয়ে ঘরে ঢোকা তার পক্ষে সহজ হবার কথা।

একটি ছোট ঘরে চল্লিশটা ছাগল গাদাগাদি করে ঠাসা। একটি কোণ বেড়া দিয়ে ঘেরা। এতে, নড়াচড়া করার বেশি জায়গা পাবার কথা নয় চিতাটার। দরজা থেকে, ছেলেটি যেখানে, ঘরের সে-কোণ অবধি দূরত্বটুকু চিতাটা ছাগলগুলোর পিঠের উপর দিয়ে গিয়েছিল, না পেটের তলা দিয়ে তা অনুমানসাপেক্ষ। কেন না, ও চলবার সময়ে ছাগলগুলোর প্রত্যেকটা নিশ্চয় দাঁড়িয়ে উঠেছিল।

জোরে দরজা ঠেলে খোলার চেষ্টায় চিতাটা যে শব্দ করে, চিতাটা ঘরে ঢোকার পর ছাগলগুলোও নিশ্চয় গোলমাল করে। এই সব গন্ডগোলের মধ্যেও ছেলেটি নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছিল মনে করাই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যেই সে সাহায্যের জন্যে বৃথা চেঁচায় নি। যে আতঙ্ক তাকে সন্ত্রস্ত করেছিল, সে আতঙ্ক এবং ওর নিজের মধ্যে ব্যবধান তো একটি পাতলা তক্তা।

ছাগলগুলো রাতের আঁধারে পালিয়ে বাঁচে। বেড়া-ঘেরা কোণে ছেলেটিকে মেরে চিতাটা ওকে বয়ে শূন্য ঘর পেরিয়ে যায়। নেমে যায় পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে। তারপর কয়েকটা স্তর-কাটা খেত পেরিয়ে নেমে যায় পাহাড়ের পাথর-ছড়ানো গিরিখাতের বুকে। সূর্যোদয়ের কয়েক ঘণ্টা বাদে ওখানেই ছেলেটির মনিব ওর চাকরের দেহের যতটুকু চিতাটার ভুক্তাবশেষ, তা খুঁজে পায়।

অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু চল্লিশটা ছাগলের একটার গায়েও এমন কি একটা আঁচড়ও লাগে নি।

এক প্রতিবেশী এসেছিল বন্ধুর বাড়িতে একটু ধীরেসুস্থে ধূমপান করতে। ঘরটির আকার ইংরেজী "L"' (বড় হাতের 'এল্') বর্ণের মত। যেখানে দুজন মেঝেয় বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে তামাক খাচ্ছিল, সেখান থেকে ঘরের একমাত্র দরজাটা চোখে পড়ে না। দরজাটা ভেজানো, কিন্তু আটকানো নয়। কারণ সে-রাত অবধি গ্রামের একটি মানুষও মারা পড়ে নি।

ঘর অন্ধকার। ঘরের মালিক সবে ওর বন্ধুর হাতে হুঁকোটা দিয়েছে, অমনি হুঁকোটা মাটিতে পড়ে গেল। ছিটিয়ে গেল এক পসলা জ্বলন্ত কাঠ-কয়লা আর তামাক। ও ওর বন্ধুকে আরো হুঁশিয়ার হতে বলল, নইলে যে কম্বলে ওরা বসে আছে তাতেই বন্ধু আগুন ধরিয়ে ফেলবে। এই বলে, জ্বলন্ত কাঠকয়লাগুলো কুড়োবার জন্যে ও সামনে ঝুঁকল। যেমন ঝুঁকেছে, দরজাটা চোখে পড়ল। নতুন চাঁদ প্রায় ডুবুডুবু। চাঁদের পশ্চাৎপটের

সিল্যুয়েটে লোকটি দেখল, একটা চিতা ওর বন্ধুকে বয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দরজা দিয়ে।

কয়েক দিন পরে এই ঘটনার বিবরণী আমাকে দিতে-দিতে লোকটি বলে, "যখন চিতাটা আমার বন্ধুকে মারছিল, যখন বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি, আমার বন্ধুর কাছ থেকে এমন কি একটা শ্বাস টানার, বা অন্য কোনো শব্দই পাই নি। অথচ আমার এক হাতের মধ্যে ও বসেছিল। এ কথা যখন বলি, তখন সত্যি কথাই বলি সাহেব। বন্ধুর জন্যে তো কিছুই করার ছিল না আমার। তাই চিতাটা চলে যাবার পর কিছুক্ষণ সবুর করে আমি হামাগুড়ি দিয়ে দরজা অবধি যাই। তারপর তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিই।"

এক গ্রামপ্রধানের স্ত্রী জ্বরে ভুগছিল। ওর শুশ্রূষার জন্যে ওর দু বন্ধুকে ডাকা হয়।

বাড়িতে দুটি ঘর। বাইরের ঘরে দুটি দরজা। একটির মুখ একটা ছোট টালি পাথরে বাঁধানো উঠোনের দিকে। অন্যটি দিয়ে ভিতরের ঘরে যাওয়া যায়। বাইরের ঘরে, মেঝে থেকে প্রায় চার ফুট উঁচুতে সংকীর্ণ একফালি একটা জানলাও ছিল। জানলাটা খোলা। জানলার মুখে পিতলের একটা বড় ঘড়া। ঘড়ায় রোগিণীর জন্য খাবার জল।

বাইরের ঘরে যাবার একটি দরজা ছাড়া ভিতরের ঘরের চার দেওয়ালের একটিতেও একটা ছিদ্র অবধি নেই।

উঠোনে বেরোবার দরজাটা বন্ধ, শক্ত করে আঁটাসাঁটা। দু-কামরার মাঝের দরজাটা হাট করে খোলা।

ভিতরের ঘরে তিনটি মেয়েই মাটিতে শুয়েছিল। রোগিণী মাঝখানে, দু-পাশে দুই বন্ধু। বাইরের ঘরে, জানলাটির খুব কাছ বরাবর একটি খাটে শুয়েছিল মহিলার স্বামী। ওর খাটের পাশে মেঝের ওপর লণ্ঠন, যাতে লণ্ঠনের আলো ভিতরের ঘরে গিয়ে পড়ে। তেল বাঁচাবার জন্য লণ্ঠনের পলতেটা নামানো।

মাঝরাত বরাবর, দু-ঘরের বাসিন্দারাই যখন ঘুমোচ্ছে, চিতাটা ওই সরু একফালি জানলা দিয়ে ঢোকে। পিতলের ঘড়াটা প্রায় জানলা জোড়া। কোনো অলৌকিক উপায়ে চিতাটা ঘড়া ফেলে-দেওয়াটা বাঁচায়। পুরুষটির নিচু খাটটি ঘুরে গিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে রোগিণীকে মারে। চিতাটা যখন ওর শিকার তুলে ধরে জানলা দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করে, তখন ভারি পিতলের ঘড়াটা সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ে। একমাত্র তখনই নিদ্রিতেরা জেগে ওঠে।

লণ্ঠনের পলতে বাড়াবার পর দেখা যায় অসুস্থ মহিলাটি তালগোল পাকিয়ে জানলার নিচে পড়ে আছে। গলায় চারটে বড়-বড় দাঁতের দাগ।

সে-রাতে শুশ্রূষাকারিণীদের মধ্যে একজন হল এক প্রতিবেশীর স্ত্রী। আমাকে ঘটনার বিবৃতি দেওয়ার সময়ে প্রতিবেশীটি বলে, "মেয়েটা জ্বরে খুব ভুগছিল। ও হয়তো মারা যেতই। ভাগ্য ভাল যে চিতাটা ওকেই বেছে নেয়।"

দু'জন গুজার ওদের ত্রিশটা মোষের পাল নিয়ে চরাই (চারণভূমি) থেকে আরেকটায় ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিল। লোক দুটি সহোদর ভাই। বড় ভাইয়ের বার বছরের মেয়েটি ওদের সঙ্গে ছিল।

ওরা ও-অঞ্চলে নবাগত। হয় ওরা নরখাদকটির কথা শোনেই নি। কিংবা ওদের যতটা নিরাপদ-প্রহরায় রাখা দরকার, মোষগুলোই তা করতে পারবে, এ রকমটা ভাবা আরো সম্ভব।

পথের কাছে, আট হাজার ফুট উচ্চতায় সরু একফালি সমভূমি। তার নিচে প্রায় পনের কাঠা চওড়া কাস্তে-আকৃতির স্তর-কাটা খেত। খেতটি বহুদিন অনাবাদে পড়ে আছে। লোক দুটি আস্তানার জন্য এই জায়গাটিই বেছে নিল। ওদের চারপাশ ঘেরা জঙ্গল। সেখান থেকে খোঁটা কেটে এনে খেতে শক্ত করে পুঁতে মোষগুলোকে লম্বা সারে বাঁধল।

মেয়েটি রাঁধল। রাতের খাওয়া সেরে, রাস্তা আর মোষগুলোর সারির মাঝামাঝি সরু ফালি জমিটায় কম্বল বিছিয়ে তিনজনই ঘুমিয়ে পড়ল।

সে এক গাঢ় অন্ধকারের রাত। মোষের গলার ঘণ্টার ঢঙ ঢঙানিতে, ভীত পশুগুলির ফোঁসফোঁসানিতে, ভোরের দিকে পুরুষ দুজনের ঘুম ভেঙে যায়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে ওরা জানত এই শব্দগুলি হচ্ছে কোনো মাংসাশী জানোয়ারের উপস্থিতির প্রমাণ। ওরা একটি লণ্ঠন জ্বালল। মোষগুলোকে শান্ত করতে গেল। দেখতে গেল যে একটি মোষও যেন খোঁটায় বাঁধা দড়ি না ছেঁড়ে।

ওরা গিয়েছিল মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। যখন শোয়ার জায়গায় ফিরে এসেছে, তখন দেখে মেয়েটি বেপাত্তা। ওরা যাওয়ার সময়ে মেয়েটি ঘুমোচ্ছিল। যে কম্বলে ও শুয়েছিল তাতে রক্তের বড়-বড় ছাপ।

আলো ফুটতে বাবা আর কাকা রক্তের দাগ অনুসরণ করে। রক্তের দাগ খোঁটায় বাঁধা মোষের সারি ঘুরে গিয়ে, সরু খেতটা পেরিয়ে পাহাড়ের খাড়াই ঢাল বেয়ে কয়েক গজ নিচে নেমে যায়। সেখানেই চিতাটা তার শিকার খেয়েছে।

"আমার দাদার জন্মটাই খারাপ লগ্নে সাহেব! কেননা ওর কোনো ছেলে নেই, এই একটি মেয়ে মাত্র ছিল। মেয়েটির শীগ্‌গির বিয়ে হবার কথা। ভরা বয়সে ওই মেয়েটিই ওকে উত্তরাধিকারী যোগাবে বলে দাদা আশা করেছিল। এখন এই চিতাটা এসে ওকেই খেল।"

আরো বলে চলতে পারি আমি। কেন না বহু লোক মারা পড়েছে। প্রত্যেক মৃত্যুরই নিজস্ব এক করুণ কাহিনী আছে। তবে আমার মনে হয়, রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতা বিষয়ে গাড়োয়ালের বাসিন্দাদের যে সন্ত্রস্ত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল, তা আপনাদের বোঝাবার পক্ষে আমিও যথেষ্টই বলেছি। বিশেষ করে মনে রাখা দরকার, গাড়োয়ালীরা অত্যন্ত কুসংস্কারগ্রস্ত। চিতাটার সঙ্গে শারীরিক সংস্পর্শে আসার ভয় তো ছিলই! তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অলৌকিকতা বিষয়ে গাড়োয়ালীদের দারুণতর ভয়। আমি তার একটা দৃষ্টান্ত আপনাদের দিচ্ছি।

এক সকালে, ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে-সঙ্গে আমি রুদ্রপ্রয়াগের ছোট, এক-কামরা ইন্‌সপেক্‌শন বাংলো থেকে বেরোই। বারান্দা থেকে নেমেই মানুষের পায়ে-পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া জমির ধুলোয় নরখাদকটার থাবার ছাপ দেখলাম।

ছাপগুলো একেবারে টাটকা। বোঝা গেল, আমার মাত্র কয়েক মিনিট আগে চিতাটা বারান্দা থেকে নেমে গেছে। থাবার ছাপ যে-দিক পানে গেছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, বাংলোয় আসার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াতে চিতাটা পঞ্চাশ গজ খানেক দূরে তীর্থ-পথের দিকে যাচ্ছে। জমির ওপরটা বেজায় শক্ত। তাই বাংলো আর তীর্থ-পথের মাঝামাঝি জায়গায় থাবার ছাপ অনুসরণ করা সম্ভব হল না। তবে গেটের কাছে পৌঁছতেই দেখি, থাবার ছাপ গোলাব্‌রাইয়ের দিকে যাচ্ছে। গত সন্ধ্যায় ওই পথে ভেড়া-ছাগলের এক বড় পাল গেছে। ওদের খুরে ওড়ানো ধুলোর ওপরেও চিতাটার থাবার ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এত স্পষ্ট, যেন টাটকা-পড়া তুষারের ওপর থাবার ছাপ পড়েছে।

নরখাদকটার থাবার ছাপের সঙ্গে ততদিনে আমার দিব্যি পরিচয় হয়ে গিয়েছে। প্রায় অনায়াসে যে-কোনো একশো চিতার থাবার ছাপের মধ্যেও আমি ওর থাবার ছাপ আলাদা করে চিনে নিতে পারি।

মাংসাশী পশুর থাবার ছাপ থেকে অনেক কিছু জানা যায়। যেমন, প্রাণীটি মদ্দা না মাদী, তার বয়েস, তার শরীরের আয়তন। প্রথম যখন দেখি, তখনি নরখাদকটির থাবার ছাপ আমি খুব যত্ন করে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিলাম। আমি জানতাম, ওটা একটা অতিকায় মদ্দা চিতা, ওর যৌবন পার করেছে বহুকাল আগে।

এই সকালে নরখাদকটার থাবার চিহ্নের পেছু-পেছু চলতে-চলতে দেখলাম, ও আমার চেয়ে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ এগিয়ে আছে। চলছে মন্থর স্থির গতিতে।

এত কাকভোরে পথে কোনো লোক চলাচল নেই। পথটা এঁকেবেঁকে অসংখ্য ছোট গিরিকন্দরে ঢুকেছে আর বেরিয়েছে। অতি সাবধানে আমি প্রতিটি

মোড়ের বাঁক ঘুরছিলাম। কেননা ভোরের আলো ফোটার পর কখনো না-বেরুবার নীতি এবারটা ও না মানতেও পারে, সে সম্ভাবনা আছে। তারপর, মাইলখানেক গিয়ে দেখলাম, চিতাটা পথ ছেড়ে একটা বড় জংলা পথ ধরে ঝোপ-ঝাড় ও গাছের ঘন জংগলে ঢুকে গেছে।

চিতাটা যেখানে রাস্তা ছেড়েছে, সেখান থেকে একশো গজ দূরে একটা ছোট খেত। তার ঠিক মাঝখানে একটা কাঁটাঝোপে ঘেরাও জায়গা। খেতের মালিক ওটি তৈরি করেছে। যাতে পশুচারকরা ওখানে আসতে উৎসাহ পায়, ওর জমিটাও সার পায়। গত সন্ধ্যায় তীর্থ-পথে ধরে যে ছাগল ভেড়ার পাল এসেছে, তা এই ঘেরাও জায়গাতেই ছিল।

পালের মালিক একটি বলিষ্ঠ পুরুষ। চেহারা দেখলে মনে হয় প্রায় আধ শতাব্দী ধরে ও ব্যবসার মাল নিয়ে তীর্থ-পথে যাওয়া-আসা করছে। আমি যখন এসে পেঁছিলাম তখন ও সবে ঘেরাও জায়গায় ঢোকার মুখের কাঁটাঝোপের ঝাঁপটা সরাচ্ছিল। আমার প্রশ্নের জবাবে ও বলল, চিতাটার চিহ্নমাত্রও ও দেখে নি বটে, তবে সবে যখন ভোরের আলো ফুটছে, তখন ওর পালরক্ষী প্রহরী কুকুর দুটো ডেকে ওঠে। কয়েক মিনিট বাদে পথের উপরের জঙ্গলে একটি কাকার হরিণ ডাকে। আমি যখন বুড়ো মালবাহককে জিগ্যেস করলাম, ওর একটা ছাগল আমায় বেচবে কিনা, ও জিগ্যেস করলে কি উদ্দেশ্যে আমি ছাগল চাইছি। যখন বললাম, নরখাদকটার টোপ হিসেবে বেঁধে রাখবার জন্যে, ও বেড়া ছেড়ে বেরিয়ে এল। ঝাঁপ দিয়ে মুখটা বন্ধ করে আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিল। পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বসল।

কিছুক্ষণ আমরা ধূমপান করলাম। আমার প্রশ্নের কোনো জবাব মিলল না। তারপর ও কথা বলতে শুরু করল। আপনি নিশ্চয় সেই সাহেব! বদ্রীনাথের কাছে আমার গ্রাম থেকে নামার সময়ে আমি আপনার কথা শুনেছি। আমার দুঃখ হচ্ছে, মিছেমিছি বাড়িঘর ছেড়ে এত দূরে এতটা পথ এলেন আপনি! এ অঞ্চলের প্রতিটি নরহত্যার জন্য দায়ী ও দুষ্ট আত্মাটা কোনো জানোয়ারই নয়। আপনি ভাবছেন ওটা জানোয়ার। গুলি-গোলা দিয়ে ওটাকে মারা যাবে। অথবা, আপনার আগে অন্যরা ওটাকে মারার যে-সব পন্থা ভেবেছে, আপনিও যা ভাবছেন, সে উপায়ে ওটাকে মারা যাবে। এই দ্বিতীয় সিগারেটটা টানতে-টানতে আমার কথার প্রমাণস্বরূপ আমি আপনাকে একটা গল্প বলছি। গল্পটা আমাকে বলেছিলেন আমার বাবা। সবাই জানে কেউ তাঁকে কখনো মিছে কথা বলতে শোনে নি।

"আমার বাবার তখন জোয়ান বয়স। আমি তখনো জন্মাই নি। এখন যেটা এ অঞ্চলে উপদ্রব করছে, ঠিক এর মত একটা দুষ্ট আত্মা আমাদের গ্রামে হানা দেয়। সবাই বলে, এ একটা চিতা। পুরুষ-মেয়েছেলে বাচ্চা বাড়িতে বাড়িতে

নিহত হতে থাকে। জানোয়ারটাকে মারার জন্যে, এখানে যেমন হচ্ছে, ওখানেও সব রকমই চেষ্টা করা হয়। ফাঁদ পাতা হয়। বহুখ্যাত অব্যর্থ শিকারীরা কাছে বসে চিতাটাকে গুলি-গোলা মারে। ওটাকে মারার এই স--ব চেষ্টা ব্যর্থ হলে পরে মানুষ ভীষণ আতঙ্কে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়ের মাঝামাঝি সময়ে কেউ ঘরের আশ্রয় ছেড়ে বেরোতে সাহস করত না।

"তারপর আমার বাবার গ্রাম, আর আশপাশের গ্রামের প্রধানরা সকলকে পঞ্চায়েতে হাজির হতে হুকুম দেয়। সবাই হাজির হলে পরে তারা সভাকে উদ্দেশ করে বলে, এই নরখাদক চিতাটার হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো নতুন পন্থা খুঁজে বের করতে হবে! একটি বুড়োর নাতি গত রাতে নিহত হয়। সদ্য-সদ্য সে শ্মশানঘাট থেকে ফিরেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ওর পাশে শুয়ে ওর নাতি ঘুমোচ্ছিল। বাড়িতে ঢুকে কোনো চিতা নাতিকে মারে নি। মেরেছে নিজেদের মধ্যেই কেউ। যখন মানুষের রক্ত-মাংসের লোভ জাগে, তখন সে চিতা রূপ ধরে। যে-সব চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে যে তাকে মারা যাবে না, তার প্রমাণ তো যথেষ্টই মিলল। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে একমাত্র মারা যেতে পারে ওকে। বুড়ো বলে, ভাঙা মন্দিরের কাছের কুঁড়েঘরে যে মোটা সাধু থাকে, ওর তাকে সন্দেহ হচ্ছে।

"এ কথায় বেজায় হইহল্লা বেধে যায়। কেউ বলে, নাতি মরার শোকে বুড়ো পাগল হয়ে গিয়েছে। আবার অন্যেরা বুড়োকে সমর্থন করে। এদের পরে মনে পড়ে যখন থেকে নরহত্যা শুরু হয়, সেই সময়েই সাধুটা গ্রামে এসেছে বটে। সকলের আরো মনে পড়ে, একটা মানুষ মারা পড়ার পরদিন সাধুটা বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়ে সারা দিন ধরে ঘুমোয়।

"সবাই শান্ত হলে ব্যাপারটা নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক চলে। অবশেষে পঞ্চায়েত স্থির করে, এখনি কিছু করা হবে না। তবে ভবিষ্যতে সাধুর গতি-বিধির ওপর নজর রাখা উচিত হবে। জমায়েতী লোকজনকে তিন দলে ভাগ করা হয়। যে-রাতে এবার নরহত্যা হতে পারে বলে অনুমান, সেই রাত থেকে প্রথম দল লক্ষ রাখতে শুরু করবে। মোটামুটি নিয়মবাঁধা সময় বাদে-বাদেই হত্যাগুলো ঘটছিল।

"প্রথম ও দ্বিতীয় দল যখন পাহারা দেয়, সে-সব রাতে সাধুটা ঘর ছেড়ে বেরোল না।

"আমার বাবা ছিলেন তৃতীয় দলের সঙ্গে। রাতে উনি নিশ্চুপে নিজের জায়গায় দাঁড়ালেন। একটু বাদেই কুঁড়ের দরজা আস্তে খুলে গেল। সাধুটা বেরিয়ে এসে রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা বাদে দূরে পাহাড়ের গায়ে অনেক উঁচুতে এক কাঠকয়লা-জ্বালানীওয়ালার কুঁড়েঘরের দিক থেকে,

রাতের বাতাসে ভেসে নিচে এসে পৌঁছল একটি যন্ত্রণার্ত আর্ত চীৎকার। তারপর সব নিঃশব্দ।

"আমার বাবার দলের কেউ সে-রাতে দু-চোখের পাতা এক করে নি। পুব আকাশে যখন নতুন দিনের আলো দেখা দিচ্ছে, ওরা দেখল সাধু বাড়ির দিকে ছুটছে। সাধুর হাত আর মুখ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

"সাধু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে পাহারাদাররা এগিয়ে গেল। ঝুলন্ত শিকল চৌকাঠের আংটায় গলিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করল দরজাটা। তারপর প্রত্যেকে গিয়ে নিজের-নিজের খড়ের গাদা থেকে একটা করে বড় খড়ের আঁটি নিয়ে ফিরে এল। সকালে সূর্য যখন উঠল, তখন যেখানে কুঁড়েটা ছিল, সেখানে জ্বলন্ত, ধূমন্ত ছাই ছাড়া কিছুই নেই। সেদিন থেকেই নরহত্যাও বন্ধ হল।

"এ অঞ্চলের বহু সাধুর কারো ওপরই এ পর্যন্ত সন্দেহের নজর পড়ে নি। তবে যখন পড়বে, তখন আমার বাবার সময়ে যে পন্থায় কাজ হয়েছিল, আমার কালেও তাতেই কাজ হবে। সেদিন না-আসা পর্যন্ত গাড়োয়ালের লোকের দুর্ভোগ চলতেই থাকবে।

"জিগ্যেস করছিলেন, আপনাকে একটা ছাগল বেচব কিনা। ছাগল আমি বেচব না সাহেব। বাড়তি ছাগল একটাও নেই আমার। যেটাকে আপনি নরখাদক চিতা ভাবছেন, আমার গল্প শোনার পরও যদি তার টোপের জন্যে কোনো পশু বেঁধে রাখতে চান, আমি আপনাকে একটা ভেড়া ধার দেব। যদি ভেড়াটা মারা পড়ে, আপনি আমাকে তার দাম দিয়ে দেবেন। যদি না পড়ে, তবে আমাতে-আপনাতে কোনো টাকা লেনদেন হবে না। আজকের দিনটা আর রাতটা আমি জিরোব এখানে। কাল ভুটিয়া তারা (শুকতারা) ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।"

সূর্যাস্তের সম-সম কালে সন্ধ্যায় আমি সেই কাঁটাঝোপ-ঘেরাও জায়গায় ফিরে গেলাম। আমার মালবাহী বন্ধু মহানন্দে ওর পাল থেকে একটা মোটা ভেড়া আমায় বেছে নিতে দিল। মনে হল ভেড়াটার ওজন যা, তাতে চিতাটার দু রাতের খোরাকি হয়ে যাবে। প্রায় বার ঘণ্টা আগে যে-পথে চিতাটা গেছে, তার কাছাকাছি ঝোপ-জঙ্গলে আমি ভেড়াটা বেঁধে রাখলাম।

পরদিন সকালে খুব ভোরে উঠলাম। বাংলো থেকে বেরোচ্ছি, আবার দেখি বারান্দা থেকে নরখাদকটা যেখানে নেমেছে, সেখানে তার থাবার ছাপ। গেটে পৌঁছে দেখি গোলাব্‌রাইয়ের দিক থেকে চিতাটা এসেছিল, বাংলোয় দেখা দিয়ে রুদ্রপ্রয়াগ বাজারের দিকে গেছে।

সত্যি কথাটা হল, চিতাটা শিকার হিসাবে মানুষ খুঁজছিল। আমি ওর জন্যে যে ভেড়াটা রেখেছিলাম, তাতে যে কোনো আগ্রহই চিতাটা দেখায় নি,

তাতে তাই প্রমাণ করে। আমি ভেড়াটাকে বাঁধার অল্প পরেই চিতাটা ওটাকে মারে। কিন্তু ভেড়াটার এতটুকুও ও খায় নি দেখে আমি অবাক হলাম না।

বুড়ো মালবাহক শিস দিয়ে ওর ছাগল-ভেড়ার পালকে ডাকল। হরিদ্বারে যাবার জন্যে উৎরাই পথে রওনা হল। যাবার কালে ও বলে গেল, "ঘরে ফিরে যাও সাহেব। পয়সা আর সময় বাঁচাও তোমার।"

কয়েক বছর আগে রুদ্রপ্রয়াগের কাছাকাছি অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। তবে সুখের বিষয়, তার পরিণতি অত শোচনীয় নয়।

আত্মীয়-বন্ধুদের হত্যায় খেপে আগুন হয়ে রাগে খ্যাপাখ্যাপ্ত একদল লোক দসজুলাপট্টির কোঠ্গি গ্রামের এক হতভাগ্য সাধুকে ধরে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কোনো মানুষই এই মৃত্যুগুলোর জন্য দায়ী। ফিলিপ মেসন তখন গাড়োয়ালের ডেপটি কমিশনার। কাছাকাছি তাঁবু ফেলেছিলেন মেসন। সাধুটির ওপর ওরা হিংস্র প্রতিশোধ নেবার আগেই উনি ঘটনাস্থলে পেঁছে যান।

মেসন অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। জনতার মেজাজের মাত্রা দেখে মেসন বললেন, প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়েছে, তাতে তাঁর কোনো সন্দেহই নেই। তবে ন্যায়-বিচারের দাবিতে এই বলে, যে জনতা সাধুটিকে হত্যা করার আগে ওর অপরাধ সুপ্রমাণিত হ'ক। তাই তিনি প্রস্তাব করেন, সাধুটিকে গ্রেপ্তার করা হ'ক, রাত-দিন কড়া পাহারায় থাকুক ও। এ প্রস্তাবে জনতা রাজী হয়। সাতদিন, সাত-রাত সাধুটিকে পুলিস সযত্নে পাহারা দেয়, জনতাও সমান মনোযোগে নজর রাখতে থাকে। আটদিনের দিন সকালে, যখন পাহারা আর নজরদার বদল হচ্ছে, খবর আসে, কয়েক মাইল দূরে এক গ্রামে আগের রাতে এক বাড়িতে হানা পড়েছে এবং একটি লোককে নিয়ে গেছে।

সেদিন সাধুটিকে ছেড়ে দেওয়াতে জনতা কোনো আপত্তি করে নি। এবার না হয় ভুল লোককে ধরা হয়েছিল, পরের বার আর কোনো ভুল হবে না—এই বলে তারা নিজেদের মনকে বোঝায়।

গাড়োয়ালে নরখাদকদের সকল নরহত্যার জন্যই সাধুদের দোষী করা হয়। নৈনিতাল ও আলমোড়া জেলায় অনুরূপ প্রতি মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয় বোখ্সারদের। পাহাড়ের পায়ের কাছে, অস্বাস্থ্যকর তৃণভূমি তরাইয়ে থাকে বোখ্সারেরা। ওদের জীবনধারণের প্রধান উপায় শিকার।

লোকবিশ্বাস, সাধুরা মানুষ মারে রক্ত-মাংসের লোভে। বোখ্সাররা মারে, যাকে মারছে তার গায়ের গহনা বা অন্য দামী জিনিসের লোভে। নৈনিতাল ও আলমোড়া জেলায় পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই নরখাদকের হাতে মারা পড়েছে বেশি। যে কারণ এখনি দেখানো হল, তার চেয়ে ভাল কারণ অবশ্যই তার পিছনে আছে।

কল্পনাবিলাসী নই আমি, কেননা বড় দীর্ঘকাল আমি নীরব-নিভৃত সব

জায়গায় থেকেছি। তবুও, শুধু বসে-বসে রুদ্রপ্রয়াগে রাতের পর রাত কাটিয়েছি, একবার তো একটানা আটাশ দিন কেটেছিল। সেতু অথবা তেরাস্তা-চৌরাস্তার মুখ অথবা গ্রামের ঢোকার পথ অথবা পশু বা মানুষ-মড়ির ওপর নজর রেখেছি বসে-বসে। তখন আমিও কল্পনায় ভাবতাম নরখাদকটার শরীরটা চিতার, মাথাটা পিশাচের। যখন প্রথমবার ওকে দেখি, দেখেছিলাম নরখাদকটা অতিকায়, গায়ের রং হাল্কা।

ও একটা পিশাচ। রাতের দীর্ঘ প্রহর ধরে আমার ওপর নজর রাখে। নজর রাখতে রাখতে, ওর ওপর টেক্কা মারার জন্য আমার ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেখে ও নিঃশব্দ পৈশাচিক হাসিতে কাঁপে, মাটিতে গড়ায়। কখন মুহূর্তেকের জন্য আমি অসতর্ক হব, আমার গলায় দাঁত বসাবার প্রত্যাশিত সুযোগ ও পাবে, সেই সময়ের প্রত্যাশায় ও ঠোঁট চাটে।

রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক যখন গাড়োয়ালের অধিবাসীদের সন্ত্রস্ত করে বেড়াচ্ছে, তখন অত বছর ধরে সরকার কি করছিল সে প্রশ্ন করা যেতে পারে। সরকারের ধামা ধরছি না আমি। তবে ও অঞ্চলে দশ সপ্তাহ কাটাবার পর আমি জোর দিয়ে বলব অঞ্চলটি এ-সন্ত্রাস মুক্ত করার জন্য সাধ্যায়ত্ত সবকিছুই করেছে সরকার। ওই সময়কালের মধ্যে আমি বহু শত মাইল হেঁটেছি, উপদ্রুত অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশ গ্রামে গেছি।

পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাস, সে পুরস্কার হল দশ হাজার নগদ টাকা এবং দুটি গ্রাম। গাড়োয়ালের চার হাজার লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুকধারীর প্রত্যেককে নরখাদকটির সম্ভাব্য হত্যাকারী করে তোলার পক্ষে এ পুরস্কার উদ্যম যোগাতে যথেষ্ট। প্রচুর মাইনের বাছাই করা শিকারীদের নিয়োগ করা হয়। চেষ্টা সফল হলে তাদের বিশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। চার হাজার বন্দুক তো ছিলই, তার ওপর তিনশোরও বেশি বিশেষ লাইসেন্স দেওয়া হয়।

ল্যান্সডাউনে গাড়োয়াল রেজিমেন্টের যে সৈন্যরা মোতায়েন ছিল, ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার সময়ে সঙ্গে নিজের রাইফেল নিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় তাদের। নইলে অফিসাররা সিপাহীদের শিকার-বন্দুক দেয়। প্রেসের মাধ্যমে, চিতাটিকে মারতে সহায়তা করার জন্য ভারতের সর্বত্র শিকারীদের কাছে আবেদন জানানো হয়। ঝপাং করে দরজা পড়ে যায়, এমনি অসংখ্য ফাঁদের ভিতর ছাগলের টোপ বেঁধে রেখে গ্রামে ঢোকার পথে, যে পথে নরখাদকটি বেশি চলে ফেরে সে-সব পথে ফাঁদগুলি পেতে রাখা হয়। মানুষের মড়িতে বিষ মাখিয়ে রাখার জন্য পাটোয়ারী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের বিষ সরবরাহ করা হয়। সরকারী কর্মচারীরা, প্রায়ই ভীষণ বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে সরকারী

কাজের বাইরে যতটুকু সময় পায়, সব সময়টা নরখাদকটার অনুসরণে ফেরে। এ কথা শেষে বললাম, কিন্তু কথাটি তুচ্ছ করার নয়।

এই সব নানা রকম এবং সংযুক্ত প্রচেষ্টার মোট পরিণতি দাঁড়ায়—একটা সামান্য বন্দুকের গুলির চোট। এর ফলে চিতাটার পিছনে বাঁ-পায়ের থাবায় ভাঁজ পড়ে, একটা আঙুলের সামান্য চামড়া উড়ে যায়। আর গাড়োয়ালের ডেপুটি কমিশনারের সরকারী নথিতে লেখা হয়, বিষক্রিয়ায় কোনো কষ্ট পাওয়া দূরে থাকুক, মানুষের মড়ি থেকে বিষ খেয়ে চিতাটা দিব্যি ভালো থাকছে, শরীরে শক্তিও পাচ্ছে।

তিনটে চমকপ্রদ ঘটনা একটি সরকারী বিবরণীতে নথিভুক্ত আছে। আমি সেগুলো সংক্ষেপে বলছি।

প্রথম ঃ প্রেসের মাধ্যমে শিকারীদের আবেদন জানানোর ফলে ১৯২১ সালে দুই তরুণ ব্রিটিশ অফিসার রুদ্রপ্রয়াগে হাজির হয়। তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নরখাদকটিকে মারবে। রুদ্রপ্রয়াগের ঝোলা-পুল দিয়ে চিতাটা অলকনন্দা নদীর এ-পার থেকে ওপারে যায়, ওদের এ কথা ভাবার কারণ কি, আমি জানি না। যাই-হ'ক, ওরা ঠিক করে এই পুলের ওপরই ওদের সকল প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখবে। রাত্রে যখন চিতাটা পুল পেরোবে, তখন ওকে মারবে। ঝুলন্ত তারের ভার ধরে রাখবার জন্য পুলটির দু'দিকে দুটি টাওয়ার আছে। একটি তরুণ শিকারী নদীর বাঁ-দিকের টাওয়ারে বসে। ওর সঙ্গী বসে ডানদিকের টাওয়ারে।

দু' মাস টাওয়ারে বসে কাটাবার পর বাঁ-পারের শিকারীটি দেখে ঠিক ওর তলার খিলানের নিচ থেকে বেরিয়ে চিতাটি পুলে উঠল। পুলের বেশ খানিকটা অবধি চিতাটা যাওয়া অবধি অপেক্ষা করে ও গুলি ছোঁড়ে। চিতাটা যেমন ছুটে পুল পেরোয়, ডানদিকের টাওয়ার থেকে শিকারীটি ছ'ঘরা রিভলভারের সবকটি গুলি ছোঁড়ে চিতাটির দিকে। পরদিন সকালে পুলের উপর, যে পাহাড় বেয়ে চিতাটি উঠে গেছে, তাতে রক্ত দেখা যায়। যেহেতু মনে করা হয়, জখম, অথবা জখমগুলি প্রাণান্তিক, বহুদিন ধরে তল্লাসী চলতে থাকে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জখম হবার পর ছ' মাস চিতাটি কোনো মানুষ মারে নি।

যারা সাতটি গুলির আওয়াজ শুনেছিল, জখম জানোয়ারটাকে খুঁজে বের করার কাজে সহায়তা করেছিল, তারাই আমাকে ঘটনাটির কথা বলে। আমাকে যারা বলে, তারা ঐ দু'জন শিকারী, সবাই ভেবেছিল প্রথম গুলিটা চিতাটার পিঠে লাগে, হয়তো পরের গুলিগুলোর কয়েকটা ওর মাথায় লাগে। সেই জন্যেই দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে তল্লাসী চালানো হয়।

রক্তচিহ্নের বিশদ বর্ণনা শুনে আমার মনে হয় চিতাটার শরীরে ও মাথায় জখম করেছে, শিকারীদের এ ধারণা ভুল। রক্তচিহ্নের বর্ণনা আমি যেমনটি শুনি, তা একমাত্র পায়ে জখম হলেই সম্ভব। আমার অনুমান যে নির্ভুল

পরে তা দেখে আমি খুবই সন্তুষ্ট হই। দেখি, বাঁ-দিকের টাওয়ারের শিকারীটির গুলির ফলে চিতাটার পিছনের বাঁ পায়ের থাবা কুঁচকে ভাঁজ পড়েছে মাত্র। গুলিতে একটা আঙুলের একাংশ শুধু উড়ে গেছে। ডান তীরের শিকারীটির সব গুলিই লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে।

দ্বিতীয় ঝাঁপফেলা ফাঁদে বন্দী হয়ে প্রায় কুড়িটি চিতা মারা পড়ে। তারপর একটি চিতা একটা ফাঁদে ধরা পড়ে। সকলে ধরে নেয় ওটাই নরখাদক চিতা। হিন্দুরা ওটাকে মারতে চায় নি। ওদের ভয়, নরখাদক যাদের মেরেছে, তাদের আত্মা ওদের যন্ত্রণা দেবে। তাই এক ভারতীয় ক্রীশ্চানকে ডেকে পাঠানো হয়। ক্রীশ্চানটি থাকত প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে এক গ্রামে। সে ঘটনাস্থলে পেৌঁছুবার আগেই চিতাটি ফাঁদ থেকে পালায়, ফাঁদ ছিঁড়ে-খুঁড়ে।

তৃতীয়ঃ একটি মানুষকে মেরে মড়ি নিয়ে চিতাটি একটা ছোট নির্জন জঙ্গলে বসে থাকে। পরদিন সকালে, যখন নিহত ব্যক্তির তল্লাসী চলছে। দেখা যায় চিতাটি জঙ্গল ছেড়ে বেরোল। সামান্য তাড়া খাবার পর দেখা যায় ও একটা গুহায় ঢুকল। তখনি গুহার মুখ কাঁটাঝোপে বন্ধ করে বড় বড় পাথর এনে মুখে জমা করা হয়। প্রত্যেক দিন লোকজন জায়গাটা দেখতে যেতে থাকে। দিনে-দিনে ভিড়ও বাড়ে। পাঁচ দিনের দিন, প্রায় পাঁচশো লোক জমা হবার পর এক ভদ্রলোক আসেন। তাঁর নাম করা হয় নি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে তিনি "একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি।" বিবৃতির ভাষায় বলতে গেলে, "তিনি সতাচ্ছিল্যে বলেন, গুহায় কোনো চিতা নেই। গুহামুখ থেকে তিনি কাঁটাঝোপ সরিয়ে দেন। যেই কাঁটাঝোপ তুলে ফেলেন, অমনি চিতাটা হঠাৎ গুহা থেকে ধেয়ে বেরিয়ে আসে। ওখানে যে প্রায় পাঁচশো লোক জমায়েত হয়েছিল, তাদের ভিতর দিয়ে অবহেলে পালিয়ে যায়।"

চিতাটি নরখাদক হবার অব্যবহিত পরেই এই ঘটনাগুলো ঘটে। চিতাটা যদি পুলে মারা পড়ত, ফাঁদের ভিতর গুলিতে মরত, গুহাতে চিরবন্দী থাকত, তাহলে বহু শত লোক মারা পড়ত না। বহু বছরব্যাপী দুর্ভোগের হাত থেকে গাড়োয়াল রেহাই পেত।



৪

রুদ্রপ্রয়াগে এলাম

১৯২৫ সালে নৈনিতালের শালে থিয়েটারে গিলবার্ট সালিভানের 'দি ইয়োমেন অব্ দি গার্ড' ছবিটার এক বিরতির সময় রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদকটা সম্বন্ধে আমি সর্বপ্রথম সঠিক খবর পাই।

মাঝে-মাঝে শুনতাম যে গাড়োয়ালে একটা নরখাদক চিতা আছে এবং কাগজেও সেটার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েছিলাম। কিন্তু জানতাম গাড়োয়ালে চার হাজারের ওপর লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুকধারী আছে, তাছাড়া রুদ্রপ্রয়াগের মাত্র ৭০ মাইল দূরে ল্যান্সডাউনে রয়েছে বহুসংখ্যক উৎসাহী শিকারী। কাজেই অনুমান করতাম যে চিতাটা মারবার উৎসাহে এ-ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় নবাগত একজনকে কেউ পছন্দ করবে না।

কাজেই সে রাতে শালের 'বার'-এ এক বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু গলা ভিজিয়ে নেবার সময় আমি খুব বিস্মিত হয়েই শুনলাম· তখনকার যুক্তপ্রদেশ সরকারের চীফ সেক্রেটারি, এবং পরে আসামের গভর্নর মাইকেল কীন—কয়েকজনকে নরখাদকটা সম্বন্ধে বলছেন ও ওটাকে মারার চেষ্টা করতে তাদের পেড়াপীড়ি করছেন। তাঁর আবেদনে যে কোনো উৎসাহ জাগল না, তা ঐ দলের একজনের মন্তব্য ও আরেকজনের সমর্থন থেকেই বুঝলাম। মন্তব্যটা হল, 'শতখানেক মানুষ মেরেছে—এরকম মানুষখেকোর পিছনে যাওয়া? প্রাণ থাকতে নয়।'

পরদিন সকালে মাইকেল কীনের সঙ্গে দেখা করে যা-যা জানবার জানলাম। নরখাদকটা ঠিক কোন্ অঞ্চলে উপদ্রব করছে তা তিনি বলতে পারলেন না, তবে আমাকে রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে ইবটসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। বাড়ি ফিরে দেখি আমার টেবিলে ইবটসনের একটা চিঠি।

ইবটসন—এখন স্যার উইলিয়াম ইবটসন, এবং যুক্তপ্রদেশের গভর্নরের ভূত-পূর্ব উপদেষ্টা—খুব সম্প্রতি গাড়োয়ালের ডেপুটি কমিশনার হয়ে এসেছে, এবং তার অন্যতম প্রধান কাজ হয়েছে গাড়োয়াল জেলাকে নরখাদকটার উৎপাত থেকে মুক্ত করা। এই প্রসঙ্গে সে আমার কাছে চিঠিটা লিখেছে।

যাবার বন্দোবস্ত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। রাণীখেত, আদবদ্রী ও কর্ণপ্রয়াগ হয়ে দশ দিনের দিন সন্ধ্যায় নাগরাসুর কাছে একটা রোড ইন্‌সপেক্‌শন বাংলোয় পৌঁছলাম আমি। এ বাংলো দখল করতে হলে যে অনুমতিপত্র নিতে হয়, তা নৈনিতাল থেকে রওনা হবার সময়ে আমি জানতাম না। চৌকিদারের উপর হুকুম ছিল, অনুমতিপত্র না থাকলে কাউকে থাকতে দেবে না। অতএব যারা আমার মাল বইছিল, সেই ছ'জন গাড়োয়ালী, আমার চাকর এবং আমি রুদ্র-প্রয়াগের পথে আরো দু' মাইল হেঁটে হয়রান হলাম। তারপর রাতের আস্তানার উপযোগী জায়গা পেলাম একটা।

গাড়োয়ালীরা জল ও জ্বালানী-কাঠ যোগাড়ে লেগে গেল। রাঁধবার উনোন তৈরি করার জন্য আমার ভৃত্য পাথর আনতে লাগল। একটা কুড়োল তুলে নিয়ে আমি গেলাম কাঁটাঝোপ কাটতে। কাঁটাঝোপ দিয়ে জায়গাটা ঘেরাও করে রাতে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। পথে আসতে দশ মাইল আগেই আমাদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে, যে আমরা নরখাদকের রাজ্য সীমান্তে ঢুকে পড়েছি।

সান্ধ্য আহার রাঁধবার জন্যে সবে উনোন ধরানো হয়েছে! একটু বাদেই দূরে, পাহাড়ের উপরের এক গ্রাম থেকে একটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল আমাদের কাছে। জিগ্যেস করল, ওই খোলা প্রান্তরে কি করছি আমরা? সাবধান করে দিল, যেখানে আছি, সেখানেই থেকে যাই যদি, তবে আমাদের মধ্যে এক, কিংবা একাধিক জন অবশ্যই নরখাদকের হাতে মারা পড়ব।

পরোপকারী লোকটির সাবধান করা হল। তখন তো অন্ধকার, লোকটি সম্ভবত প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে আমাদের সতর্ক করে। মাধো সিংয়ের* সঙ্গে আপনাদের অন্যত্র পরিচয় হয়েছে। সে সকলের হয়ে বলল, "আমরা এখানেই থাকব সাহেব। লণ্ঠনে যথেষ্ট তেল আছে, সারা রাত জ্বলবে। আর আপনার রাইফেল তো আছেই।"

* "কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ"-এর "চৌগড়ের বাঘ" দেখুন।

সারা রাত জ্বলবার মত যথেষ্ট তেল লণ্ঠনে ছিল। কেন-না সকালে যখন জাগি, তখনো ওটা জ্বলছে। আমার গুলি-ভরা রাইফেল বিছানায় পড়ে আছে। তবে কাঁটাঝোপের ঘেরাওটা নেহাত পলকা। দশ দিন পথ চলে আমরাও হত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সে রাতে চিতাটা যদি মোলাকাত করতে আসত, অতি সহজে ও একটা শিকার পেতে পারত।

পরদিন আমরা রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছলাম। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে ইবটসন যাদের পাঠিয়েছিল, তাদের কাছে সাদর অভ্যর্থনা পেলাম।



৫

তদন্ত

রুদ্রপ্রয়াগে যে দশ সপ্তাহ আমি ছিলাম তার প্রতিদিনের কার্য-বিবরণ আপনাদের দেবার চেষ্টা করব না। কারণ এতদিন পরে সে বিবরণী লেখাও কঠিন, যদি লিখি, আপনাদের তা পড়তে বিরক্ত লাগবে। সুতরাং আমি আমার সামান্য কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথাই বলব, যে সময়টা কখনো আমি একা, কখনো বা ইবটসনের সঙ্গে কাটিয়েছি। কিন্তু তার আগে, যে এলাকায় আট বছর ধরে চিতাটা বিচরণ করেছে এবং যেখানে দশ সপ্তাহ যাবৎ আমি তার পিছনে ঘুরেছি সে এলাকাটা সম্বন্ধে আপনাদের কিঞ্চিৎ ধারণা দিতে চেষ্টা করব।

রুদ্রপ্রয়াগের পূর্বদিকের পাহাড়টায় উঠলে আপনি ঐ ৫০০ বর্গমাইল এলাকাটার বেশির ভাগই দেখতে পাবেন। ঐ এলাকায় রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক রাজত্ব করেছে। অলকনন্দা নদী এলাকাটাকে কমবেশি সমান দু-ভাগে ভাগ করেছে এবং কর্ণপ্রয়াগ পেরিয়ে দক্ষিণে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে বয়ে গেছে। সেখানে তার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম থেকে এসে মিশেছে মন্দাকিনী। দুই নদীর মাঝখানে ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চলটা অলকনন্দার বাঁ পাড়ের এলাকার চেয়ে কম খাড়াই। ফলে শেষোক্ত এলাকার চেয়ে প্রথমোক্ত এলাকায় গ্রামের সংখ্যা বেশি।

আপনি দাঁড়িয়ে আছেন উঁচুতে। সেখান থেকে দূরের আবাদী জমিগুলো দেখাচ্ছে খাড়া পাহাড়ের গায়ে আঁকা সার-সার রেখার মত। ওই রেখাগুলো হল খেতী-জমির স্তর। জমিগুলোর চওড়াইয়ে তফাত প্রচুর। এক গজ থেকে শুরু করে কোনো-কোনো খেতে পঞ্চাশ গজ, বা তারও বেশি।

আপনি লক্ষ করলে দেখবেন, গ্রামের বাড়িগুলো সব সময়েই আবাদী-জমির উপর সীমানায়। দলছুট গরু-ছাগল ও বুনো জন্তু-জানোয়ারের ওপর নজর রেখে, খেত-আবাদ তাদের থেকে বাঁচাবার জন্যেই এই ভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করা। অতি বিরল দু-একটা খেত ছাড়া খেতী-জমি ঘিরে কোনো ঝোপ বা বেড়া নেই।

এ নিসর্গ দৃশ্যছবির অধিকাংশই যে বাদামী ও সবুজ রঙের ছোপে আঁকা, তা হল, যথাক্রমে ঘেসোজমি ও বনভূমি। দেখবেন কয়েকটা গ্রাম একেবারে ঘেসোজমিতেই ঘেরাও। আবার অন্যগুলো একেবারে জঙ্গলে ঘেরাও। নিচে চাইলে দেখবেন, সমস্ত দেশটাই অসমান ও বন্ধুর। অসংখ্য গভীর গিরিদরি ও খাড়াই ঢালের পাহাড়ে রচিত-খচিত। এ অঞ্চলে রাস্তা বলতে মাত্র দুটি। একটি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বেরিয়ে চড়াই উঠে কেদারনাথ চলে গেছে। আরেকটি হল বদ্রীনাথে যাবার প্রধান তীর্থ-পথ। আমি যে-সময়ের কথা লিখছি, তখন অবধি দুটো রাস্তাই ছিল সংকীর্ণ, বন্ধুর। তখন অবধি ওগুলোর ওপর দিয়ে কোনো রকম চাকাই চলে নি।

এ বইয়ের শেষে যে মানচিত্র আছে, তা দেখলে পরে দেখবেন তাতে অনেকগুলো গোল-গোল চিহ্ন আছে। প্রতি গ্রামে রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদকের মারা মানুষের সংখ্যার নিশানা চিহ্নগুলি। পরের পাতায়, ১৯১৮ থেকে ১৯২৬ সাল অবধি চিহ্নিত গ্রামগুলির প্রত্যেকটিতে নিহত মানুষ দেওয়া হল।

আবাদী-জমি ঘেরা গ্রামগুলোর চেয়ে জঙ্গল-ঘেরাও গ্রামগুলোতে বেশি মানুষ মারা পড়বে এ রকম মনে করাই যুক্তিসংগত। নরখাদকটি বাঘ হলে, নিঃসন্দেহে তাইই ঘটত। কিন্তু নরখাদক চিতা তো শুধু রাতেই শিকার করে। আড়াল-আবডাল থাকা-না-থাকায় তার কিছু এসে যায় না। এক গ্রামে অন্য গ্রামের চেয়ে কেন বেশি মানুষ মরেছে, তার একমাত্র কারণ হল—এর ক্ষেত্রে সতর্কতার অভাব। ওর ক্ষেত্রে সতর্কতা-ব্যবস্থা মেনে চলা।

নরখাদকটি একটি অতিকায় মদ্দা চিতা, যৌবন তার বহুদিন বিগত, এ আমি বলেছি। তবে বুড়ো হলেও শরীরে তার প্রচণ্ড শক্তি। যেখানে বসে মাংসাশী প্রাণীরা নিরুপদ্রবে খেতে পারবে, সে জায়গায় শিকারকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদের আছে কি না, তার অনেকটা স্থিরীকৃত হয়, শিকারকে মারার জন্যে তারা যে জায়গা ঠিক করেছে, তার উপর।

রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদকের কাছে সব জায়গাই সমান। কারণ, মারার পর ওর শিকারের মধ্যে যে মানুষ সবচেয়ে ভারি, তাকেও ও বহুদূরে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখত। যেবারকার কথা আমি জানি, সেবার ও চার মাইল বয়ে নিয়ে গিয়েছিল মড়ি। আমি যেবারের কথা বলছি, সেবার চিতাটি একটি পূর্ণ-বয়স্ক মানুষকে তার বাড়ির ভিতর মারে। তারপর জঙ্গল-ঢাকা এক পাহাড়ের খাড়াই-ঢাল বেয়ে দু' মাইল উঠে যায় মড়ি বয়ে। দূরের ঘনঝোপ জঙ্গলে ঢাকা ঢাল ধরে নেমে যায়। কেন করেছিল তার কারণ বোঝা ভার। কেন না রাতের প্রথমদিকেই মানুষটাকে ও হত্যা করে। পরদিন দুপুরের আগে চিতাটার পেছু-পেছু যায় নি কেউ।

রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতার নিহতদের তালিকা (গ্রাম অনুসারে), ১৯১৮-২৬

ছয়জন নিহত

চোপরা

পাঁচজন নিহত

কোঠকি, রাতাউরা

চারজন নিহত

বিজ্বাকোট

তিনজন নিহত

নাকোট, গান্ধারী, কোখাণ্ডি, দাদোলি, কোয়েথি, ঝিরমোলি, গোলাব্রাই, লার্মোর

দুজন নিহত

বাজাড়ু, রামপুর, মাইকোটি, ছাতোলি, কোটি, মাদোলা, রাউতা, কান্দে (যোগি), বরান, সারি, রানাউ, পুনার, তিলানি, বাউংঠা, নাগরাসু, গোয়ার, মারোয়ারা

একজন নিহত

আসোঁ, পিলু, ভাউংসাল, মংগু, বৈঁজি, ভাটোয়ারি, খামোলি, সোয়াঁরি, ফাল্সি, কান্দা, ধারকোট, দাংগি, গুনাওন, ভাটগাঁও, বাওয়াল, বার্সিল, ভৈংস-গাঁও, নরি, সান্দার, তামেন্দ্, খাটিয়ান, সিওপুরী, সান্, সাইউন্দ্, কামেরা, দারমারি, ধামকা বেলা, বেলা-কুণ্ড্, সাউর, ভৈংসারি, বাজ্নু, কুইলি, ধারকোট, ভাইগাঁও, ছিংকা, ধুং, কিটি, গামনকান্দাই, পোখ্তা, ঠাপালগাঁও, বাঁসু, নাগ, বৈসানি, রুদ্রপ্রয়াগ, গোয়ার, কালনা, ভুন্কা, কামেরা, সৈল্, পাবো, ভৈংসোয়ারা।

বার্ষিক যোগফল

১৯১৮	১
১৯১৯	৩
১৯২০	৬
১৯২১	২৩
১৯২৩	২৬
১৯২২	২৪
১৯২৪	২০
১৯২৫	৮
১৯২৬	১৪
	১২৫

আমাদের সকল অরণ্যপ্রাণীর মধ্যে, নরখাদক চিতা ছাড়া অন্য চিতাদের মারা সবচেয়ে সহজ। কেন না তাদের গন্ধ বিষয়ে কোনো অনুভূতিই নেই।

অন্য কোনো প্রাণী মারার সময়ে যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক পন্থায় চিতা মারা হয়। চিতাটিকে নিছক শিকারের আনন্দে মারা হচ্ছে, না লাভের জন্য, সেই বুঝে পন্থাতেও তফাত করা হয়।

শিকারের আনন্দে চিতা মারবার সবচেয়ে রোমাঞ্চকর, চমৎকার পন্থা হল, জঙ্গলে ওদের খোঁজে যাওয়া। যখন খোঁজ মিলল, তখন চুপে-চুপে গিয়ে ওদের গুলি করে মারা।

লাভের জন্য চিতা মারার সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে নিষ্ঠুর পন্থা হল, চিতার মারা কোনো জন্তুর মাংসের ভিতর একটি ছোট, ভীষণ বিস্ফোরক বোমা ঢুকিয়ে দেওয়া।

অনেক গ্রামবাসীই এই বোমাগুলো বানাতে শিখেছে। যখন একটা বোমার সঙ্গে চিতার দাঁতের ছোঁয়া লাগে, তখন বোমাটা ফাটে, চিতাটার চোয়াল উড়িয়ে দেয়। কোনো-কোনো সময়ে সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই হতভাগ্য জীবটি গুড়ি টেনে চলে যায়, মরে। সে মৃত্যু বড় সময়সাপেক্ষ, বড় যন্ত্রণার। কেন না যারা বোমাগুলো ব্যবহার করে, তাদের এ সাহস নেই যে রক্তের নিশানা অনুসরণ করে গিয়ে চিতাটাকে মেরে ফেলে।

থাবার ছাপ দেখে চিতাকে খুঁজে বের করা, নিশ্চুপে কাছে যাওয়া, রোমাঞ্চকর ও চিত্তাকর্ষক তো বটেই, তুলনায় তা সহজও। কেন না চিতার থাবা নরম। তারা যতদূর সম্ভব মানুষ ও জীবজন্তুর চলার পথ ধরে চলে। ওদের খুঁজে বের করা খুব কঠিন নয়। কেন না বলতে গেলে জঙ্গলের প্রতিটি পশু-পাখি শিকারীকে সহায়তা করে। নিশ্চুপে ওদের কাছে যাওয়াও সোজা। কেন না ভাগ্যবশে ওদের চোখ ও কানের শক্তি অতি তীক্ষ্ন। তবে গন্ধ বিষয়ে কোনো অনুভূতি না থাকায় ওখানে ওরা মার খেয়ে গেছে। সেই জন্যেই, বাতাস যেদিক থেকেই বইতে থাকুক, যেভাবে এগোলে পরে তার সবচেয়ে সুবিধে, শিকারী তা বেছে নিতে পারে।

খুঁজে বের করে, নিশ্চুপে চিতার কাছে যাওয়ার পর, রাইফেলের ট্রিগার টেপার চেয়ে ক্যামেরার বোতাম টিপলে অনেক, অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। এক ক্ষেত্রে, চিতাটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে দেখা যায়। বসে দেখতে হলে, চিতার চেয়ে সলীল-লাবণ্য, মনোগ্রাহী জন্তু জঙ্গলে দুটি নেই। ইচ্ছে মত ক্যামেরার বোতাম টিপে এমন এক স্থায়ী দলিল রাখা যায়, যাতে আগ্রহ কখনো ফুরোয় না।

অন্য ক্ষেত্রে—এক পলকের দেখা, ট্রিগারে একটি চাপ, লক্ষ যদি সঠিক হয় তবে একটি ট্রফি লাভ। সে ট্রফির সৌন্দর্য, তাতে আগ্রহ, দ্রুত চলে যায়।



৬

প্রথম মড়ি

আমি রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছনোর অল্প আগেই ইবটসন একটা ঝাঁপানের (জঙ্গল বা অন্য জায়গা ঘেরাও করে জন্তু খোঁজার জন্য বন্দোবস্ত করা হল ঝাঁপান।) ব্যবস্থা করেছিল। সেটি সার্থক হলে পনেরটা মানুষের প্রাণ বাঁচত। সে ঝাঁপান, যে কার্যকারণে তা করতে হয়, সে বিবরণী লিখে রাখার মত।

কুড়িজন তীর্থযাত্রী বদ্রীনাথের চড়াই-পথ ভাঙতে-ভাঙতে সন্ধ্যার দিকে পথের পাশের একটি ছোট দোকানে হাজির হয়। ওদের যা দরকার, সব দেবার পর দোকানীটি ওদের রওনা হতে তাড়া দেয়। বলে চার মাইল পথ এগোলে পরে ওরা যাত্রীশালায় পৌঁছবে। সেখানে ওরা আহার ও নিরাপদ আশ্রয় পাবে। তা ওদের ওখানে পৌঁছবার পক্ষে যতটুকু আলো দরকার, ততটুকুই দিনের আলো আছে।

তীর্থযাত্রীরা এ পরামর্শ নিতে নারাজ। ওরা বলল, সেদিন ওরা দীর্ঘ পথ হেঁটেছে। আরো চার মাইল হাঁটার পক্ষে বড়ই হতক্লান্ত। রাতের আহারের ব্যবস্থা ও রান্না করার এবং দোকানের লাগাও কাঠের মাচায় শোবার অনুমতি, এই সুবিধেটুকু মাত্র চায় ওরা। এ প্রস্তাবে দোকানী ঘোর আপত্তি জানায়। তীর্থযাত্রীদের বলে, নরখাদকটি প্রায়ই ওর বাড়িতে হানা দেয়। খোলা জায়গায় শোয়া মানে মৃত্যু ডেকে আনা।

বাদানুবাদ যখন চূড়ান্তে পেঁৗছেছে। তখন মথুরা থেকে বদ্রীনাথ যাত্রী সাধু ঘটনাস্থলে হাজির হল। সে তীর্থযাত্রীদের জোর সমর্থন জানাল। বলল, দোকানী যদি দলের মেয়েদের আশ্রয় দেয়, তবে ও মাচাটায় পুরুষদের সঙ্গে শোবে। নরখাদক বা অন্য কোনো চিতা যদি পুরুষদের জখম করতে চেষ্টা করে, সাধু সেটাকে মুখে ধরে দু' টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ প্রস্তাবে দোকানীকে রাজী হতে হল। এক-কামরার দোকান-ঘরে, বন্ধ দরজার পিছনে দলের দশটি মেয়েছেলে আশ্রয় নিল। দশটি পুরুষ সারি বেঁধে মাচাটিতে শুল। সাধুটি রইল মধ্যিখানে।

মাচার ওপর যারা শুয়েছিল, সে তীর্থযাত্রীরা সকালে উঠে দেখে সাধুটি নিখোঁজ। যে কম্বলে সে শুয়েছিল, তা দলামোচড়া। গায়ে যে চাদর ঢাকা দিয়েছিল, তার খানিকটা মাচার বাইরে, তাতে রক্তের দাগ। লোকগুলির উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজে দোকানীটি দরজা খোলে। এক পলকেই দেখে কি হয়েছে। সূর্য উঠলে পরে দোকানীটি, লোকগুলির সঙ্গে রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করে পাহাড়ের নিচে নামে। তিনটি খাঁজ-কাটা খেত পেরোয়, একটা নিচু পাঁচিলের কাছে পেঁৗছয়। পাঁচিলের ওপারে সাধুটিকে খুঁজে পায় ওরা। শরীরের নিচের অংশ চিতাটি খেয়ে গেছে।

সে-সময় ইবটসন ছিল রুদ্রপ্রয়াগে। নরখাদকটির হদিস পেতে চেষ্টা করছিল। ও থাকার সময়ে কেউ মারা পড়ে নি। অলকনন্দার পাশে দূরে একটা জায়গা, খুব মনে হয় ওটা চিতাটার লুকোবার জায়গা। স্থানীয় লোকদের সন্দেহ, যতক্ষণ দিনের আলো থাকে, ওখানেই লুকিয়ে থাকে ও। তাই ইবটসন আন্দাজেই ঝাঁপান চালাবে ঠিক করল।

তাই, এদিকে যখন ওই বিশজন তীর্থযাত্রী ছোট দোকানটির পথে চড়াই ভাঙছে, পাটোয়ারী এবং ইবটসনের কর্মচারীদের অন্যরা কাছাকাছি গ্রামগুলো ঘুরছে। সকালে যে ঝাঁপান হবে, সেজন্যে তৈরি থাকতে বলে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে পুরুষদের।

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে ইবটসন ঝোলা-পুল দিয়ে অলকনন্দা পেরোল। পাহাড়ের চড়াই বেয়ে মাইলখানেক দূরে ওপাশে গেল, ঝাঁপানের জন্যে যে-যার জায়গায় দাঁড়াল। সঙ্গে ছিল ওর স্ত্রী, এক বন্ধু—তার নাম আমি ভুলে গেছি, ওর কর্মচারীদের কয়েকজন, আর দুশো ঝাঁপানদার।

ঝাঁপান যখন চলছে, তখন রানার এসে সাধুকে মারার খবর দিল।

ঝাঁপান শেষ হল, তবে কাজ হল না কিছুই। তাড়াতাড়ি সবাই পরামর্শ করে নিল। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই, ইবটসন ওর সঙ্গীরা, দুশো ঝাঁপানদার, নদীর উজান মুখে চার মাইল উজিয়ে গিয়ে, একটা ঝোলা-পুলে নদী পেরিয়ে বাঁ-পাড় দিয়ে ফিরতি পথে হত্যার ঘটনাস্থলে পেঁৗছবার জন্য নদীর ডান পাড়ের

চড়াই ভেঙে রওনা হল। ওর কর্মচারীরা যতজন পুরুষকে পারে, যোগাড় করে দোকানে জমায়েত করার জন্যে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল।

দুপুর গড়িয়ে যেতে দু-হাজার ঝাঁপানদার, অনেকগুলো বাড়তি বন্দুক জমায়েত হল। দোকানের ওপরের উঁচু, এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়টার ওপর থেকে নিচ অবধি ঝাঁপান চালানো হল। ইবটসনকে যদি চিনে থাকেন, তাহলে ঝাঁপানের বন্দোবস্ত হয়েছিল পরম দক্ষতায়, সমান দক্ষতায় তা চালানো হয়েছিল, আপনাদের এ কথা আমাকে বলে দিতে হবে না। ঝাঁপানের উদ্দেশ্য কেন ব্যর্থ হল, তার একমাত্র কারণ হল, চিতাটা ও অঞ্চলেই ছিল না।

যখন কোনো চিতা বা বাঘ নিজে থেকেই খোলা, উন্মুক্ত জায়গায় মড়ি ফেলে রেখে চলে যায়, তার যে ও মড়িতে আর আকর্ষণ নেই, এ তারই একটা লক্ষণ। খাওয়া সেরে এরা সব সময়ে মড়ি দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কখনো দু-তিন মাইল দূরে, কিংবা নরখাদকের ক্ষেত্রে হয়তো দশ, বা আরো বেশি মাইল দূরে। তাই, যখন পাহাড়ে ঝাঁপান চলছিল, নরখাদকটা দশ মাইল দূরে আরামে ঘুম দিচ্ছিল, এ খুবই সম্ভব।



৭

চিতার সন্ধান

নরখাদক চিতা খুবই দুর্লভ ঘটনা। সেইজন্যে তাদের সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়।

এই প্রাণীগুলো সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা খুব সীমাবদ্ধ। শুধু বহু বছর আগে মাত্র একটার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মোলাকাত হয়েছিল। যদিও আমার ধারণা হয়েছিল যে শুধু পশু আহার থেকে খাদ্যাভ্যাস বদলিয়ে মানুষ-আর-পশু আহারে অভ্যস্ত হলে স্বভাবের পরিবর্তন বাঘ আর চিতার একই রকম হয়। তবু আমি জানতাম না চিতার অভ্যাস কতদূর অবধি বদলাবে। এর মধ্যে আমি ঠিক করলাম, নরখাদকটাকে মারতে চিতা মারার সাধারণ পদ্ধতি-গুলোই প্রয়োগ করব।

চিতা শিকারের সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে, হয় মড়ির ওপর, না হয় ছাগল বা ভেড়ার জ্যান্ত টোপ বেঁধে ওদের জন্যে বসে থাকা। এ দুটো পদ্ধতির যে-কোনোটা কাজে লাগাতে গেলে, একটায় দরকার মড়ি খুঁজে বের করা, অপর-টায় দরকার চিতাটার অবস্থিতির খোঁজ পাওয়া।

আমার রুদ্রপ্রয়াগ যাবার উদ্দেশ্য ছিল যাতে আরো মানুষ প্রাণ না হারায় তার চেষ্টা করা। আরেকটা মানুষ মড়ি হয়ে আমাকে তার ওপর বসার সুযোগ করে দেবে, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করার আমার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। কাজেই স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল আমার কাজ হল, চিতাটা খুঁজে বের করে জ্যান্ত টোপের সহায়তায় তাকে গুলি করা।

এখানে একটা ভয়াবহ প্রতিবন্ধ দেখা দিল। আশা করলাম, সময়ে তা অন্তত অংশত দূর করতে পারব। আমাকে যে মানচিত্রগুলো দেওয়া হয়, তাতে দেখি নরখাদকটা প্রায় পাঁচশো বর্গ মাইলের এক এলাকা জুড়ে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে। যে কোনো জায়গাতেই একটি জানোয়ারকে খুঁজে বের করে গুলি করার পক্ষে পাঁচশো বর্গ মাইল এক বিরাট এলাকা। অলকনন্দা নদী যে এলাকাটিকে কম বেশি দু-ভাগে ভাগ করেছে, এ-কথা যতক্ষণ ভেবে দেখি নি, ততক্ষণ অবধি প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, যে-জানোয়ার শুধু রাতে হানা দিয়ে ফেরে, গাড়োয়ালের এই পার্বত্য, বন্ধুর অঞ্চলে তাকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব কাজ।

সাধারণ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, অলকনন্দা নরখাদকটির কাছে কোনো প্রতিবন্ধই নয়। যখন নদীর এক পারে শিকারের মানুষ খুঁজে পেতে ওর মুশকিল হয়, ও নদী সাঁতরে ও-পারে চলে যায়।

এ বিশ্বাস আমি বাতিল করে দিই। আমার মতে, কোনো চিতা কোনো পরিস্থিতিতেই নিজে থেকে অলকনন্দার খরস্রোত তুষার-শীতল জলে নামবে না। আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়, নরখাদকটি যখন এক-পার থেকে অপর-পারে যায়, ও একটা ঝোলা-পুলের ওপর দিয়ে পেরোয়।

ও এলাকায় দুটি ঝোলা-পুল। একটি রুদ্রপ্রয়াগে, অন্যটি নদীর প্রায় বার মাইল উজানে, চাতোয়াপিপলে। এই দুটো পুলের মাঝে একটা দড়ির পুল আছে। ঝাঁপানের দিন ওটার ওপর দিয়েই ইবটসন, ওর দল, আর দুশো লোক নদী পেরিয়েছিল।

আমি এ-জাতের যত পুল দেখেছি, তার মধ্যে এই দড়ির পুলটার মত ভয়-জাগানো বস্তু কখনো দেখি নি। ইঁদুর ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী সম্ভবত ওটা পেরোতে পারে না। দুটো হাতে পাকানো ঘাসের দড়ি, পুরনো হয়ে কাল হয়ে গেছে—নদী থেকে যে কুয়াশা ওঠে, তার দরুন দড়ি দুটো পিছল। প্রায় দুশো ফুট ফেনিল সাদা জলের উপর দিয়ে চলে গেছে দড়ি দুটো। একশো গজ নিচে নেমে দুটো পাথুরে দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বজ্রগর্জনে ফুলে-ফেঁপে ছুটেছে সে জল। শোনা যায়, বুনো কুকুরের তাড়া খেয়ে একটা কাকার এই জায়গায় লাফ মেরে অলকনন্দা পেরিয়ে গিয়েছিল।

পা রেখে চলবার জন্য দড়ি দুটোর মাঝে-মাঝে প্রায় দু-ফুট অন্তর অন্তর এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চি চওড়া যেমন-তেমন কতকগুলো কাঠের টুকরো ঘাসের গোছা দিয়ে দড়ি দুটোর সঙ্গে আলগা বাঁধা আছে। মাকড়সার জালের মত এই পলকা বস্তুটি পার হবার বিপদ আরো বেড়ে গেছে। কেননা, একটা দড়ি ঝুলে পড়েছে। ফলে যে কাঠগুলোতে পা রাখতে হবে, সেগুলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ রচনা করে বেঁকে আছে।

যে লোকটা মাশুল নেয়, সে এক পয়সা মাশুলের জন্যে আমাকে ওটায় উঠিয়ে জীবন বিপন্ন করতে দিয়েছিল আমার। প্রথম যখন এই ভয়ংকর ঝুলাটি দেখি, আমি এমন বোকা, যে ওকেই জিগ্যেস করেছিলাম, ঝুলাটি কখনো পরখ, অথবা মেরামত করা হয়েছে কি না। আমার আগাগোড়া বেশ হিসাবী নজরে দেখে নিয়ে ও জবাব দিল, ঝুলাটা কখনো পরখ, অথবা মেরামত করা হয় নি। তবে কে একজন ওটা পেরোচ্ছিল। তার ভার সইতে না পেরে ওটা ছিঁড়ে যায়। তখন সে-জায়গায় আরেকটা ঝুলা লাগানো হয়েছে। ওর জবাব শুনে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা কনকনানি নেমে যায়। নিরাপদে ও-পারে পৌঁছবার পরেও অনেকক্ষণ অবধি সে অনুভূতিটা রয়ে গিয়েছিল আমার ভিতরে।

এ ঝুলা পেরনো নরখাদকটার সাধ্যের বাইরে। তা হলে বাকি রইল দুটো ঝোলা-পুল। আমি নিশ্চিত ভাবলাম, ওগুলো বন্ধ করে যদি নরখাদকটাকে রুখে দিই, তবে ওকে অলকনন্দার এক-পারে আটকে ফেলতে সমর্থ হব। ফলে ওকে খোঁজার এলাকাও আয়তনে অর্ধেক কমে যাবে।

তাই, নদীর কোন্ পাড়ে চিতাটা আছে, তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করাই দাঁড়াল প্রথম কর্তব্য। চাতোয়াপিপল ঝোলা-পুলের কয়েক মাইল দূরে, নদীর বাঁ-পারে, চিতাটির শেষ শিকার, সাধুর হত্যা ঘটেছিল। আমি নিশ্চিত জানতাম, চিতাটা মড়ি ছেড়ে যাবার সময়ে এই পুল দিয়েই পেরিয়েছে। কেননা, একজনকে ঘায়েল করবার আগে স্থানীয় বাসিন্দা আর তীর্থযাত্রীরা যত সাবধানতামূলক ব্যবস্থাই গ্রহণ করুক না কেন, একজন ঘায়েল হবার ঠিক পরেই সে ব্যবস্থা দ্বিগুণ জোরদার হবে। ফলে, সেই একই অঞ্চলে পর-পর শিকার যোগাড় করা চিতাটার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

মানচিত্রটি দেখে আপনি জিগ্যেস করবেন, তাই যদি হবে, তাহলে একটা গ্রামের নামের পাশে ছয়টা মৃত্যুর সংখ্যা দেখানো হল কেন। অনির্দিষ্টকাল ধরে কোনো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যায় না, আমি শুধু এই উত্তরই দিতে পারি। বাড়িগুলো ছোট। শৌচের সুবিধে বা ব্যবস্থা সেখানে নেই। তাই, নরখাদকটা দশ, পনের বা বিশ মাইল দূরের কোনো গ্রামে হানা দিয়ে ফিরছে শুনে প্রয়োজনীয় শারীরিক তাগিদে কোনো পুরুষ, রমণী বা শিশু মুহূর্তেকের জন্যে দরজা খুলবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। যে জন্যে চিতাটা হয়তো বহু রাত ধরে অপেক্ষা করছিল, ওই মুহূর্তেকেই সে-সুযোগ তার হাতে তুলে দেওয়া হল।



৮

দ্বিতীয় মড়ি

থাবার ছাপ দেখে নরখাদকটাকে চিনি, তেমন কোনো ফোটো বা অন্য কোনো উপায় ছিল না। তাই, নিজের জন্য এ তথ্যটি যতক্ষণ না যোগাড় করার সুযোগ পাচ্ছি, ততক্ষণ অবধি রুদ্রপ্রয়াগের আশপাশের সব চিতাকেই আমি আসামী ব'লে সন্দেহ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঠিক করলাম, যে চিতা সুযোগ দেবে, তাকেই গুলি করব।

যেদিন রুদ্রপ্রয়াগে পেঁছিই, সেদিনই দুটো ছাগল কিনি। পরদিন সন্ধ্যায় তীর্থ-পথের এক মাইল গিয়ে একটিকে বেঁধে এলাম। অন্যটিকে অলকনন্দার ও-পারে নিয়ে একটা পথের ওপর বাঁধলাম। পথটা চলে গেছে ঘন ঝোপঝাড়ের জঙ্গল দিয়ে। ও-পথে আমি একটা বড় মদ্দা চিতার থাবার পুরনো ছাপ দেখেছিলাম।

পরদিন সকালে ছাগল দুটোকে দেখতে গিয়ে দেখি, নদীর ও-পারের ছাগলটাকে মারা হয়েছে, সামান্য মাংসও খাওয়া হয়েছে। একটা চিতাই যে ছাগলটা মেরেছে, তা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না, তবে ওটিকে খেয়েছে কোনো ছোট প্রাণী, সম্ভবত পাহাড়ে বেজি।

দিনের বেলায় নরখাদকটার কোনো খবর পেলাম না। সুতরাং মরা ছাগলটার উপর বসা সাব্যস্ত করলাম, এবং বেলা তিনটের সময় মড়ি থেকে গজ-পঞ্চাশেক দূরে একটা ছোট গাছের উপর গিয়ে বসলাম। যে তিন ঘণ্টা গাছের উপর ছিলাম সে সময় চিতাটা যে কাছাকাছি কোথাও আছে, কোনো জীবজন্তু বা

পাখির ব্যবহার থেকে এমন কোনো লক্ষণই বুঝতে পারলাম না। যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন গাছ থেকে নেমে ছাগলের দাড়টা কেটে নিলাম। চিতাটা আগের রাতে সেটা ছেঁড়ার কোনো চেষ্টাই করে নি। তারপর বাংলোর দিকে পা চালিয়ে দিলাম।

আগেই বলেছি যে নরখাদক চিতা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম, কিন্তু কয়েকটা নরখাদক বাঘ আমি দেখেছি। গাছ থেকে নামার পর থেকে বাংলোয় পেঁছনো পর্যন্ত অতর্কিত আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে সবরকম-ভাবে সতর্ক রইলাম। ভাগ্যিস তা করেছিলাম!

পরদিন বেশ সকালে বেরিয়ে পড়ে বাংলোর গেটের কাছেই একটি বড় মদ্দা চিতার থাবার ছাপ দেখতে পেলাম। ছাপ অনুসরণ করে গিয়ে দেখি সেগুলো এসেছে একটা ঘন জঙ্গলে ভরা খাদ থেকে।

যে-পথটার কাছে ছাগলটা পড়েছিল, খাদটা সে-পথ পার হয়ে চলে গেছে। রাতে ছাগলটাকে কেউ ছোঁয়ও নি।

যে চিতাটা আমাকে অনুসরণ করেছিল, সেটা নিশ্চয় নরখাদকটাই হবে। নরখাদকটা এখন নদীর এ-ধারে, আমাদের দিকে—এই কথা জানিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ার হতে বললাম গ্রামে-গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের, পথে যার সঙ্গে দেখা হল, তাদের সকলকে। দু-পায়ে যতদূর বয়, তত মাইল হেঁটে-হেঁটে এ-কথাই বললাম বাকি দিনটা ধরে।

সেদিনটা কিছু ঘটল না, কিন্তু পরদিন সকালে গোলাবুরাইয়ের পিছনের জঙ্গলগুলোয় অনেকক্ষণ ধরে সন্ধান চালিয়ে এসে সবে প্রাতরাশ শেষ করেছি এমন সময় একটি লোক উত্তেজিতভাবে ছুটে এসে খবর দিল যে আগের রাতে নরখাদকটি বাংলোর উপরের একটা পাহাড়ী গ্রামে একটা স্ত্রীলোককে মেরেছে। যেখান থেকে একনজরে আপনি নরখাদকটার ৫০০ বর্গ-মাইল বিচরণভূমির সবটা দেখেছিলেন, সেই পাহাড়টায়, এবং প্রায় সেই জায়গাতেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি প্রয়োজনীয় সব জিনিস গুছিয়ে নিলাম—একটা বাড়তি রাইফেল আর শটগান, গুলি, দড়ি আর খানিকটা মাছ-ধরা ছিপের সুতো। খাড়াই পাহাড় ভেঙে রওনা দিলাম, সঙ্গে রইল গ্রামবাসীটি, আমার নিজের লোক দু-জন। দিনটা বেজায় গুমোট, ভ্যাপ্‌সা গরম। দূরত্ব যদিও বেশি নয়, বড়জোর তিন মাইল, তবু ঐ রোদের ভিতর ৪০০ ফুট চড়াই-ভাঙা বেশ কষ্টকর হয়েছিল। ঘামে প্রায় নেয়ে উঠে গ্রামে গিয়ে পেঁছলাম।

মৃত স্ত্রীলোকটির স্বামীর কাছে কাহিনীটা শুনলাম। উনুনের আলোয় রাতের খাওয়া শেষ হলে স্ত্রীলোকটি এঁটো বাসনগুলো ধোয়ার জন্যে দরজার কাছে নিয়ে যায়। পুরুষটি তখন তামাক খেতে বসে। দরজার কাছে গিয়ে

স্ত্রীলোকটি চৌকাঠের উপর বসে এবং বসার সঙ্গে-সঙ্গেই বাসনগুলো সশব্দে মাটিতে পড়ে যায়।

কি ঘটল দেখার মত যথেষ্ট আলো ছিল না। উৎকণ্ঠায় ডাকাডাকি করেও যখন সাড়া পায় নি, তখন পুরুষটি ছুটে গিয়ে খিল তুলে দরজা এঁটে দেয়।

ও বলল, "একটা মৃতদেহ উদ্ধার করতে চেষ্টা করতে গিয়ে নিজের জীবনটা বিপন্ন করে লাভ কি হত?" যুক্তিটা হৃদয়হীন, তবে অকাট্য। আমি বুঝলাম, ও যে শোকপ্রকাশ করছে, তা ওর স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে ততটা নয়। কয়েকদিনের মধ্যে যে ছেলে, উত্তরাধিকারী জন্মাবে বলে ও আশায় ছিল, তার মৃত্যুতেই ওর বেশি শোক।

যে দরজা থেকে স্ত্রীলোকটিকে ধরে নিয়ে গেছে সেটা একটা চার ফুট চওড়া গলির উপর ; পঞ্চাশ ফুট লম্বা এই গলিটার দু-ধারে দু-সারি বাড়ি। বাসনগুলো ছড়িয়ে পড়ার শব্দ আর তারপরেই লোকটির উৎকণ্ঠিত ডাক শুনে গলির সমস্ত দরজা নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল। মাটির উপর দাগ থেকে বোঝা গেল যে চিতাটা হতভাগ্য স্ত্রীলোকটিকে সারাটা গলি টেনে নিয়ে গিয়েছে, তারপর তাকে মেরে পাহাড়ের নিচের দিকে খানিকটা দূরে কয়েকটা ধাপ-জমির সংলগ্ন একটা ছোট খাদের ভিতর বয়ে নিয়ে গিয়েছে। এখানে বসেই সে খেয়েছে এবং এখানেই ফেলে রেখে গিয়েছে শোচনীয় ভুক্তাবশিষ্ট।

একটা সরু ধাপ-জমির এক সীমান্তে খাদের মধ্যে দেহটা পড়ে ছিল। অন্য মাথায়, চল্লিশ গজ দূরে একটা পাতাবিহীন বেঁটে আখরোট গাছ। তার উপর একটা খড়ের মাচা। খড়ের এই মাচাটা হল মাটি থেকে চার ফুট উপরে, ছ-ফুট উঁচু। এই খড়ের মাচার উপরই বসব স্থির করলাম।

দেহটার কাছ থেকে শুরু হয়ে একটা সরু পথ নালার মধ্যে নেমে গিয়েছে। এই পথের উপর, যে চিতাটা মেয়েটিকে মেরেছে, তার থাবার ছাপ দেখতে পেলাম। দু-রাত আগে ছাগলের মড়ির কাছ থেকে রুদ্রপ্রয়াগের বাংলো পর্যন্ত যে ছাপ-গুলো আমাকে অনুসরণ করেছিল অবিকল সেইরকম। থাবার ছাপগুলো বিগত যৌবন অতিকায় এক মদ্দা চিতার, সামান্য একটু খুঁত-যুক্ত,—কেননা তার পিছনের বাঁ থাবার কোনায় চার বছর আগে একটা গুলি লেগে থাবাটা কুঁচকে দেয়।

গ্রাম থেকে দুটো শক্ত আট-ফুট লম্বা বাঁশ যোগাড় করলাম। নিচের খেত, আর যে খেতে মড়িটা পড়ে আছে, দুটো খেতের মাঝে একটা খাড়া বাঁধ। সেই বাঁধের কাছের মাটিতে শক্ত করে গেড়ে দিলাম বাঁশ দুটো। বাঁশ দুটোতে আমার বাড়তি রাইফেল ও শটগান শক্ত করে পুঁতলাম। রেশমী মাছ-ধরা সুতো বন্দুকগুলোর ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধলাম। সুতোর ফাঁস ট্রিগার-গার্ডের উপরে

গলিয়ে পেছনে টেনে নিয়ে পথের দূরে একটু উপরে পাহাড়ের গায়ে পোঁতা দুটো কাঠের গোঁজের সঙ্গে বেঁধে দিলাম।

গত রাতে যে-পথে এসেছে, সে-পথে চিতাটা এলে, সুতোয় টান লাগলে ও আপনা থেকেই গুলি খাবে, সে-সম্ভাবনা ভালমতই রইল। অপরপক্ষে, চিতাটা যদি সুতোগুলো এড়াতে পারে, অথবা অন্য কোনো পথে আসে—ও যখন মড়ি খাচ্ছে, তখন যদি আমি ওকে গুলি করি—তবে যে-পথে পিছু হটে পালানো সবচেয়ে স্বাভাবিক, সে-পথে পালালেও ও সুতোর ফাঁদে গিয়ে পড়বে এ প্রায় নিশ্চিত। ফাঁদটা ওর পালাবার পথের উপর।

চিতাটার গায়ের রং এমন যে, তাই ওকে আত্মগোপনে সহায়তা করে। মড়ির গা থেকেও সব জামাকাপড় খুলে ফেলা হয়েছে। অন্ধকারে দুজনকেই দেখা যাবে না। তাই, কোন্ দিকে গুলি করব, তার আন্দাজ পাবার জন্য আমি খাদ থেকে এক চাঙড় সাদা পাথর আনলাম। মড়িটার কাছাকাছি ফুট-খানেক দূরে, খেতের কিনারায় সেটা রাখলাম।

নিচের বন্দোবস্ত আমার মনোমত করেই সারা হল। এবার খড়ের মাচার উপর আরামে বসার বন্দোবস্ত করলাম। খানিক খড় টেনে ফেলে দিলাম। খানিক পেছনে, খানিক সামনে আমার কোমর ঢেকে পাঁজা করলাম। মড়ি আমার সামনে। গাছে পিঠ ঠেস দিয়ে বসেছি। যে-সময়েই আসুক না কেন, চিতাটা আমায় দেখতে পাবে, সে সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। এক মড়ির কাছে কখনো ফিরে আসে না বলে ওর খ্যাতি আছে বটে, তবু রাতে ও যে আসবেই, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

খাড়া-চড়াই ভাঙার ফলে আমার জামাকাপড় তখনো ঘামে ভেজা। তবু একটা মোটামুটি শুকনো জ্যাকেট হিমেল হাওয়া আটকাল। আমি আমার নরম, আরামপ্রদ আসনে বসলাম, রাতভোর প্রহরার জন্যে প্রস্তুত করলাম নিজেকে। আমার লোকদের ফেরত পাঠালাম। বলে দিলাম, যতক্ষণ আমি ওদের খোঁজে না-আসি, অথবা পরদিন সকালে সূর্য ভাল মত না-ওঠে, ওরা যেন গ্রাম-প্রধানের বাড়িতেই থাকে। (আমি সোজা বাঁধ থেকে মাচানে উঠেছি। নরখাদকটাও তাই করলে, তাকে আটকানো যাবে না)।

সূর্য অস্ত যায়-যায়। অস্তায়মান সূর্যের সিধে রশ্মিতে পশ্চাৎপটে তুষার-মৌলী হিমালয়কে নীলচে গোলাপী দেখাচ্ছে। সে দৃশ্য, গঙ্গা-উপত্যকার দৃশ্য চোখ ভরে দেখার মত। আমি টের পাবার প্রায় আগেই আকাশ থেকে দিবালোক মিলিয়ে গেল। নেমে এল রাত।

'অন্ধকার' শব্দটা যখন রাত্রি সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, তখন সেটা একটা আপেক্ষিক শব্দ। তার কোনো নির্দিষ্ট মান নেই। একজনের কাছে যা সূচিভেদ্য অন্ধকার, আরেকজনের কাছে তা শুধু অন্ধকার এবং তৃতীয়জনের

কাছে তা মোটামুটি অন্ধকার। আমার জীবনের বহু দিন আমি খোলা জায়গায় কাটিয়েছি। তাই, যদি না আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা থাকে, রাত্রি আমার কাছে কখনই তেমন অন্ধকার নয়।

আমি এ কথা বলতে চাই না যে আমি রাতেও দিনের মতই দেখি। কিন্তু আমি যে-কোনো জঙ্গলে বা যে-কোনো জায়গায় পথ দেখে যথেষ্ট চলতে পারি। মড়ির কাছে সাদা পাথরটা রেখেছিলাম শুধু সতর্কতা হিসেবে। আশা করেছিলাম যে তারার আলো তুষারমণ্ডিত পর্বতশ্রেণীর ওপর প্রতিফলিত হয়ে গুলি করার মত যথেষ্ট আলো যোগাবে।

কিন্তু আমার ভাগ্য বিরূপ। কারণ রাত হতে না হতেই দেখা গেল একটা বিদ্যুতের চমক, তারপর দূরে বজ্রনির্ঘোষ, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে গেল। বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা সবে দু-চারটে পড়েছে, এই সময় নালার মধ্যে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ পেলাম। কয়েক মিনিট পরে আমার নিচে মাটিতে ছড়ানো বিচালির ওপর খসখসানি শোনা গেল।

চিতাটা এসেছে। যতক্ষণ আমি মুষলধার বৃষ্টিতে বসে রইলাম, তুষারশীতল বাতাস শোঁ-শোঁ করে আমার ভিজে পোশাক ভেদ করে বইতে লাগল, সে ততক্ষণে আরামে নিচে শুকনো জায়গায় শুয়ে থাকল। আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে যৎপরোনাস্তি খারাপ এই ঝড়টা। ঝড় যখন তুঙ্গে, তখন দেখতে পেলাম গ্রামের দিকে একটা লণ্ঠন নিয়ে কে যাচ্ছে।

যে লণ্ঠন নিয়ে যাচ্ছে, তার সাহস দেখে আমি তাজ্জব। কয়েক ঘণ্টা বাদে তবে আমি জানতে পারি, যে লোকটি অমন সাহসে ঝড় ও চিতাকে পরোয়া না-করে যাচ্ছিল, সে সেদিন বাধ্য হয়ে ত্রিশ মাইল হেঁটে পাউরি থেকে এল। রাতে গুলি করার জন্য, সরকার আমাকে যে ইলেক্‌ট্রিক টর্চ দেবেন বলে কথা দেন, সেটি আনল ও।

মাত্র তিন ঘণ্টা আগে এ টর্চটা এসে পৌঁছত যদি...তবে বৃথা এ অনুশোচনা। চিতাটা যদি ওদের গলায় দাঁত না-বসাত, তাহলেই যে পরে যে চোদ্দজন লোক মারা পড়ে, তারা আরো কিছুকাল বাঁচত, এ কথা কে বলতে পারে? তা ছাড়া, সময়ে টর্চটা এসে যদি পৌঁছতও, সে-রাতে আমি চিতাটাকে মারতামই, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আমার হাড অবধি কাঁপিয়ে দিয়ে বৃষ্টি হঠাৎ থামল। মেঘ কাটছে, এমন সময়ে হঠাৎ সাদা পাথরটা ঢাকা পড়ল। একটু বাদেই শুনলাম চিতাটা খাচ্ছে। গত রাতে খাদে শুয়ে খাদের দিক থেকে মড়ি খেয়েছে। আজ রাতেও ও তাই করবে আশা করে আমি মড়ির কাছে সাদা পাথরটা রেখেছিলাম।

বোঝাই যাচ্ছে বৃষ্টির ফলে খাদের ভিতর ছোট-ছোট ডোবে জল জমেছে। সেগুলো এড়াতে চিতাটা নতুন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসেছে। ফলে আমার

নিশানাটা আড়াল করে দিয়েছে। এ এমন ঘটনা, যে আগে আমি ভেবে দেখি নি এমন হতে পারে। যাই হ'ক, চিতাদের স্বভাব-অভ্যাস জানি বলে জানতাম, পাথরটা আবার দেখা যাবে। বেশি সবুর করতে হবে না আমায়।

দশ মিনিট পরে পাথরটাকে দেখা গেল, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই আমার নিচে একটা শব্দ শুনতে পেলাম ও একটা হালকা হলদে জিনিসের মত চিতাটাকে গাদার নিচে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। তার হালকা রঙের কারণ তার বেশি বয়স, কিন্তু চলার সময়ে সে যে শব্দ করেছিল, তার কারণ আমি তখনো বুঝি নি, এখনো বুঝে উঠতে পারি নি। সেটা ছিল মেয়েদের রেশমী পোশাকের শব্দের মত। খেতে 'নাড়া' (শস্য কেটে নেবার পর যে গোড়া থাকে) ছিল বললে হবে না, 'নাড়া' ছিল না। আশপাশে যে-খড় পড়ে ছিল, তাও সে শব্দের কারণ নয়।

প্রয়োজনীয় সময়-কাল সবুর করে রাইফেল তুলে পাথরটা নিশানা করলাম। যেই ওটা আবার ঢাকা পড়বে, সেই মুহূর্তে গুলি ছুঁড়ব, এই মনের ইচ্ছে। কিন্তু ভারি রাইফেল কাঁধে তুলে ধরে রাখার সময়ের একটা সীমা আছে তো! সে সীমায় পৌঁছে যেতে, ব্যথায় টনটনে মাংসপেশীগুলোকে একটু আরাম দিতে আমি রাইফেলটা নামালাম।

নামাতে-না-নামাতেই পাথরটা দ্বিতীয় বার আড়ালে ঢাকা পড়ল। পরের দু-ঘণ্টায় তিন-তিন বার এই একই কাণ্ড ঘটল। তারপর চিতাটা যখন চতুর্থ-বার মাচার দিকে আসছে বলে শুনলাম, মরিয়া হয়ে ঝুঁকে পড়ে আমার তলের ওই অস্পষ্ট জিনিসটার দিকে গুলি ছুঁড়লাম।

সরু ধাপ-জমিটা, যেটাকে আমি প্রচলিত 'খেত' নাম দিয়েছি, সেটা এখানে মাত্রই দু-ফুট চওড়া। পরদিন সকালে যখন জমি নিরীক্ষণ করে দেখছি, তখন দেখি ওই দু-ফুট পরিসরের ঠিক মধ্যিখানে আমার গুলির ফুটো। চিতাটার ঘাড়ের কয়েকটা লোম, ফুটোর চারপাশে ছড়িয়ে আছে।

সে-রাতে চিতাটার আর দেখা পাই নি। ভোরে সূর্য উঠতে আমার পাকদেব ডেকে নিয়ে খাড়াই-পাহাড়ের উৎরাই পথে রুদ্রপ্রয়াগ রওনা হলাম। ওদিকে মেয়েটির দেহের যে টুকু পড়েছিল, সৎকারের জন্যে তাই বয়ে নিয়ে গেল ওর স্বামী, স্বামীর বন্ধু-বান্ধব।



৯

আয়োজন

যাতের ব্যর্থতার পর ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে যখন রুদ্রপ্রয়াগের দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম তখন আমার মন তিক্ততায় ভরে গেছে, কারণ যেদিক থেকেই দেখা হ'ক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে গাড়োয়ালের সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে অদৃষ্ট একটা বিশ্রী চাল চেলেছে যা আমাদের প্রাপ্য নয়।

আমার যোগ্যতা যাই হ'ক না কেন, আমাদের পাহাড়ের মানুষগুলো নরখাদকের ব্যাপারে আমাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে মনে করে। আমি আসার আগেই খবর পৌঁছে গিয়েছিল যে গাড়োয়ালকে নরখাদক-মুক্ত করতে আমি রওনা হয়ে পড়েছি। রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছতে তখনও অনেক দিনের পথ বাকি, এর মধ্যেই রাস্তায় যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে অথবা মাঠ থেকে বা গ্রাম থেকে যারা আমায় পথ চলতে দেখেছে তারা আমার অভীষ্ট সিদ্ধিতে অটল বিশ্বাস রেখে যেভাবে আমায় অভিনন্দন জানিয়েছে তা যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি বিব্রতকর। যতই রুদ্রপ্রয়াগের কাছে আসছিলাম ততই এগুলোর মাত্রা বাড়ছিল। রুদ্রপ্রয়াগে

আমি ঢোকার সময় কেউ যদি সেখানে থাকত তবে তার পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন হত যে জনতা যাকে ঘিরে ধরেছে সে কোনো যুদ্ধফেরত বীরপুরুষ নয়, সে নিজের ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন একটি মানুষ। অত্যন্ত ভীত হয়ে সে ভাবছে, যে-কাজ সে হাতে নিয়েছে তা সম্পন্ন করা হয়তো তার সাধ্যের অতীত।

যেখানে হয়তো প্রায় পঞ্চাশটা চিতা আছে, সেখানে বিশেষ একটা চিতাকে খুঁজে বের করে মারার পক্ষে পাঁচশো বর্গ-মাইল জায়গা একটা বিরাট এলাকা। বিশেষত যার সবটাই ঘন ঝোপ-জঙ্গলে ভরা, এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ী এলাকা। যতই এই বিরাট সুন্দর এলাকাটা দেখছিলাম ততই, যে-কাজ হাতে নিয়েছি, সে-কথা ভেবে জায়গাটা অপছন্দ করছিলাম।

এখানকার জনসাধারণের মনে স্বভাবতই তেমন কোনো সংশয় ছিল না। তাদের কাছে আমি অনন্যসাধারণ, কেননা আমি অন্যান্য এলাকা নরখাদকের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। এখন তাদের মধ্যে এসেছি তাদের দীর্ঘ আট বছরের উৎপাতটাকে উৎখাত করতে। তারপর, অবিশ্বাস্যরকম বরাতজোরে আমি আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যাকে মারতে এসেছি, সেই জন্তুটা আমার একটা ছাগল মেরেছে, উপরন্তু অন্ধকারের পর খানিকটা সময় বাইরে থেকেই আমি জন্তুটাকে আবার অনুসরণ করে অলকনন্দার যে পারে আসতে বাধ্য করেছি সেখানে তাকে মারা অপর পারের চেয়ে কম কঠিন। এই প্রাথমিক সাফল্যের পর হতভাগ্য স্ত্রীলোকটি নিহত হয়েছে। যাতে আরো মানুষের প্রাণনাশ না হয় সে চেষ্টা করেছিলাম। তাতে ব্যর্থ হয়েছি। আমার ব্যর্থতাই আমায় চিতাটাকে গুলি করার সুযোগ করে দিয়েছে। অন্যথায় সে সুযোগ আমি কয়েক মাসের মধ্যেও হয়তো পেতাম না।

আগের দিন আমার পথপ্রদর্শকের পিছনে চড়াই ভেঙে পাহাড়ে ওঠার সময় হিসেব করে দেখেছিলাম, চিতাটাকে মারার সম্ভাবনা দুই বনাম এক। যদিও ইদানীং চিতাটা এক মড়ির কাছে কখনো ফিরে আসে না বলে নাম কিনেছে। রাতটা ছিল অন্ধকার, এবং আমার কাছে রাতে শিকারের উপযুক্ত কোনো সরঞ্জাম ছিল না। যেদিন আমি মাইকেল কীনের সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছিলাম যে আমি গাড়োয়ালে যাব, তিনি জিগ্যেস করেছিলেন, প্রয়োজনীয় সবকিছু আছে কি না। যখন বললাম আমার শুধু একটা রাতে শিকার করার টর্চলাইট দরকার এবং সেজন্যে কলকাতায় তার করব, তখন তিনি বললেন যে আমার জন্যে সরকার এইটুকু করতে পারবেন এবং সবচেয়ে ভাল টর্চ যা পাওয়া যায় তা রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে আমি দেখতে পাব।

টর্চটা এসে পেঁছয় নি দেখে আমি অত্যন্ত নিরাশ হওয়া সত্ত্বেও খানিকটা আশা ছিল এইজন্যে যে, অন্ধকারেও আমার মোটামুটি নজর চলত, এবং সে-

জন্যই চিতাটাকে মারার সম্ভাবনা দুই বনাম এক বলে ধরেছিলাম। সে রাতের অভিযানের উপর এত নির্ভর করছিল, যে আমি বাড়তি একটা রাইফেল আর বন্দুক সংগে নিয়েছিলাম। এবং খড়ের গাদার উপরে আমার লুকনো জায়গাটা থেকে সামনের দিকে তাকিয়ে যখন দেখলাম যে খুব অল্প দূরের পাল্লা থেকে আমি গুলি করতে পারব এবং লক্ষ ব্যর্থ হলে অথবা প্রাণীটা শুধু আহত হলেও নিখুঁতভাবে লুকনো বন্দুক আর রাইফেলের ফাঁদের মধ্যে তাকে এসে পড়তেই হবে,—আমার আশা বেড়ে গেল এবং সাফল্যের সম্ভাবনাটা ধরে নিলাম দশ বনাম এক।

তারপর এল ঝড়, দৃষ্টির পরিধি সংকুচিত হয়ে শূন্যে এসে ঠেকল, এবং টর্চের অভাবে আমি ব্যর্থ হলাম! বুঝলাম আমার ব্যর্থতার খবর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সারা উপদ্রুত এলাকাটায় ছড়িয়ে পড়বে।

মনের তিক্ততা কমাবার আশ্চর্য সান্ত্বনাদায়ী ক্ষমতা আছে ব্যায়াম, গরম জল আর খাবারের। খাড়া উৎরাই বেয়ে নেমে পথ ধরে এসে গরম জলে স্নান করে প্রাতরাশ খাওয়ার পর অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া বন্ধ করলাম। রাতের ব্যর্থতাটাকে আরো যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারলাম। মাটিতে একটা গুলি লেগেছে বলে আফসোস করাটা বালির ওপর দুধ পড়েছে বলে আফসোস করার মতই নিরর্থক। চিতাটা যদি অলকনন্দা পার হয়ে গিয়ে না থাকে তবে আমার তাকে মারার সম্ভাবনা বেড়েছে। কারণ এখন আমার কাছে আছে টর্চলাইট, যেটা আমাকে এনে দেবার জন্যে রানারটি এই ঝড়-জল, আর চিতা দুই বিপদই তুচ্ছ করেছিল।

এখন প্রথম কর্তব্য হচ্ছে চিতাটা অলকনন্দা পার হয়ে গিয়েছে কি না সেটা বের করা, আর যেহেতু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র কোনো একটি ঝোলা-পুল দিয়েই তাকে যেতে হবে, আমি প্রাতরাশের পরই সেই খবরটা আনতে বেরোলাম।

চাতোয়াপিপল পুল দিয়ে চিতাটার নদী পার হওয়ার সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিলাম, কারণ আমার ভারি রাইফেলটার গুলি তার মাথা থেকে ক-ফুট দূরে লাগাতে সে যত কমই ঘাবড়াক না কেন, এটা সম্ভব নয় যে গুলি খাওয়ার পর দিনের আলো ফুটতে যতটা সময় বাকি ছিল তারই মধ্যে সে মড়ি ছেড়ে চোদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করে ঐ পুলটা পর্যন্ত পৌঁছবে। সুতরাং আমি শুধু রুদ্রপ্রয়াগের ঝোলা-পুলেই আমার অনুসন্ধান সীমিত রাখা স্থির করলাম।

পুলে পৌঁছনোর তিনটে পথ : একটা উত্তর থেকে, একটা দক্ষিণ থেকে, আর একটা বহুব্যবহৃত পায়ে-চলা পথ থেকে, যেটা এসেছে রুদ্রপ্রয়াগ বাজার থেকে। এই পথগুলো ভাল করে পরীক্ষা করার পুলটা পার হয়ে কেদারনাথের পথে আধ মাইল পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখলাম। তারপর দেখলাম

সেই পায়ে-চলা পথটা, যার ওপর তিন রাত আগে আমার ছাগলটা মারা পড়েছিল।

চিতাটা নদী পার হয় নি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি পুলদুটো বন্ধ করে দিয়ে সেটাকে নদীর এই পারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরিকল্পনাটা কাজে লাগাতে মনস্থ করলাম। পুলের চৌকিদারদের সহযোগিতা পেলে পরিকল্পনাটা সহজ। ওরা দু-জন নদীর বাঁ-পারে, পুলের থামের কাছেই থাকে। তাদের সহযোগিতা পেলে সাফল্য সুনিশ্চিত।

নদীর দুই পারের ত্রিশ মাইলের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র উপায়কে বন্ধ করে রাখাটা একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত, চিতাটার জারী-করা সান্ধ্য-আইনের ভয়ে পুলদুটো ব্যবহার করার সাহস ছিল না।

পুলের দু-মুখে টাওয়ার দুটোর ওপর ইস্পাতের দড়ির ভার, ইস্পাতের দড়ি থেকে আবার কাঠের তক্তায় তৈরি পায়ে-হাঁটা পাটাতনের সার ঝুলছে। সেই টাওয়ার দুটোর নিচের চার ফুট চওড়া খিলানের মুখ কাঁটাঝোপ ঠুসে বন্ধ করে দেওয়া হল। যত কাল পুলের মুখ ওইভাবে বন্ধ থাকে, অথবা আমি পাহারা দিই, কোনো মানুষই ও-পথে পেরোবার দাবি জানায় নি।

রুদ্রপ্রয়াগের বাঁ-তীরে পুলের টাওয়ারের উপর সবসুদ্ধ আমি প্রায় কুড়ি রাত কাটিয়েছি। সে রাতগুলো ভোলার নয়।

ঠেলে বেরিয়ে আসা একটা পাহাড়ের উপর টাওয়ারটা তৈরি হয়। ওটা কুড়ি ফুট উঁচু, ওপরের ছাতটা প্রায় চার ফুট চওড়া, আট ফুট লম্বা। ওখানে ওঠার উপায় দুটো। টাওয়ারের ওপরের দিকে ফুটো দিয়ে ইস্পাতের দড়িগুলো ঢুকেছে, পিছনে বেরোবার পর, টাওয়ার থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে পাহাড়ের গায়ে দড়িগুলো নোঙর-বাঁধা। এক উপায় হল, সেই দড়ি বেয়ে ওঠা। আরেকটি হল, অত্যন্ত নড়বড়ে একটা বাঁশের মই বেয়ে ওঠা। আমি দ্বিতীয়টাই বেছে নিই। কেন না ইস্পাতের পাকানো তারের দড়ির ওপর একটা কাল, দুর্গন্ধ জিনিসের স্তর জমেছে। জিনিসটা হাতে লেগে থাকে, জামাকাপড়ে যে দাগ ধরায় তা আর ওঠে না।

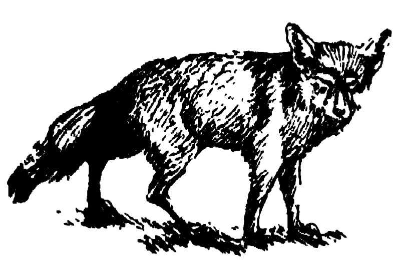
মইটা হল, দুটো অসমান মাপের বাঁশের মাঝে দড়ি দিয়ে বাঁধা পাতলা-পাতলা কাঠে তৈরি। ওটা টাওয়ারের ছাতের চার ফুট নিচে অবধি পৌঁছয়। মইয়ের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে মসৃণ ছাতটা ধরার জন্যে আমার হাতের চেটোর ওপর নির্ভর করতে হয়। ও-ভাবে ওপরে ওঠা শারীর-কৌশলের মহাকীর্তি বিশেষ। যত বেশিবার চেষ্টা করা গেছে, ততই জিনিসটা কম পছন্দ হয়েছে।

হিমালয়ের এ-অঞ্চলে সব নদীই উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়। যে অধিত্যকার ভিতর দিয়ে বয়, সেখানে একরকম বাতাস বয়। সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সঙ্গে

সে বাতাসের গতি বদলায়। স্থানীয় ভাষায় ও-বাতাসের নাম 'দাদু'। বাতাসটা দিনের বেলা দক্ষিণ থেকে বয়। রাতে বয় উত্তর থেকে।

যে-সময়ে আমি ছাতে উঠতাম, তখন সাধারণত বাতাস মন্দা থাকত। কিন্তু একটু পরেই, স্বয়ং পবনদেবের মত তার জোর বাড়ত, বাতাস বইত, মাঝরাত নাগাদ রীতিমত ঝড় বইত। হাত দিয়ে ধরার মত ছাতে কিছু ছিল না। বাতাসের চাপ ঠেকাতে, শরীরের চাপ বাড়াতে আমি উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম পেট চেপে। তবু, বাতাসে উড়িয়ে আমাকে ষাট ফুট নিচের পাথরে ফেলে দেবে, এ ঝুঁকি থেকে যেত। সেখান থেকে ছিটকে গিয়ে তুষার-শীতল অলকনন্দায় পড়ার কথা। অবশ্য ধারালো, খোঁচা-খোঁচা পাথরের উপর ষাট ফুট উঁচু থেকে আছড়ে পড়ার পর জলের তাপমাত্রা নিয়ে চিন্তা করার কোনো মানে থাকার কথা নয়। আশ্চর্য, যখনই পড়ে যাব বলে ভয় হত, সব সময়ে জলের কথাই মনে হত, পাথরগুলোর কথা মনে হত না।

বাতাসের দরুন অস্বস্তির ওপর, অসংখ্য ছোট পিঁপড়ে আমায় যন্ত্রণা দিত। ওরা আমার জামাকাপড়ে ঢুকে পড়ে চামড়ার টুকরো খেয়ে নিত। যে কুড়ি রাত আমি পুল পাহারা দিই, কাঁটাঝোপ পুলের মুখে ছিল না। সেই দীর্ঘ সময়-কালের মধ্যে একটি মাত্র জ্যান্ত জানোয়ার পুলটা পেরোয়। একটা শেয়াল।





১০

ম্যাজিক

প্রত্যেক দিন বিকেলে আমার সঙ্গে দু-জন লোক মই নিয়ে পুল পর্যন্ত যেত। মই বেয়ে আমি উঠে পড়লে পরে রাইফেলটা আমার হাতে দিয়ে মইটা সরিয়ে নিয়ে যেত।

দ্বিতীয় দিন পুলের কাছে যখন পৌঁছলাম, সাদা আলখাল্লা-পরা একটি লোককে দেখলাম, তার বুকে আর কপালে কি দুটো জিনিস চকচক করছিল। ছ-ফুট রুপোর ক্রুশ নিয়ে কেদারনাথের দিক থেকে সে পুলটার দিকে আসছিল। পুলে পৌঁছে লোকটা হাঁটু গেড়ে বসল, তারপর ক্রুশটা সামনে তুলে ধরে মাথা নোয়াল। কিছুক্ষণ সেইভাবে থেকে সে ক্রুশটা তুলে ধরল। তারপর উঠে কয়েক পা এগিয়ে আবার হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নামিয়ে ক্রুশ তুলে ধরল। সারাটা সেতু সে এই করতে-করতে পার হল।

আমাকে পেরিয়ে যাবার সময়ে সে নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত তুলল, কিন্তু তাকে গভীরভাবে প্রার্থনারত মনে হওয়ায় আমি কোনো কথা বললাম না। মাথায় আর বুকে যে দুটো জিনিস চকচক করতে দেখেছিলাম সে দুটো দেখলাম রুপোর ক্রুশ।

এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখে আমার মত আমার লোকরাও কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। লোকটি রুদ্রপ্রয়াগ বাজারে যাবার চড়াই হাঁটাপথে উঠে গেল। ওকে দেখতে-দেখতে ওরা জিগ্যেস করল লোকটি কি করম ? কোন্ দেশ থেকে এসেছে ও ? ও যে ক্রীশ্চান, তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। যে-হেতু আমি ওকে কথা বলতে শুনি নি, ওর লম্বা চুল, কুচকুচে ঘন দাড়ি, আর ওর চোখ-মুখ দেখে যা বুঝলাম, লোকটি উত্তর ভারতীয়।

পরদিন সকালে মই বেয়ে টাওয়ার থেকে নেমে আমি ইন্‌সপেক্‌শন বাংলোর দিকে যাচ্ছিলাম। দিনের যে সময়টুকু আমি নরখাদকটার খবরের খোঁজে কাছের ও দূরে গ্রামে-গ্রামে ঘুরতাম না, সে সময়টা ওই বাংলোতেই থাকতাম। যাচ্ছি, তখন দেখি পথের কাছে একটা মস্ত পাথরের চাঁইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে সেই আলখাল্লা-পরা লোকটা নদীটা দেখছে।

আমি কাছে আসতে ও পাথর থেকে নেমে এসে আমায় সম্ভাষণ জানাল। আমি যখন জিগ্যেস করলাম, এখানে আসার উদ্দেশ্য কি, ও বলল, যে দুষ্ট আত্মা গাড়োয়ালের মানুষদের নির্যাতন করছে, তার হাত থেকে ওদের উদ্ধার করবার জন্য বহু দূরের এক দেশ থেকে ও এসেছে।

যখন বললাম, এ কাজ কিভাবে করবে ? ওর প্রস্তাবটা কি ? ও বলল, ও একটা বাঘের কুশপুত্তল তৈরি করবে। তৈরি করার পর, প্রার্থনার সহায়তায় দুষ্ট আত্মাটাকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলবে। তারপর কুশপুত্তলটি ও গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। নদী ওটাকে ভাসিয়ে সমুদ্রে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে দুষ্ট আত্মাটা ফিরতে পারবে না। সমুদ্রে থেকে, মানুষের আর কোন ক্ষতিও করতে পারবে না।

লোকটা যে-কাজ সেধে ঘাড়ে নিয়েছে, ওর তা সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে আমি যত সন্দেহই করি না কেন, ওর বিশ্বাস আর পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। আমি টাওয়ার থেকে নামার আগেই রোজ সকালে ও পেঁৗছে যেত। সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসতাম, তখনো দেখতাম কঞ্চি, দড়ি, কাগজ, সস্তার রঙিন কাপড় দিয়ে ও ওর সেই 'বাঘ' বানাচ্ছে খেটেখুটে। সে 'বাঘ' তৈরির কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এক রাতের প্রবল বর্ষণে সব ভেঙেচুরে খুলে ফেলে দিল। এতটুকু নিরস্ত না-হয়ে পরদিন সকাল থেকে গান গাইতে-গাইতে মহানন্দে আবার ও কাজ শুরু করল।

অবশেষে সেই মহান দিবস হাজির হল। ওর মনের মত করে জিনিসটা তৈরির কাজ শেষ হল। সে 'বাঘ' প্রায় ঘোড়ার মত বড়। তার সঙ্গে কোনো জানিত প্রাণীর মিল নেই।

তামাশায় যোগ দিতে মনে-প্রাণে ভালবাসে না, এমন লোক আমাদের পাহাড়ীদের মধ্যে কে আছে ? লম্বা খুঁটিতে বেঁধে সে কুশপুত্তল যখন খাড়া

উৎরাই-পথে একটা ছোট বাল্মচরে নামানো হল, তার সঙ্গে তখন একশোর বেশি লোক। তাদের অনেকে কাঁসর পেটাচ্ছে, লম্বা শিঙায় ফু দিচ্ছে।

নদীর কিনারে এনে খুঁটি থেকে কুশপুত্তলটি খোলা হল। মাথার টুপিতে, বুকে রুপোর ক্রুশ, হাতে ছ-ফুট ক্রুশ, সাদা আলখাল্লা-পরা লোকটি বালিতে হাঁটু গেড়ে বসল। অতি আন্তরিক প্রার্থনায় দুষ্ট আত্মাটাকে ওর তৈরি মূর্তিতে ঢোকাল। তারপর কাঁসরের ঢং-ঢং, শিঙার কানফাটানো শব্দের মধ্যে সেটিকে গঙ্গায় ভাসান দেওয়া হল। বহু মিষ্টান্ন ও ফুলের অর্ঘ্যের সঙ্গে মূর্তিটি দ্রুত সমুদ্রের পথে ভেসে চলে গেল।

পরদিন সকালে পাথরের ওপর আর চেনা চেহারাটি দেখা গেল না। যারা ভোরে নদীতে স্নান করতে যাচ্ছিল, তাদের কয়েকজনকে জিগ্যেস করলাম, আমার সেই আলখাল্লা-শোভিত বন্ধুটি কোথা থেকে এসেছিল, গেলই বা কোথায়? তারা জবাব দিল, "পুণ্যাত্মা পুরুষ কোথা থেকে এলেন, কে বলতে পারে? তিনি কোথায় গেলেন, তা জিগ্যেস করার সাহস আছে কার?"

কপালে চন্দনের ত্রিবলী আঁকা এই যে লোকগুলো ওই মানুষটিকে "পুণ্যাত্মা" বলে উল্লেখ করল—মূর্তি-ভাসানের অনুষ্ঠানে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল, এরা সবাই হিন্দু।

ভারতে কোনো পাসপোর্ট, পরিচয়-জ্ঞাপক গোল চাকতির চল নেই। সামান্য ক'জন, যারা "কালাপানি" পার হয়েছে, তারা ছাড়া অন্যদের কাছে ধর্মের স্থান অতি উচ্চে।

—আমার মনে হয়, গেরুয়া আলখাল্লা পরে, অথবা ভিক্ষাপাত্র হাতে, অথবা মাথার টুপিতে ও বুকে রুপোর ক্রুশ লাগিয়ে, এখানে যে-কোনো লোক খাইবার পাস থেকে কুমারিকা অন্তরীপ অবধি হেঁটে চলে যেতে পারে। কেউ তাকে একবারও তার গন্তব্য কোথায়, তা জিগ্যেস করবে না, জানতে চাইবে না তার যাত্রার উদ্দেশ্য কি।



১১

অল্পের জন্য রেহাই

তখনও পুলটা পাহারা দিচ্ছে, এর মধ্যে পাউরি থেকে ইবটসন আর তার স্ত্রী জীন এসে হাজির। ইন্‌সপেক্‌শন বাংলোয় জায়গার খুবই অভাব, সুতরাং তাদের জন্যে ঘরটা ছেড়ে দিয়ে আমি তীর্থপথের অনেক দূরের পাহাড়টায় গিয়ে আমার চল্লিশ-পাউণ্ড ওজনের তাঁবু গাড়লাম।

বহু মাইল জুড়ে প্রত্যেকটি বাড়ির দরজায় আর জানলায় যে প্রাণীটা নখের আঁচড় রেখে গিয়েছে তার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তাঁবু মোটেই যথেষ্ট নয় বলে আমি ও আমার লোকজন মিলে তাঁবুর জায়গাটার চারদিকে একটা কাঁটাঝোপের বেড়া তৈরি করলাম। এই জায়গাটার উপর এসে ঝুঁকে পড়েছে একটা বড় ময়না গাছ। সেটার ডালপালার জন্যে আমার তাঁবু খাটাতে অসুবিধে হচ্ছে দেখে গাছটা কেটে ফেলতে বললাম। খানিকটা কাটা হয়ে যাওয়ার পর আমি মত বদলালাম, কারণ তাহলে দিনের বেলা রোদের তাত আটকানোর জন্যে ছায়া পাব না। কাজেই গাছটা সম্পূর্ণ কেটে না ফেলে শুধু ডালগুলো ছেঁটে দিতে বললাম। তাঁবুর উপর গাছটা প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে হেলে ছিল।

আমরা ছিলাম আটজন। রাতের খাওয়ার পর আমি বেড়ার প্রবেশপথটা একটা কাঁটাঝোপ দিয়ে বন্ধ করে দিলাম, এবং সেই সময় আমার খেয়াল হল যে নরখাদকটার পক্ষে গাছটায় উঠে বেড়ার ভিতর লাফিয়ে পড়া খুবই সহজ হবে।

যা হ'ক, বেজায় দেরি হয়ে গেছে, তখন আর কিছু করার ছিল না। চিতাটা যদি সে-রাতের মত আমাদের রেহাই দেয় তবে পরদিন সকালেই গাছটা কেটে সরিয়ে ফেলা যাবে।

আমার লোকদের জন্যে কোনো তাঁবু ছিল না ; ভেবেছিলাম তারা ইন্‌স্‌পেক্‌শন বাংলোর সংলগ্ন কুঠরিতে ইবটসনের লোকজনদের সঙ্গেই শোবে। কিন্তু তারা তাতে রাজী হল না, বলল খোলা তাঁবুতে তাদের বিপদ আমার চেয়ে বেশি হবে না। আমার রাঁধুনি প্রচণ্ড নাক ডাকায়, আমার পাশেই গজখানেক দূরে সে শুয়ে ছিল, এবং তার ওপাশে ছোট জায়গাটার মধ্যে সার্ডিন মাছের মত গাদাগাদি হয়ে শুয়ে ছিল নৈনিতাল থেকে আনা ছ-জন গাড়োয়ালী।

আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বল জায়গা হচ্ছে গাছটা, সেটার কথাই ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

খুব উজ্জ্বল চাঁদনি রাত সেটা। মাঝরাত্রি নাগাদ হঠাৎ চিতাটার গাছে চড়ার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চার পাশে ছড়ানো কাঁটা থেকে পা বাঁচাবার জন্যে বিছানা থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে পা দুটো নামিয়ে সবে চপ্পলের মধ্যে ভরেছি এমন সময় গাছটা থেকে একটা কটাৎ শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে রাঁধুনির চিৎকার ঃ 'সাহেব, বাঘ, বাঘ!'

এক লাফে তাঁবুর বাইরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করার আগেই চিতাটা ওধারে বাঁধ থেকে লাফিয়ে একটা ধাপ-জমির উপর লাফিয়ে পড়ল। প্রবেশ-পথের কাঁটাঝোপটা টেনে সরিয়ে ছুটলাম জমিটার দিকে। শস্যশূন্য চল্লিশ গজ চওড়া জমিটার উপর দাঁড়িয়ে কাঁটাঝোপের আর বড়-বড় কয়েকটা পাথর-ছড়ানো পাহাড়ের গা-টা ভাল করে নজর করে দেখছি, এমন সময় পাহাড়-টার অনেক উপর থেকে একটা শেয়ালের ডাক জানিয়ে দিল যে চিতাটা আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

পরে রাঁধুনি আমাকে জানিয়েছিল যে সে চিত হয়ে ছিল। আমি তা অনেক আগেই বুঝেছিলাম। গাছে চিড় খাবার শব্দ শুনে চোখ খুলতেই সোজা তার নজর গিয়ে পড়ে চিতাটার উপর—ঠিক যে সময় জন্তুটা লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল।

পরদিন গাছটা কেটে ফেলা হল, বেড়াটা শক্ত করা হল এবং যদিও ওই তাঁবুতে আমরা কয়েক সপ্তাহ ছিলাম, আমাদের ঘুমের আর কোনো ব্যাঘাত হয় নি।



১২

জাঁতি-কল

কাছাকাছি গ্রামগুলো থেকে খবর পেয়েছি নরখাদকটা ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছে, ব্যর্থ হয়েছে। রাস্তায় তার থাবার ছাপও দেখেছি। এসব থেকে জানতে পেরেছি সেটা তখনও এ অঞ্চলেই আছে। ইবটসনরা আসার কয়েকদিন পরেই খবর এল, এক গ্রামে গরু মারা পড়েছে। গ্রামটা রুদ্রপ্রয়াগ থেকে দু-মাইল এবং যে গ্রামে আখরোট গাছের উপর খড়ের মাচার উপর বসে ছিলাম সেখান থেকে আধ মাইল দূরে।

গ্রামটায় গিয়ে দেখলাম, একটা এক-কামরা বাড়ির দরজা ভেঙে চিতাটা ঘরের বহু গরুর মধ্যে একটা গরু মেরে সেটাকে দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে, তারপর আর দরজার বাইরে বের করতে না পারায় বেশ খানিকটা খাওয়ার পর সেটাকে দোরগোড়ায় ফেলে রেখে গেছে।

ঘরটা গ্রামের একেবারে মাঝখানে। ঘুরে-ফিরে দেখা গেল যে কয়েক গজ দূরের একটা বাড়ির দেওয়ালে গর্ত করলে মড়িটার উপর বেশ নজর রাখা যায়।

মৃত গরুটার মালিকই ওই বাড়ির মালিক। সে আমাদের পরিকল্পনায় সানন্দে সম্মত হল। সন্ধ্যা হলে ঘরটা ভাল করে আটকে, সঙ্গে আনা স্যান্ড-উইচ আর চা খেয়ে আমরা পালা করে দেওয়ালের গর্ত দিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘ রাত জেগে পাহারা দিলাম, কিন্তু চিতাটার কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না।

সকালে ঘর থেকে বের হওয়ার পর গ্রামবাসীরা গ্রামটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেখাল। বেশ বড় গ্রাম। মানুষ ধরার জন্যে বাড়িগুলোর দরজা জানলায় নরখাদকটা বহু বছর ধরে যেসব নখের দাগ রেখে গেছে সেগুলো দেখলাম। বিশেষ করে একটা দরজায় নখের দাগ অন্যান্যগুলোর চেয়ে গভীর। এই দরজা ঠেলেই ঢুকেছিল চিতাটা। এই ঘরের মধ্যেই চল্লিশটা ছাগল ও রাখাল ছেলেটা বন্ধ ছিল।

একদিন কি দু-দিন পরে আরেকটা গরু মারা পড়ার খবর পাওয়া গেল, এটা বাংলো থেকে কয়েকশো গজ দূরে পাহাড়ের উপর একটা ছোট গ্রামে। এখানেও দেখলাম গরুটা মারা পড়েছে ঘরের ভিতর। তাকে দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে ও তার কিছুটা অংশ খেয়ে ফেলেছে। দরজাটার মুখোমুখি দশ গজ দূরে একটা নতুন খড়ের গাদা বানানো হয়েছিল, গাদাটা ষোল ফুট উঁচুতে, একটা দু-ফুট উঁচু কাঠের মাচার উপর।

খবরটা এসেছিল খুব সকালে, সুতরাং সারাটা দিন সময় পেলাম এবং বিকেল নাগাদ যে মাচানটা আমরা তৈরি করলাম, নিশ্চিত বলতে পারি, সেটা যে শুধু অত্যন্ত কার্যকরী হল তাই নয়, উপরন্তু এই ধরনের কাজের জন্যে এ পর্যন্ত যত মাচান বানানো হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে শিল্পসুন্দর।

প্রথমে খড়ের গাদা ভেঙে ফেলা হয়, তারপর কাঠের মাচানটার চারদিকে খুঁটি লাগিয়ে ওটার চার ফুট উপরে একটু ছোট করে দ্বিতীয় একটা মাচান তৈরি করা হল। গোটা জিনিসটাকে ঘেরা হল দু-ইঞ্চি ফাঁক তারের জাল দিয়ে। প্রথম মাচান ও মাটির মধ্যে ফাঁক থাকল। জালের ফাঁক ঠুসে দেওয়া হল খড়ের আঁটি। আগের মত কিছু নিচে, চারদিকে ছড়িয়েও দেওয়া হল। খড়ের গাদাটা এজমালি। তার এক অংশীদার দু-এক দিন আগে থেকে গ্রামে ছিল না। আমাদের কাজ শেষ হওয়ার পরই সে এসে পেঁছয়। প্রথমটা সে বিশ্বাস করে নি যে কিছু নাড়াচাড়া করা হয়েছে, হাত দিয়ে চারদিক দেখে, সংলগ্ন এক খেতে বাড়তি খড় দিয়ে আমরা যে দ্বিতীয় মাচানটা বানাই, সেটা দেখে তবে সে বিশ্বাস করে।

সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ে জালের গর্তের ভিতর দিয়ে গুড়ি মেরে আমরা মাচানটার মধ্যে ঢুকলাম ও ঢোকার জায়গাটা ভাল করে আটকে দিলাম। ইবটসন আমার চেয়ে মাথায় খানিকটা খাটো, কাজেই সে বসল উপরের মাচানটায়। আরাম করে বসে আমরা দু-জনেই খড় সরিয়ে গুলি করার মত দুটো ছোট ফুটো তৈরি করলাম। যেহেতু চিতাটা আসার পর আর আমাদের মধ্যে কথা বলা চলবে না সেহেতু ঠিক হল, প্রথম যার চোখে পড়বে সে-ই গুলি করবে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাত ছিল, কাজেই আমাদের টর্চলাইট ব্যবহারের প্রয়োজনও রইল না।

রাতের খাওয়ার পর সারা গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে গেল। প্রায় দশটার সময় শুনতে পেলাম চিতাটা আমাদের পিছনের পাহাড় দিয়ে নেমে আসছে। গাদাটার কাছে এসে সে কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর গুঁড়ি মেরে ঢুকতে লাগল আমার মাচানটার নিচে। সে যখন ঠিক আমার নিচে এবং তার মাথা ও আমার মধ্যে মাত্র একটা তক্তার ব্যবধান, দীর্ঘ এক মিনিট কাল সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আবার গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল।

যে-মুহূর্তে আশা করছি যে চিতাটা মাচানের তলা থেকে বেরিয়ে মাত্র তিন-চার ফুটের ব্যবধানে আমাকে গুলি করার খুব সহজ একটা সুযোগ দেবে, ঠিক সেই সময় ক্যাঁচ করে একটা বিরাট শব্দ হল উপরের মাচানটায়। চিতাটা ছুটে ডানদিকে বেরিয়ে গেল, সেদিকটা আমি আর দেখতে পেলাম না। চরম মুহূর্তে তক্তার আওয়াজটা হওয়ার কারণ—দু-পায়ে যন্ত্রণাদায়ক খিল ধরায় একটু আরাম পাওয়ার জন্যে ইবটসন সরে বসেছিল একটু। এইরকম চমক খাওয়ার পর চিতাটা আর পরের দিন বা তারও পরের দিন মড়িটার কাছে ফিরে এল না।

দু-রাত্রি পরে আবার একটা গরু মারা পড়ল রুদ্রপ্রয়াগ বাজারের কয়েকশো গজ উপরে।

গরুর মালিক একটা একটেরে বাড়িতে একাই থাকত। একটাই ঘর, মাঝ-খানে নানারকম তক্তার টুকরো বেঁধে একটা দেওয়াল করে একদিকে থাকার ও একদিকে রান্নার ব্যবস্থা। রাতে একসময় রান্নাঘরে শব্দ শুনে লোকটা জেগে ওঠে। সে ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। একটু পরে, খোলা দরজার ভিতর দিয়ে যেটুকু চাঁদের আলো আসছিল তাতে তক্তার ফাঁক দিয়ে লোকটা দেখে যে চিতাটা একটা তক্তা টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে।

দীর্ঘ সময় লোকটা শুয়ে-শুয়ে ঘামতে লাগল, আর চিতাটাও একটার পর একটা তক্তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে একটাও আলগা তক্তা না-পেয়ে ব্যর্থ হয়ে চিতাটা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ঘরের সংলগ্ন ঘাসের চালার নিচে বাঁধা গরুটাকে মারল। মারার পর দড়ি ছিঁড়ে সেটাকে চালা থেকে সামান্য দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে বেশ ভাল-মত একটা ভোজ সেরে বাকিটা সেখানেই ফেলে রেখে গেল।

যেখানে মরা গরুটা পড়েছিল, সেখান থেকে কুড়ি গজ দূরে পাহাড়ের একেবারে কিনারায় ছিল একটা মাঝারি সাইজের গাছ। তার উপর দিকের ডালের উপর একটা খড়ের গাদা। এই স্বাভাবিক মাচানটার উপর থেকে পড়লে পড়ব একেবারে কয়েকশো ফুট নিচের উপত্যকায়, তবুও আমি আর ইবটসন সেখানেই বসব ঠিক করলাম।

নরখাদকটাকে মারার সহায়তা করতে গভর্নমেন্ট কয়েক দিন আগে একটা জিন-ট্র্যাপের ফাঁদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাঁচ ফুট লম্বা আর আশি পাউন্ড

ওজনের সেই জাঁতিকলটার মত একটা ভয়াবহ বস্তু আমি আরেকটি দেখি নি। তার তিন ইঞ্চি লম্বা ধারালো দাঁত-লাগানো জাঁতিদুটো চব্বিশ ইঞ্চি করে চওড়া এবং দুটো শক্তিশালী স্প্রিঙের সহায়তায় ওটা কাজ করে। স্প্রিং চেপে ধরতে দু-জন লোক দরকার।

মড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময়ে, প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া একটা খেতের বুক-চেরা পায়ে-চলা পথ ধরে গিয়ে চিতাটা একটা তিন ফুট উঁচু আল পেরিয়ে আরেকটা খেতের উপর দিয়ে গেছে। এই খেতটায় চারদিকে ঘন ঝোপে ঢাকা পাহাড়। উপরের ও নিচের খেতের মাঝামাঝি আমরা জাঁতিকলটা পাতলাম।

চিতাটা যাতে অবশ্যই জাঁতিকলে পা দেয়, সে-জন্যে পথের দু-পাশে কয়েকটা কাঁটাডাল পুঁতলাম। জাঁতিকলের একদিকে আধ ইঞ্চি মোটা ছোট শেকল আঁটা। সে-শেকলের মুখে তিন ইঞ্চি ব্যাসের একটা কড়া। এই কড়ার ভিতর দিয়ে একটা মোটা গোঁজ ঢুকিয়ে মাটিতে শক্ত করে পুঁতে জাঁতিকলটাকে মাটির উপর বসালাম।

এসব ব্যবস্থা শেষ হলে পর জীন ইবটসন লোকজনদের নিয়ে বাংলোয় ফিরে গেল এবং আমি ও ইবটসন গাদাটার উপর গিয়ে উঠলাম। আমাদের সামনে একটা লাঠি বেঁধে তার উপর দিয়ে কিছু খড় ঝুলিয়ে দিয়ে আড়াল তৈরি করা হল। তারপর আমরা আরাম করে বসে চিতাটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম যে এবার চিতাটা আমাদের হাত থেকে পালাতে পারবে না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে এল। রাত্রি ন-টার আগে যেহেতু চাঁদ উঠবে না সেহেতু নির্ভুলভাবে গুলি করার জন্যে আমাদের বাধ্য হয়েই টর্চলাইটের উপর নির্ভর করতে হবে। এই লাইটটা বেশ ভারি ও ঝামেলার ব্যাপার। ইবটসন আমাকেই গুলি করার জন্য পীড়াপীড়ি করায় আমি খানিক চেষ্টার পর সেটা আমার রাইফেলে আটকে নিলাম।

অন্ধকার ঘনাবার এক ঘণ্টা বাদে উপর্যুপরি ক্রুদ্ধ গর্জনে বোঝা গেল চিতাটা জাঁতিকলে পড়েছে। সুইচ টিপে টর্চ জেবলে দেখি, চিতাটা পেছন ফিরছে। সামনের দু-পা থেকে জাঁতিকলটা ঝুলছে। দুম করে গুলি করলাম। আমার .৪৫০ বুলেট লাগল শেকলের একটা জোড়-আংটায়, শেকল ছিঁড়ে গেল।

গোঁজ থেকে ছাড়া পেতেই লম্বা-লম্বা লাফ মেরে চিতাটা খেত পেরিয়ে ছুটল। জাঁতিকলটা ওর সামনের দিকে। আমার বন্দুকের বাঁ-নলের গুলি, ইবটসনের শটগানের দুটো মরণান্তিক গুলি ওর দিকে ছুটে গেল। প্রত্যেকটি গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। রাইফেলে আবার গুলি ভরার চেষ্টা করতে গিয়ে আমি টর্চটার কোথাও গড়বড় করে ফেলি। তারপর টর্চটা আর জবললই না।

চিতাটার গর্জন আর আমাদের চারটে গুলির আওয়াজ শুনে—রুদ্রপ্রয়াগ বাজার থেকে, কাছাকাছি গ্রাম থেকে, লন্ঠন ও পাইন কাঠের মশাল নিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পিল-পিল করে লোক বেরিয়ে এল। সবাই এসে জুটল একটেরে বাড়িটার চারদিকে।

চেঁচিয়ে ওদের দূরে সরে থাকতে বলে কোনো লাভ হল না। কেননা ওরা নিজেরা এত হল্লা করছিল যে আমাদের গলা শুনতে পাচ্ছিল না। আমি রাইফেল নিয়ে গাছ থেকে নামলাম। অন্ধকারে সে এক বেপরোয়া ঝুঁকি নেওয়া হল। মাচানে যে পেট্রোম্যাক্স নিয়ে উঠেছিলাম, আমি নামতে-নামতে ইবটসন সেটা জ্বালল, পাম্প দিল।

দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে পেট্রোম্যাক্সটা আমার হাতে দিয়ে ইবটসন মাটিতে নেমে এল। যে-দিকে চিতাটা গেছে. দুজনেই চললাম সেদিকে। খেতের মাঝামাঝি জায়গায় নিচের পাহাড় মাটি ফুঁড়ে বেরুবার ফলে একটা ঢিপি-পাহাড়। ভারি বাতিটা উঁচু করে ধরেছে ইবটসন, আমার কাঁধে রাইফেল। আমরা পাশাপাশি ওদিকে এগোচ্ছি। ঢিবি-পাহাড়টার পরেই মাটিতে গর্ত মত। সেখানে বসে আমাদের দিকে চেয়ে গর্জাচ্ছে চিতাটা। ওর মাথায় আমার গুলিটা ঢোকবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক উত্তেজিত জনতা আমাদের ঘিরে ফেলল। এতকালের ভয়ংকর শত্রুকে ঘিরে ওরা সত্যিই নাচতে সুরু করে দিল।

আমার সামনে যে জন্তুটা মরে পড়ে আছে, এটা একটা অতিকায় মদ্দা চিতা। আগের রাতে এ কাঠের তক্তার পার্টিশন ভেঙে একটা মানুষকে ধরার চেষ্টা করেছে। যে-অঞ্চলে ডজন-ডজন মানুষ নিহত হয়েছে, সেখানেই ও গুলি খেয়ে মরল। এই যে সেই নরখাদক, তা ধরে নেবার পক্ষে এ যুক্তিগুলো ভাল, পর্যাপ্তও বটে। তবু আমি নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছি না, মেয়েটির মড়ি রেখে যখন বসেছিলাম, সে-রাতে যে জানোয়ারটাকে দেখি, এই সে। হ্যাঁ, সেও ছিল অন্ধকার রাত। হ্যাঁ, আমি চিতাটার শরীরের একটা আবছা ঝলক মাত্র দেখি। তবু, সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে যে জানোয়ারটাকে বাঁশে বাঁধা হচ্ছে, সেটা যে নরখাদকটা নয়, এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস হল।

সামনে ইবটসনরা, তারপর চিতাটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক-জন, তারপর বহু শত লোকের এক জনতা চলেছে। আমরা বাজারের পথে বাংলোর দিকে চললাম।

মিছিলের পিছনে পাহাড় থেকে হোঁচট খেতে-খেতে নামছি। এই জমায়েতের মধ্যে আমিই একমাত্র বিশ্বাস করতে পারছি না রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতা মরেছে। আমার চিন্তা-ভাবনা সহসা ফিরে গেল অতীতে। তখন আমি ছোট ছেলে। ঘটনাটা আমাদের শীতকালীন আবাসের কাছাকাছি ঘটে। অনেক

বছর বাদে, "ব্রেভ ডীড্‌স", কিংবা হয়তো "ব্রেভেস্ট ডীড্‌স" নামে একটা বইয়ে ঘটনাটার কথা দেখেছিলাম।

বন-বিভাগের ব্রেইডউড, এবং ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসের স্মীটন, এই দুজন সে-ঘটনায় ছিল। সে রেলগাড়ির আগেকার যুগের কথা। এক অন্ধকার ঝড়ের রাতে এরা দু-জন "ডাকগাড়ি" চেপে মোরাদাবাদ কালাধুংগি যাচ্ছিল। একটা পথে মোড় ঘুরতে ওরা একটা খ্যাপা হাতির সামনে পড়ে। কোচোয়ান আর ঘোড়া দুটোকে মেরে ফেলে হাতিটা, গাড়িটা উলটে দেয়।

ব্রেইডউডের কাছে একটা রাইফেল ছিল। রাইফেলটা কেস থেকে বের করে জোড়া লাগিয়ে ও যখন গুলি ভরছে, স্মীটন গাড়িতে উঠে একমাত্র আভাঙা বাতিটি বাতিদান থেকে খুলে নেয়। মাথার উপর উঁচু করে ধরলে সে বাতিতে সামান্য আলোর আভা ছড়াচ্ছিল মাত্র। সেই ভাবেই সেটাকে ধরে স্মীটন হাতিটার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাতির কপালের উপর আলো ফেলে, যাতে ব্রেইড-উড হাতিটাকে ঠিক জায়গায় গুলি মেরে মেরে-ফেলতে পারে।

চিতা আর খ্যাপা হাতিতে অবশ্যই প্রচুর পার্থক্য আছে। তবু, সঙ্গীর বুলেট তাকে বাঁচাবে মাত্র এই ভরসায়, মাথার উপর বাতি ধরে। যন্ত্রণায় উন্মত্ত একা চিতার কাছে এগোতে ভরসা পাবে, এমন লোকও কমই আছে। পরে দেখেছিলাম, চিতাটা ওর থাবাটা ছিঁড়ে, প্রায় খুলে ফেলেছিল জাঁতিকল থেকে, চামড়ার একটা পাতলা টুকরোয় বেধে আটকেছিল মাত্র।

বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম, রাতে বাজারের সব বাড়ির দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় মেয়েরা, ছেলেপিলে দাঁড়িয়ে। খুব ধীরে এগোনো যাচ্ছিল। কেননা কয়েক গজ বাদে-বাদেই, ছেলেপিলে চারপাশে ভিড় করে ভাল করে দেখবে বলে চিতাটাকে নামাতে হচ্ছিল। লম্বা পথটার অনেক দূর গিয়ে দলটা আমাদের ছেড়ে চলে গেল। বিজয়গর্বে চিতাটাকে বাংলোয় নিয়ে এল আমাদের লোকজন।

তাঁবুতে গিয়ে স্নান সেরে বাংলোয় ফিরে এলাম। ডিনার খেতে খেতে, তার অনেক বাদেও, ইবটসনরা এবং আমি, মৃত চিতাটাই যে নরখাদক, তার সপক্ষে ও বিপক্ষে স্ব-স্ব যুক্তি পেশ করলাম। এ-পক্ষ ও-পক্ষকে বোঝাতে, বিশ্বাস করাতে সক্ষম হল না। অবশেষে আমরা ঠিক করলাম, ইবটসনকে নিজের কাজে পাউরি ফিরতে হবে। রুদ্রপ্রয়াগে এতদিন থাকার ফলে আমিও ক্লান্ত-শ্রান্ত। তাই পরের দিনটা আমরা চিতাটার ছাল ছাড়িয়ে শুকোব। তার পর দিন, তাঁবু উঠিয়ে পাউরি রওনা দেব।

ভোর থেকে শুরু করে, সন্ধে গড়িয়ে যাওয়া অবধি, কাছে ও দূরের গ্রাম থেকে দলের পর দল লোক আসতেই থাকল চিতাটাকে দেখতে। যেহেতু এদের মধ্যে অধিকাংশ জনই বলতে থাকল, এই জানোয়ারটাই যে নরখাদক,

তা ওরা দেখেই চিনেছে—ইবটসনদের বিশ্বাস বদ্ধমূল হতেই থাকল, যে ওদের ধারণা ঠিক, আর আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হতেই থাকল ওরা ভুল করছে। আমার অনুরোধে ইবটসন দুটো কাজ করল। ও, জনসাধারণকে হুঁশিয়ারী জানাল, নরখাদকটির বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক থাকার কথা যেন মনে রাখে সবাই, সে-ব্যবস্থায় গা-ঢিলা না দেয়। আর, আমরা নরখাদকটিকেই মেরেছি. সরকারকে টেলিগ্রাম করে সে-খবর জানানো থেকে বিরত হল।

সে-রাতে আমরা তাড়াতাড়ি ঘুমোতে গেলাম। পরদিন ভোর না হতেই রওনা হতে হবে। আমি যখন উঠেছি, তখনো অন্ধকার। 'ছোটা হাজরি' (প্রাতরাশ) খাচ্ছি। পথে কথাবার্তার আওয়াজ পেলাম। যে-হেতু এটা অত্যন্ত আশ্চর্য, আমি হেঁকে জিগ্যেস করলাম. এমন সময়ে রাস্তায় ওরা করছেটা কি?

আমাকে দেখে চারটি মানুষ চড়াই-পথ বেয়ে আমার তাঁবুতে উঠে এল। খবর দিল. চাতোয়াপিপল ঝোলা-পুল থেকে মাইল খানেক দূরে, নদীর তীরে, বেশ দূরে. নরখাদকটি একটি মেয়েকে মেরেছে। আমাকে এই খবরটা দিতে পাটোয়ারী ওদের পাঠিয়েছে।





১৩

শিকারীরাই যখন শিকার

ভোরের চা নিয়ে ঢুকবে বলে ইবটসন সবে তার লোককে দরজা খুলে দিচ্ছে, এই সময় আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম। পাউরি যাত্রা বাতিল করে দিয়ে জীনের বিছানার উপর বসে একটা বড় ম্যাপ বিছিয়ে চা খেতে খেতে আমরা পরিকল্পনা আঁটতে লাগলাম।

ইবটসনের হেডকোয়ার্টার পাউরিতে তার জরুরী কাজ রয়েছে! বড়জোর আর দুটো দিন ও দুটো রাত সে অপেক্ষা করতে পারে। আগের দিন নৈনিতালে তার করে দিয়েছিলাম যে পাউরি ও কোটদোয়ারা হয়ে ফিরছি। ওই তার বাতিল করে দেব, এবং রেলপথে না গিয়ে যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই হাঁটা-পথেই ফিরে যাব।

এই ব্যবস্থা পাকা করে, আর যে গ্রামে মেয়েটি মারা পড়েছে ম্যাপে সেটা দেখে নিয়ে আমি আমার তাঁবুতে ফিরে গিয়ে পরিকল্পনা বদলের কথা আমার লোকদের জানালাম, ও জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যে চারজন লোক খবর এনেছে তাদের সংগে আসতে বললাম।

জীন রুদ্রপ্রয়াগেই থাকবে। প্রাতরাশের পর ইবটসনের ঘোড়াদুটোয় চেপে আমি আর ইবটসন রওনা হয়ে পড়লাম। একটা গাল্‌ফ অ্যারব, অন্যটি

বিলিতী ঘোড়া। আমার যত ঘোড়ায় চাপার সৌভাগ্য হয়েছে, তার মধ্যে সব চেয়ে স্থির-কদম দুটি ঘোড়া।

আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম আমাদের রাইফেল, একটা স্টোভ, একটা পেট্রো-ম্যাক্স বাতি এবং কিছু খাবার-দাবার। একটা ধার-করা ঘোড়ার উপর ঘোড়া-গুলোর খাবার চাপিয়ে নিয়ে সঙ্গে আসছিল ইবটসনের সহিস।

চাতোয়াপিপল পুলের কাছে গিয়ে ঘোড়া দুটো ছেড়ে দিলাম। চিতাটাকে গুলি করার রাতে পুলটা বন্ধ করা হয় নি। ফলে নরখাদকটা নদী পার হয়ে গিয়ে প্রথম গ্রামটাতেই একটা শিকার পেয়েছে।

একজন পথপ্রদর্শক পুলের উপর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে আমাদের নিয়ে একটি অত্যন্ত খাড়াই শৈলশিরা বেয়ে উঠে, ঘাসে-ঢাকা এক পাহাড়ের ঢাল ধরে চলে নামল উৎরাই-পথে। ঘন জঙ্গলে ঢাকা এক গভীর খাদে। খাদ দিয়ে একটি ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে। সেখানে পাটোয়ারী, আর জনা বিশেক লোক মড়িটা পাহারা দিচ্ছে।

অতি স্বাস্থ্যবতী, ফর্সা একটি মেয়ের মড়ি। বয়স প্রায় আঠার-কুড়ি হবে। উপুড় হয়ে দু-পাশে হাত দুটো ছড়িয়ে মেয়েটি পড়েছিল। শরীর থেকে সুতোটি অবধি খুলে ফেলা হয়েছে। পায়ের তলা থেকে ঘাড় অবধি চেটে সাফ করে ফেলেছে চিতাটা। ঘাড়ে বড়-বড় চারটে দাঁতের দাগ। শরীরের ওপর ও নিচ থেকে যথাক্রমে কয়েক পাউন্ড করে মাংস খেয়ে ফেলা হয়েছে।

পাহাড়ের চড়াই ভাঙার সময়ে আমরা ঢোল পেটাবার শব্দ পাচ্ছিলাম। মড়িটা পাহারা দিচ্ছিল যারা, তারাই ওগুলো বাজাচ্ছিল। তখন বেলা প্রায় দুটো। ধারে কাছেও চিতাটা থাকবার কোনো সম্ভাবনা নেই। পাটোয়ারী আর পথপ্রদর্শকটিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চড়াই-পথে গ্রামে গেলাম একটু চায়ের যোগাড়ে।

চা খেয়ে, যে-বাড়িতে মেয়েটিকে মারা হয়েছে, সে-বাড়িটা একবার দেখে নিতে গেলাম। পাথরে তৈরি এক-কামরা বাড়ি। ছ থেকে ন বিঘা খাঁজ-কাটা খেতের ঠিক মধ্যিখানে। বাড়িতে থাকত মেয়েটি, ওর স্বামী, আর ওদের ছ-মাসের একটি বাচ্চা।

দুর্ঘটনার দু-দিন আগে স্বামীটি এক জমির মামলায় সাক্ষ্য দিতে পাউরি চলে যায় এবং বাড়ির তত্ত্বাবধানে রেখে যায় তার বাবাকে। মারা যাবার রাতে মেয়েটি ও তার শ্বশুর রাতের খাওয়া শেষ করে। শুতে যাওয়ার আগে মেয়েটি শিশুটিকে দুধ খাইয়ে তাকে শ্বশুরের কোলে দিয়ে দরজা খুলে সিঁড়ির ধারে গিয়ে বসে—আগেই বলেছি আমাদের পাহাড়ী মানুষদের বাড়িতে শৌচা-গারের ব্যবস্থা নেই।

মায়ের কোল থেকে ঠাকুর্দার কোলে গিয়ে শিশুটা কাঁদতে শুরু করে,

সুতরাং বাইরে কোনো শব্দ হলেও তা শোনার সম্ভাবনা কম, এবং আমি নিশ্চিত, যে কোনো শব্দ হয় নি। রাতটা ছিল অন্ধকার। লোকটা কয়েক মিনিট অপেক্ষার পর মেয়েটিকে ডাক দিল, উত্তর না পেয়ে আবার ডাকল এবং তারপর উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে খিল এ'টে দিল।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি হয়েছিল, কাজেই পুরো ঘটনাটা কি ঘটে, তা মনে-মনে সাজিয়ে বুঝে নেওয়া সহজ হল। বৃষ্টি থামার কিছু পরেই চিতাটা গ্রামের দিক থেকে এসে দরজাটার বাঁয়ে ত্রিশ গজ দূরে জমির মধ্যে একটা পাথরের আড়ালে গুড়ি মেরে বসে ছিল।

এখানে চিতাটা কিছুক্ষণ যাবৎ শুয়ে ছিল—বোধহয় লোকটিকে আর মেয়েটিকে কথাবার্তা বলতে শুনেছিল। দরজা খুলে মেয়েটি দরজার ডান-দিকে ফিরে এবং অংশত চিতাটার দিকে পিছন ফিরে বসে। পাথরটা ঘুরে ঘরের কোণ পর্যন্ত কুড়ি গজ জমি চিতাটা গুড়ি মেরে চলে আসে, এবং ঘরের দেয়াল ঘে'ষে এসে পিছন থেকে মেয়েটিকে ধরে পাথরটা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়।

মেয়েটি মারা যাবার পর, অথবা সম্ভবত যখন ওর শ্বশুর উদ্বেগে ডাকা-ডাকা করে, তখন চিতাটা তাকে মুখে করে উ'চু করে তুলে নেয়, যার জন্যে চষা নরম জমিটার ওপর মেয়েটির হাতের বা পায়ের কোনো দাগ পড়ে নি। ওই অবস্থায় তাকে বয়ে নিয়ে একটা জমির পর তিন ফুট উ'চু আল পার হয়ে আরেকটা জমির শেষে গিয়ে পে'ছিয়। এই জমিটার শেষে খাড়া বার ফুট নিচে একটা পায়ে-চলা পথ প্রায় ১৫০ পাউণ্ড ওজনের মেয়েটিকে মুখে করে চিতাটা এখানে লাফ দিয়ে নামে। এই থেকে তার শক্তির কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে যে, যখন সে পায়ে-চলা পথটার উপর লাফিয়ে নামে, তখনও মেয়েটির শরীরের কোনো অংশই মাটিতে লাগে নি।

পথটা পার হয়ে সে পাহাড় বেয়ে সোজা নিচে আধ-মাইলখানেক নেমে যায়। জামাকাপড় ছি'ড়ে ফেলে এখানেই মেয়েটির কিছু অংশ খাওয়ার পর তাকে একটা ঘন লতার ছাউনি দেওয়া গাছের ছায়াতে, একটুকরো পান্না-সবুজ ঘাসে-ঢাকা জমির ওপর রেখে যায়।

বিকাল চারটে নাগাদ মড়ির ওপর বসার জন্যে আমরা নেমে গেলাম, সঙ্গে নিয়ে গেলাম পেট্রোম্যাক্স বাতিটা আর রাতে শিকারের জন্যে টর্চলাইট।

এটা ধরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত যে মেয়েটিকে খোঁজার সময় ও পরে পাহারা দেওয়ার সময় গ্রামবাসীরা যে হৈচৈ করেছিল চিতাটা তা শুনতে পেয়েছে এবং সে যদি মড়ির কাছে ফিরে আসে তবে অতি সন্তর্পণে আসবে। সুতরাং আমরা ঠিক করলাম মড়ির কাছাকাছি বসব না, তাই ষাট গজ দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা গাছ বেছে নিলাম। গাছটি ওই ঘাসী-জমির মুখোমুখি।

এই বেঁটে ওক গাছটা পাহাড় থেকে বেরিয়েছে প্রায় এক সমকোণ রচনা করে। পেট্রোম্যাক্সটা খোঁদলে লুকিয়ে রেখে পাইন পাতা চাপা দেওয়া হল। দুটো ডালের মাঝখানে বসল ইবটসন। সেখান থেকে মড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়। আর আমি বসলাম গাছের গুঁড়িতে তার দিকে পিছন ফিরে ও পাহাড়ের দিকে মুখ করে। ইবটসন গুলি করবে, আমি আমাদের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখব।

সম্ভবত ব্যাটারি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলেই টর্চলাইটটা কাজ করছিল না, অতএব পরিকল্পনা ছিল যে যতক্ষণ ইবটসন গুলি করার মত দেখতে পাবে ততক্ষণই আমরা বসে থাকব, তারপর পেট্রোম্যাক্সটা জ্বালিয়ে গ্রামে ফিরে যাব,—সেখানে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আমাদের লোকদের এসে পৌঁছনোর কথা আছে।

এলাকাটি ঘুরে দেখবার সময় আমাদের ছিল না, কিন্তু গ্রামবাসীরা জানাল যে মড়িটার পূর্বদিকে একটা ঘন জঙ্গল আছে এবং তারা নিশ্চিত যে তাদের তাড়া খেয়ে চিতাটা সেখানেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

যদি চিতাটা সেইদিক দিয়ে আসে তবে ঘাসী জমিতে আসার বহু আগেই ইবটসন তাকে দেখতে পাবে এবং খুব সহজেই গুলি করতে পারবে, কারণ তার রাইফেলে টেলিস্কোপিক-সাইট লাগানো আছে। এতে যে শুধু নিশানাই নিখুঁত হয় তা নয়, উপরন্তু, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আলোর ব্যাপারেও আধ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় হাতে পাওয়া যায়—এই ধরনের পরিস্থিতিতে যা অত্যন্ত জরুরী, কেননা দিনের আলোর একটি মিনিটের কম-বেশির উপরই সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

উঁচু পাহাড়ের পিছনে পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, কিছুক্ষণ হল আমাদের এদিকে ছায়া পড়েছে ; এমন সময় যেদিকে ঘন জঙ্গল আছে শুনেছিলাম, সেদিক থেকে হঠাৎ একটা কাকার হরিণ ডাকতে-ডাকতে পাহাড় বেয়ে ছুটে নেমে এল। পাহাড়ের গায়ে গিয়ে সেটা থামল, কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ডাকল, তারপর চলে গেল পাহাড়ের অন্যদিকে। শব্দটা ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল।

কাকারটা নিঃসন্দেহে চিতাটাকে দেখেই ভয় পেয়েছে, এবং যদিও ও অঞ্চলে অন্য অনেক চিতা থাকাও সম্ভব, তবু আমার আশা বেড়ে উঠল। ইবটসনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে-ও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে, দুটো হাতই রয়েছে রাইফেলে।

আলো কমে আসছিল, কিন্তু তখনও টেলিস্কোপিক-সাইট ছাড়াই গুলি করা চলে। সেই সময় আমাদের ঠিক ত্রিশ গজ উপরে নিচু ঝোপগুলোর

পিছন থেকে স্থানচ্যুত একটা পাইন-ফল গড়াতে-গড়াতে আমার পায়ের কাছে গাছের গোড়ায় এসে ঠেকল।

চিতাটা এসে গিয়েছে এবং সম্ভবত বিপদ আঁচ করে পাহাড়ের এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে নিরাপদে মড়ির চারদিকের জমিটা খুঁটিয়ে দেখা যায়। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, এই করতে গিয়ে সে আমাদের গাছটাকে একেবারে মড়ির সঙ্গে একই সঙ্গে দেখতে পেল। যদিও আমার দেহরেখা কোথাও বেরিয়ে নেই বলে আমি হয়তো তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাব, কিন্তু দুই ডালের মাঝখানে বসে থাকা ইবটসনকে সে নির্ঘাত দেখে ফেলবে।

আমার গুলি করার মত আলো যখন একেবারে মিলিয়ে গেছে, এবং ইবটসনের টেলিস্কোপিক-সাইটও যখন আর কোনো কাজেই আসবে না, তখন টের পেলাম যে চিতাটা চুপি-চুপি গাছটার দিকে নেমে আসছে। কিছু একটা করার এই হচ্ছে সময়, সুতরাং ইবটসনকে আমার জায়গায় বসতে বলে আমি বাতিটা বের করে আনলাম। বাতিটা জার্মানির তৈরি, এর আলোটা খুব উজ্জ্বল। কিন্তু এর লম্বা গড়ন ও আরো লম্বা হাতলের জন্যে এটা জঙ্গলে ব্যবহারের উপযোগী মোটেই নয়।

আমি ইবটসনের চেয়ে একটু লম্বা বলে প্রস্তাব করলাম বাতিটা আমিই নিয়ে যাব, কিন্তু ইবটসন জানাল, বাতির দায়িত্ব সে ঠিকমতই নিতে পারবে। অধিকন্তু, নিজের রাইফেলের চেয়ে আমার রাইফেলের উপরই ওর ভরসা বেশি। সুতরাং আমরা রওনা দিলাম—আগে ইবটসন, পিছনে আমি—আমার দুটো হাত রাইফেলের উপর।

গাছটা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা পাথরে চড়তে গিয়ে ইবটসন পিছলে পড়ল। বাতির তলাটা জোরে ধাক্কা খেল পাথরের সঙ্গে—এবং ম্যান্টলটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে পড়ল বাতির তলায়। পেট্রলের চুঙি দিয়ে যে নীল শিখাটা বেরোচ্ছিল তাতে কোথায় পা ফেলব, তা দেখার মত আলো পাওয়া যাচ্ছিল বটে, কিন্তু কথা হচ্ছে, কতক্ষণ এই সুবিধে পাওয়া যাবে। ইবটসন বলল বাতিটা ফাটার আগে মিনিট-তিনেক সময় আমরা পাব। তিন মিনিটে আধ মাইল চড়াই ভাঙা অসম্ভব ভয়াবহ প্রস্তাব: বিশেষত যেখানে প্রতি পদে পদে পাথর আর কাঁটা-ঝোপ এড়িয়ে চলতে হচ্ছে, এবং সম্ভবত পিছু নিয়েছে, এবং পরে দেখেছি প্রকৃতই পিছু নিয়েছিল—একটা নরখাদক।

জীবনে এক-একটা ঘটনা ঘটে যা যত দিনই যাক, কখনো স্মৃতি থেকে মুছে যায় না। আমার কাছে ওই অন্ধকারে পাহাড়ে ওঠাটা এমনি এক ঘটনা। অবশেষে যখন হাঁটা-পথটার উপর গিয়ে পড়লাম তখনও আমাদের কষ্টের শেষ হল না। কেননা, সে-পথে সার-সার মোষ গড়াগড়ি খাবার অগভীর ডোবা।

ফলে পথের চিহ্ন-টিহ্ন হারিয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু আমাদের লোকজনরা কোথায় আছে তা জানতাম না।

কখনো ভিজে মাটির উপর আছাড় খেয়ে, কখনো অদেখ্তা পাথরের উপর হোঁচট খেয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা কয়েকটা পাথরের সিঁড়ির গায়ে গিয়ে পৌঁছলাম। সিঁড়িগুলো পথ থেকে তফাতে, ডানদিকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে দেখি একটা ছোট উঠোন, তার ওদিকে একটা দরজা। দরজা ধাক্কা দিয়ে ভিতরের লোকজনকে চেঁচিয়ে ডেকে দরজা খুলতে বললাম। উঠে আসতে আসতে হুঁকো টানার শব্দ শুনেছিলাম। দরজায় লাথি মেরে খুলতে বললাম। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে পকেট থেকে দেশলাই বের করে সেটা নাড়িয়ে বললাম, 'যদি এক মিনিটের মধ্যে দরজা না খোল তাহলে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব!' এতে ঘরের ভিতর থেকে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে অনুনয় শোনা গেল যে দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে, যেন আগুন না লাগানো হয়। এক মিনিট বাদে প্রথমে ভিতরের, তারপর বাইরের দরজা খুলে গেল। দুই লাফে আমি আর ইবটসন ঘরে ঢুকলাম। তারপর দরজা বন্ধ করে দরজায় পিঠ দিয়ে বসলাম।

নানা বয়সের বার-চোদ্দ জন স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু ঘরটার মধ্যে ছিল। আমাদের এ-রকম অদ্ভুত আবির্ভাবের পর লোকগুলো সংবিৎ ফিরে পেয়ে দরজা খোলায় দেরির জন্যে ক্ষমা চাইল। বলল যে পরিবারসুদ্ধ সবাই এতদিন নরখাদকের আতঙ্কে বাস করতে-করতে সাহস তাদের একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নরখাদকটা যে কখন কী বেশ ধারণ করবে তা জানা না থাকায় তারা রাতের বেলায় যে-কোনো শব্দকেই সন্দেহের চোখে দেখে। তাদের ভীতিতে আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, কারণ ম্যান্টেলটা ভেঙে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরে তেতে-লাল-হওয়া বাতিটা যখন ফেটে যাওয়ার আশঙ্কায় নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকেই আমি ধরে নিয়েছিলাম যে আজ আর আমাদের সশরীরে গ্রামে পৌঁছুনো সম্ভব হবে না।

আমরা জানতে পারলাম আমাদের লোকজন সূর্যাস্তের সময় এসে পৌঁছেছে। পাহাড় বেয়ে আরো দূরে গিয়ে কয়েকটা বাড়ির একটাতে তারা আছে। দু-চার জন শক্ত-সমর্থ লোক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু আমরা জানতাম যে তাদের একলা ফিরে আসতে দেওয়াটা, খুন করারই শামিল হবে। অতএব আমি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা এই বিপদের ঝুঁকিটা পুরো বুঝেই প্রস্তাবটা করেছিল।

আমরা জিগ্যেস করলাম তারা যে-কোনো রকমের একটা লণ্ঠন আমাদের দিতে পারে কি না। ঘরের কোণ থেকে খুঁজে-পেতে তারা একটা পুরোনো, অব্যবহার্য ও চিমনি-ফাটা লণ্ঠন এনে হাজির করল এবং খুব ঝাঁকিয়ে যখন শোনা গেল কয়েক ফোঁটা তেল ওটার ভিতর আছে, তখন সেটা জ্বালল। ঘরের

সবায়ের শুভেচ্ছা নিয়ে আমরা বের হলাম ও সংগে-সংগেই দরজা-দুটো বন্ধ হল।

আরো মোষের গর্ত, আরো ডোবা পাথর। কিন্তু টিমটিমে আলোটার সাহায্যে আমরা ভালভাবেই হাঁটলাম, এবং দ্বিতীয় যে সিঁড়িটা দিয়ে আমাদের উঠে যেতে হবে বলেছিল সেটার কাছে পেঁছিলাম। সিঁড়ির উপরে উঠে দেখি ডাইনে-বাঁয়ে টানা লম্বা একসার দোতলা বাড়ির সামনেকার উঠোনের উপর আমরা এসে পড়েছি। বাড়ির প্রত্যেকটি দরজা জানলা বন্ধ, কোথাও কোনো আলোর চিহ্ন নেই।

ডাকাডাকির পর একটা দরজা খুলে গেল। একটা ছোট পাথরের সিঁড়ি বেয়ে আমরা উপরতলার বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। এখানে পাশাপাশি দুটো ঘর আমাদের ও আমাদের লোকজনের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের লোকেরা যখন লণ্ঠন ও রাইফেলগুলো নামিয়ে নিচ্ছিল তখন কোথা থেকে একটা কুকুর এসে উপস্থিত। সেটা একটা গ্রাম্য নেড়ী কুকুর, বেশ বন্ধু-ভাবাপন্ন। লেজ নাড়তে-নাড়তে আমাদের পায়ের চারদিকে শুঁকে যে-সিঁড়ি দিয়ে আমরা এইমাত্র উঠে এসেছি সেইদিকে এগিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ করে ভীষণ ঘেউ-ঘেউ করতে করতে সেটা আমাদের দিকে পিছিয়ে এল। সমস্ত লোম তার খাড়া হয়ে উঠেছে।

যে লণ্ঠনটা আমরা নিয়ে এসেছিলাম, সেটা উঠোনে পেঁছতেই নিভে গিয়েছিল, কিন্তু আমাদের লোকেরা এর জোড়াটাকে যোগাড় করে রেখেছিল। আমি খুব তাড়াতাড়ি রাইফেলে গুলি ভরে নেবার পর ইবটসন লণ্ঠনটাকে নানাভাবে কাত করে, ঘুরিয়ে ধরেও আট ফুট নিচের মাটি পর্যন্ত আলো ফেলতে পারল না।

কুকুরটাকে লক্ষ্য করেই চিতাটার গতিবিধি আন্দাজ করা যাচ্ছিল। চিতাটা যখন উঠোন পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে পথের দিকে নেমে গেল তখন কুকুরটা আস্তে-আস্তে ঘেউ-ঘেউ থামিয়ে শুয়ে পড়ল এবং একাগ্র দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে মাঝে-মাঝে গর-গর করতে লাগল।

আমাদের জন্যে যে ঘরটা খালি করে দেওয়া হয়েছিল সেটায় কোনো জানলা নেই। নিরাপদে সেটার মধ্যে থাকতে হলে নিরেট দরজাটা বন্ধ করে দিতে হয়, কিন্তু তাহলে আর আলো বাতাস আসবে না। কাজেই রাতটা বারান্দার উপর কাটাব স্থির করলাম। ঘরটায় যে থাকত, কুকুরটা মনে হল তারই। দেখলাম বারান্দায় শুতে সে অভ্যস্ত। কারণ নিশ্চিন্তভাবে সে আমাদের পায়ের কাছে শুয়ে থাকল। ফলে আমাদের মনেও একটা নিরাপত্তার অনুভূতি হল। তারপর দীর্ঘ রাতের প্রহরগুলো পালা করে পাহারা দিয়ে কাটালাম।



১৪

পশ্চাদপসরণ

পরদিন ভোরে খুব সন্তর্পণে মড়িটার কাছে গিয়ে দেখে হতাশ হলাম যে চিতাটা আর সেখানে ফিরে আসে নি। আমাদের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আগের সন্ধ্যায় আমাদের একজনকেও বাগে না পাওয়ায় সে নিশ্চয়ই সেখানে ফিরে আসবে।

ওকে কিছু আপিসের কাজকর্ম পাঠানো হয়েছিল। দিনের বেলায় ইবটসন তাই নিয়ে বসল। আর আমি রাইফেল নিয়ে চিতাটাকে গুলি করতে পারি কিনা, সেই খোঁজে বেরুলাম। পাইন-কাঁটাভরা শক্ত মাটিতে তাকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়, সুতরাং আমি পাহাড়ের ও-পিঠে, যেখানে ঘন জঙ্গল আছে বলে গ্রামবাসীরা বলেছিল, সেদিক পানে এগোতে লাগলাম। এদিকটায় এগোনোও ভারি শক্ত কাজ, কারণ ঘন ঝোপ-জঙ্গল ছাড়াও এদিকে এমন একসার পাহাড়ের চূড়ো পেলাম যার ওপর পা রেখে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

অবাক হলাম এ এলাকাটায় নানা রকমের জীবজন্তু দেখে। সেখানকার প্রাণী-চলা পথগুলোর উপর আমি কাকার, ঘয়াল, শুয়োর এবং একটা সেরো-র পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম। কয়েকটা পুরোনো আঁচড়ের দাগ ছাড়া চিতাটার আর কোনো চিহ্নই দেখতে পেলাম না।

জাঁতিকলটা আগের দিন রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দুপুরের খাওয়ার সময় সেটা এসে পেঁছিল। বেলা পড়ে আসতেই সেটা নিয়ে ঐ ঘেসো জমির উপর আমরা পাতলাম আর মাং ।।২৬ দিয়ে বিরাক্ত করে রাখলাম। বিষ সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না.

ইবটসনেরও না। কিন্তু নৈনিতাল ছাড়ার আগে এক ডাক্তার বন্ধুকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম যে গভর্মেণ্ট চাচ্ছেন আমি চিতাটাকে মারতে যে-কোনো উপায় প্রয়োগ করি। কিন্তু বিষ দিয়ে চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না, কারণ দেখা গিয়েছে চিতাটা বিষ খেয়ে বেশ বহাল তবিয়তেই থাকে।

এ পর্যন্ত কি-কি বিষ ব্যবহার করা হয়েছে তা শুনে সে আমাকে সায়ানাইড ব্যবহারের কথা বলল। জানাল, মার্জার-জাতীয় প্রাণীদের পক্ষে ওটাই সবচেয়ে কার্যকরী। এ খবরটা ইবটসনকে দিয়েছিলাম এবং কয়েকদিন আগেই কিছু সায়ানাইড এবং যে ক্যাপসুলে তা ভরে প্রয়োগ করতে হবে, তার কতকগুলো এসে পেঁৗছেছিল। মড়িটার যে-সব জায়গা খেয়েছিল সে-সব জায়গায় কয়েকটা ক্যাপসুল ভরে দিলাম।

খুবই আশা ছিল এই দ্বিতীয় রাতে চিতাটা মড়ির কাছে ফিরে আসবে। আগের সন্ধ্যায় সে গাছের উপরে আমাদের দেখে ফেলেছে, কাজেই আর তার জন্যে বসে না থেকে জাঁতিকল আর বিষের ওপরই ভরসা রেখে চলে এলাম।

পায়ে-চলা পথটার কাছে একটা বড় পাইন গাছে আমরা মাচান বাঁধলাম। তার ওপর খড় পেতে, ইবটসনের স্টোভে রাঁধা রাতের খাওয়া শেষ করে আমরা তাতে চড়ে বসলাম। এই আরামদায়ক মাচানটার ওপর সটান লম্বা হয়ে শুয়ে সিগারেট টানা ও কথাবার্তা বলাও বেশ সম্ভব হল। কেননা সেখানে আমাদের থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য, মড়ির দিকে কোনো শব্দ হয় কি না তা শোনা।

আমরা পালা করে পাহারা দিলাম আর ঘুমোলাম, আশা করতে লাগলাম যদি দৈবাৎ চিতাটা গিয়ে ফাঁদে পা দেয়, তাহলে তার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পাব। কারণ সেখানে এমন কোনো পথের রেখা ছিল না যা দিয়ে চিতাটাকে ফাঁদের উপর এনে ফেলা যায়। সারা রাতে একবার মাত্র একটা কাকারের ডাক কানে এল, তাও যেদিক দিয়ে চিতাটা আসবে বলে আশা করেছিলাম তার উল্টো দিক থেকে।

ভোরের আলো ফুটে উঠলে আমরা গাছ থেকে নামলাম, এবং এক কাপ করে চা তৈরি করে খেয়ে মড়িটার কাছে গিয়ে দেখলাম—যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম সেটা তেমনই পড়ে আছে।

সকাল-সকাল প্রাতরাশ সেরে ইবটসন রুদ্রপ্রয়াগের দিকে চলে গেল। আমি জিনিসপত্র গুছোতে-গুছোতে পনের দিনের পথ নৈনিতাল যাত্রার আগে গ্রামবাসীদের সঙ্গে শেষ দু-চারটে কথা বলছি, এমন সময় একদল লোক এসে খবর দিল যে চার মাইল দূরের একটা গ্রামে চিতা একটা গরু মেরেছে।

তাদের সন্দেহ যে গরুটা মেরেছে নরখাদকটাই, কারণ আগের রাতেই চিতাটা আমাকে ও ইবটসনকে গাছ থেকে বারান্দা পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল এবং শেষ রাতের দিকে মোড়লের বাড়ির দরজা ভাঙার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা

করেছিল। পরের দিন সন্ধ্যার পরে বাড়িটার তিনশো গজ দূরে জঙ্গলের মধ্যে গরুটা মারা পড়েছে। লোকগুলোর সনির্বন্ধ অনুরোধে আমি নৈনিতাল যাত্রা স্থগিত রাখলাম এবং জাঁতিকল আর বিষ নিয়ে তাদের সঙ্গে সে গ্রামে গেলাম।

মোড়লের বাড়িটা আবাদী-জমি-ঘেরা ছোট একটা টিলার উপর, একটা পায়ে-চলা পথ ধরে যেতে হয়। আবার খানিকটা পথ গিয়েছে নরম প্যাচপেচে জমির উপর দিয়ে। এখানে নরখাদকটার থাবার ছাপ দেখা গেল।

মোড়ল আমাকে উপত্যকা দিয়ে আসতে দেখে টাটকা দুধে ফোটানো গুড়-দেওয়া ধোঁয়া-ওঠা একবাটি গরম চা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। উঠোনে, খুরালের চামড়া-ছাওয়া একটা মোড়ার উপর বসে আমি সেই সুমিষ্ট ঘন, পানীয়টায় চুমুক দিচ্ছিলাম আর সে তার দরজাটার অবস্থা দেখাচ্ছিল। দু-রাত্রি আগে চিতাটা ওটা ভাঙতে চেষ্টা করেছিল। ঘরের ছাদ সারানোর জন্যে ভাগ্যক্রমে কিছু চেরাই-তক্তা মজুত ছিল। তা দিয়ে দরজায় ঠেকো দেওয়া না-থাকলে চিতাটার চেষ্টা নিশ্চয় সফল হত।

বুড়ো মোড়ল বাতে পঙ্গু, কাজেই সে মড়িটা দেখানোর জন্যে তার ছেলেকে আমার সঙ্গে দিল আর নিজে তার বাড়িতে আমার ও আমার লোকজনের থাকার বন্দোবস্ত করতে লাগল।

মড়িটা দেখলাম। অল্প বয়সের একটা চমৎকার গরু—গরু বাছুরের চলা-পথের ঠিক উপরেই একটুকরো সমান জমির উপর পড়ে আছে। ফাঁদটা পাতবার পক্ষে আদর্শ জায়গা। গরুটার পিঠটা ছিল একটা বুনো গোলাপ ঝাড়ের গায়ে, আর পায়ের খুরগুলো ছিল একফুট উঁচু একটা আলের গায়ে। খাওয়ার সময় চিতাটা বসেছিল আলটার উপর, আর তার সামনের থাবা দুটো ছিল গরুর পাগুলোর মাঝখানে।

গরুর পায়ের মধ্যকার জমি খুঁড়ে মাটিটা দূরে সরিয়ে ফেললাম। চিতাটা যেখানে থাবা রেখেছিল সেখানে জাঁতিকলটা পেতে তার ওপর বড়-বড় সবুজ পাতা চাপা দিলাম। তারপর একপ্রস্থ মাটি ছড়িয়ে দিয়ে গরুর পায়ের মাঝখানে শুকনো পাতা, কুটো কাঠি ও হাড়ের টুকরো ঠিক যেমনটি দেখেছিলাম তেমনি করে সাজিয়ে রাখলাম। মড়িটার কাছে গিয়ে কেউই বুঝতে পারত না যে জমিটাতে কোনোরকম নাড়াচাড়া করা হয়েছে বা সেখানে একটা মারাত্মক ফাঁদ পাতা হয়েছে।

মনোমত ব্যবস্থা করে আমি ফিরে এসে মোড়লের বাড়ি ও মড়িটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা গাছে উঠে বসলাম। দরকার হলে ওখান থেকে চট করে জাঁতিকলটার কাছে যেতে পারব।

সূর্যাস্তের সময় একজোড়া কালীজ ফেজেন্ট ও তাদের পাঁচটা ছানাকে

আমি কিছুক্ষণ যাবৎ লক্ষ্য করছিলাম, হঠাৎ তারা ভয় পেয়ে পাহাড়ের নিচের দিকে উড়ে পালাল। কয়েক সেকেন্ড পরেই একটা কাকার ছুটে এল আমার দিকে। আমার গাছটার নিচে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে-আস্তে পা টিপে-টিপে সেটা পাহাড়ের উপর উঠে গেল। তারপর আর কিছুই ঘটল না। গাছের ছায়ার অন্ধকারে যখন আমার বন্দুকের নিশানা দেখা কঠিন হয়ে এসেছে তখন গাছ থেকে নেমে রবার-সোলের-জুতো-পরা পা টিপে-টিপে গ্রামের দিকে রওনা দিলাম।

মোড়লের বাড়ি থেকে একশো গজ দূরে পথটা ত্রিশ গজ লম্বা কুড়ি গজ চওড়া একটা খোলা জমির উপর দিয়ে গেছে। জমিটার উপরে পাহাড়ের দিকে একটা বড় পাথর। জমিটার উপর পেঁছেই আমার মনে হল চিতাটা আমার পিছু নিয়েছে। পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নেওয়ার জন্যে আমি পথ ছেড়ে নরম জমির উপর গোটা-দুই লম্বা লম্বা পা ফেলে পাথরটার পিছনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কেবল একটা চোখ থাকল মড়িটার দিকে।

পুরো দশ মিনিট ভিজে মাটির উপর শুয়ে থাকলাম, তারপর দিনের আলো একেবারে নিভে গেলে, রাস্তা ধরে, সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করে, বাকি পথটা পার হয়ে মোড়লের বাড়িতে এসে পেঁছিলাম।

রাতে একবার মোড়ল আমাকে জাগিয়ে বলল, যে সে চিতাটাকে দরজা আঁচড়াতে শুনেছে। পরদিন সকালে দরজার সামনে ধুলোর উপর নরখাদকটার থাবার ছাপ দেখতে পেলাম। থাবার ছাপ ধরে আমি ফিরে গেলাম সেই খোলা জমিটার উপর। দেখতে পেলাম, আগের সন্ধ্যায় আমি যা-যা করেছি চিতাটাও ঠিক তাই-তাই করেছে। আমি যেখানটায় পথটা ছেড়েছি, সে-ও ছেড়েছে। নরম জায়গাটা পেরিয়ে গেছে পাথরটার কাছে, তারপর আবার পথের উপর ফিরে গিয়ে বাড়ি পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করে এসেছে এবং বাড়িটার চারপাশে কয়েকবার ঘুরেছে।

বাড়িটা ছেড়ে চিতাটা পথ ধরে ফিরে গেছে। থাবার ছাপ ধরে মড়িটার দিকে এগোতে-এগোতে আমার আশা বেড়ে উঠল। তখনও পর্যন্ত আমি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি নি, আট বছর ধরে মানুষের কাছাকাছি থাকতে-থাকতে একটা নরখাদক চিতা কতটা পরিমাণ ধূর্ত হয়ে উঠতে পারে!

পথটা ছেড়ে আমি উঁচু জমির দিক থেকে এগোতে লাগলাম। খানিকটা দূর থেকে দেখতে পেলাম মড়িটা নেই, আর যে-মাটিতে জাঁতিকলটা বসানো আছে, সেখানে দুটো থাবার দাগ ছাড়া জমিটার উপর একটুও নাড়াচাড়ার চিহ্ন দেখা গেল না।

প্রথম রাতের মতই চিতাটা এক ফুট উঁচু আলের উপর বসে সামনের দুটো পা গরুর পায়ের মাঝখানে রাখে। কিন্তু এবারে পা দুটো ছড়িয়ে

রেখেছিল দুদিকে। বেশ ফাঁক করে, লুকোনো ফাঁদের ডান্ডাদুটোর উপর। যে দুটো খুলে গেলেই মস্ত জাঁতিদুটো বন্ধ হয়ে যেত। এখানে নিশ্চিন্তে বসে সে খাওয়া শেষ করেছে। তারপর ঘুরে গিয়ে গরুর মাথাটা ধরে গোলাপ-কাঁটার মধ্য দিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে ফেলেছে নিচে, সেখানে পঞ্চাশ গজ নিচে একটা ওক চারায় গিয়ে সেটা ঠেকেছে। রাতের মত এ কাজ সমাধা করে চিতাটা গেছে গরু-বাছুর-চলা পথটা ধরে। মাইলখানেক তাকে অনুসরণ করার পর শক্ত জমিতে তার থাবার চিহ্ন হারিয়ে গেল।

চিতাটার মড়ির কাছে ফেরার আর কোনো আশা ছিল না। যাই হ'ক, আগের রাতে বিষ দিই নি বলে নিজের বিবেককে সান্ত্বনা দিতেই বেশ খানিকটা সায়ানাইড গরুটার দেহাবশেষে ঢুকিয়ে দিলাম। সত্যি বলতে, বিষ ব্যবহারের চিন্তাটাই আমার কাছে তখন ঘৃণ্য বলে মনে হয়েছিল—এবং এখনও হয়।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখলাম, যে-অংশটায় বিষ দিয়ে রেখেছিলাম সে-অংশটা কোনো চিতা খেয়ে ফেলেছে। অন্য একটা চিতাই যে দৈবাৎ সেখানে এসে পড়ে বিষটা খেয়ে ফেলেছে, নরখাদকটা নয়,—এ বিষয়ে আমি এতটা নিশ্চিত হয়েছিলাম যে গ্রামে ফিরে গিয়ে মোড়লকে বললাম যে চিতাটাকে খুঁজে পাবার জন্যে আমি আর অপেক্ষা করব না। তবে, যে ওটা খুঁজে পাবে সে যদি চামড়াটা পাটোয়ারীর কাছে নিয়ে যায় তবে তাকে একশো টাকা পুরস্কার দেব আমি। এক মাস পরে পুরস্কারটা দাবি করা হল। বহুদিন-আগে-মরে-যাওয়া একটা চিতার চামড়া সেটা, পাটোয়ারী সেটা মাটিতে পুঁতে রাখল।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে আমার লোকজনের বেশি সময় লাগে নি এবং দুপুরের অল্প পরেই আমরা নৈনিতালের দীর্ঘ পথে যাত্রা করলাম। একটা সরু পথ দিয়ে চাতোয়াপিপল পুলের দিকে নামছি, এমন সময় একটা বড় দাঁড়াস সাপ ধীরে-সুস্থে পথটা পার হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওটাকে চলে যেতে দেখছি, আমার পিছন থেকে মাধো সিং বলল, 'আপনার ব্যর্থতার জন্যে দায়ী যে দুষ্ট আত্মা, ওই সে যাচ্ছে!'

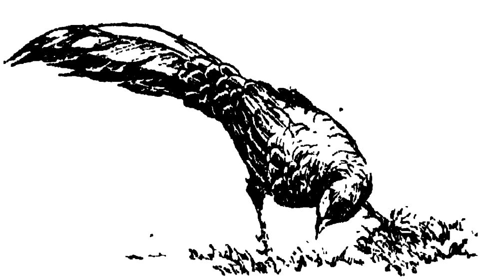
নরখাদকটার দয়ার উপর গাড়োয়ালকে ছেড়ে দিয়ে আমার চলে যাওয়াটা আপনাদের কাছে হৃদয়হীনতা বলে মনে হতে পারে। আমারও মনে হয়েছিল। কাগজেও বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছিল। কেননা সে-সময় প্রতিদিনই ভারত-বর্ষের কাগজগুলোয় চিতাটার উল্লেখ থাকত।

কিছুটা দোষ স্খালনের জন্যে আমি বলতে পারি, যাতে স্নায়ুর উপর অসম্ভব চাপ পড়ে এমন কোনো প্রচেষ্টাই অনির্দিষ্টকাল যাবৎ চালিয়ে যাওয়া যায় না। বহু সপ্তাহ যাবৎ আমি গাড়োয়ালে ছিলাম। তার প্রত্যেকটা দিনে ছিল চব্বিশ ঘণ্টা করে সময়, এবং বারংবার, সারা রাত ধরে জেগে বসে থাকার

পর আবার পরদিন মাইলের পর মাইল আমাকে হাঁটতে হয়েছে। নরখাদকটার ব্যর্থ শিকার-প্রচেষ্টার খবর পেয়ে যেতে হয়েছে দূর দূরান্তরের গ্রামে। বহু চন্দ্রালোকিত রাত্রি নানা অসুবিধের মধ্যে বসে থেকে-থেকে আমি আমার দৈহিক শেষ শক্তির প্রান্তসীমায় এসে পেঁাছেছিলাম। যে জায়গা থেকে চিতাটা সহজেই আমাকে ধরে ফেলতে পারে, তেমন জায়গার উপর বসেও শেষ পর্যন্ত আমি আমার চোখের পাতা আর খুলে রাখতে পারছিলাম না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি সেইসব পথে ঘুরে বেড়িয়েছি যে পথ রাতে খোলা থাকত শুধু আমার আর চিতাটার জন্যে। সবরকম কৌশল খাটিয়ে চেষ্টা করেছি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করতে, আর নরখাদকটা তার ধারণাতীত ভাগ্যের জোরে অথবা তার শয়তান-সুলভ ধূর্ততার জন্যে আমার বুলেট বরাবর এড়িয়ে গিয়েছে। এই নৈশ অভিযানগুলোর পর সকালবেলায় এইসব পথে ফিরে গিয়ে পথের উপর তার থাবার ছাপ দেখে বুঝেছি যে আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম, সত্যিই সে আমাকে খুব কাছে থেকে অনুসরণ করছিল। শিকার ধরতে ব্যগ্র, উন্মুখ এক নরখাদক উজ্জ্বল চাঁদনী রাতে আমায় অনুসরণ করে চলেছে,—একথা মনে হলেই যে হীনমন্যতা এসে দেখা দেয় তা স্নায়ুকে প্রচণ্ড আঘাতে বিবশ করে ফেলে, এবং এর বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার কিছুমাত্র উপশম হয় না।

দেহে-মনে নিদারুণ ক্লান্তি নিয়ে আমি আরো অনেক দিন রুদ্রপ্রয়াগে থাকলে তা গাড়োয়ালের লোকদের পক্ষে কিছু লাভের হত না। হয়তো আমার নিজের জীবন-সংশয় হত। আমি জানতাম যে আমার এই স্বেচ্ছাহৃত কাজ ছেড়ে সাময়িকভাবে চলে যাওয়াটা কাগজে দারুণ সমালোচনার বিষয় হবে। কিন্তু এখন আমি যা করেছি, তা ঠিক। যত শিগগির সম্ভব তাদের সাহায্য করতে আবার আমি ফিরে আসব—গাড়োয়ালের লোকদের এই আশ্বাস দিয়ে আমি আমার বহুদূরবর্তী বাড়ির দিকে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চললাম।





১৫

মাছ-ধরা পর্ব

ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে আমার ব্যর্থতার যে ক্ষেত্রটা ছেড়ে ১৯২৫ সালের শরৎকালে চলে এসেছিলাম, ১৯২৬-এর বসন্তকালে আবার ফিরে গেলাম সেখানে নবোদ্যমে, পূর্ণ আশা নিয়ে।

গাড়োয়ালের নরখাদকের সন্ধানে আমার এই দ্বিতীয় যাত্রায় কোটদোয়ারা পর্যন্ত গেলাম ট্রেনে এবং সেখান থেকে পাউরি পর্যন্ত হেঁটে,—তাতে আটটা দিন সময় বাঁচল। পাউরি থেকে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত ইবটসন এল আমার সঙ্গে।

গাড়োয়ালে আমার তিন মাসের অনুপস্থিতির মধ্যে নরখাদকটি দশটা মানুষ মেরেছে, এবং এই তিন মাস আতঙ্কগ্রস্ত অধিবাসীরা চিতাটাকে মারার কোনো চেষ্টা করে নি।

এই দশটার মধ্যে শেষ শিকার হয়েছে একটি ছোট ছেলে। আমরা রুদ্রপ্রয়াগ পেঁছনোর দু-দিন আগে অলকনন্দার বাঁ পাড়ে ঘটনাটা ঘটেছে। পাউরিতে টেলিগ্রামে এ হত্যার সংবাদ পেয়েছিলাম, কিন্তু যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে পথ চলে এসেও ইন্‌সপেক্‌শন বাংলোয় অপেক্ষারত পাটোয়ারীর কাছে হতাশ হয়ে শুনলাম যে চিতাটা আগের রাতে মড়িটা সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলেছে।

ছোট ছেলেটির মড়ির এমন কিছুই আর অবশিষ্ট রাখে নি যার ওপর আমরা বসতে পারি।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে চার মাইল দূরের একটা গ্রামে ছেলেটি মাঝরাত্রিতে মারা পড়েছে এবং নির্বিঘ্নে খাওয়া সারার পর চিতাটা যে নদী পার হয়ে যাবে সে সম্ভাবনা খুব কম। কাজেই আমরা পৌঁছনোর পর অবিলম্বে পুলদুটো বন্ধ করার ব্যবস্থা করলাম।

শীতের সময়টায় ইবটসন নরখাদক উপদ্রুত সারা এলাকাটায় এক অতীব সুদক্ষ সংবাদ-সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। এই এলাকায় কোনো কুকুর, ছাগল, গরু বা মানুষ মারা পড়লে অথবা কোনো দরজা ভাঙার চেষ্টা হলে সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী সংবাদ এসে পৌঁছত এবং এই উপায়ে আমরা নিয়মিত-ভাবে নরখাদকটার খবর পেয়ে চললাম।

নরখাদকের আক্রমণের শত-শত মিথ্যা গুজব আমাদের কাছে আনা হতে লাগল, তাতে ফল হল শুধু মাইলের পর মাইল হাঁটা। কিন্তু এটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কারণ যে-যে এলাকায় একটা সুপ্রতিষ্ঠিত নরখাদক উপদ্রব করে বেড়াচ্ছে যেখানে, সেখানে প্রত্যেকে তার নিজের ছায়াকেই সন্দেহ করে, আর রাতের বেলায় যে-কোনো শব্দ শুনলেই সেটা নরখাদকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

গাল্‌টু নামে একটা লোককে নিয়ে এরকম একটা গুজব উঠেছিল। লোকটা রুদ্রপ্রয়াগ থেকে সাত মাইল দূরে অলকনন্দার ডান-পাড়ের কুন্দা গ্রামের বাসিন্দা। গাল্‌টু একদিন বিকেলে গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরে তার গরুর খাটালে রাত কাটাতে চলে যায়। পরদিন সকালে তার ছেলে সেখানে গিয়ে দেখে যে তার বাপের কম্বলটা পড়ে রয়েছে, দরজার ভিতরে অর্ধেক আর বাইরে অর্ধেক। নিকটে নরম জমির উপর সে যা দেখতে পায়, তার ধারণা সেটা একটা টেনে নেওয়ার দাগ এবং তার কাছেই নরখাদকের থাবার ছাপ।

গ্রামে ফিরে গিয়ে সে একটা শোর তুলল, ষাট জন লোক বেরুল দেহটা খুঁজতে আর চারজন লোককে পাঠানো হল রুদ্রপ্রয়াগে আমাদের খবর দিতে। যখন লোক চারটে এল তখন আমি আর ইবটসন নদীর বাঁ-পাড়ের একটা পাহাড়ে নরখাদকের খোঁজে ঝাঁপান চালাচ্ছি। আমি নিশ্চিত জানতাম যে চিতাটা নদীর এপারেই আছে এবং গাল্‌টু মারা যাওয়ার সত্যতা নেই। সুতরাং ইবটসন একজন পাটোয়ারীকে ঐ চারজনের সঙ্গে কুন্দায় পাঠিয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট আনতে বলল।

পরদিন বিকেলে রিপোর্ট পাওয়া গেল, আর সেই নরম জমির উপরে থাবার ছাপের একটা নক্‌শাও। রিপোর্টটায় বলা হয়েছে যে দুশো লোক নিয়ে সারা দিনে চারদিকে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে কিন্তু গাল্‌টুর

দেহাবশেষ পাওয়া যায় নি, এবং অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া হবে। নকশাটায় ছয়টা বৃত্ত আঁকা ছিল। মাঝেরটা ডিশের সাইজের, তাকে ঘিরে পাঁচটা সমান সাইজের বৃত্ত, এক একটা চায়ের পেয়ালার মত। সব বৃত্তগুলোই আঁকা হয়েছে কম্পাস দিয়ে। পাঁচদিন পরে আমি আর ইবটসন টাওয়ারে বসার জন্যে রওনা হয়েছি, এমন সময় একটা শোভাযাত্রা এসে হাজির হল বাংলোর সামনে। তার আগে-আগে একটা মহা খাপ্পা লোক জোর গলায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে যে সে এমন কোনো অপরাধ করে নি যার জন্যে তাকে গ্রেপ্তার করে রুদ্রপ্রয়াগে আনা যেতে পারে। খাপ্পা লোকটি হচ্ছে গাল্‌টু। আমরা তাকে শান্ত করার পর সে তার কাহিনী বলল।

জানা গেল, সেদিন সে যখন বাড়ি থেকে বের হচ্ছে তখন তার ছেলে এসে তাকে জানায় যে একজোড়া বলদের দাম সে একশো টাকা দিয়ে এসেছে, কিন্তু গাল্‌টুর দৃঢ় অভিমত, সে-জোড়ার দাম সত্তর টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। টাকার এই অপব্যয়ে সে এতটা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে যে রাতটা খাটালে কাটিয়ে ভোরে উঠেই সে চলে যায় দশ মাইল দূরে তার মেয়ের বাড়িতে। আজ তার নিজের গাঁয়ে ফিরে আসতেই পাটোয়ারী তাকে গ্রেপ্তার করে। এখন সে জানতে চায় তার গ্রেপ্তারের কারণটা কী। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে পরিস্থিতিটার মজার দিকটা বুঝতে পারে, এবং বুঝতে পারার পর সমবেত জনতার সঙ্গে সেও এই কথা ভেবে প্রাণ খুলে হাসতে থাকে যে, পাটোয়ারীর মত একজন মাতব্বর ব্যক্তি যে সময় দুশো বন্ধুবান্ধব নিয়ে পাঁচদিন ধরে তার দেহাবশেষ খুঁজে বেড়িয়েছিল, সে তখন দশ মাইল দূরের এক গ্রামে বসে মাথা ঠাণ্ডা করছে।

রুদ্রপ্রয়াগ পুলের বাত্যাক্ষুব্ধ মুক্ত টাওয়ারের উপর শুয়ে সারারাত্রি কাটাতে ইবটসনের প্রবল আপত্তি। কাজেই কাঠ ও মিস্ত্রি যোগাড় করে টাওয়ারের উপর সে একটা মঞ্চ তৈরি করিয়ে ফেলল। ইবটসন যে পাঁচদিন রুদ্রপ্রয়াগে থাকতে পারল, সে কদিন আমরা সেই মঞ্চের উপরই রাত কাটালাম।

ইবটসন চলে যাওয়ার পর চিতাটা একটা কুকুর, চারটে ছাগল আর দুটো গরু মারল। কুকুর আর ছাগলগুলোকে সে রাতেই খেয়ে শেষ করেছিল, কিন্তু গরুদুটোর মড়ির উপর দুদিন করে বসলাম। প্রথম গরুটার মড়ির উপর আমি বসে থাকার দ্বিতীয় রাতে চিতাটা এসেছিল। রাইফেলটা তুলে টর্চটা জ্বালাতে যাচ্ছি, এমন সময় দুর্ভাগ্যক্রমে কাছেই একটা বাড়িতে একটি স্ত্রীলোকের দরজায় ঘা মারার শব্দে চিতাটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

এর মধ্যে কোনো মানুষ মারা পড়ে নি, তবে, একটি স্ত্রীলোক ও তার শিশুসন্তান সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছিল। যে ঘরে তারা শুয়ে ছিল তার দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে চিতাটা স্ত্রীলোকের হাত কামড়ে ধরে তাকে ঘরের

বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রীলোকটির সাহস ছিল, এবং সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে নি বা বুদ্ধিও হারায় নি। চিতাটা তাকে টেনে পিছুতে পিছুতে দরজার বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দরজাটা তার উপর বন্ধ করে দেয় এবং হাতে আর বুকে জখম নিয়ে বেঁচে যায়,—শিশুটার মাথায় কিছুটা চাট লেগেছিল। পরের দু-রাত্রি আমি এই ঘরে কাটাই, কিন্তু চিতাটা আর ফিরে আসে নি।

মার্চের শেষভাগে একদিন কেদারনাথ তীর্থপথের ধারে একটা গ্রাম থেকে আমি ফিরে আসছি, একটা জায়গায় এসে পেঁছিলাম যেখানে রাস্তাটা মন্দাকিনী নদীর খুব ধার ঘেঁষে চলেছে। সেখানে দশ-বারো ফুট উঁচু একটা জলপ্রপাতও রয়েছে। এখানে নদীর উপরে জলপ্রপাতটার পাথরের উপরে দেখলাম লম্বা বাঁশের আগায় বাঁধা তিনকোনা একটা জাল নিয়ে কয়েকটা লোক বসে আছে। জলের গর্জনে কথাবার্তা সম্ভব নয় বলে আমি একটু ধূমপান ও একটু বিশ্রামের জন্যে এপাশে একটা পাথরের উপর বসলাম, কেননা সেদিন হাঁটাও হয়েছিল অনেক, আর লোকগুলো কী করছে তাও দেখার ইচ্ছে ছিল প্রবল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি লোক উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে আঙুল দিয়ে জলপ্রপাতের নিচে সাদা ফেনিল জলের দিকে দেখাতে লাগল আর দু-জন লোক বাঁশটা বাড়িয়ে ত্রিভুজাকৃতি জালটা জলপ্রপাতের খুব কাছে পেতে ধরল। পাঁচ থেকে পঞ্চাশ পাউন্ড পর্যন্ত বিভিন্ন সাইজের একঝাঁক মহাশোল মাছ জলপ্রপাতটার উপর লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল। এর মধ্যে একটা পাউন্ড-দশেক ওজনের মাছ জলপ্রপাতের বাইরে লাফিয়ে পড়ল। ফিরে জলে পড়ার সময় সেটাকে বেশ কায়দা করে জালে ধরে ফেলা হল এবং জাল টেনে নিয়ে মাছটা বের করে নেওয়ার পর আবার পাতা হল জলপ্রপাতের কাছে। ঘণ্টাখানেক ধরে আমি তাদের মাছ ধরা দেখলাম,—এর মধ্যে লোকগুলো চারটে মাছ ধরল, প্রত্যেকটি দশ পাউন্ড ওজনের।

আগের বার রুদ্রপ্রয়াগে থাকার সময় ইনস্‌পেক্‌শন বাংলোর চৌকিদারের মুখে শুনেছিলাম যে বসন্তকালে, বরফ-গলা জল নামার আগে, অলকনন্দা আর মন্দাকিনীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। সেজন্যে এবার আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম চোদ্দ ফুট লম্বা বেতের তৈরি একটা স্যামন-মাছ-ধরা ছিপ, ২৫০ গজ সুতো-সমেত একটা রীল, কয়েকটা শক্ত বঁড়শি, আর এক থেকে দুই ইঞ্চি মাপের কতকগুলো ঘরে-তৈরি পিতলের টোপ।

নরখাদকটার কোনো সংবাদ না পাওয়ায় পরের দিন সকালে আমি আমার ছিপ আর সরঞ্জাম নিয়ে জলপ্রপাতটার দিকে গেলাম।

জলপ্রপাতটায় আর আগের দিনের মত মাছ লাফাচ্ছিল না। উপরে

লোকগুলো একটা ছোট আগুনের চারদিকে ঘিরে বসে হুঁকোটা এ-হাত ও-হাত ঘোরাচ্ছিল আর খুব আগ্রহে আমাকে নজর করে দেখছিল।

জলপ্রপাতটার নিচে ত্রিশ থেকে চল্লিশ গজ চওড়া একটা জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, দু-পাশে পাথরের দেওয়াল প্রায় দুশো গজ লম্বা। জলপ্রপাতের মাথায় যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে একশো গজ পর্যন্ত দেখা যায়। এই মনোরম সুন্দর জলাশয়ের জলটা স্ফটিক-স্বচ্ছ।

জলাশয়ের মাথায় জল থেকে সোজা দশ-বারো ফুট উঁচু হয়ে খাড়া পাহাড়ের গা উঠেছে। এইভাবে খাড়া হয়ে গজ-কুড়ি যাওয়ার পর ঢালটা ধীরে-ধীরে উঁচু হয়ে উঠে গিয়েছে একশো ফুট পর্যন্ত। আমার এদিক থেকে জল পর্যন্ত নামা কোনোমতেই সম্ভব নয়। বঁড়শিতে একটা মাছ যদি আমি বিঁধিয়েও ফেলি তবু পাড় ধরে সেটাকে অনুসরণ করা সম্ভব হবে না, লাভও নেই ; কারণ উপরদিকটায় ঝোপ-জঙ্গল আর গাছপালা, আর নিচের দিকে নদীটা বিপুল কলোচ্ছ্বাসে অলকনন্দার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এখানে মাছ ধরে ডাঙায় ওঠানো কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ। অবশ্য একটা মাছ না বিঁধানো পর্যন্ত সে বাধা পার হওয়ার কথা চিন্তা না করাই ভাল। তা ছাড়া এখনো তো ছিপই জুড়ি নি।

আমার এপাশে জলাশয়টার জল গভীর। অসংখ্য বুদ্‌বুদ্ উড়িয়ে ছুটে চলেছে জল। আধাআধি ওপাশে নুড়িপাথর বিছানো জলের তলাটা পর্যন্ত দেখা যাচেছ। তার ওপর চার থেকে ছ-ফুট জল। জলের তলের প্রত্যেকটা নুড়ি আর পাথর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার উপর দিয়ে তিন থেকে দশ পাউন্ড ওজনের কতকগুলো মাছ ধীরে-ধীরে উজানের দিকে এগিয়ে চলেছিল।

বার ফুট উপরে দাঁড়িয়ে আমি মাছগুলো দেখছি, হাতে রয়েছে দু-ইঞ্চি একটা টোপে লাগানো একটা তিনমুখো বঁড়শি,—হঠাৎ দেখি গভীর জল থেকে একঝাঁক স্যামন মাছের পোনা ছুটে বেরিয়ে এসে নুড়ি-বিছানো নদীর তলা দিয়ে ছুটে চলেছে—পিছনে তাড়া করছে তিনটে বড়-বড় মহাশোল।

উৎকৃষ্ট স্যামন ধরার ছিপটা ধরে আমি টোপটি সজোরে দূরে ছুঁড়ে মারলাম। ছিপটা এভাবে ব্যবহার হয়, আমার বন্ধু হার্ডি তা কোনোদিনও চায় নি, এবং আগে, বহুবার ওটি ওই ভাবেই ব্যবহার হয়েছে। উৎসাহের বশে দূরত্ব আন্দাজ সঠিক হয় নি। ফলে জলের দু-ফুট আন্দাজ উপরে জলাশয়টির অনেক ওদিকে, পাথরের গায়ে বাজল টোপটা। ওটা জলে পড়ল, স্যামনের পোনাগুলোও পাথরের কাছে পেঁছিল। টোপটা ছুঁতে-না-ছুঁতে সামনের মহাশোলটি ওটি গিলে ফেলল।

উঁচু জায়গা থেকে লম্বা সুতোয় মাছ তুলতে টান পড়ে প্রচণ্ড, কিন্তু আমার ছিপটা বেশ মজবুত, আর শক্ত তিনমুখো বঁড়শিটা বেশ ভাল-মত

গেঁথে গেছে মাছটার মুখে। একটি কি দুটি মুহূর্ত, মনে হল মাছটা বুঝতে পারে নি কি ব্যাপার ঘটে গেছে। পেটটা আমার দিকে, মুখটা উঁচু করে জলের ভেতর সোজা হয়ে উঠে সেটা এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়তে লাগল। তারপর সম্ভবত ঝুলন্ত টোপটা মাথায় লাগায় ভয় পেয়ে সে একটা প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে ছুট লাগাল ভাটির দিকে, আর নুড়ির বুকে ছোট মাছগুলো ছিটকে যেতে লাগল দুদিকে।

প্রথম দৌড়ে মাছটা টেনে বের করে নিয়ে গেল একশো গজ সুতো, তারপর এক মুহূর্ত থেমে আবার গজ-পঞ্চাশেক। রীলে আরো সুতো ছিল, কিন্তু মাছটা ততক্ষণে বাঁকটা পার হয়ে বিপজ্জনকভাবে জলাশয়টার শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। সুতোর টান একবার শক্ত করে একবার ঢিল দিয়ে অবশেষে মাছটার মুখ উজানের দিকে ফেরাতে পারলাম, এবং তারপর খুব আস্তে-আস্তে সেটাকে বাঁক ঘুরিয়ে জলের যে একশো গজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল তার মধ্যে নিয়ে এলাম।

আমার ঠিক নিচেই পাহাড়ের খানিকটা বেরিয়ে এসেছে। সেখানে বাধা পেয়ে জল স্থির, স্রোতহীন। আধঘণ্টা বীরের মত যুঝে তবে মাছটা সেই বদ্ধজলে আসতে বাধ্য হল।

এতক্ষণে আমি আমার শেষ বাধার সম্মুখীন হয়েছি। এবার এটা পার হওয়ার কোনো উপায়ই যখন নেই তখন ভাবছি সুতো কেটে মাছটাকে ছেড়েই দিতে হবে। বেশ দুঃখিত মনেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এমন সময় একটা ছায়া এসে পড়ল পাশের পাথরের ওপর। পাথরের ধারে ঝুঁকে পড়ে নবাগতটি মন্তব্য করল যে মাছটা মস্ত বড়, এবং একই নিশ্বাসে আমাকে প্রশ্ন করল এখন আমি কী করব ঠিক করেছি। যখন বললাম যে মাছটাকে তোলা সম্ভব নয়, একমাত্র পথ হচ্ছে তাকে ছেড়ে দেওয়া, তখন সে বলল, 'দাঁড়াও সাহেব, আমার ভাইকে ডেকে আনি।' তার ভাই হল লম্বা, রোগা ; সে যখন এল, স্পষ্টই বোঝা গেল যে তখন সে গোয়াল-ঘর সাফ করছিল। তাকে ওপারে গিয়ে হাত পা ধুয়ে নিতে বললাম যাতে সে পাথর থেকে পিছলে না পড়ে যায়। তারপর বড় ভাইটির সঙ্গে পরামর্শ করলাম।

যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে জলের এক ফুট উপর পর্যন্ত কয়েক ইঞ্চি চওড়া একটা ফাটল এঁকে-বেঁকে নিচে নেমে গেছে। ঠিক সেখানেই দু-ইঞ্চি চওড়া একটা পাথরের ফলক। আমাদের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াল যে, ছেলেটা হাত পা ধুয়ে ফিরে এসেই ফাটল বেয়ে ঐ ফাটলটার উপর চলে যাবে, বড় ভাই ফাটল দিয়ে কিছুটা নেমে ছোট ভাইয়ের হাত ধরে থাকবে, আর আমি পাড়ের উপর শুয়ে পড়ে বড় ভাইয়ের হাত ধরে থাকব। কাজে নামার আগে আমি তাদের জিগ্যেস করলাম মাছ তোলার কায়দা-কানুন তাদের

জানা আছে কি না এবং তারা সাঁতার জানে কি না। এতে তারা একগাল হেসে জানাল যে ছোটবেলা থেকেই তারা মাছ ধরছে আর নদীতে সাঁতার দিয়ে আসছে।

আমাদের পরিকল্পনাটার মধ্যে অসুবিধের ব্যাপার এইটুকু যে, একই সঙ্গে বড় ভাইয়ের হাত ধরে থাকা ও ছিপ সামলানো আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হ'ক কিছুটা ঝুঁকি নিতেই হবে। কাজেই আমি ছিপ নামিয়ে রেখে সুতোটা হাত দিয়ে ধরলাম, এবং দু-ভাই যখন নেমে গেল তখন পাথরের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বড় ভাইয়ের একটা হাত ধরলাম। তারপর খুব আস্তে-আস্তে একবার বাঁ-হাতে, একবার দাঁতে কামড়ে সুতো গুটিয়ে এনে মাছটাকে পাথরের কাছে টেনে আনলাম।

বাচ্চা ছেলেটা মাছ ধরতে জানে কি না সে সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্নই রইল না, কারণ মাছটা পাথরের গায়ে এসে লাগায় আগেই সে তার তর্জনী আর বুড়ো আঙুল মাছটার দু-পাশের কানকোর মধ্যে চালিয়ে দিয়ে শক্ত করে গলাটা চেপে ধরল। এ পর্যন্ত মাছটা বেশ শান্তই ছিল, কিন্তু গলায় হাত পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মারল প্রচন্ড এক ঝাপট। কিছুক্ষণ পর্যন্ত মনে হতে লাগল যে আমরা তিনজনেই উল্টে গিয়ে পড়ব জলের ভিতর।

দুই ভাইয়েরই খালি পা। সুতো ধরে থাকার প্রয়োজন শেষ হতে দু-হাত দিয়েই তাদের সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হল। উপর থেকে প্রাণপণে আমি টানতে লাগলাম, আর পাথরের দিকে মুখ করে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে তারা উঠে এল উপরে।

মাছটাকে নিরাপদে ডাঙায় তোলার পর তাদের আমি জিগ্যেস করলাম তারা মাছ খায় কি না। সাগ্রহ উত্তর পেলাম যে পেলেই তারা খায়। তখন তাদের বললাম যে তারা যদি আমার লোকজনের জন্যে আর একটা মাছ ওঠাতে সাহায্য করে তবে এই চমৎকার মহাশোল মাছটা তাদের আমি দিয়ে দেব—মাছটার ওজন ছিল ত্রিশ পাউন্ডেরও একটু উপরে। এ প্রস্তাবে তারা তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল।

মাছটার নিচের নরম ঠোঁটে বঁড়শিটা গভীরভাবে বসে গিয়েছিল। কেটে যখন সেটা বার করছি, দু-ভাই সাগ্রহে তা লক্ষ করতে লাগল। বঁড়শিটা বের হলে তারা জানতে চাইল সেটা তারা একটু দেখতে পারে কি না। তিনটে বঁড়শি একসঙ্গে, এমন জিনিস তাদের গাঁয়ে আগে কখনো দেখা যায় নি। বাঁকানো পিতলের টুকরোটা অবশ্য ভারের কাজ করে—কিন্তু বঁড়শিতে টোপ ছিল কিসের? মাছ পিতল খেতে চাইবে কেন, এবং সেটা কি সত্যিই পিতল, না কোনো রকমের শক্ত টোপ?

টোপ, এবং তিনমুখো বঁড়শিটা সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ ও মন্তব্যাটি হয়ে

গেলে পর আমি তাদের বসে বসে আমার দ্বিতীয় মাছ ধরাটা দেখতে বললাম।

জলাশয়ের সবচেয়ে বড় মাছগুলো ছিল জলপ্রপাতটার ঠিক নিচেই। ওখানকার ফেনায়িত সাদা জলের মধ্যে মহাশোল ছাড়াও খুব বড়-বড় কয়েকটা গুঞ্চ্ মাছও ছিল। ওরা স্পুন বা টোপ খুব চট করে ধরে এবং ওরাই আমাদের পাহাড়ী নদীগুলিতে শতকরা নব্বইটা বঁড়শি হারানোর জন্যে দায়ী, কারণ এগুলোর একটা ভারি বদ অভ্যাস, যে, বঁড়শি ধরার সংগে-সংগেই জলের তলায় ডুব দেয়, আর মাথাটা ঢুকিয়ে দেয় কোনো পাথরের তলায়ঃ সেখান থেকে তাদের নড়ানো সব সময়েই কঠিন এবং প্রায়ই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

প্রথম মাছটা যেখানে ধরেছি সেখানকার মত সুবিধেজনক জায়গা নেই দেখে আমি সেখানেই ছিপ নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

মাছটাকে খেলিয়ে তোলার সময় নুড়ির উপরকার মাছগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। অচিরেই ভাইদুটি বিস্ময়সূচক আওয়াজ করে আঙুল দিয়ে খানিকটা ভাটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। যেখানে নুড়ি-বিছানো তলটা শেষ হয়ে গভীর জল আরম্ভ হয়েছে, সেখানে একটা মস্ত বড় মাছ। আমি বঁড়শি ফেলার আগেই মাছটা ঘুরে গিয়ে গভীর জলে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরে এল সেটা। সেটা অগভীর জলে আসার পর আমি বঁড়শি ফেললাম, কিন্তু সুতো ভিজে থাকায় সেটা ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ল না।

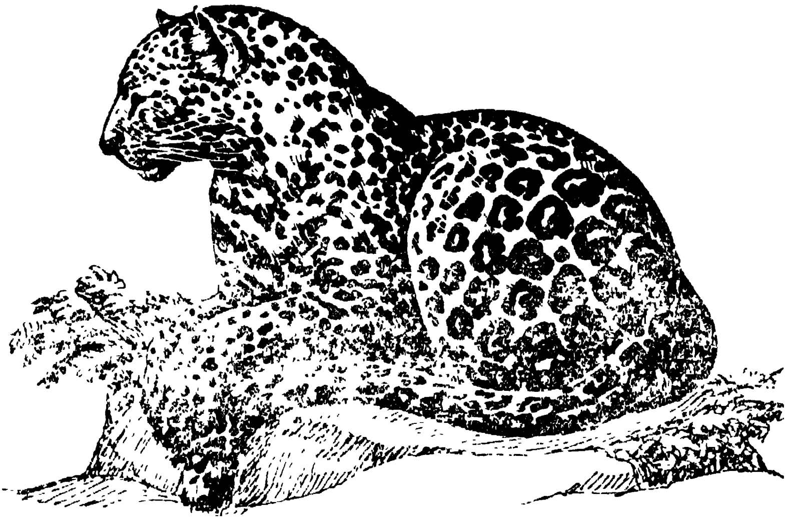
দ্বিতীয়বার টোপটা জলের যেখানে ফেলতে চেয়েছিলাম ঠিক সেই জায়গায় এবং ঠিক সময়মত গিয়ে পড়ল। টোপটা ডোবার জন্যে এক সেকেন্ড অপেক্ষা করে, প্রয়োজন-মত ঘোরানোর জন্যে একটু-একটু করে সুতো গোটাতে লাগলাম। ছোট-ছোট টান দিয়ে সেটা এগিয়ে আনছি, এমন সময় মহাশোলটা বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এল এবং পরমুহূর্তেই মুখে বঁড়শি গেঁথে জলের উপর পরিষ্কার লাফিয়ে উঠল, উল্টে পড়ল অনেকটা জল ছিটকিয়ে, তারপর উন্মত্তের মত ছুট লাগালো ভাটির দিকে। উত্তেজিত হয়ে উঠল দর্শকরা—কারণ ওপারের লোকগুলোও ভাই-দুটির মতই একাগ্র মনে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ করে যাচ্ছিল।

রীল ঘুরে চলেছে, চলেছে, সুতো চলে যাচ্ছে, ইতিমধ্যে দু-ভাই আমার দু-পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা আমাকে বার-বার বলতে লাগল যেন মাছটাকে আমি জলাশয়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে যেতে না-দিই। এটা করার চেয়ে বলা সহজ, কারণ যে-কোনো মাপের মহাশোলেরই প্রথম মরিয়া ছুটটা থামানো সম্ভব নয়। তাতে সুতো ছিঁড়ে যাওয়ার বা বঁড়শি ভেঙে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে। আমাদের ভাগ্যটা ভাল, কারণ রীলে যখন আর পঞ্চাশ গজেরও কম সুতো বাকি, তখন সে থামল। যদিও সে বেশ ভালভাবেই লড়াই

চালিয়ে গেল তবু তাকে বাঁকটা ঘুরিয়ে টেনে আনা গেল, এবং শেষ পর্যন্ত পাথরের নিচের সেই স্থির জলের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হল।

দ্বিতীয় মাছটা ডাঙায় ওঠাতে প্রথম মাছটার মত তত বেশি বেগ পেতে হল না, কেননা পাথরের উপর আমাদের প্রত্যেকের জায়গাগুলো, এবং ঠিক কি-কি করতে হবে, তা ঠিকমত জানা হয়ে গিয়েছিল।

দৈর্ঘ্যে দুটো মাছই সমান, কিন্তু দ্বিতীয়টা একটু বেশি ভারি। বড় ভাইটি একটা ঘাসের দড়ি পাকিয়ে নিয়ে তা দিয়ে নিজেদের মাছটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে বিজয়গর্বে গাঁয়ের দিকে রওনা হল। ছোট ভাইটি প্রার্থনা জানাল যে সে আমার ছিপটা আর মাছটা বয়ে নিয়ে ইনস্‌পেক্‌শন বাংলো পর্যন্ত দিয়ে আসবে। অনেকদিন আগে আমি নিজেও বালক ছিলাম আর আমার এক ভাইয়ের ছিল মাছ ধরার বাতিক, কাজেই ছেলেটির আর আমাকে অনুরোধ করে একথা বলার দরকার ছিল না ঃ 'সাহেব, তুমি যদি তোমার মাছটা আর ছিপটা আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে দাও আর নিজে একটু দূরে-দূরে পিছন-পিছন আসো, তবে রাস্তায় বা বাজারে যারা দেখবে তারা ভাববে যে আমিই এই মস্ত মাছটা ধরেছি, যার সমান মাছ তারা চোখেও কখনো দেখে নি!'



১৬

একটি ছাগলের মৃত্যু

মার্চের শেষ তারিখে ইবটসন পাউরি থেকে ফিরে এল। পরের দিন সকালে আমরা প্রাতরাশ খেতে-খেতে শুনলাম, রুদ্রপ্রয়াগের উত্তর-দক্ষিণে একটা গ্রামের কাছে একটা চিতা সারারাত ধরে ডেকেছে। যেখানে জাঁতিকলে আটকানো চিতাটাকে আমরা মেরেছিলাম তার মাইলখানেক দূরে জায়গাটা।

গ্রামের আধ মাইল উত্তরে, পাহাড়টার উঁচু শিখরে বেশ খানিকটা জায়গা খুব এবড়ো-খেবড়ো ও দুর্গম। সেখানে বিরাট বিরাট পাথর আর গুহা আর গভীর গর্ত। স্থানীয় লোকেরা বলে ওখান থেকে তাদের পূর্বপুরুষরা তামা খুঁড়ে বের করত। সারা এলাকাটায় ঝোপ জঙ্গল। কোথাও গভীর কোথাও পাতলা, পাহাড়ের ঢাল দিয়ে গ্রামেব উপরের স্তর-কাটা জমিগুলোর আধ মাইল দূর পর্যন্ত নেমে এসেছে।

আমার বহুদিন ধরে সন্দেহ হচ্ছিল, নরখাদকটা রুদ্রপ্রয়াগের ধারে-কাছে এলে এই এলাকাটাতেই আস্তানা হিসাবে ব্যবহার করে। আমি বহুবার এবড়ো খেবড়ো জমিটার উপরের পাহাড়ে উঠেছি। আশা করেছি চিতাটাকে ভোরের সূর্যে পাথরের উপর রোদ পোহাতে দেখব। ঠান্ডার সময়ে এ-ভাবে রোদ পোহাতে চিতারা খুব ভালবাসে। এই অবস্থায় ওদের গুলি করা খুব সহজ। শুধু ধৈর্য আর নির্ভুল নিশানা দরকার।

আমি এবং ইবটসন সকাল-সকাল লাঞ্চ সেরে আমাদের .২৭৫ রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে ইবটসনের একটি লোক। তার কাছে একগাছা ছোট দড়ি। গ্রাম থেকে একটা জোয়ান মদ্দা ছাগল কিনলাম। আমি আগে-আগে যে-ছাগলগুলো কিনেছি, সবগুলোই চিতাটার হাতে নিহত হয়েছে।

গ্রাম থেকে একটি উঁচু-নিচু পথ পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা উঠে, এবড়ো-খেবড়ো জমিটার কিনারে গিয়ে বাঁ-দিকে মোড় নিয়েছে। তারপর পাহাড়ের গা দিয়ে আরো একশো গজ গিয়ে পাহাড়ের চূড়া ঘিরে দূরে চলে গেছে। যেখানে পথটা পাহাড়ের গা দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে উপরের দিকে পথের দু-পাশে দূরে-দূরে ঝোপ। নিচের দিকে খাড়া জায়গাটায় দু-পাশে ছোট-ছোট ঘাস।

যেখানে পথটা মোড় ঘুরেছে, সেখানে, ঝোপ-জঙ্গলের দশ গজ নিচে ছাগলটাকে শক্ত খুঁটিতে বাঁধলাম। পাহাড় বেয়ে দেড়শো গজ নেমে আমরা কতকগুলো বড় পাথরের আড়ালে লুকোলাম। ছাগলটার গলায় জোর আছে। যতক্ষণ ওর চড়া, তীক্ষ্ন ডাক শোনা যাচ্ছে, ততক্ষণ ওকে দেখার কোনো দরকার নেই। কেননা ওকে খুব শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। চিতাটার ওকে তুলে নিয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

সূর্য যখন লাল আগুনের গোলার মত কেদারনাথের উপরের তুষার-চূড়ার এক হাতের মধ্যে, তখন আমরা পাথরের পিছনে লুকোই। তার খানিকটা বাদে ছাগলটা হঠাৎ ডাক থামাল। তখন কয়েক মিনিট মাত্র ছায়া পেয়েছি আমরা।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে, পাথরের পাশে গিয়ে ঘাসের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, ছাগলটা কান খাড়া করে ঝোপগুলোর দিকে চেয়ে আছে। আরো দেখলাম, ছাগলটা মাথা বাঁকিয়ে দড়িটা পুরো টেনে পিছিয়ে গেল।

চিতাটা নিশ্চয় ছাগলের ডাক শুনেই এসেছে। চিতার উপস্থিতি টের পাওয়ার আগে অবধি ছাগলটা লাফায় নি। এই দেখেই বোঝা গেল ছাগলটা সন্দিগ্ধ। ইবটসনের লক্ষ আমার চেয়ে নির্ভুল হবে। কেননা ওর রাইফেলে টেলিস্কোপিক-সাইট লাগানো আছে। তাই আমি ওকে জায়গা করে দিলাম।

শুয়ে ও যখন রাইফেল তুলল, আমি ফিসফিস করে বললাম, ছাগলটা যে ঝোপগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, ও যেন সেই ঝোপগুলো ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে। আমার মনে হল, ছাগলটা যদি চিতাটাকে দেখতে পেয়ে থাকে, লক্ষণ দেখে তাই মনেই হচ্ছে, তা হলে ইবটসনও নিশ্চয় ওর শক্তিশালী টেলিসকোপ দিয়ে চিতাটাকে দেখতে পাবে। ইবটসন কয়েক মিনিট টেলিস্কোপ্ চোখে লাগিয়ে রাখল, মাথা নাড়ল, রাইফেল নামিয়ে আমাকে জায়গা করে দিল।

শেষ যে-অবস্থায় ওকে দেখেছি, ছাগলটা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি সেই একই ঝোপের ওপর টেলিস্কোপ নিশানা করলাম। চোখের পলক-ফেলা, কম-সে-কম কান কিংবা গোঁফের নড়াচড়া, টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা যাবেই। কিন্তু কয়েক মিনিট লক্ষ করেও আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে দেখি আলো দ্রুত মিলিয়ে আসছে। ছাগলটাকে পাহাড়ের গায়ে একটা লাল-সাদা ছোপ বলে মনে হচ্ছে। আমাদের অনেকটা পথ যেতে হবে। আর অপেক্ষা করা অহেতুক, বিপজ্জনকও বটে। আমি উঠে ইবটসনকে বললাম, এবার যাওয়া উচিত।

সেই ডাক বন্ধ-করা থেকে ছাগলটা আর কোনো শব্দ করে নি। ওটাকে খুঁটি থেকে খুলে নিয়ে আমরা গ্রামের দিকে চললাম। ইবটসনের লোকটার হাতে ছাগলটার দড়ি। বোঝা গেল, যে ছাগলটার গলায় কোনোদিন দড়ি পড়ে নি। এইভাবে নিয়ে যাওয়াতে সে তীব্র আপত্তি জানাতে লাগল। আমি লোকটাকে দড়ি খুলে নিতে বললাম। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, কোনো ছাগলকে জঙ্গলে বেঁধে রাখার পর ছেড়ে দিলে সে, হয় ভয়ে, নয় সাহচর্য চেয়ে কুকুরের মত পায়ে-পায়ে হাঁটে। এ ছাগলটার কিন্তু অন্য মতলব ছিল। লোকটা দড়ি খুলে নিতেই ও পথ দিয়ে উলটো দিকে ছুটল।

ছাগলটার ডাকের দাম আছে। তাই ওটাকে ফেলে রেখে আসতে চাইলাম না। ডেকে ও একবার চিতাটাকে টেনে এনেছে। হয়তো আবারও আনতে পারে। তাছাড়া, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ভাল দামে কেনা হয়েছে ওটাকে। তাই আমরা ওর পিছু ধাওয়া করলাম। ছাগলটা বাঁ-দিকে ঘুরল। আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল। আমরাও ছাগলটার পথ ধরেই চললাম।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। সেখান থেকে পাহাড়ের নিচে ঘাসে-ঢাকা ছোট এলাকাটার অনেকটা দেখা যায়। ছাগলটাকে কোথাও না দেখে আমরা ভাবলাম যে ও নিশ্চয় কোনো ছোট পথ ধরে গ্রামে ফিরে গেছে। আমরাও ফিরে যাবার পথ ধরলাম। আমি আগে-আগে হাঁটছিলাম। যে একশো গজ লক্ষ পথের উপরের দিকে ছড়ানো ঝোপ, খাড়া নিচের দিকে ছোট-ছোট ঘাস, তার মাঝামাঝি এসেছি—আমাদের সামনে পথের উপর কি একটা সাদা জিনিস দেখতে পেলাম।

আলো প্রায় নেই বললেও হয়। সন্তর্পণে এগিয়ে এসে দেখি সাদা জিনিসটা হল সেই ছাগলটা। সরু পথের উপর লম্বা করে শোয়ানো, ফলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যায়, সে-ভয় নেই। ছাগলটার গলা থেকে রক্ত পড়ছে। আমি গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম মাংসপেশীগুলি তখনো কাঁপছে।

ওই চিতাটা ছাড়া আর কেউ ছাগলটাকে মেরে পথের উপর শুইয়ে রেখে

যায় নি। মনে হল, নরখাদকটা বলছে, "ছাগলটাকে খুব চেয়েছিলে তো? এই নাও। এখন অন্ধকার। তোমাদের অনেকখানি পথ যেতে হবে। দেখা যাক, তোমাদের মধ্যে কে গ্রামে জ্যান্ত পৌঁছয়!"

আমার কাছে দেশলাইয়ের একটি আস্ত বাক্স না থাকলে, সেদিন আমরা তিনজন গ্রামে বেঁচে ফিরতে পারতাম বলে মনে হয় না আমার। (ইবটসন তখন ধূম-পান করত না)। একটি-একটি করে দেশলাই জ্বালাছি, চারদিকে উৎকণ্ঠায় চাইছি, কয়েক পা হাঁটছি। যতক্ষণ না গ্রামটা হাঁকের মধ্যে এল, ততক্ষণ এইভাবেই আমরা সেই উঁচু-নিচু পথ বেয়ে কোনো মতে নামলাম। আমাদের উদ্বিগ্ন চেঁচামেচিতে, লোকজন লণ্ঠন এবং পাইন কাঠের মশাল হাতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

যেখানে চিতাটা ছাগলটাকে শুইয়ে রেখেছিল, পরদিন সকালে সেখানে ফিরে গিয়ে দেখি, চিতাটার থাবার ছাপ আমাদের অনুসরণ করে গ্রাম পর্যন্ত এসেছিল।

আমরা যে অবস্থায় ছাগলটাকে রেখে এসেছিলাম, ওটা ঠিক তেমনি পড়ে আছে। কেউ ছোঁয় নি।





১৭

সায়ানাইড প্রয়োগ

গত রাতের নিহত ছাগলটাকে দেখে আমি যখন ইন্‌সপেক্‌শন বাংলোয় ফিরলাম, গ্রামে এসে খবর পেলাম, আমার রুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিতি জরুরী দরকার। খবর এসেছে, নরখাদকটা গত রাতে ওখানে একজনকে মেরেছে। আমাকে সংবাদবাহকরা সঠিক বলতে পারল না, কোথায় লোকটাকে মারা হয়েছে। তবে নরখাদকটার থাবার ছাপ দেখে বোঝা গেল, যে ও গ্রাম পর্যন্ত আমাদের অনুসরণ করে এসে আবার ফিরতি-পথে ফিরে যায়। তারপর পথের মোড়ে এসে ডান দিকে ঘুরে যায়। পরে জেনেছিলাম, আমার অনুমান সঠিক। আমাদের কাউকে না পেয়ে ওটা পাহাড়ের আরো উঁচুতে উঠে অন্য শিকার ধরে।

বাংলোয় এসে দেখি, ইবটসন নন্দরাম নামে একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। আমরা গত সন্ধ্যায় যেখানে বসেছিলাম, নন্দরামের গ্রাম সেখান থেকে মাইল চারেক দূরে। এই গ্রাম থেকে আধ মাইল উঁচুতে, এক গভীর খাদের অন্য ধারে, গাওইয়া নামে অনুন্নত সম্প্রদায়ের একটি লোক, জঙ্গলের একটু ছোট জায়গা সাফ করে বাড়ি করেছিল। ওর সঙ্গে থাকত ওর মা, স্ত্রী আর তিনটি বাচ্চা।

সকালে নন্দরাম গাওইয়ার বাড়ির দিক থেকে নারীকণ্ঠের কান্না শুনতে পায়। ও চেঁচিয়ে জানতে চায়, কি হয়েছে! উত্তর পায়, "বাড়ির মরদকে"

আধঘণ্টা আগে নরখাদকটা তুলে নিয়ে গেছে। সেই খবর নিয়ে নন্দরাম ইন্‌সে-পেক্‌শন বাংলোয় দৌড়ে এসেছে।

আরবী ও ইংরেজ, ঘোড়া দুটোকে জিন পরাতে বলল ইবটসন। ভাল করে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। নন্দরাম আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। পাহাড়ে কোনো রাস্তাই নেই। শুধু ছাগল ও গরু চলার পথ। বিরাটকায় ইংরেজ ঘোড়াটি পথের অসম্ভব আঁকাবাঁকা মোড়গুলি ঘুরতে পারছিল না। তাই দেখে আমরা ঘোড়াগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। বন্ধুর ও চড়াই, বাকি পথটুকু উঠলাম পায়ে হেঁটে।

জঙ্গলের সেই সাফ-করা নির্জন জায়গায় পেঁছিলাম আমরা। দুটি উদ্বিগ্ন রমণী আমাদের দেখাল, দরজার কাছে কোথায় গাওইয়া বসেছিল, কোথায় নরখাদকটা ওকে ধরে। ওদের তখনো আশা আছে, "বাড়ির মরদ" বেঁচে আছে।

চিতাটা বেচারাকে গলায় কামড়ে ধরে। সেই জন্যেই ও কোনো আওয়াজ করতে পারে নি। একশো গজ টেনে নিয়ে গিয়ে তবে ওকে মারে। মারবার পর গাওইয়াকে চিতাটা, ঘন ঝোপে ঢাকা খাতে টেনে নিয়ে যায় আরো চারশো গজ দূরে। মেয়েদের কান্নাকাটি আর নন্দরামের চিৎকারে নিশ্চয় চিতাটার খাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। কেননা, ও গাওইয়ার গলা, চিবুক, একটা কাঁধ আর উরুর কিছুটা অংশ মাত্র খেয়েছে।

আমরা বসতে পারি, এমন কোনো গাছ শিকারটার কাছাকাছি ছিল না। তাই, মড়িটার যে তিন জায়গা থেকে চিতাটা খেয়েছে, সেই তিন জায়গায় সায়ানাইড বিষ প্রয়োগ করলাম। এর মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। আমরা কয়েকশো গজ দূরে পাহাড়ে এক জায়গায় বসলাম। চিতাটা নিশ্চয় ঘন ঝোপের মধ্যেই কোথাও ছিল। কিন্তু যদিও আমরা লুকিয়ে দু-ঘণ্টা নজর রাখলাম, কিছুই দেখতে পেলাম না। সন্ধ্যা হতে, সঙ্গে-আনা লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমরা বাংলোয় ফিরে গেলাম।

পরদিন উঠলাম খুব ভোরে। যখন খাতের উপরের পাহাড়ে গিয়ে বসেছি, তখন সবে আলো হচ্ছে। কিছু দেখা গেল না, কিছু শোনা গেল না। সূর্যো-দয়ের ঘণ্টাখানেক বাদে আমরা মড়ির কাছে গেলাম। যে-তিন জায়গায় বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেগুলো চিতাটা ছোঁয় নি। খেয়েছে অন্য কাঁধ আর পা থেকে। লাশটাকে আরো কিছুদূর টেনে নিয়ে গিয়ে ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে।

এখানেও বসার মত কোনো গাছ নেই, এবং দীর্ঘ পরামর্শের পর ঠিক হল ইবটসন মাইলখানেক নিচে একটা গ্রামে গিয়ে একটা বড় আম গাছে মাচান

বেঁধে রাত কাটাবে, আর আমি মড়িটা থেকে চারশো গজ দূরে একটা গাছের উপর বসব। সেখানেই আগের দিন নরখাদকটার থাবার ছাপ দেখেছি।

যে গাছটায় আমি বসব ঠিক করলাম সেটা একটা রডোডেনড্রন গাছ, অনেক বছর আগে মাটি থেকে ফুট পনেরো উপরে গাছটা কাটা হয়েছিল। চারপাশের ডালপালার জন্য, যেখানে কাটা হয়েছিল তার চারপাশে শক্ত-শক্ত ডাল বেরিয়েছে, ফলে ওই ডাল-ঘেরা কাণ্ডটার উপর বেশ চমৎকার লুকিয়ে থাকার ও আরাম করে বসার জায়গা হল।

আমার সামনের দিকে একটা খাড়া পাহাড়। • ঘন ব্র্যাকেন এবং ছোট-ছোট বাঁশ-ঝোপে ঢাকা। পাহাড়ের গায়ে পুব থেকে পশ্চিমে একটা পায়ে-চলা পথ। পথটা বহু-ব্যবহৃত, এবং তার ফুট-দশেক নিচে আমার রডোডেনড্রন গাছটা।

গাছের উপর থেকে দশ গজ পরিমাণ রাস্তা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। পথটা আমার বাঁয়ে একটা খাদ পার হয়ে সমান হয়ে চলে গিয়ে ঘুরে এসেছে। তারপর আমার ডাইনে তিনশো গজ দূরে একটা ঝোপের সামান্য নিচ দিয়ে গিয়েছে। ওই ঝোপটার নিচেই মড়িটা পড়ে আছে। খাদটার যেখানে পথটা গিয়ে নেমেছে সেখানে জল ছিল না, কিন্তু ত্রিশ গজ নিচের দিকে, ঠিক আমার গাছটার নিচেই, গাছ থেকে তিন-চার গজ দূরে কয়েকটা ছোট-ছোট জলাশয় ছিল। ওগুলো একটা ছোট ঝরনার উৎসস্থল। ঝরনাটা নিচে নেমে একটি ছোট নদীতে পরিণত হয়ে গিয়ে গ্রামের লোকের পানীয় আর সেচের জল যোগায়।

রাস্তার যে দশ গজ আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, সেখানে তিনশো গজ উপরের পাহাড়ে গাওইয়ার ঘর থেকে একটা সরু পথ সোজা নেমে এসে সমকোণ করে মিশেছে। বাড়িটা আমার থেকে তিনশো গজ উপরে। এই পথটার ত্রিশ গজ উপরে একটা বাঁক, এবং সেখান থেকে একটা ছোট খাত শুরু হয়ে নিচের পথটায় এসে মিশেছে। উপরের পথে যেখানটায় খাতটা শুরু হয়েছে আর নিচের পথে সেটা যেখানে এসে মিশেছে, সে দুটো জায়গাই আমার দৃষ্টির আড়ালে।

টর্চের কোনো দরকার ছিল না কারণ চাঁদের উজ্জ্বল আলো ছিল। এবং চিতাটা যদি সমতল পথটা দিয়ে অথবা ওই উপরের পথটা দিয়ে আসে—আর থাবার ছাপে তো বোঝাই গেছে আগের দিন তাই করেছে—আমি তাহলে খুব সহজেই ত্রিশ চল্লিশ ফুট পাল্লার ভিতরে থেকে গুলি করার সুযোগ পাব।

ইবটসনের সঙ্গে পাহাড় দিয়ে খানিকটা নেমে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে সূর্যাস্তের কিছুটা আগে গাছের উপর উঠে বসলাম। কয়েক মিনিট পরে তিনটে কালিগি ফেজেন্ট, একটি মোরগ, দুটি মুরগি, পাহাড় দিয়ে নেমে এসে ঝরনায়

গিয়ে জল খেল, তারপর যে পথ ধরে এসেছে সেই পথ ধরে ফিরে গেল। দুবারই ওরা আমার গাছটার ঠিক নিচ দিয়েই গেল, এবং আমাকে তারা দেখতে না পাওয়ায় প্রমাণ হল যে আমার লুকোনোর জায়গাটা ভালই।

রাতের প্রথম দিকটা সব চুপচাপ ছিল। কিন্তু আটটার সময় মড়িটার দিক থেকে একটা কাকার ডাকতে শুরু করল। চিতাটা এসেছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, যে দুটো রাস্তা আমি পাহারা দিচ্ছি তার কোনোটা দিয়েই সে আসে নি। কাকারটা কয়েক মিনিট ডেকে থামল। রাত দশটা পর্যন্ত সব চুপচাপ কাটল। তখন কাকারটা আবার ডাক শুরু করল। ঘণ্টা-দুই চিতাটা মড়ির কাছে ছিল। বেশ ভাল করে খাওয়ার পক্ষে এ সময় যথেষ্ট। এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ বিষও নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলেছে, কেননা এই দ্বিতীয় রাত্রিতে মড়িটাতে প্রচুর পরিমাণে বিষ দেওয়া হয়েছে। লাশের গভীরে ভাল করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল সায়ানাইড।

আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে সামনের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। চাঁদের আলো এত উজ্জ্বল যে প্রতিটি ঘাসের ডগা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। রাত দুটোর সময়ে শুনতে পেলাম চিতাটা বাড়ির রাস্তা ধরে আসছে। আমি এই পথে কিছু শুকনো পাতা ছড়িয়ে রেখেছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল যে চিতার আগমনের আভাস পাওয়া। ও যে এই পাতাগুলির উপর দিয়ে অসাবধানে হাঁটছে, নিঃশব্দে আসার কোনো চেষ্টা করছে না দেখে আমি আশান্বিত হলাম যে ওর অবস্থা ভাল নয়। আমার অবশ্য আশা ছিল যে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আমি ওকে গুলিবিদ্ধ করতে পারব।

রাস্তার বাঁকে চিতাটা একটু দাঁড়াল, তারপর রাস্তা ছেড়ে ছোট খাতটায় ঢুকল, সেটা ধরে নিচের রাস্তায় নেমে আবার দাঁড়াল।

আমার হাঁটুর উপর রাইফেল। তার উপর হাত রেখে বহু ঘণ্টা নড়াচড়া না করে বসে ছিলাম। আমার ধারণা ছিল যে চিতাটা রাস্তা ধরে আসবে। আমি ঠিক করেছিলাম যে ওকে আমার সামনে দিয়ে যেতে দেব। ও যখন আমার নড়াচড়া আর দেখতে পাবে না, আমি রাইফেল তুলে যেখানে খুশি সেখানে গুলি করব।

বেশ কয়েক সেকেণ্ড আমি পথটার উপর নজর রাখলাম, ডালপালার আড়াল থেকে ওর মাথাটা বেরুবে আশা করলাম। যখন এ উত্তেজনা অসহ্য লাগছিল তখন শুনতে পেলাম যে ওটা রাস্তা থেকে লাফিয়ে নামল এবং কোনাকুনিভাবে আমার গাছের দিকে আসতে লাগল। আমার একবার মনে হল যে ও কোনো রহস্যময় উপায়ে গাছের উপর আমার উপস্থিতির কথা জেনে গেছে ; এবং ওর আগের শিকারের স্বাদ আর ভাল না লাগায় নতুন মানুষ-শিকার খুঁজছে। ওর পথ ছাড়ার উদ্দেশ্য আমাকে ধরা নয়। ও ঝরনার কাছে

পৌঁছবার জন্য ছোট রাস্তা ধরল, কেননা সে-গাছের নিচে দাঁড়াল না। পরের মুহূর্তে শুনতে পেলাম ওর জল খাওয়ার আগ্রহ, জোর শব্দ।

চিতাটার পাহাড়ের উপর চলাফেরা এবং জল খাওয়ার ধরণ দেখে মনে হল যে ওকে বিষে ধরেছে। কিন্তু সায়ানাইডের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি জানতাম না বিষটা কাজ করতে কত সময় নেবে। চিতাটা জল খাওয়া বন্ধ করার দশ মিনিট পরে মনে হল যে ও হয়তো ঝরনার কাছে মরে গেছে। সেই সময় আমি শুনতে পেলাম, ও খাদের ওপারের পাহাড় ধরে উঠে যাচ্ছে। ও যখন পাহাড়ের চূড়া ঘেরা রাস্তাটায় পৌঁছল আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

যখন চিতাটা রাস্তা ধরে নামল, খাদ ধরে এল, পাহাড় বেয়ে আমার গাছের নিচে এল, যখন জল খেল, খাদের ওপারের পাহাড়ে উঠে গেল—কোনো সময়ে আমি ওকে দেখতে পেলাম না। কি দৈবঘটনায়, কিংবা স্বেচ্ছায় ও এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকল যেখানে চাঁদের একটু রশ্মিও ঢোকে নি। আমার গুলি চালাবার আশা আর ছিল না। তবে নৈনিতালের ডাক্তারের কথা মত বিষটা যদি সত্যিই শক্তিশালী হয়ে থাকে তাহলে গুলি চালাবার আর প্রয়োজন ছিল না।

বাকি রাতটা বসে কাটালাম, নজর রাস্তার উপর, কান আওয়াজ শুনবার জন্য সজাগ। দিনের আলো হতে ইবটসন ফিরল। এই সময়ে চা বস্তুটি খুবই আদরের। তাই বানাতে বানাতে ইবটসনকে রাত্রের ঘটনাগুলি বললাম।

মড়ির কাছে গিয়ে দেখলাম যে চিতাটা একটা পা খেয়েছে, যেখান থেকে দু রাত আগে অল্প একটু অংশ খেয়েছিল, সেখানে আমরা প্রচুর পরিমাণে বিষ প্রয়োগ করেছিলাম। তাছাড়া আরো দু' জায়গা থেকে বিষ খেয়েছে, বাঁ কাঁধ এবং পিঠ থেকে।

এখন চিতাটার অনুসন্ধান করা দরকার। গ্রামের পাটোয়ারী ইবটসনের সঙ্গে ফিরেছিল। তাকে লোক সংগ্রহ করতে পাঠানো হল। বেলা বারটা নাগাদ সে দুশো লোক নিয়ে হাজির হল। তাদের সারি-সারি সাজিয়ে আমরা চিতাটা যেদিকে গেছে সেদিকের পাহাড়টায় ঝাঁপান করলাম।

যেখানে চিতাটা তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল, তার থেকে আধ মাইল দূরে কতকগুলি বড় বড় পাথর ছিল। চিতাটা এদিকেই গিয়েছিল। পাথরগুলির তলায় একটা গুহা ছিল। সেটা পাহাড়ের অনেকটা ভিতরে ঢুকে গেছে। ওটার মুখটা চিতা ঢোকার পক্ষে যথেষ্ট বড়। এই গুহার মুখে চিতাটা জমি আঁচড়েছে এবং মড়ির পায়ের আঙুলগুলি বমি করে বার করেছে। এগুলিকে ও আস্ত গিলেছিল।

বহু আগ্রহী হাত পাহাড়ের গা থেকে পাথর টেনে নিয়ে এল। আমরা চলে

আসার আগে গুহার মুখ এমনভাবে বন্ধ করে এলাম যে ভিতরে যদিও বা কোনো চিতা থেকে থাকে তার পালাবার আর কোনো সম্ভাবনা থাকল না।

পর দিন সকালে আমি এক ইঞ্চি চওড়া তারের জাল এবং কিছু তাঁবু খাটাবার লোহার খুঁটি নিয়ে এলাম। পাথর সরিয়ে গুহার মুখটা জাল দিয়ে বন্ধ করলাম। তার পর-পর দশ দিন সকালে এবং সন্ধ্যায় গুহাটায় আসতাম। এই সময়ে অলকনন্দার বাঁ-পারের কোনো গ্রাম থেকে নরখাদকটার কোনো খবর আসছিল না দেখে আমার আশা রোজ ক্রমাগত বাড়তে লাগল যে হয়তো পরের দিনই এসে কোনো নিশানা পাব যে চিতাটা গুহার ভিতরে মরে গেছে।

দশম সকালে যখন গুহা থেকে ফিরলাম—জালটাকে দেখলাম কেউ মাড়ায় নি। ইবটসন আমাকে খবর দিল যে গত রাত্রে পাঁচ মাইল দূরের একটা গ্রামে একজন মহিলা নিহত হয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ-বদ্রীনাথ যাওয়ার তীর্থপথের এক মাইল উপরে।

যে জন্তু আর্সেনিক এবং স্ট্রীকনিন খেয়ে বেঁচে থাকে এবং যার শরীরে এই সব দ্রব্য উত্তেজক-পদার্থের কাজ করে, বোঝাই গেল তার পক্ষে সায়ানাইড সঠিক বিষ নয়। চিতাটা যে সায়ানাইড খেয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আরো সন্দেহ নেই, যে ও গুহাটায় ঢুকেছিল। কেননা গুহাতে ঢুকবার সময় একটা পাথরে ওর পিঠের লোম লেগেছিল।

হয়তো বিষের পরিমাণ বেশি হয়েছিল বলে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি, এবং হয়তো পাহাড়ের গায়ে গুহায় কোনো দ্বিতীয় রন্ধ্র ছিল বলে ও পালাতে পেরেছে। আমার চিতাটার সঙ্গে পরিচয় মাত্র কয়েক মাস। তবুও আমি আর অবাক হলাম না যে গাড়োয়ালের লোকরা—যারা চিতাটার সঙ্গে দীর্ঘ আট বছর ধরে নিবিড় এবং অন্তরঙ্গভাবে বসবাস করেছে—ওকে—জন্তু বা প্রেতাত্মা—অলৌকিক ক্ষমতার মালিক বলে বিশেষিত করেছে। তাদের বদ্ধ ধারণা ছিল যে আগুন ছাড়া এই দুষ্ট আত্মাকে তাড়ানো যাবে না।



১৮

অল্পের জন্য

যে খবর প্রতিটি জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা খুব দ্রুত ছড়ায়। গত দশ দিন ধরে গাড়োয়ালের সবাই শুনেছিল যে নরখাদকটার উপর বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং আমাদের আশা যে তাকে গুহায় বন্দী করা হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক যে সবাই ঝুঁকি নিতে শুরু করেছিল। প্রত্যক্ষরূপে বোঝাই গেল যে চিতাটা বিষের প্রতিক্রিয়া থেকে সেরে উঠে গুহা থেকে পালাবার রাস্তা খুঁজে নেয়, এবং প্রথম যে জন ঝুঁকি নিচ্ছিল তাকে ধরে।

আমি সকাল থাকতেই গুহা থেকে ফিরেছিলাম। সারা দিনটা পড়ে ছিল। প্রাতরাশ খেয়ে ইবটসনের নির্ভরযোগ্য ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাইফেল হাতে নিয়ে সেই গ্রামের দিকে চললাম। যেখান থেকে মহিলাটির নিহত হওয়ার খবর এসেছে।

তীর্থপথ ধরে জোরে ঘোড়া ছোটালাম। পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা কোনাকুনি রাস্তা ধরলাম। সেটা এক মাইল দূরে গিয়ে—গ্রামের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। সে সন্ধিস্থলে ধস্তাধস্তির চিহ্ন এবং অনেকখানি জমাট রক্ত।

গ্রামপ্রধান এবং নিহত মহিলাটির আত্মীয়রা আমাদের জন্য গ্রামে অপেক্ষা করছিল। যেখানে বাড়ির দরজা বন্ধ করে বেরোবার সময় চিতাটা মহিলাটিকে ধরে, তারা আমাদের সে জায়গাটা দেখাল। এখান থেকে চিতাটা মহিলাটিকে চিত অবস্থায় একশো গজ টেনে দুই রাস্তার মোড় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়।

সেখানে ও মহিলাটিকে ছেড়ে দেয়। তারপর খুব ধস্তাধস্তির পর তাকে মেরে ফেলে।

যখন মহিলাটিকে মাটিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এবং যখন সে চিতাটার বিরুদ্ধে প্রাণ বাঁচাবার জন্য লড়াই করছিল, তখন গ্রামের লোকেরা ওর চিৎকার শুনতে পায়, কিন্তু ভয়ে কোনো সাহায্য করে নি।

মহিলাটি মারা যাওয়ার পরে চিতাটা তাকে তুলে একটা পতিত জমি পার হয়। সেটার পর একটা একশো গজ চওড়া খাদ ছিল। সেটা পার হয়ে লাশটাকে নিয়ে যায় আরো দুশো গজ পাহাড়ের উপরে। মাটিতে কোনো টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ পড়ে নি, কিন্তু রক্তের দাগ অনুসরণ করা সহজই ছিল। সেই দাগ আমাদের নিয়ে যায় একটি সমতল জমিতে। জমিটা চার ফুট চওড়া এবং কুড়ি ফুট লম্বা। এই সরু জমিটার উপর দিকে লম্বাভাবে অবস্থিত আট ফুট উঁচু ঢিপি ছিল। তার উপরে একটা খর্বকায় মেডলার গাছ।

নিচের দিকে যেখানে পাহাড়টা হঠাৎ উৎরাই হয়ে যায়, একটি বুনো গোলাপের ঝোপ, ঝোপটা উপরদিকে বেড়ে মেডলার গাছটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়েছে। ওই ঢিপি এবং গোলাপের ঝোপটার মাঝখানে, ঢিপির উপরে মাথা রেখে পড়ে আছে শিকারটা। গায়ে একটুকু আবরণ নেই। নগ্ন দেহের উপরে ঝরে পড়েছে সাদা গোলাপের পাপড়ি—একজন পাকা চুল বৃদ্ধা, বয়স সত্তর।

এই মর্মান্তিক হত্যার জন্য চিতাটাকে জীবন দিতে হবে। আমরা যুদ্ধের পরামর্শ করার পর ইবটসন বাড়তি ঘোড়াটাকে নিয়ে রুদ্রপ্রয়াগে ফিরে গেল আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে। আমি রাইফেল নিয়ে বেরোলাম। দিনের আলোয় নরখাদকের মুখোমুখি হওয়া যায় কি না, সেই চেষ্টায়।

অঞ্চলের এই এলাকাটা আমার কাছে নতুন। আমার প্রথম কাজ হবে জায়গাটা পরিদর্শন করা। আমি গ্রাম থেকেই লক্ষ করেছি যে পাহাড়টা খাদ থেকে চড়াইয়ে চার-পাঁচ হাজার ফুট উঠে গেছে। পাহাড়ের দু' হাজার ফুট উপরে ওক এবং পাইনের ঘন জঙ্গল, তার নিচে আধ মাইল চওড়া ছোট ঘাস ভর্তি খোলা জমি। ঘাস-জমির নিচে ঝোপ-জঙ্গল।

ঘাস এবং ঝোপ-জঙ্গলের পাশ দিয়ে আমি পাহাড়ের অন্য দিকে চলে গেলাম। আমার সামনে দেখলাম একটা খাত। আধ মাইল নিচে গিয়ে তীর্থ-পথে মিশেছে। বহুদিন আগে মাটি ধসে খাতটা সৃষ্টি হয়েছিল। খাতটার উপর দিকটা একশো গজ চওড়া, এবং নিচের দিকটা যেখানে তীর্থপথে মিশেছে, তিনশো গজ চওড়া। তার পরে ফাঁকা মাঠ।

খাতের মাটি ভেজা, ভেজা মাটির উপর গজিয়েছে কিছু বড়-বড় গাছ, গাছের নিচে ঘন ঝোপ-জঙ্গল। খাতের উপর দিকে ঝুলে পড়া পাথরের উৎরাই, উচ্চতায় কুড়ি থেকে চল্লিশ ফুট বাড়ছে ও কমছে—দৈর্ঘ্য একশো গজ। এই

উৎরাইয়ের মাঝামাঝি কয়েক ফুট চওড়া ফাটল, সেখান দিয়ে ছোট একটি জল-ধারা কুলকুল করে নামছে। পাথরগুলির উপর ঝোপ-জঙ্গলের সরু ফালি। তার উপরে আবার খোলা ঘাসের মাঠ।

আমি খুব সাবধানে জায়গাটা পরিদর্শন করলাম। চিতাটা নিশ্চয় খাতের কোথাও লুকিয়ে ছিল। আমি চাই নি যে ও আগে থেকে আমার উপস্থিতি টের পায়। তাতে আমার সুবিধা হবে না। এবার আমার জানা দরকার মোটামুটি কোন্ জায়গায় চিতাটা লুকিয়ে আছে। তার জন্যে আমাকে মড়ির কাছে ফিরে যেতে হল।

গ্রামেই আমাদের বলা হয়েছিল যে মহিলাটি নিহত হওয়ার কিছু পরে আলো হয়। তাকে মেরে, চারশো গজ টেনে নিয়ে, কিছুটা অংশ খেতে চিতাটার নিশ্চয় কিছুটা সময় লেগেছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে যেখানে মড়ি-টাকে লুকনো হয়েছে সেই জায়গা ছাড়তে সকাল হয়ে গিয়েছিল। যে পাহাড়ে মড়িটা পড়ে ছিল, সেটা গ্রামটার পুরো দৃষ্টিসীমার মধ্যে। এই সময়ে গ্রামে নিশ্চয় লোক-চলাচল শুরু হয়েছিল। চিতাটা তাহলে মড়ি ছেড়ে নিশ্চয় গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়েছিল। মাটি খুব শক্ত থাকাতে ওর থাবার ছাপ দেখা যাচ্ছিল না। এই দুটি অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমি ওকে অনুমানিত পথ ধরে অনুসরণ করতে লাগলাম।

আমি আধ মাইল দূরে গ্রামের দৃষ্টির বাইরে খাতের কাছাকাছি এসে পড়লাম। দেখে তৃপ্ত হলাম যে আমি চিতাটার পায়ে-পায়ে চলে এসেছি। একটা ঝোপের, বাতাসের উল্টো দিকে আলগা মাটি ছিল। তার উপরে ওর থাবার ছাপ দেখে বোঝা গেল যে এই জায়গাটা ছেড়ে সে পাথরের উৎরাই-এর পঞ্চাশ গজ নিচ থেকে খাতটায় ঢুকেছে।

যেখানে চিতাটা লুকিয়েছিল, আমি সেখানে আধ ঘণ্টা শুয়ে আমার সামনের গাছ এবং ঝোপ-জঙ্গল ভর্তি ছোট এলাকাটা লক্ষ করলাম। আশা করছিলাম যে চিতাটা একটু নড়েচড়ে ও কোথায় আছে, নিশানা দেখাবে।

কয়েক মিনিট নিরীক্ষণ করার পর ঝরা পাতার উপর শব্দ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটু পরে দুটি সিমিটার ব্যাবলার পাখিকে দেখা গেল, খুব অধ্যবসায় সহকারে পাতা উলটে পোকা খুঁজছে। মাংসাশী জীব সম্বন্ধে এই পাখিরা জঙ্গলের ভিতরে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংবাদবাহক। আমার আশা হল যে পরে এই দুজনকে দিয়ে চিতাটার অবস্থানের খোঁজ বার করব।

কোনো নড়াচড়া দেখা যাচ্ছিল না, এবং কোনো শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছিল না যে চিতাটা খাতের মধ্যে আছে কি না। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ও আছে, এবং এক উপায়ে যখন গুলি করা সম্ভব হল না, আমি অন্য উপায় অবলম্বন করলাম।

চিতাটা খোলা জায়গায় না-এলে দুটি রাস্তা ধরে পালাতে পারে। একটি হল উৎরাই ধরে তীর্থপথের দিকে, এবং অন্যটা চড়াই ধরে উপরে। ওকে পাহাড় বেয়ে নামালে আমার সুবিধা হবে না। কিন্তু যদি ওকে পাহাড়ের উপর দিকে ধাইয়ে নেওয়া যায়, ও নিশ্চয় সেই পাথরের ফাটলটার দিকে গিয়ে উৎরাই-এর উপরের ঝোপগুলিতে আশ্রয় নেবে। এই সময়ে ওকে গুলি করার পর্যাপ্ত সুযোগ পাওয়া যাবে।

যেখানে চিতাটি থাকতে পারে তার একটু নিচ দিয়ে আমি খাতটায় ঢুকলাম। আমি আঁকা-বাঁকাভাবে খুব আস্তে হাঁটতে লাগলাম। অল্প-অল্প করে কয়েক ফুট উঠতে লাগলাম। এখনো ফাটলটার উপর চোখ রাখার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কেননা ব্যাবলার দুটি ঠিক তার কয়েক ফুট নিচে ছিল, এবং চিতাটা নড়লে ওরাই আমাকে সতর্ক করবে।

আমি আঁকা-বাঁকাভাবে খাত দিয়ে হেঁটে প্রায় চল্লিশ গজ উঠেছি। তখন আমি ফাটল থেকে দশ গজ নিচে একটু বাঁয়ে। হঠাৎ ব্যাবলার দুটি ভয় পেয়ে ডানা মেলল। ছোট একটা ওক গাছের ডালে বসে উত্তেজিত হয়ে লাফাতে লাগল এবং ওদের স্পষ্ট এবং জোরাল ডাক ডাকতে লাগল, যে ডাক পাহাড়ী অঞ্চলে আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। আমি দ্রুত গুলি চালাবার জন্য রাইফেলটা ধরলাম। এক মিনিট নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আবার আস্তে-আস্তে সামনে এগোলাম।

এখানে জমিটা ভেজা এবং পিচ্ছিল। আমি ফাটলের উপর চোখ নিবদ্ধ করে দু-পা এগোতেই আমার রবার-সোলের জুতো ভেজা-মাটিতে পিছলে গেল। আমি টাল সামলাতে-সামলাতে চিতাটা এক লাফে ফাটলে উঠে গেল। উপরের ঝোপ থেকে এক রাশ কালিগি ফেজেন্ট আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

আমার দ্বিতীয় উদ্যমও নিষ্ফল হল। আমার পক্ষে চিতাটাকে আবার তার আদি অবস্থানে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ। কিন্তু তাতে আমার কোনো লাভ হবে না। কেননা, উপর থেকে দেখতে গেলে, পাথরের ফাটলটা একদম কাছে না—আসলে দেখা যায় না, এবং সেই জায়গায় আমি পেঁছবার আগেই চিতাটা খাত দিয়ে অনেক দূর নেমে যাবে।

আমার এবং ইবটসনের, খাদের খোলা জায়গায় দেখা হওয়ার কথা দুপুর দুটোয়। ও তার একটু আগে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ফিরল—সঙ্গে বেশ কিছু লোক, ও যা আনতে গিয়েছিল বহন করে আনছে। এর মধ্যে ছিল খাবার, পানীয়—তার মানে চা—আমাদের পুরনো সঙ্গী পেট্রোম্যাক্স। যদি দরকার পড়ে এবার ওটাকে আমি বয়ে বেড়াব। দুটো অতিরিক্ত রাইফেল, গুলি-বারুদ, আমার মাছ ধরার ছিপ, বেশি পরিমাণে সায়ানাইড, এবং জাঁতিকল।

খাদের মধ্যে একটি স্বচ্ছ নদীর ধারে বসে আমরা দিনের আহার খেলাম। চা পর্ব শেষ করে আবার মড়িটার কাছে ফিরে গেলাম।

এবার আমি মড়িটার অবস্থান সম্বন্ধে বলব। আপনারা তাহলে আমাদের গতিবিধি এবং পরবর্তী ঘটনাগুলি বুঝতে পারবেন।

চার ফুট চওড়া ও কুড়ি ফুট লম্বা সমতল ভূমিটার খাদের দিকের পাঁচ ফুটের কাছাকাছি মড়িটা পড়ে ছিল। এই ভূমিখণ্ডটার উপর দিকটা উঁচু ঢিপিদ্বারা সুরক্ষিত। নিচের দিকে ছিল ভীষণ উৎরাই এবং ছড়ানো গোলাপের ঝোপ। ঢিপির উপরের খর্বকায় মেডলার গাছটা মাচানের ভার বইবার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। সেই কারণে আমরা ঠিক করলাম যে বন্দুক, বিষ ও জাঁতি-কলের উপর নির্ভর করব। এই সিদ্ধান্তে আসার পর আমরা যোগাড়যন্ত্র করতে লাগলাম।

প্রথমে মড়িটায় বিষ প্রয়োগ করলাম। সময়ের অভাবে চিতাটা এর অল্প অংশ খেয়েছিল। আশা ছিল যে এবার ও যথেষ্ট পরিমাণে আহার করে নিজেকে বিষিয়ে তুলবে। চিতাটা যে-জায়গায় যে-ভাবে দাঁড়িয়ে খেতে পারে, আমি সে-ভাবে সেই জায়গায় দাঁড়ালাম। আমার ওপর চোখ রেখে, ইবটসন ওর .২৬৫ ম্যানলিকার—যেটার ঘোড়া খুব হালকা এবং আমার .৪৫০ হাই-ভেলসিটি রাই-ফেল দুটোকে দুটো ডালের সঙ্গে বাঁধল। আমরা যে-দিক দিয়ে মড়ির কাছে যাব, ডাল দুটো সেই দিকে।

চিতাটা যে-কোনো দিক থেকে মড়ির দিকে আসতে পারে। কোথাও কোনো অনতিক্রম্য বাধা ছিল না। অবশ্য আমি ওকে যেখানে দেখেছিলাম, সেখান থেকে ওর আসার স্বাভাবিক রাস্তা হল পনের ফুট মত সমতল জমি ধরে। আমরা এই সমতল জমিটাতেই বড় জাঁতিকলটা পুঁতলাম। পোঁতার আগে জমি থেকে প্রতিটি শুকনো পাতা, ছোট-ছোট কাঠ-কুটো, ঘাস তুলে ফেললাম।

আমরা এবার পর্যাপ্ত মাপের এক গর্ত খুঁড়লাম—লম্বা, চওড়া এবং গভীর। খুঁড়ে-তোলা মাটি দূরে নিয়ে গেলাম। গর্তে কলটা বসিয়ে স্প্রিং-এ চাপ দিয়ে কলের চোয়াল দুটি ফাঁক করলাম। কলে একটা প্লেট আছে যেটা ট্রিগারের কাজ করে। সেটাকে যতটা সম্ভব খুব সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করলাম।

কলটাকে এবার সবুজ পাতা দিয়ে ঢাকা হল, তার উপর দেওয়া হল মাটি শুকনো পাতা, কাঠ-কুটো, ঘাস—ঠিক যেভাবে আগে ছিল। কলটা এত ভাল-ভাবে পোঁতা হল যে আমরা, যারা কলটা পেতেছিলাম, ওটার সঠিক অবস্থান খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

এবার আমার মাছ ধরার সুতোর কাঠিম বার করা হল। শক্ত রেশমের সুতোর একদিকটা বাঁধা হল একটা রাইফেলের ঘোড়ায়, বাঁটে জড়িয়ে মড়িটার

দশ ফুটের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে দ্বিতীয় রাই-ফেলটার বাঁটে জড়িয়ে ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা হল। এবার সুতোটাকে কাটা হল—আমার বেশ দুঃখ হল। সুতোটা নতুন এবং ভাল ছিল—একটা দিক বাঁধা হল মহিলাটির কোমরে। তার ভিতর দিয়ে সুতোটা চালিয়ে ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা সুতোগুলিকে টেনে শক্ত গিঁট দেওয়া হল। দ্বিতীয় বারের জন্য, সুতোটাকে আবারও কাটা হল।

আমরা শেষ বারের মত নিজেদের হাতের কাজটা দেখলাম—বেশ ভালই মনে হল। এবার খেয়াল হল যে চিতাটা যদি ঘুরে এসে আমাদের দিক থেকে মড়িটার দিকে যায়, তাহলে ও সম্ভবত বন্দুক এবং ফাঁদ এড়িয়ে যেতে পারে। সেটা বন্ধ করার জন্য আমরা গ্রাম থেকে একটা শাবল আনতে বললাম।

ইতিমধ্যে আমরা কিছুদূর থেকে পাঁচটা কাঁটাঝোপ কেটে নিলাম। সমতল জমিতে আমাদের দিকটায় শাবল দিয়ে এক ফুট গভীর পাঁচটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ঝোপগুলি পুঁতলাম। চারি পাশের মাটি পা দিয়ে ঠুকে দিলাম, যাতে ঝোপগুলি শক্ত এবং স্বাভাবিক দেখায়, যেন ওগুলি পাহাড়ের গায়েই গজিয়েছে। এবার আমাদের প্রত্যয় হল যে ইঁদুরের চেয়ে বড় কোনো জন্তু কোনো-না-কোনো রূপে মৃত্যুকে এড়িয়ে মড়িটার কাছে এসে কোনো অংশ খেতে পারবে না। রাইফেলদুটির সেফটি-ক্যাচ খুলে দিয়ে গ্রামে ফিরে এলাম।

গ্রাম থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, যেখানে আমরা এসে জমাট রক্ত দেখেছিলাম তার কাছে, একটা ডালপালা ছড়ানো আমগাছ ছিল। গ্রাম থেকে পাটাতন এনে এই গাছে মাচান বানালাম। তার উপরে দিলাম সুগন্ধি খড়। ওর উপরে রাত কাটানোই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে চিতাটা একবার ফাঁদে পড়লে ওকে শেষ করতে হবে।

আমরা যখন মাচানে উঠলাম তখন প্রায় সূর্যাস্ত। মাচানটা বেশ লম্বা এবং চওড়া ছিল যাতে আমরা পাশাপাশি লম্বা হয়ে শুতে পারি। মাচান থেকে খাদের ওপাশের মড়িটার দূরত্ব দুশো গজ, এবং মাচান থেকে মড়িটা একশো ফুট উঁচু জমিতে।

ইবটসনের ভয় ছিল যে ওর রাইফেলে লাগান টেলিস্কোপিক-সাইট দিয়ে ওর লক্ষ নির্ভুল হবে না। সেই কারণে ও খাপ থেকে একজোড়া শর্ট ফিল্ড-গ্লাস বার করল আর আমি আমার .২৭৫ রাইফেলে গুলি ভরলাম। আমরা ঠিক করলাম যে চিতাটার যে রাস্তা দিয়ে আসার কথা, সেই জায়গাটার উপর ইবটসন লক্ষ রাখবে আর আমি পুরো পাহাড়টার উপরই ব্যাপকভাবে নজর রাখব। যদি চিতাটাকে দেখা যায় আমি গুলি করবার ঝুঁকি নেব। যদিও গুলি করতে হবে আমার রাইফেলের শেষ পাল্লায়, এবং সেটা হল তিনশো গজ।

ইবটসন ঝিমোচ্ছিল। আমি ধূমপান করতে-করতে দেখলাম পশ্চিমের পাহাড়ের ছায়া আমাদের সামনের পাহাড়ে গুটি-গুটি উঠছে। যখন অস্তমান সূর্যের রশ্মিতে পাহাড়ের চূড়া রক্তিম হয়ে উঠল, ইবটসন জাগল। তুলে নিল ফিল্ড-গ্লাস, আমি তুললাম রাইফেল। কেননা, যে-সময়ে চিতাটা দেখা দেবে বলে আমরা আশায় আছি, সে-সময় এসে গেছে। দিনের আলোর তখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি ছিল এবং সেই সময়টুকু আমাদের মাচান থেকে পাহাড়ের যে বিস্তীর্ণ এলাকাটা দেখা যায়, তার প্রতিটি ফুট ভাল করে নিরীক্ষণ করলাম—আমি এক জোড়া চোখ দিয়ে, যেমন চোখ মাত্র কয়েকজন ভাগ্যক্রমে পায়, আর ইবটসন দেখল ওর ফিল্ড-গ্লাস দিয়ে। কোনো জন্তু বা পাখির সাড়াশব্দ পেলাম না।

যখন আর গুলি চালাবার মত যথেষ্ট আলো ছিল না, আমি রাইফেল নামালাম। একটু পরে ইবটসন ফিল্ড-গ্লাস খাপে ভরে ফেলল। চিতাটাকে মারার একটা সুযোগ নষ্ট হল, কিন্তু তখনও তিনটি সুযোগ বাকি, কাজেই আমরা অযথা নিরুদ্যম হলাম না।

অন্ধকার হওয়ার একটু পরে বৃষ্টি শুরু হল। আমি ইবটসনকে ফিস-ফিস করে বললাম যে এতে আমাদের কাজ পণ্ড হতে পারে, কেননা বৃষ্টির জলের বাড়তি ওজনে সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত কলের চোয়াল বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কিংবা মাছ ধরার সুতো জলে ভিজে কুঁকড়ে গিয়ে রাইফেলের হাল্কা ঘোড়ায় টান মেরে গুলি চালিয়ে দেবে।

একটু পরে ইবটসন আমার কাছে সময় জানতে চাইল। তখনও বৃষ্টি পড়ে চলেছে। আমার কব্জিতে লুমিনাস ঘড়ি ছিল। আমি ওকে বললাম যে সময় হয়েছে পৌনে আটটা, তখন মড়িটার দিক থেকে পরপর হিংস্র এবং ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল—চিতাটা, রুদ্রপ্রয়াগের সুপ্রসিদ্ধ নরখাদক চিতাটা অবশেষে ফাঁদে পড়েছে।

ইবটসন এক লাফে মাচান থেকে নামল, আমি ডাল ধরে নামলাম। নামতে গিয়ে যে কারুর হাত-পা ভাঙে নি সেটা আমাদের সৌভাগ্য। পেট্রোম্যাক্সটা কাছের একটা মিষ্টি আলুর খেতে লুকানো ছিল। ইবটসন ওটা ধরাতে-ধরাতে আমি আমার ভয় এবং অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে উক্তি করলাম। ইবটসন তার যোগ্য পাল্টা জবাব দিল।

"তুমি একটা বাজে দুঃখবাদী। প্রথমে ভাবলে যে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য ফাঁদটা বন্ধ হয়ে যাবে, আমার রাইফেল থেকে গুলি ছুটে যাবে। এখন ভাবছ যে চিতাটা কোনো আওয়াজ করছে না মানে ওটা ফাঁদ থেকে পালিয়েছে।"

আমি ঠিক তাই ভাবছিলাম এবং ভয় পাচ্ছিলাম। আরেকবার যখন একটা চিতাকে ফাঁদে ফেলেছিলাম, সেটা ক্রমাগত গর্জন এবং চিৎকার করেছিল। কিন্তু

এই চিতাটা, ওই প্রথম ক্রোধপূর্ণ গর্জনের পর, যে-গর্জন শুনে আমরা মাচান থেকে হুড়মুড় করে নামলাম, নিস্তব্ধ হয়ে আছে। অতি অমঙ্গুলে এই স্তব্ধতা।

ইবটসন সব রকমের লণ্ঠন জ্বালাতে দক্ষ। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে পেট্রোম্যাক্সটাকে জ্বালিয়ে পাম্প করে ফেলল। আমাদের সব দ্বিধা দূরে সরিয়ে শক্ত জমির উপর দিয়ে ছুটলাম। ইবটসনও এখন এই দীর্ঘ নৈঃশব্দ্যে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। আমরা কিছুটা ঘুরে উপর থেকে মড়িটার দিকে গেলাম, উদ্দেশ্য হল সুতোগুলি এবং সম্ভবত ক্রুদ্ধ চিতাকে এড়িয়ে যাওয়া।

উঁচু ঢিপি থেকে নিচের জমির গর্তটা দেখলাম, কিন্তু কলটার কোনো চিহ্ন নেই। আমাদের আশা আবার চড়ে উঠল, কিন্তু পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোয় এবার কলটা দেখা গেল--চোয়াল বন্ধ এবং শূন্য। পাহাড়ের ঢালে দশ গজ নিচে পড়ে আছে। মড়িটা আর ঢিপিতে মাথা দিয়ে পড়ে নেই। ক্ষণিক দৃষ্টিপাতে দেখা গেল যে ওটার বেশ কিছুটা অংশ খাওয়া হয়েছে।

আমরা আমগাছে ফিরে গিয়ে মাচানে উঠলাম--আমাদের মন এত তিক্ত-বিরক্ত, যে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আর আমাদের জেগে থাকার প্রয়োজন ছিল না। কাজেই নিজেদের উপর খড় চাপা দিয়ে—আমাদের বিছানা ছিল না, এবং রাত্রিটা খুব ঠাণ্ডা ছিল—আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

পর দিন ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই আমগাছের কাছে আগুন জেবলে জল গরম করা হল। আমরা বেশ কয়েক কাপ চা খেয়ে আগুন পোয়ালাম। তারপর পাটোয়ারী, ইবটসন, আমার এবং গ্রামের কিছু লোক নিয়ে মড়িটার দিকে গেলাম।

আমি বলছি যে আমরা দুজন ছাড়া আমাদের সঙ্গে পাটোয়ারী এবং আরো কয়েকজন লোক ছিল। কেননা আমি যদি একলা থাকতাম তাহলে এবারে আপনাদের যা বলব সেটা বলতে ইতস্তত করতাম।

পিশাচ কি পশু, বৃদ্ধার হত্যাকারী যদি উপস্থিত থেকে আমাদের রাতের যোগাড়যন্ত্র দেখত তাহলেও এটা বোঝা মুশকিল, যে ও কি করে এক অন্ধকার, বর্ষণমুখর রাতে কোনো-না-কোনো উপায়ে ধরা-পড়া কিংবা মৃত্যু থেকে বাঁচল। যদিও হাল্কা বৃষ্টিই পড়েছিল, তাতেই মাটি নরম হয়েছিল, এবং ওর গত রাত্রের প্রতিটি গতিবিধি মনে-মনে পুনর্গঠন করে বুঝতে পারলাম।

যেদিক থেকে আশা করেছিলাম, সেদিক থেকেই চিতাটা এসেছিল। সমতল জমিটার কাছে এসে ও ওটার নিচে দিয়ে ঘুরে আসে। তার পর যেদিকে আমরা শক্ত করে কাঁটাঝোপ পুঁতেছিলাম, সেদিক থেকে মড়িটার দিকে আসে। ও তিনটি ঝোপ টেনে তুলে নিজের যাওয়ার মত জায়গা করে নেয়। তার পর মড়িটাকে ধরে ফুটখানেক রাইফেলগুলির দিকে টেনে নেয়।

তাতে সুতোগুলি ঢিলা হয়ে যায়। তারপর সে খেতে শুরু করে। খাওয়ার সময় সে মহিলাটির কোমরে জড়ানো সুতোটাকে ছোঁয় নি। আমরা মড়ির মাথা এবং ঘাড়ে বিষ দেওয়ার কথা ভাবি নি। এগুলিকে সে প্রথমে খায়, তার পর, অতি সাবধানে, বিষ-দেওয়া জায়গাগুলির মাঝখান থেকে বাকি সব অংশটুকু খেয়ে ফেলে।

ক্ষুধা নিবৃত্তির পর চিতাটা মড়ি ছেড়ে বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নিতে যায়। এই সময় আমি যে ব্যাপারে ভয়টা করেছিলাম সেটাই হয়। খুব সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত কলে বৃষ্টির জল পড়ে বাড়তি ওজন সৃষ্টি করে। তাতে প্লেটটা, মানে ট্রিগারটা, নেমে গিয়ে স্প্রিংগুলিকে ছেড়ে দেয়। ঠিক এই সময়ে চিতাটা কলটাকে ডিঙিয়ে যাচ্ছিল। বড় চোয়াল দুটি ওর পিছনের পায়ের হাঁটুতে ধরে। এটাই হল সবচেয়ে আফসোসের বিষয়।

যে-লোকরা রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কলটা নিয়ে আসছিল তারা ওটাকে মাটিতে ফেলে দিতে একটা তিন ইঞ্চি লম্বা দাঁত ভেঙে যায়। চিতাটার হাঁটু, কলের চোয়ালের যে-জায়গায় চেপ্‌টে যায়, ঠিক সেখানকার দাঁতটাই ভাঙা ছিল। সেই জন্য সেইখানে ফাঁক ছিল, বাকি জায়গায় দাঁতগুলি ঠিক সারি-সারি।

এই দাঁতটা ঠিক থাকলে চিতাটা কল থেকে বেরোতে পারত না। কেননা ওর পায়ে সেটা শক্ত করেই চেপে ধরেছিল, যাতে করে ও আশি পাউন্ড ওজনের কলটাকে গর্ত থেকে তুলতে পারে। যে-গর্তে আমরা কলটা পুঁতেছিলাম, তার পর সেটাকে পাহাড়ের গা দিয়ে দশ গজ নিচে টেনে নিয়ে যায়। এখন চিতাটার বদলে আছে শুধু এক গোছা লোম আর ছোট এক টুকরো চামড়া, যেটা পরে--অনেক পরে--ঠিক জায়গায় জোড়া লাগাবার তৃপ্তি হয়েছিল।

চিতাটার গতিবিধি যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন, যে পশু আট বছর ধরে নরখাদক হয়েছে, তার কাছ থেকে এই ধরনেরই গতিবিধি আশা করা যায়। খোলা জমি এড়িয়ে চলা, মড়ির কাছে গা-ঢাকা দিয়ে যাওয়া, রক্তের দাগের উপর বসানো কাঁটাঝোপ সরানো, আহারের জন্য সুবিধাজনক জায়গায় মড়ি টেনে নেওয়া, বিষ দেওয়া অংশগুলি বাদ দেওয়া—সায়ানাইডের পূর্ব-অভিজ্ঞতা ওর ছিল, ওটার বড় তীব্র গন্ধ—এগুলি ওর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

ফাঁদ ভাঙার যে ব্যাখ্যাটা আমি দিলাম, সেটা সঠিক বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বৃষ্টির জলের বাড়তি ওজনের জন্য চোয়াল বন্ধ হওয়ার সময়েই যে চিতাটা ওটা ডিঙিয়ে যাচ্ছিল, সেটা ঘটনার সমাপতন।

আমরা ফাঁদটা খুলে ফেলে অপেক্ষা করলাম যাতে করে আত্মীয়রা ওই বৃদ্ধার দেহাবশেষ শবদাহের জন্য নিয়ে যেতে পারে। তারপর আমরা দুজনে হেঁটে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে চললাম, আমাদের লোকরা পরে আসবে এই কথা রইল।

রাত্রে কোনো সময়ে চিতাটা আমগাছের কাছে এসেছিল। যেখানে জমাট রক্ত পড়েছিল এবং যে রক্ত বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়, সেখানে আমরা ওর থাবার ছাপ দেখতে পাই। আমরা থাবার ছাপ অনুসরণ করে দেখলাম, যে সেগুলি তীর্থপথে নেমে গেছে। তারপর রাস্তা ধরে চার মাইল দূরে ইন্‌সপেক্‌শন বাংলোর গেট পর্যন্ত গেছে। গেটের একটা থামের তলার মাটি আঁচড়ে চিতাটা আরো এক মাইল দূরে আমার পুরনো বন্ধু মালবাহকের ক্যাম্পে গিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ওর একটা ছাগলকে মারে।

পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলে আপনাদের মধ্যে যাঁরা শিকারার্থে রাইফেল হাতে নিয়েছেন, তাঁদের বলার প্রয়োজন নেই যে এতগুলি অকৃতকার্যতা এবং নৈরাশ্য আমাকে দমাতে পারে নি, বরং আমার সংকল্প আরো জোরাল হল যে আমি কাজ চালিয়ে যাব, যতদিন না সেই শুভ দিন কিংবা রাত আসে যেদিন বিষ এবং ফাঁদ পরিত্যাগ করে আমি আমার রাইফেল, যেমনভাবে উচিত, তেমনি করেই ব্যবহার করার সুযোগ পাব। নরখাদকের দেহ সঠিক এবং অব্যর্থভাবে গুলিবিদ্ধ করব।





১৭

সতর্কতার শিক্ষা

কিছু শিকারী ভাবেন, যে তাঁরা অলক্ষুণে বলেই বড় জানোয়ার শিকারে ব্যর্থ হন। আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই।

শিকারী নিজে আশাবাদী, বা নিরাশাবাদী যাই হন না কেন, তিনি যে-জন্তুকে গুলি করবার, কিংবা তার ছবি তুলবার জন্য অপেক্ষা করে আছেন, শিকারীর চিন্তাধারা কোনোমতেই তার গতিবিধিকে প্রভাবিত করতে পারে না।

আমরা ভুলে যাই, যে বন্য প্রাণীদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি, বিশেষ যে-প্রাণীরা খাদ্য-সংগ্রহ এবং আত্মরক্ষার জন্যে এই ইন্দ্রিয়গুলির উপর নির্ভর করে—সভ্য মানুষের তুলনায় অতি উঁচু স্তরের। এত উঁচু যে আমরা সম্ভাব্য শিকারে কিছু দেখতে বা শুনতে পাচ্ছি না বলে, তারাও আমাদের চলাফেরার আওয়াজ পাচ্ছে না, চলাফেরা দেখতে পাচ্ছে না, এ অনুমানের কোনো ন্যায্য কারণই নেই।

বন্য প্রাণীর বুদ্ধি বিষয়ে ভুল ধারণাপোষণ, এবং কোনো শব্দ, বা নড়াচড়া না করে প্রয়োজনীয় সময়টুকু বসে থাকায় ব্যর্থতাই হল জানোয়ার শিকারে সকল ব্যর্থতার কারণ। মাংসাশী পশুর সঠিক শ্রবণ-ক্ষমতা. এদের সঠিক কারো দেখা পেতে হলে কত যে সতর্ক হতে হয়, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে আমার একটি অধুনা অভিজ্ঞতার কথা বলি।

মার্চ মাসের একটি দিন ; মাটিতে শুকনো পাতার গালচের উপর প্রতিটি মরা পাতা ঝরে পড়ার শব্দ পাওয়া যায়, মাটিতে-খুঁটে-খাওয়া ছোট-ছোট পাখিদের প্রতিটি নড়াচড়া বুঝতে পারা যায়। অনেক দিন ধরে একটা বাঘের ছবি তোলার চেষ্টা করেছি। সেটা যেদিকে শুয়ে আছে বলে আন্দাজ করেছি সেদিকে একদল হনুমানকে চালিয়ে দিয়ে খুব ঘন ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে বাঘটার সঠিক অবস্থিতি টের পেয়ে গিয়েছি। বাঘটা থেকে সত্তর গজ দূরে একটা ফাঁকা জমি। পঞ্চাশ গজ লম্বা ত্রিশ গজ চওড়া জমিটার পাশে, বাঘের বিপরীত দিকে একটা বড় গাছ—ঘন লতায় একেবারে মাথা পর্যন্ত ঢাকা। মাটি থেকে কুড়ি ফুট উপরে গাছটা দুটো ডালে ভাগ হয়ে উঠেছে। আমি জানতাম বেলা শেষ হয়ে এলে বাঘটা জমিটা পার হবে, কারণ জমিটা তার ও তার শিকার-করা সম্বরটার মাঝ-বরাবর। সম্বরটাকে সেদিনই সকালে দেখতে পেয়েছি। মড়ির কাছাকাছি কোথাও দিনের বেলাটা শুয়ে কাটানোর মত উপযুক্ত আড়াল না থাকায় বাঘটা সরে গিয়েছে ঐ ঘন জঙ্গলটার ভেতর, সেখানে হনুমানগুলোই আমাকে তার সন্ধান পাইয়ে দিয়েছে।

পায়ে হেঁটে বাঘ বা চিতা শিকার করা বা তার ছবি তোলার জন্যে জন্তুটার সঠিক অবস্থিতি জানা প্রায়ই প্রয়োজন হয়, তা সেটা কোনো আহত প্রাণীকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যেই হ'ক অথবা ফোটো তোলার জন্যেই হ'ক। তার প্রকৃষ্টতম উপায় হচ্ছে জীবজন্তু বা পাখিদের সাহায্য নেওয়া। খানিকটা ধৈর্য এবং তাদের অভ্যাস সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকলে বিশেষ একটা প্রাণী বা পাখিকে ইচ্ছেমত দিকে চালানো কঠিন কাজ নয়। এ কাজে পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে লাল জংলি মোরগ, ময়ূর এবং সাদা-মাথা ছাতারে পাখি, আর জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে কাকার ও হনুমান।

যে বাঘটার কথা আমি বলছি সেটা আহতও নয়, এবং ঝোপের ভেতর ঢুকে সেটাকে আমি নিজেও সহজেই খুঁজে বের করতে পারতাম। কিন্তু তা করতে গেলে তার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটত এবং ফলে আমার নিজের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হত। ঝোপের মধ্যে বাঘটা নজরে পড়লে তাদের প্রতিক্রিয়া কী হবে জানা থাকায় তাদের সাহায্য নিয়ে বাঘটাকে বিরক্ত না করেই যা জানার তা জেনে গেলাম।

খুব সন্তর্পণে ঐ গাছটার কাছে এগোলাম। লতাগাছটার উপরের দিকের পাতাগুলো বাঘটার নজরে আসতে পারে ভেবে গাছের দুই ডালের মাঝখান-টায় চড়ে বসলাম—নিখুঁতভাবে লুকিয়ে আরামে বসার মত জায়গা বটে সেটা। ১৬ মিলিমিটার সিনে-ক্যামেরাটা বের করে সামনের পাতাগুলোর মধ্যে ছবি তোলার মত একটা ফাঁক তৈরি করলাম। নিঃশব্দে এসব শেষ করে আমি বসে

থাকলাম চুপচাপ। আমার সামনে দৃশ্যমান রইল ফাঁকা জমিটা আর তার ঠিক পিছনের জঙ্গলটা।

ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর একজোড়া ব্রোঞ্জ-পাখা ঘুঘু জঙ্গলটা থেকে উঠে নিচু ঝোপগুলোর উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল এবং এক কি দু-মিনিট পরে, আমার একটু কাছে, ছোট একঝাঁক পাহাড়ী পিপিট মাটি ছেড়ে উঠে একটা ন্যাড়া গাছের ডালগুলোর ভিতর দিয়ে একেবারে উপরে উঠে উড়ে চলে গেল।

এই দু-জাতের পাখির কোনোটারই বিপদজ্ঞাপক কোনো ডাক নেই, কিন্তু তাদের আচরণ দেখে আমি বুঝলাম যে বাঘটা উঠে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের সন্ত্রস্ত করে দিয়েছে। কয়েক মিনিট ধরে আমি আস্তে-আস্তে বাঁ থেকে ডাইনে আমার নজর ফেরাতে লাগলাম ; আমার সামনে যতটা জায়গা দেখা যায় তার প্রতি ফুট জায়গা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম। এই সময় আমার দৃষ্টি গিয়ে ঠিক আমার সামনের দিকে ফাঁকা জমিটার কিনার থেকে দশ ফুট দূরে এক কি দুই বর্গ-ইঞ্চি মাপের একটা ছোট জিনিসের উপর আবদ্ধ হল।

খানিকক্ষণ ঐ নিশ্চল জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থেকে ডানদিকে দৃষ্টি-সীমার মধ্যকার ঝোপগুলো নজর করে গিয়ে আবার সেই সাদা জিনিসটার উপর নজর ফিরিয়ে আনলাম।

এইবার আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম যে ঐ জিনিসটাকে মিনিট-খানেক বা মিনিট-দুয়েক আগে প্রথম যেখানটায় দেখেছি সেখানে সেটা আর নেই এবং সেটা বাঘের মুখের একটা সাদা দাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। বোঝা যাচ্ছে যে যদিও আমার পায়ে পাতলা রবারের জুতো ছিল এবং জ্ঞানত কোনো শব্দই আমি করি নি, তবুও আমি যখন গাছটার দিকে এগোচ্ছিলাম বা গাছে উঠে-ছিলাম তখন বাঘটা সে শব্দ শুনতে পেয়েছে।

যখন তার মড়ির কাছে যাওয়ার সময় হয়েছে তখন সে শুকনো পাতার উপর দিয়ে সত্তর গজ দূরের ঐ সন্দেহজনক শব্দটার উৎপত্তি-স্থলের দিকে ভাল করে নজর করে দেখেছে। নড়াচড়া না করে আধ ঘণ্টা ধরে শুয়ে থাকার পর সে উঠে দাঁড়াল, আড়মোড়া ভাঙল, হাই তুলল, তারপর ভয়ের কিছু নেই দেখে বেরিয়ে পড়ল খোলা জমিটার উপর। সেখানে দাঁড়িয়ে সে মাথাটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘোরাল। তারপর জমিটা পার হয়ে সোজা আমার গাছটার তলা দিয়ে মড়ির কাছে চলে গেল।

জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর সময় মাংসাশী প্রাণী শিকারের জন্যে তৈরি মাচান-গুলো প্রায়ই আমার চোখে পড়ে এবং যখন দেখতে পাই মাচান বানানোর জন্যে কাছে-পিঠে চারাগাছগুলো কাটা হয়েছে, দেখার সুবিধের জন্যে ডালপালা ছাঁটা হয়েছে আর আশে-পাশে পড়ে রয়েছে টুকরো-টাকরা ফালতু জিনিস, তখন চিন্তা

করি এসব কাজের সময়ে কী পরিমাণ কথাবার্তা ও হৈ-হল্লা চলত। সেইজন্যে আমি বিস্মিত হই না, যখন কেউ বলে যে চিতা বা বাঘের জন্যে কয়েক-শো-বার বসে থেকেও তারা কোনোবার একটিরও দেখা পায় নি এবং এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী করে মন্দ ভাগ্যকেই।

এ পর্যন্ত যে নরখাদকটাকে মারতে পারি নি তার কারণ এ নয় যে আমরা এমন কিছু করেছি, যা করা উচিত ছিল না। অথবা এমন কিছু করি নি, যা করা উচিত ছিল। এর জন্যে একমাত্র দোষ দেওয়া যায় ভাগ্যকে। দুর্ভাগ্য—টর্চ-লাইটটা সময়-মত এসে পৌঁছল না। ইবটসনের দু-পায়েই টান ধরল। চিতাটা পরিমাণের অতিরিক্ত সায়ানাইড খেয়ে ফেলল। এবং সর্বশেষ, বাহুকটা জাঁতি-কলটা ফেলে দিয়ে, যে-দাঁতটা সবচেয়ে দরকারী সেটাই ভেঙে ফেলল।

সুতরাং আমরা চিতাটাকে তার সত্তর-বছর-বয়স্ক শিকারের মড়িতে আনতে ব্যর্থ হওয়ার পর ইবটসন যখন পাউরি ফিরে গেল, আমার আশা তখনো পুরো-মাত্রায়, কেননা চিতাটাকে গুলি করার সম্ভাবনাটা রুদ্রপ্রয়াগে আসার প্রথম দিনের মতই রয়েছে, বরং এখন আমি প্রাণীটার ক্ষমতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ায় সে সম্ভাবনা আগের চেয়েও বেশিই হয়েছে।

একটা জিনিস আমার খুব অস্বস্তি ও মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেটা হচ্ছে নরখাদকটাকে নদীর একটা পাড়ে আটকে রাখা। যেভাবেই দেখি না কেন, অলকনন্দার বাঁ-পাড়ের লোকরাই শুধু চিতাটার আক্রমণের আওতা-ভুক্ত হয়ে থাকবে আর ডান-পাড়ের লোকদের সে-রকম কোনো আক্রমণের ঝুঁকি থাকবে না, এটা মোটেই উচিত মনে হচ্ছিল না।

আমরা আসার দু-দিন আগে যে-ছেলেটি মারা পড়েছে তাকে নিয়ে মোট তিনজন ইদানীং বাঁ-পাড়ে প্রাণ হারিয়েছে, এবং আরো অনেকেরও সেই দশা হতে পারে। তবু, পুলদুটো খুলে দিয়ে চিতাটাকে নদীর ডান-পাড়ে চলে যেতে দিলে আমার অসুবিধেগুলো শতগুণ বেড়ে যাবে, এবং তাতে সামগ্রিকভাবে গাড়োয়ালেরও কোনো উপকার হবে না। কারণ নদীর ডান-দিকের মানুষগুলোর জীবনও বাঁ-দিকের মানুষদের জীবনের মতই সমান মূল্যবান।

সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি পুলদুটো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তই করলাম। নদীর বাঁ-পাড়ের বহু সহস্র মানুষদের আমি আমার শ্রদ্ধা জানাই এ-জন্যে যে, পুল বন্ধ রাখার অর্থ ভয়ঙ্কর নরখাদকটার কার্যকলাপগুলো তাদের এলাকার ভিতরই গন্ডীবদ্ধ করে রাখা। একথা জেনেও তবু যে ক-মাস পুলগুলো আমি বন্ধ করে রেখেছিলাম, তার মধ্যে একবারও তারা বাধাগুলো অপসারণের চেষ্টা করে নি, বা আমাকে তা করতে অনুরোধ করে নি।

পুলদুটো বন্ধ রাখা সাব্যস্ত করে আমি গ্রামবাসীদের তাদের বিপদ সম্বন্ধে

সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলাম, নিজেও যতটা সময় পেলাম আর পায়ে হেঁটে যতটা সম্ভব, বিভিন্ন গ্রামে বলে বেড়ালাম। গ্রামে বা পথে যত লোকের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের একজনকেও চিতাটাকে তাদের এলাকায় গন্ডীবদ্ধ রাখার জন্যে একটিবারও অসন্তোষ প্রকাশ করে নি, এবং যেখানেই গিয়েছি আতিথ্য আপ্যায়ন পেয়েছি এবং শুভেচ্ছা কুড়িয়েছি। কেউ জানে না কে নরখাদকটার পরবর্তী শিকার হয়ে পড়তে পারে, তবু এমনই সব স্ত্রী ও পুরুষের কাছ থেকেই এই আশ্বাস পেয়ে প্রচুর উৎসাহ বোধ করেছি। চিতাটা গতকাল মারা পড়ে নি তাতে আফসোসের কিছু নেই, কারণ সেটা নিশ্চয়ই আজ নয় তো আগামী কাল মারা পড়বে।





২০

বুনো শুয়োরের পিছনে

বুড়ো পশুপালক আগের দিন সন্ধ্যায় কাঁটা-বেড়া-ঘেরা আস্তানাটায় এসে পেঁছেছিল। হরিদ্বারের বাজার থেকে লবণ আর গুড় নিয়ে সে বদ্রীনাথের ওপারের গ্রামগুলোর দিকে যাচ্ছিল, তার ভেড়া আর ছাগলগুলোর পিঠে পুরো বোঝা। লম্বা পথ হেঁটে আস্তানাটায় এসে পেঁছতে খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল, বেড়ার দুর্বল অংশগুলো মেরামত করে নেওয়ারও সময় আর ছিল না।

ফলে কয়েকটা ছাগল বেড়ার ফাঁক দিয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার ভিতর একটা ভোর রাতের দিকে রাস্তার ধারেই চিতাটার হাতে মারা পড়ে। কুকুরগুলোর ডাকে বুড়োর ঘুম ভেঙে যায়, এবং দিনের আলো ফুটলে সে দেখে যে রাস্তার কাছে মরে পড়ে আছে তার সবচেয়ে সেরা ছাগলটি। প্রায় শেটল্যান্ড পনি-র মত বড় ইস্পাত-রঙা সেই সুন্দর প্রাণীটাকে চিতাটা অনর্থক মেরে রেখে গেছে।

নরখাদকটার আগের রাতের আচরণ লক্ষ করলেই বোঝা যায়, নরখাদক হয়ে পড়লে এবং বহু বছর যাবৎ মানুষের সান্নিধ্যে থাকলে চিতাদের স্বভাবের কতটা পরিবর্তন ঘটে।

যুক্তিসঙ্গতভাবেই এটা ধরে নেওয়া যায় যে কলে আটক পড়ে নরখাদকটা প্রচন্ড ধাক্কা ও ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছে। ভারি কলটা টেনে দশ গজ দূরে নিয়ে যাওয়া ও তার ক্রুদ্ধ গর্জনের ধাঁচ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সবাই আশা

করবে, কল থেকে মুক্ত হওয়ামাত্রই সে সোজা লোকালয় থেকে যতটা সম্ভব দূরে একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম নেবে এবং কয়েক দিনের মধ্যে আর ক্ষুধার্ত হবে না। কিন্তু তা দূরে থাক, সে ছিল মড়ির কাছাকাছি, এবং আমাদের নিরীক্ষণ করতে এসেছিল।

সৌভাগ্যবশত ইবটসন সতর্কতা হিসেবে মাচানটার চারদিকটা তারের জাল দিয়ে ঘিরে নিয়েছিল, কারণ নরখাদক চিতা অপেক্ষমান শিকারীকে হত্যা করেছে এমন ঘটনা বিরল নয়। মধ্যপ্রদেশে একটা নরখাদক চিতা আছে, সেটা বিভিন্ন সময়ে চারজন ভারতীয় শিকারীকে মেরে খেয়েছে। শেষ যখন এই প্রাণীটার কথা শুনেছি ততদিনে সে নরহত্যা করেছে চল্লিশটি। তার সম্ভাব্য নিধনকারীদের খেয়ে ফেলার এই অভ্যাসের ফলে সে মানুষের সঙ্গে মাঝে-মাঝে বন্য ও গৃহপালিত জন্তু দিয়ে মুখ বদলিয়ে অব্যাহত শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল।

আমগাছটার কাছে আসার পর আমাদের নরখাদকটি গেঁয়ো পথের সংযোগস্থল পর্যন্ত চলে যায়। এখানেই আমরা জমাট রক্ত দেখেছিলাম। এখান থেকে ডান-দিকে মোড় নিয়ে পায়ে-চলা পথ ধরে মাইলখানেক সে গিয়েছে, তারপর তীর্থপথটা ধরে আরও চার মাইল গিয়ে তার উপদ্রুত এলাকার সবচেয়ে ঘন-বসতিপূর্ণ অংশে প্রবেশ করেছে। রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে সে বাজারের প্রধান রাস্তা ধরে গিয়েছে আর আধমাইল পরে ইন্‌সপেক্‌শন বাংলোর গেটের কাছে মাটি আঁচড়িয়েছে। আগের রাতের বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়ে থাকায় চিতাটার থাবার ছাপ ফুটে রয়েছে স্পষ্ট। তা থেকে বোঝা গেল যে জাঁতিকলে পড়ে তার কোনো পায়ে তেমন আঘাত লাগে নি।

প্রাতরাশের পর গেটের কাছ থেকে থাবার ছাপ অনুসরণ করে আমি পশুপালকের আস্তানা পর্যন্ত গেলাম। আস্তানা থেকে একশো গজ দূরে রাস্তার একটা বাঁক থেকেই চিতাটা বেড়া থেকে বেরিয়ে-পড়া ছাগলগুলো দেখতে পায় এবং রাস্তার বাইরের কিনারা থেকে ভিতরের কিনারে সরে এসে পাহাড়ের ধার দিয়ে গুঁড়ি মেরে ছাগলগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। তারপর ইস্পাত-রঙা ছাগলটাকে মেরে তার রক্তটাও পান করেই সে রাস্তায় ফিরে যায়।

কাঁটা-বেড়ার মধ্যে শক্ত খুঁটিতে ভারি শিকল দিয়ে বাঁধা পশুপালকের দুটো পাল-প্রহরী কুকুর মরা ছাগলটা ও নিখুঁতভাবে সাজানো মালের বস্তাগুলো পাহারা দিচ্ছিল। আমাদের পাহাড়গুলোয় ব্যবহৃত এই বৃহদাকার কালো রঙের তেজীয়ান কুকুরগুলো গ্রেট ব্রিটেন বা য়ুরোপের পাল-প্রহরী কুকুর বলতে যা বোঝায়, ঠিক তেমন নথিভুক্ত কুলীন নয়। চলার সময় তারা কাছে-কাছে থাকে, কিন্তু তাদের কাজ শুরু হয় তাঁবু ফেলার পর থেকে, আর তারা তা অত্যন্ত নিপুণভাবেই সমাধা করে। রাতে তারা বন্য প্রাণীর হাত থেকে তাঁবুকে রক্ষা করে। এদের দুটোয় মিলে একটা চিতা মারার ঘটনাও

আমি জানি। দিনের বেলায় মনিব যখন পশু চরাতে যায়, এরা বাইরের প্রবেশকারীদের হাত থেকে তাঁবুকে বাঁচায়। এমন একটা ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যাতে একটি লোক তাঁবু থেকে একটা বস্তা সরানোর চেষ্টা করছিল, অমনি ক-টা কুকুর মিলে তাকে মেরেই ফেলেছে।

ছাগলটাকে মেরে চিতাটা আবার যেখানে রাস্তায় ফিরে এসেছে সেখান থেকে তার থাবার ছাপ অনুসরণ করে গোলাবরাইয়ের ভিতর দিয়ে আরও এক মাইল পর্যন্ত গেলাম। সেখানে একটা গভীর খাত রাস্তাটাকে চিরে চলে গিয়েছে। আমগাছ থেকে খাত পর্যন্ত যে দূরত্ব চিতাটা অতিক্রম করেছে সেটা প্রায় আট মাইল। মড়ি থেকে দূরে, এই দীর্ঘ এবং উদ্দেশ্যহীন হেঁটে যাওয়াই এমন একটা ব্যাপার, যা সাধারণ চিতা কোনো পরিস্থিতিতেই করবে না। তা ছাড়া খিদে না পেলে ছাগলও মারবে না।

খাতটা ছাড়িয়ে সিকি মাইল দূরে রাস্তার ধারে একটা পাথরের ওপর বসে বুড়ো পশুপালক পশমের সুতো কাটছিল, আর তার পশুর পালটা চরছিল খোলা পাহাড়ের গায়ে। তর্কলি আর পশমগুলো আলখাল্লার পকেটে রেখে, একটা সিগারেট নিয়ে সে জিগ্যেস করল, আমি তার তাঁবুর পাশ দিয়ে এসেছি কি না।

যখন বললাম, এসেছি, এবং দুষ্ট আত্মাটা কি করেছে তাও দেখেছি। সেই-সঙ্গে যোগ করলাম, পরের বার হরিদ্বারে গিয়ে যেন সে তার কুকুরদুটো উটওয়ালাদের কাছে বেচে দেয় কারণ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ওগুলোর সাহস নেই—তখন সে অনেকটা সম্মতিসূচকভাবে মাথাটা নাড়ল।

তারপর বলল, 'সাহেব, আমরা বুড়োরাও অনেক সময় ভুল করি। আর আজ রাত্রে যেমন আমার সেরা ছাগলটা হারিয়ে ভুগছি তেমনি তার ফলও ভুগি। আমার কুকুরগুল্যের বাঘের মত সাহস, গাড়োয়ালের সেরা কুকুর এরা। তুমি যে এদের উটওয়ালাদের কাছে বেচে দিতে বললে, এটা এদের পক্ষে অপমান। আমার তাঁবু তো দেখেছ, রাস্তার একেবারে ধারেই। রাতে হঠাৎ কোনো লোক যদি রাস্তা দিয়ে এসে পড়ে তবে কুকুরগুলো তার ক্ষতি করতে পারে ভেবেই আমি ও-দুটোকে ছাড়া না রেখে বেড়ার বাইরে বেঁধে রেখেছিলাম। তার ফল তুমি দেখেছ। কিন্তু কুকুরের দোষ দিয়ো না সাহেব, আমার ছাগল বাঁচানোর চেষ্টায় ওদের গলায় শিকল বসে গিয়েছে গভীর হয়ে, তার ঘা সেরে উঠতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।'

যখন আমরা এ-সব কথা বলছি তখন গঙ্গার অনেক দূরে পাহাড়ের চূড়ায় একটা প্রাণীকে দেখা গেল। রং ও আকার দেখে প্রথমে আমি ওটাকে একটা হিমালয়ের ভাল্লুক বলে মনে করেছিলাম, কিন্তু যখন ওটা পাহাড় থেকে নদীর দিকে নামতে লাগল তখন বুঝতে পারলাম ওটা প্রকাণ্ড একটা বুনো শুয়োর।

শুয়োরটার পিছনে তাড়া করে আসছিল একপাল গেঁয়ো কুকুর, তাদের পিছনে এক দঙ্গল ছেলে-বুড়ো। তাদের সবার হাতেই নানা আকারের লাঠিসোঁটা।

সবশেষে আসছিল বন্দুকধারী একটি মানুষ। লোকটি পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছেই বন্দুকটা তুলল। এক-ঝলক ধোঁয়া দেখতে পেলাম এবং একটু পরেই গাদা বন্দুকের একটা শব্দ। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে জীবন্ত প্রাণী বলতে ছিল শুধু ছেলেবুড়োর দলটা, কিন্তু সেই দৌড় প্রতিযোগিতা থেকে কেউ পড়ে গেল না দেখে বোঝা গেল যে শিকারীর গুলি লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে।

শুয়োরটার সামনে তখন লম্বা একটা ঘেসো ঢাল। ইতস্তত এক-আধটা ঝোপ-জঙ্গলের একটা বেষ্টনী একেবারে নদীর ধার পর্যন্ত নেমে গিয়েছে।

ভাঙাচোরা জমিটার ওপর কুকুরগুলো শুয়োরটাকে প্রায় ধরে ফেলল। সবগুলো প্রায় একসঙ্গেই ঢুকে পড়ল ঝোপ-জঙ্গলের ভিতরে। পরমুহূর্তেই, শুধু আগের হালকা রঙের কুকুরটা ছাড়া সব-কটা কুকুর পরিত্রাহি ছুটে ঝোপ-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। লোকজনরা এসে পৌঁছলে মনে হল তারা কুকুরগুলোকে আবার জঙ্গলে ঢোকানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু শুয়োর তার দাঁত দিয়ে কী করতে পারে সদ্য-সদ্য তার নমুনা দেখে কুকুরগুলো এখন অনিচ্ছুক। এই সময় বন্দুকধারী লোকটি এসে পৌঁছবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাকে ঘিরে ধরল সবাই।

আমরা উঁচু পাহাড়ে বসে আছি, মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। ওপারের পাহাড়ে যে দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে তা একটি নির্বাক ছবি, কারণ জলের গর্জনে সব শব্দ মুছে গিয়েছে, শব্দের মধ্যে শুনতে পাচ্ছি শুধু গাদা বন্দুকের ভোঁতা আওয়াজটা।

বন্দুকধারী লোকটিও দেখা গেল জঙ্গলে প্রবেশ করতে কুকুরগুলোর মতই অনিচ্ছুক। অচিরেই সে সবার সঙ্গ ত্যাগ করে একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসে পড়ল, ভাবখানা এই, 'আমার যেটুকু করার করেছি, এখন তোমরা বোঝ গিয়ে।' কুকুরগুলোর কয়েকটাকে প্রহার করা সত্ত্বেও তারা শুয়োরটার সম্মুখীন হতে কিছুতেই রাজী হল না ; এই উভয়-সংকটে পড়ে প্রথমে ছেলে-গুলো, পরে বয়স্করাও ঝোপের মধ্যে পাথর ছুঁড়তে শুরু করল।

এইসব ব্যাপার যখন চলেছে তখন আমরা শুয়োরটাকে জঙ্গলের নিচের দিক থেকে একটুকরো বালি-জমির ওপর বেরিয়ে আসতে দেখলাম। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে সেটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড, আরও কয়েক পা এগোল, থামল আবার, তারপর একটু দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর মধ্যে। বুনো জাতের শুয়োররা দুর্দান্ত সাঁতারু, এবং সাঁতারের সময় খুরের ঘায়ে তাদের গলা আদৌ কেটে যায় না, যদিও চলতি ধারণা তাই।

নদীতে স্রোত ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু আমাদের বুনো শুয়োরদের মত বীরের কলিজা খুব কম জানোয়ারেরই আছে। শেষবার শুয়োরটাকে যখন দেখলাম তখন স্রোতের টানে সে প্রায় সিকি মাইল দূরে চলে গিয়েছে, কিন্তু সাঁতার কাটছে অমিতবিক্রমে, আর এপারের দিকেই আসছে। সন্দেহ নেই যে সে নিরাপদেই পাড়ে পৌঁছেছিল।

'শুয়োরটা যখন বালিটার উপর দাঁড়িয়েছিল তখন ওটা কি তোমার রাইফেলের পাল্লার মধ্যে ছিল সাহেব?' পশুপালক প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' আমি উত্তর দিলাম, 'শুয়োরটা পাল্লার মধ্যেই ছিল। কিন্তু প্রাণের দায়ে যে শুয়োর পালাচ্ছে, তাকে গুলি করার জন্যে আমি রাইফেল নিয়ে গাড়োয়ালে আসি নি। গুলি করতে এসেছি, তুমি যাকে দুষ্ট আত্মা বলে ভাব আর আসলে আমি যেটাকে চিতা বলে জানি।'

'তোমার যা অভিরুচি,' সে জবাব দিল,—'তুমি এখন চলে যাবে, এবং আর কখনো হয়তো আমাদের মধ্যে দেখা হবে না। আমার আশীর্বাদ জানাচ্ছি তোমাকে। যথাসময়েই প্রমাণ হবে কার কথা ঠিক, তোমার না আমার।'

আমার দুঃখ, যে আর কোনোদিন বুড়োর সঙ্গে দেখা হয় নি। বুড়ো লোক ছিল চমৎকার—সম্রাটের মত গর্বিত, আর রোদ ঝলমলে দিনের মত সদাই হাসিখুশি। কেবল, তার সেরা ছাগলগুলো চিতাটার হাতে মারা না পড়লে, বা তার কুকুরের সাহস নিয়ে কেউ প্রশ্ন না তুললেই হল।





২১

পাইন গাছে রাতের পাহারা

পরের দিন ইবটসন পাউরি ফিরে গেল এবং তার পরের দিন সকালেই রুদ্রপ্রয়াগের পূর্বদিকের গ্রামগুলোয় ঘুরতে ঘুরতে নরখাদকটার থাবার ছাপ দেখতে পেলাম। থাবার ছাপটা ছিল একটা গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তায়। নরখাদকটা আগের রাতে গ্রামের যে বাড়ির দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করেছে সে-বাড়িতে একটি ছেলে প্রচন্ড কাশিতে ভুগছিল। থাবার ছাপ ধরে কয়েক মাইল চলার পর গিয়ে পৌঁছলাম একটা পাহাড়ের ঢালের উপর,—এখানেই কিছুদিন আগে ডাকিয়ে ছাগলটাকে বেঁধে আমি ইবটসন বসে ছিলাম। সেটা পরে চিতার হাতে মারা পড়ে।

তখনও খুব ভোর রয়েছে। এই বিস্তৃত ভাঙাচোরা জায়গাটার কোথাও হয়তো চিতাটাকে পাথরের উপর রোদ পোহাতে দেখতে পাব এই আশায়, অনেকটা এলাকা নজরে আসে এমন একটা পাথরের ওপর শুয়ে পড়লাম। আগের সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয়ে গেছে, ফলে চিতাটার থাবার ছাপ অনুসরণ করতে পেরেছি ; আর বাতাসের ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে গিয়ে আবহাওয়াটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি অব্যাহত ছিল এবং পাথরটা থেকে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৃশ্যাবলীর অন্যতম—পাহাড়গুলো ২৩০০০ ফুট উপরে

মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ঠিক নিচেই হল অলকনন্দার রূপসী উপত্যকা, রুপোলী ফিতের মত আঁকাবাঁকা নদীটা তার বুক চিরে বয়ে চলেছে।

নদীর ওপারের পাহাড়ে ছিটেফোঁটা কয়েকটি গ্রাম। কোনোটায় শুধু একটিমাত্র খড়ে-ছাওয়া কুঁড়ে, কোনোটায় সারিবন্ধ স্লেট পাথরের ছাদ-দেওয়া লম্বা লম্বা ঘর। এই সারিবন্ধ ঘরগুলো আসলে কিন্তু আলাদা বাড়ি, খরচ আর জায়গা বাঁচানোর জন্যেই গায়ে-গায়ে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে। কেননা এখানকার মানুষ গরিব, এবং গাড়োয়ালে চাষের উপযোগী প্রতিটি ফুট জমিই কৃষিকাজের জন্যে দরকার।

পাহাড়গুলোর পিছনে এবড়ো-খেবড়ো শিলারাশির সমারোহ, শীতে ও প্রাক্-বসন্তে সেখান দিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে নেমে আসে তুষার-ধস। শিলারাশির পিছনে ও ওপারে হল ঘন নীল আকাশের গায়ে দৃশ্যমান চিরন্তন তুষারের দেশ, ঠিক যেন সাদা কার্ডবোর্ড কেটে তৈরি। এর চেয়ে সুন্দর আর শান্তিপূর্ণ ছবি কল্পনা করাও কঠিন। কিন্তু তবুও, যখন আমার পিছনের এই সূর্য ঐ তুষার-পর্বতের অন্তরালে অস্ত যাবে তখন অসহ্য আতঙ্ক সামনের এই মেলে-ধরা সারাটা এলাকা গ্রাস করে নেবে। এ আতঙ্ক আজ দীর্ঘ আট বছর ধরে ছড়িয়ে আছে, আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া এর প্রকৃত রূপ কল্পনা করাও অসম্ভব।

ঘণ্টাখানেক পাথরটার উপর শুয়ে আছি, এই সময় পাহাড় দিয়ে দু-জন লোক বাজারে যাওয়ার পথে নেমে এল। আরো এক মাইল ওপরের এক গ্রামে তারা থাকে, সেখানে আগের দিন আমি গিয়েছিলাম। তারা বলল যে সূর্যোদয়ের খানিকটা আগে তারা এইদিকে একটা চিতাকে ডাকতে শুনেছে। ছাগল বেঁধে চিতাটাকে গুলি করার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা খানিকটা আলোচনা করলাম। তখন আমার নিজের কোনো ছাগল না থাকায় তারা তাদের গ্রাম থেকে একটা ছাগল আমাকে এনে দেবে বলল। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেইখানেই সূর্যাস্তের ঘণ্টা-দুই আগে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে কথা দিল।

লোকদুটো চলে গেলে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কোথায় বসা যায়। পাহাড়ের একদিকটায় একমাত্র গাছ হচ্ছে একটি নিঃসঙ্গ পাইন। যে-পথ দিয়ে লোকদুটো নেমে এসেছে তারই কাছাকাছি শৈলশিরাটার উপর গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। তার নিচ থেকে দ্বিতীয় একটা পথ বের হয়ে পাহাড়টার গা দিয়ে, যেখানে একটু আগে আমি চিতাটার সন্ধান করছিলাম, সেই ভাঙাচোরা জায়গাটার ওপর-কিনার ঘেঁষে চলে গিয়েছে। গাছটা থেকে দেখা যায় অনেকখানি

বিস্তৃত এলাকা, কিন্তু ওটাতে চড়া খুব কঠিন হবে, আড়ালও পাব সামান্যই। যাই হ'ক, এলাকার একমাত্র গাছ বলে ওটাতেই বসব ঠিক করলাম।

বিকেল চারটে নাগাদ যখন সেখানে ফিরে এলাম, দেখি লোকদুটো একটা ছাগল নিয়ে অপেক্ষা করছে। কোথায় বসব—তাদের এ প্রশ্নের জবাবে যখন পাইন গাছটার দিকে আঙুল দেখালাম তখন তারা হাসতে লাগল। বললে, দড়ির একটা মই ছাড়া ও গাছে ওঠা যাবে না, আর মই ছাড়া যদি উঠতেও পারি আর সারা রাত সেখানে কাটাই, তাহলেও নরখাদকটার হাত থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই থাকবে না আমার, কারণ এ গাছটা চিতাটার কাছে কোনো বাধা বলেই গণ্য হবে না।

গাড়োয়ালে দুজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ ছিল—তাদের মধ্যে একজন হল ইবটসন ; এদের ছোটবেলায় পাখির সংগ্রহের বাতিক ছিল এবং দু-জনেই গাছে চড়তে জানত। "পুল পার হওয়ার আগে সেটার কাছে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা"—এই প্রবাদটার কোনো যথাযথ হিন্দী নেই বলেই লোকদুটোর শেষ কথাগুলোর কোনো জবাব দিলাম না, শুধু আমার রাইফেলটা দেখিয়ে দিলাম।

পাইন গাছটায় চড়া খুব সহজসাধ্য হল না, কারণ কুড়ি ফুট পর্যন্ত গাছটায় কোনো ডালপালা নেই। কিন্তু সব-নিচের ডালটা পর্যন্ত পৌঁছনোর পর বাকিটা সহজ হল। লম্বা একটুকরো সুতো নিয়ে উঠেছিলাম, লোকদুটো তাতে আমার রাইফেলটা বেঁধে দিল। সেটা টেনে নিয়ে গাছের উপরে উঠে গেলাম—সেখানে প্রধান আড়াল হল পাইন পাতাগুলো।

ছাগলটা ভালই ডাকে বলে লোকদুটো আমায় আশ্বাস দিয়েছিল। গাছের বেরিয়ে-থাকা একটা শিকড়ে সেটাকে বেঁধে এবং পরদিন খুব সকালে সেখানে ফিরে আসবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা গ্রামের পথে ফিরে গেল। ছাগলটা লোকদুটোর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর গাছের নিচে ছোট-ছোট ঘাস ছিঁড়ে খেতে লাগল। সে-পর্যন্ত ছাগলটা একবারও না-ডাকলেও আমি চিন্তিত হই নি, কারণ আমি নিশ্চিত জানতাম যে একটু বাদেই সে নিঃসঙ্গ বোধ করতে শুরু করবে। তখনই এ সন্ধ্যায় তার যতটুকু করণীয় তা সে করবে। আলো থাকতে-থাকতেই যদি সে তা করে তবে চিতাটা ছাগলের ধারে-কাছে আসার অনেক আগেই আমি আমার উঁচু জায়গা থেকে চিতাটাকে মারতে পারব।

গাছটার ওপর যখন উঠে বসলাম তখন তুষার-পর্বতের ছায়াগুলো এসে অলকনন্দার উপর পড়েছে। ধীরে-ধীরে ছায়াগুলো পাহাড় বেয়ে উঠে এল, ছাড়িয়ে গেল আমাকে, শেষ পর্যন্ত শুধু পাহাড়ের চূড়াটা রাঙা আভায় রঞ্জিত হয়ে রইল। এই আভা নিভে যাওয়ার পর দীর্ঘ আলোর রেখা ফুটে বেরুল তুষার-পর্বত থেকে। সেখানে পড়ন্ত সূর্যের রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে একপ্রস্থ

মেঘের গায়ে ধরা পড়েছে। পাঠক জানেন যে সূর্যাস্ত দেখার চোখ খুব কম-সংখ্যক লোকেরই আছে, আর তারা সবাই মনে করে যে সারা পৃথিবীর মধ্যে তাদের এলাকার সূর্যাস্তই সবচেয়ে সুন্দর।

আমিও ব্যতিক্রম নই, কারণ আমিও মনে করি যে আমাদের সূর্যাস্তের তুলনা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এর সঙ্গে দ্বিতীয় হিসেবে তুলনা চলে একমাত্র উত্তর টাঙ্গানাইকার সূর্যাস্তের। সেখানে বায়ুমণ্ডলের কোনো বিশেষ গুণে তুষারমণ্ডিত কিলিম্যানজারো আর তার উপরের মেঘগুলো পড়ন্ত সূর্যের আলোয় গলানো সোনার মত জ্বলে ওঠে। আমাদের হিমালয়ের সূর্যাস্তের রঙ বেশির ভাগই লাল, গোলাপী বা সোনালী। সেদিন পাইন গাছের ওপর থেকে যেটা দেখেছিলাম সেটার গোলাপী-লাল, সাদা আলোর বর্শাগুলো, বর্শার ফলার মত তুষার-উপত্যকা থেকে গোলাপী মেঘ ভেদ করে বিস্তৃত হয়ে উপরের আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

অনেক মানুষের মত ছাগলটারও সূর্যাস্ত দেখার কোনো আগ্রহ ছিল না। নাগালের মধ্যেকার ঘাস-কুটি খাওয়া হয়ে গেলেই পা দিয়ে খানিকটা মাটি আঁচড়িয়ে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার হল সংকট! যে ছাগলটার ওপর চিতাটাকে ডেকে দেবে বলে ভরসা করেছিলাম সেটা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে, এবং শুধু ঘাস খাওয়ার প্রয়োজনে ছাড়া একবারও মুখ খোলে নি। এখন মনে হয় বেশ নিশ্চিন্ত আরামে, বোধহয় সারা রাতই ব্যাটা ঘুমোবে

এই মুহূর্তে গাছ থেকে নেমে বাংলোর দিকে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করার অর্থ হল নির্ঘাত আত্মহত্যা করতে যাওয়া। নরখাদকটাকে মারার জন্যে আমায় কিছু একটা করতেই হবে। মড়ির অভাবে সব জায়গাই আমার কাছে সমান, কাজেই স্থির করলাম যেখানে আছি সেখানেই থাকব, এবং নিজেই চিতাটাকে ডাকব।

আমাকে যদি কেউ জিগ্যেস করে বহু বছর ভারতবর্ষের জঙ্গলে-জঙ্গলে কাটিয়ে আমি কিসে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি, তাহলে বিনা দ্বিধায় বলব যে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি বনের বাসিন্দাদের ভাষা আর চালচলন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে। জঙ্গলের কোনো সার্বজনীন ভাষা নেই। প্রত্যেক প্রজাতির আলাদা-আলাদা ভাষা। যদিও শজারু, শকুন প্রভৃতির শব্দভাণ্ডার খুবই সীমাবদ্ধ—তবু প্রত্যেকে-প্রত্যেকের ভাষা বুঝতে পারে, একমাত্র ঝুঁটিওয়ালা তার-ল্যাজা ড্রোঙ্গো ছাড়া। মানুষের শব্দনালীর ক্ষমতা জঙ্গলের অন্য যে-কোনো প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশি। এই কারণেই মানুষের পক্ষে নানারকমের পাখি আর প্রাণীদের সঙ্গে সংকেত বিনিময় সম্ভব। জঙ্গলের প্রাণীদের ভাষা বোঝার ক্ষমতা শুধু নিজের আনন্দ-বর্ধনেই লাগে না, অনেক সময় ইচ্ছে করলে এটাকে বেশ কাজেও খাটানো যায়। একটা উদাহরণই যথেষ্ট হবে।

ইটনের এক প্রাক্তন শিক্ষক, লায়োনেল ফোর্টেস্ক এবং আমি প্রথম মহাযুদ্ধের অল্পদিন পরেই হিমালয়ে ফোটো তোলা ও মাছ ধরার সফরে বেরিয়ে ছিলাম। এক সন্ধ্যায় আমরা একটা বিরাট পাহাড়ের নিচে বনবিভাগের এক বাংলোয় গিয়ে উঠলাম,—এই পাহাড়ের ওপারের কাশ্মীর উপত্যকাটাই ছিল আমাদের লক্ষ্যস্থল। কঠিন পথে বেশ কিছুদিন ধরে হেঁটে আসছি, মাল-বাহকদের বিশ্রামের দরকার। কাজেই একটা দিন বাংলোটায় বিশ্রাম নেওয়া স্থির করলাম।

পরদিন ফোর্টেস্ক তার নোটবই খুলে লিখতে বসল, আর আমি পাহাড়টা ঘুরে দেখতে আর একটা কাশ্মীরী হরিণ শিকারের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লাম। কাশ্মীরের যেসব বন্ধুর শিকারের অভিজ্ঞতা আছে তাদের কাছে আগেই শুনে-ছিলাম যে অভিজ্ঞ শিকারী ছাড়া আর কারো পক্ষে এ জাতের হরিণ শিকার সম্ভব নয়। এ কথা বাংলোর চৌকিদারটিও বলল। সারাটা দিন আমার সামনে। প্রাতরাশের পর একাই বেরিয়ে পড়লাম। আমার কোনো ধারণা নেই যে এই লাল হরিণগুলো কত উঁচুতে থাকে বা কী ধরনের জায়গায় তাদের দেখা পাওয়া যেতে পারে। পাহাড়টা প্রায় ১২,০০০ ফুট উঁচু, এর উপর দিয়ে একটা গিরিপথ কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে। আমি ৮,০০০ ফুট ওঠার পরই একটা ঝড় নেমে এল।

মেঘের রঙ দেখেই বুঝতে পারলাম ঝড়ের সঙ্গে শিল পড়বে, তাই আশ্রয় হিসেবে একটা গাছের তলা বেছে নিলাম। শিলাঘাতে এবং তার অচ্ছেদ্য সংগী বজ্রপাতে আমি মানুষ ও পশু মারা যেতে দেখেছি। সুতরাং সুচলো-চুড়ো বড়-বড় দেওদার গাছগুলো বাদ দিয়ে গোল-মাথা ঘন-পাতাওয়ালা ছোট একটা গাছ বেছে নিলাম। ঝরা-পাতা ও দেওদার পাতা জড় করে আগুন জ্বাললাম। ঘণ্টাখানেক ধরে, মাথার ওপরে যতক্ষণ বাজের গর্জন ও চার-পাশে শিলাবৃষ্টি চলতে লাগল, আমি গাছতলায় আগুনের কাছে বেশ নিরাপদে বসে রইলাম।

শিলাবৃষ্টি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য দেখা দিল এবং আমি আমার আশ্রয় ছেড়ে রূপকথার রাজ্যে পা দিলাম। মাটিতে বিছানো শিলের টুকরো-গুলো থেকে লক্ষ-লক্ষ আলোর কণা বিচ্ছুরিত। তার সঙ্গে প্রতিটি ঘাস পাতাতেই উজ্জ্বল প্রতিফলন দেখা দিচ্ছিল। আরো দু-তিন হাজার ফুট উঠে কতগুলো পাথরের চাঁইয়ের কাছে পেঁছিলাম। তার নিচেই কতগুলো পাহাড়ী পপি। হিমালয়ের বুনো ফুলদের মধ্যে এই ফুলগুলোই সবচেয়ে সুন্দর। অনেকগুলোর ডাঁটি গেছে ভেঙে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, নিষ্কলঙ্ক সাদার ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা এই আসমানি-রঙ ফুলগুলোর দৃশ্য কোনোদিন ভোলবার নয়।

পাথরগুলো অত্যন্ত পিছল বলে এবং পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত ওঠার কোনো দরকার না থাকায়, উপরে না উঠে বাঁ-দিক পানে গেলাম। বিরাটকায় একটা দেওদার বনের ভিতর দিয়ে প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত গিয়ে একটা ঢালু ঘেসো জমির কাছে এসে পৌঁছলাম। ঘেসো জমিটা পাহাড়ের মাথা থেকে শুরু হয়ে কয়েক হাজার ফুট নিচেকার জঙ্গল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। গাছগুলোর ভিতর দিয়ে ঘেসো জমিটার দিকে আসতে-আসতে দেখলাম, অপর প্রান্তে একটা ঢিবির ওপর একটা জন্তু পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শিকারের বইয়ে বহু ওর ছবি দেখেছি. কাজেই বুঝতে পারলাম যে ওটা লাল কাশ্মীরী হরিণ, এবং মাথা তুলতেই দেখলাম হরিণটা মাদী।

ঘেসো জমিটার আমার দিকটায়, বনের কিনারা থেকে ত্রিশ গজ দূরে প্রায় চার ফুট উঁচু একটা পাথর। পাথরটা থেকে ঢিবিটার দূরত্ব আন্দাজ চল্লিশ গজ। হরিণটা যখন ঘাস খায় তখন এগিয়ে যাই, আর যখন মাথা তোলে তখন স্থির হয়ে থাকি। এই করে-করে গুঁড়ি মেরে পাথরটার আড়ালে গিয়ে পৌঁছলাম। প্রত্যেকবার মাথা তোলার সময় সে তার ডান-দিকে তাকিয়ে দেখছিল, তাতে বুঝতে পারলাম তার সঙ্গীরাও কাছাকাছিই আছে এবং কোন্ দিকে আছে। ঘাসের ওপর দিয়ে তার চোখ এড়িয়ে আর কাছে এগোনো অসম্ভব।

আবার বনের ভিতর ঢুকে উপর দিক থেকে এগোনো অবশ্য কঠিন নয়, কিন্তু তাতে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না। কারণ বাতাস বইছিল সেইদিক থেকেই। আর একটা বিকল্প পথ হচ্ছে বনে ঢুকে ঘেসো জমির নিচের দিক ঘুরে উপরে ওঠা, কিন্তু তাতে সময় লাগবে এবং খাড়া চড়াই ভাঙতে হবে। শেষ পর্যন্ত যেখানে আছি সেখানেই থাকা স্থির করলাম।

এই হরিণগুলোকে এই বনে প্রথম দেখছি, কাজেই চিতার ডাকে এদেরও চিতল বা সম্বরের মতই প্রতিক্রিয়া হয় কি না তা দেখব ঠিক করলাম। জানতাম ঐ পাহাড়ে অন্তত একটা চিতা আছেই, সেদিনই সকালে তার আঁচড়ানোর দাগ দেখতে পেয়েছি। একটা চোখ বাইরে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলাম, এবং যেই হরিণটা ঘাস খেতে শুরু করেছে অমনি চিতার ডাক ডেকে উঠলাম।

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা ঘুরে দাঁড়াল এবং সঙ্গীদের সতর্ক করার জন্যে সামনের পা দিয়ে মাটি ঠুকতে লাগল। সঙ্গীগুলোকে আমি দেখতে চাই, কিন্তু হরিণটা না ডাকা পর্যন্ত তারা স্থান-ত্যাগ করবে না, এবং চিতাকে না দেখা পর্যন্ত হরিণটাও ডাকবে না। আমার গায়ে ছিল রাইন রঙের একটা টুইড কোট। বাঁ-কাঁধের কয়েক ইঞ্চি পাথরটার বাইরে বের করে একটু উপর-নিচে নাড়লাম।

সঙ্গে-সঙ্গে এই নড়াচড়াটা তার চোখে পড়ল। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে এসে সে ডাকতে শুরু করল। মাটিতে খুর ঠুকে যে-বিপদ সম্বন্ধে সঙ্গীদের সে সতর্ক করে দিয়েছে সেই বিপদ দেখা গেছে, এখন তারা এসে তার সঙ্গে যোগ দিতে পারে। প্রথমেই একটা এক বছরের বাচ্চা শিল-বিছানো জমির ওপর দিয়ে পরিষ্কার পা ফেলে ফেলে মাদীটার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। তার পিছনে এল তিনটে পুরুষ-হরিণ এবং সবশেষে একটা বেশি বয়সের মাদী। সমস্ত দলটায় সবসুদ্ধ ছ'টি প্রাণী, তাদের এবার পঁয়ত্রিশ গজ দূরে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে।

মাদীটা তখনও ডেকে চলেছিল এবং অন্যগুলো তাদের কান কখনো খাড়া করে কখনো সামনে পিছনে হেলিয়ে শব্দ বা বাতাসের গতি বোঝার চেষ্টা করতে-করতে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমার পিছনের বনটার দিকে তাকাচ্ছিল। গলন্ত শিলের স্তূপের ওপর ভিজে অবস্থায় বসে থাকাটা আমার কাছে মোটেই আরামদায়ক বলে মনে হচ্ছিল না। ওভাবে জবুথবু হয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকলে হয়তো সর্দি লেগে যাবে। বহুবিখ্যাত কাশ্মীরী হরিণের প্রতিনিধিমূলক একটা দল আমি দেখলাম, একটা মাদী হরিণের ডাকও আমি শুনলাম। কিন্তু আরো একটা জিনিস আমার চাই—শুনতে চাই একটা পুরুষ-হরিণের ডাক। আবার কাঁধের কয়েক ইঞ্চি পাথরের বাইরে বের করে দিলাম, এবং প্রাণভরে শুনতে পেলাম পুরুষ, মাদী ও বাচ্চা হরিণের বিভিন্ন পর্দার গলার আওয়াজ।

শিকারের লাইসেন্স অনুযায়ী একটা পুরুষ-হরিণ শিকারের অনুমতি আমার ছিল, এবং খুব সম্ভবত একটা রেকর্ড সাইজেরই শিং আমার নাগালের মধ্যে এসে গেছে। কিন্তু যদিও সেদিন ক্যাম্পে মাংস দরকার, আর সকালে আমি হরিণের খোঁজেই বেরিয়েছিলাম, তবু সেই মুহূর্তে আমার মনে হল যে শিং-এর তেমন খুব জরুরী প্রয়োজন আমার নেই। যাই হ'ক, হরিণটার মাংসও খুব শক্ত, আর ছিবড়েওয়ালা হবে। সুতরাং রাইফেল না তুলে আমি নিজেই উঠে দাঁড়ালাম এবং কাশ্মীরের সবচেয়ে দুর্লভ হরিণের দলটা নিমেষে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এক মুহূর্ত পরে ঢিবিটার পিছনদিককার ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাদের বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

তৎক্ষণে আমার বাংলোর দিকে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে, ঠিক করলাম ঢালু ঘেসো জমিটা দিয়ে নেমে নিচেকার পাতলা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাব। ঢালটা খুব খাড়া নয়, লম্বা কদমে সহজেই দৌড়ে নামা যায়। শুধু নজর রাখা দরকার, প্রত্যেকটা ধাপে ঠিক জায়গায় পা পড়েছে কি না। খোলা জায়গাটার মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছেছি, ছ-শো গজের মত এই সময় ঢালটার বাঁ-হাতি

বনের ধারে একটা পাথরের উপর দাঁড়ানো সাদা একটা জিনিসের উপর চোখ পড়ল।

চকিত নজরে বুঝলাম যে সাদা জিনিসটা একটা ছাগল, খুব সম্ভব সেটা বনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। এক পক্ষ কাল হল আমাদের ভাগ্যে মাংস জোটে নি, এবং ফোর্টেস্ককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়েছিলাম যে আজ কিছু-না-কিছু নিয়ে ফিরবোই। এই হচ্ছে সুযোগ। ছাগলটা আমাকে দেখেছে এবং আমি যদি তার সন্দেহ কাটাতে পারি তবে খুব সম্ভব সে আমাকে তার কাছ দিয়ে চলে যেতে দেবে এবং সেই সুযোগে খপ্ করে তার পা চেপে ধরব।

সুতরাং দৌড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একটু বাঁ দিক কেটে নামতে নামতে ট্যারচা চোখে জন্তুটার উপর নজর রাখতে লাগলাম। ওটা যদি ঠিক ঐ জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে তবে ধরার জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা পাহাড় এলাকায় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে চ্যাপটা পাথরটার কিনারে প্রাণীটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা পাঁচ ফুট উঁচু। সোজাসুজি ওটার দিকে না তাকিয়ে আর গতিবেগ সমান রেখে পাথরটার পাশ দিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম এবং যাওয়ার সময় বাঁ হাত চালিয়ে ছোঁ মারলাম ওটার সামনের পায়ে। ফ্যাঁচ করে একটা শব্দ করে প্রাণীটা আমার হাত এড়িয়ে লাফিয়ে উঠল। পাথরটা সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে গিয়ে থেমে পিছন ফিরে তাকাতেই অবাক হয়ে দেখলাম যে যাকে আমি একটা সাদা ছাগল বলে মনে করেছিলাম আসলে সেটা একটা সাদা কস্তুরী হরিণ।

আমাদের মধ্যে মাত্র দশ ফুটের ব্যবধান, ছোট্ট তেজী প্রাণীটা নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আমার দিকে দৃপ্ত ভঙ্গীতে তাকিয়ে ফোঁস-ফোঁস করছে। ফিরে আমি হাঁটতে লাগলাম এবং পঞ্চাশ গজ নেমে যখন পিছন ফিরে তাকালাম, তখনও সেটা সেই পথটার উপরই দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত আমাকে ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছে বলে মেজাজটা খুব খুশি। কয়েক সপ্তাহ পরে যখন ঘটনাটা কাশ্মীরের গেম ওয়ার্ডেনকে বলি, তিনি ওটাকে না মারার জন্যে খুব দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ওটাকে ঠিক কোন জায়গায় দেখতে পেয়েছি সেটা জানার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু জায়গা সম্বন্ধে আমার স্মরণ-শক্তিও খুব কম, আর তার বর্ণনাতেও প্রায়ই ভুলত্রুটি থেকে যায়। তাই আমার মনে হয় যে ঐ বিশেষ সাদা কস্তুরী হরিণটা কোনো মিউজিয়ামেরই শোভা বর্ধন করছে না।

নিজের এলাকায় অন্যের নাক গলানো পুরুষ-চিতারা আদৌ পছন্দ করে না। এ কথা সত্য যে নরখাদকটার এলাকা ৫০০ বর্গ-মাইল জায়গা জুড়ে ছিল, কিন্তু তার মধ্যে আরো অনেকগুলো পুরুষ-চিতার থাকাটাই সম্ভব। তবু, এই বিশেষ এলাকাটায় কয়েক সপ্তাহ ধরে থাকার ফলে সে যুক্তিসঙ্গতভাবেই

এটাকে নিজের এলাকা বলে ধরে নিতে পারে। উপরন্তু মিলনের ঋতু সবেমাত্র শেষ হয়েছে এবং চিতাটা আমার ডাককে কোনো স্ত্রী-চিতার ডাক বলেও ভুল করতে পারে। সুতরাং বেশ অন্ধকার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর আমি আবার ডাক দিলাম, এবং আমাকে বিস্মিত করে সঙ্গে সঙ্গেই একটা চিতা আমার ঈষৎ ডান-দিকে আন্দাজ চারশো গজ নিচে থেকে তার জবাব দিল।

আমাদের মধ্যকার জমিটা বড় বড় পাথর ও বেঁটে বেঁটে কাঁটাগাছে ভর্তি, আর আমি জানতাম যে চিতাটা সোজা পথে আমার দিকে আসবে না। বরং খুব সম্ভবত ভাঙাচোরা জায়গাটা ঘুরে একটা ছোট শৈলশিরা ধরে আমার গাছটার কাছে আসবে। তার পরবর্তী ডাক শুনে বুঝলাম যে সেইভাবেই সে আসছে। পাঁচ মিনিট ধরে আবার তার ডাক শোনা গেল ঐ পথ থেকেই, পথটা আমার গাছের কাছ থেকে সরু হয়ে দুশো গজ দূরে পাহাড়ের গা দিয়ে চলে গেছে। চিতাটাকে দিকনির্দেশ দেবার জন্যে আমি এই ডাকটার জবাব দিলাম। তিন বা চার মিনিট পরে সে আবার প্রায় একশো গজ দূর থেকে ডাক দিল।

অন্ধকার রাত্রি, আমার টর্চ-লাইটটা রাইফেলের পাশে বাঁধা। তার বোতামের উপর বুড়ো আঙুল রেখে অপেক্ষা করছি। গাছের গোড়া থেকে পথটা সোজা পঞ্চাশ গজ গিয়ে একটা তীক্ষ্ন বাঁক নিয়েছে। পথটার কোন্ অংশে এবং কখন টর্চের আলো ফেলতে হবে তা জানা সম্ভব নয় বলে চিতাটা ছাগলটার ওপরে এসে না পড়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

ঠিক বাঁকটার ওধারে, ষাট গজ দূর থেকে চিতাটা আবার ডেকে উঠল। জবাব এল পাহাড়ের অনেক ওপরের আর-একটা চিতার কাছ থেকে। এ এক মহা ঝামেলা—যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি দুর্ভাগ্যজনক, কারণ চিতাটা আমার এত কাছে এসে পড়েছে যে ডাক দেওয়ার অবস্থা আর নেই, এবং সে আমার শেষ ডাক শুনেছে দুশো গজ দূর থেকে। কাজেই তার ধারণা হবে যে স্ত্রী-চিতাটা আরো উপরের দিকে উঠে গিয়ে সেখান থেকেই ডাকছে।

যাই হ'ক, ঐ রাস্তা ধরেই চিতাটার চলে আসার একটা সম্ভাবনা ছিল এবং এলে দরকার না থাকলেও মারতই ছাগলটাকে। কিন্তু বরাত খারাপ আমার, চিতাটা কোনাকুনিভাবে চলে গেল এবং পরের বার তার ডাক শোনা গেল আমার থেকে একশো গজ দূরে এবং দ্বিতীয় চিতাটার একশো গজ কাছ থেকে। দুটো চিতার ডাক কাছাকাছি হতে-হতে থেমে গেল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আবার সে-দুটোর আওয়াজ মনে হল জঙ্গলের ধার থেকে ভেসে এল ; —ঘেসো জমিটা সেখানে গিয়েই শেষ হয়েছে।

নানা দিক দিয়েই চিতাটার বরাত ভাল ছিল বলতে হবে, রাতটা অন্ধকার

থাকাটাও তার মধ্যে অন্যতম। মিলনের সময় চিতাকে শিকার করা খুবই সহজ। এ কথা বাঘের পক্ষেও খাটে, তবে এ অবস্থায় যেসব শিকারী হেঁটে বাঘ দেখতে যাবেন তাঁরা সত্যি-সত্যিই তা দেখতে চান কি না সে বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হয়ে যাওয়া ভাল, কারণ এ সময় বাঘের নয়, বাঘিনীর মেজাজ অত্যন্ত কড়া থাকে। তার কারণও বোঝা শক্ত নয়। বিড়াল-জাতীয় মদ্দা প্রাণীদের আদর সোহাগের ধরনটা কর্কশ এবং তারা জানে না যে তাদের নখ কতখানি ধারাল।

চিতাটা মরে নি, সে-রাতে মরবেও না। কিন্তু আগামী কাল বা তার পরের দিন হয়তো সে মারা পড়তে পারে, কারণ দিন তার ফুরিয়ে এসেছে। বেশ কিছুটা সময়ের জন্যে মনে হল আমারও বুঝি দিন ফুরিয়ে এসেছে, কারণ কোনোরকম আভাস না দিয়েই আচমকা একটা দমকা বাতাস এসে গাছটার গায়ে লাগল আর গাড়োয়ালের মাটির সঙ্গে আমার পা আর মাথার পারস্পরিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটল।

কয়েক সেকেন্ড যাবৎ আমার মনে হতে লাগল যে গাছটা আর কখনো সোজা অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না বা আমিও আর গাছের গায়ে লেগে থাকতে পারব না। পাইন গাছটা আগেও হয়তো এরকম অথবা এর চেয়েও মারাত্মক ঝড়ের প্রকোপ সয়ে এসেছে, কিন্তু তার সঙ্গে বাড়তি একটা মানুষের বোঝা নিশ্চয়ই ছিল না। রাইফেলটা একটা ডালে বেঁধে রেখে আমি একটার পর একটা ডালে উঠে যতদূর পর্যন্ত পারি পাইন-পাতা-ভরা ছোট-ছোট প্রশাখা-গুলো ভেঙে ফেলতে লাগলাম। এটা আমার কল্পনাও হতে পারে, কিন্তু গাছটাকে হালকা করার পর সত্যিই মনে হল যেন সেটা আর প্রথমবারের মত বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়ছে না।

সৌভাগ্যক্রমে গাছটা ছিল চারা গাছ, সহজেই নমনীয় আর গোড়াটাও বেশ শক্ত। ঘণ্টাখানেক ধরে ঝড়ের দাপটে সেটা এপাশ ওপাশ করতে লাগল, তারপর যেমন আচম্‌কা শুরু হয়েছিল তেমনি আচম্‌কা বাতাসটা থেমে গেল। চিতাটা ফিরে আসার আর কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে একটা সিগারেট শেষ করার পর আমিও ছাগলটার পিছু-পিছু স্বপ্নের দেশে পাড়ি দিলাম।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা 'কু' শুনে আমি স্বপ্নের দেশ থেকে মাটির পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে ফিরে এলাম। গাছের নিচে আমার আগের দিনের সেই বন্ধুদুটি, সঙ্গে গ্রামের আর দু-জন যুবক। আমাকে জেগে উঠতে দেখে তারা জিগ্যেস করল আমি রাতে চিতার ডাক শুনতে পেয়েছি কি না, আর গাছটার এ অবস্থাই বা কী করে হল।

চিতাদের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ বাক বিতণ্ডা হয়ে গিয়েছে এবং আর কিছুই করার না থাকায় বসে বসে গাছের ডালগুলো ভেঙেছি শুনে তারা খুবই মজা পেল। তারপর যখন তাদের জিগ্যেস করলাম রাতে যে সামান্য

বাতাস উঠেছিল সেটা তারা টের পেয়েছে কি না, যুবকদের একজন উত্তর দিল, সামান্য বাতাস, সাহেব! এরকম প্রচণ্ড ঝড় আর কখনো দেখা যায় নি। আমার কুঁড়েঘরটা তো ওর দাপটে উড়েই গিয়েছে!'

এ কথায় তার সঙ্গীটি যোগ দিল, 'এতে দুঃখের কিছু নেই সাহেব। শের সিং অনেক দিন ধরেই তার ঘরটা ভেঙে নতুন করে তৈরি করবে বলে শাসাচ্ছিল, কাল ঝড়টা সেই পুরনো ঘর ভেঙে ফেলায় তার একটা খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছে।'





২২

আতঙ্কের রাত

পাইন গাছের অভিজ্ঞতার পর বেশ কয়েক দিনের জন্যে নরখাদকটার সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেললাম। সে আর ভাঙা-জায়গাটায় ফিরে আসে নি এবং চষা-জমিটার উপরদিকের জঙ্গলে মাইলের পর মাইল খুঁজেও আমি তার বা তার প্রাণ-বাঁচানো সঙ্গিনীটির কোনো হদিসই পেলাম না। এই ধরনের জঙ্গল আমার খুব পরিচিত এবং চিতাদুটো এর কোনো অংশে থাকলে আমি নিশ্চয়ই খুঁজে পেতাম। জঙ্গলে যে-সব প্রাণী বা পাখি রয়েছে তারাই আমাকে সাহায্য করত।

পাইন গাছের উপর থেকে মাদীটা আমার ডাক শুনতে পেয়ে প্রচুর ছটফট করতে করতে তার নিজের এলাকা ছেড়ে বহু দূরে এসে পড়েছিল, আর আমি তাকে সঙ্গী খুঁজে দিতে সাহায্য করায় তার সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজের এলাকাতেই ফিরে গিয়েছিল। পুরুষটা শিগগিরই একাই ফিরে আসবে এবং নদীর বাঁ-পাড়ের লোকদের সতর্কতার জন্যে তার মানুষ শিকার করা কঠিন হয়ে পড়েছে বলে খুব সম্ভব নদী পার হয়ে অলকনন্দার ডান পাড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে। পরের কয়েক রাত আমি রুদ্রপ্রয়াগ পুলের ওপর পাহারায় থাকলাম।

বাঁ-পাড়ের পুলের ওপর উঠে আসার তিনটে পথ ছিল। তার একটা এসেছে দক্ষিণ থেকে, চৌকিদারের ঘরের কাছ দিয়ে। চারদিনের দিন রাতে চিতাটার চৌকিদারের কুকুরটাকে মেরে ফেলবার আওয়াজ শুনলাম। বেশ পোষ-মানা ছোট্ট প্রাণীটা, ও-পথ দিয়ে গেলেই সেটা আমাকে দেখে ছুটে বেরিয়ে

আসত। কুকুরটা ডাকত খুবই কম, কিন্তু সে-রাতে পাঁচ মিনিট ধরে ডেকেছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা আর্তনাদ উঠেই ডাকটা থেমে গেল এবং তারপরই ঘরের ভিতর থেকে চৌকিদারের চিৎকার শোনা গেল, তারপর সব চুপচাপ। পুলের উপরের কাঁটা-ঝোপগুলো সরিয়ে রাখা হয়েছিল বটে, কিন্তু পুলটা খোলা ছিল ; বাকি রাতটা রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে অপেক্ষা করলাম, কিন্তু চিতাটা আর পুল পার হওয়ার কোনো চেষ্টাই করল না।

সকালে থাবার ছাপ দেখে বুঝলাম, কুকুরটাকে রাস্তার উপর মেরে রেখে চিতাটা টাওয়ারের কাছাকাছি এসেছিল। যেদিকে সে এগোচ্ছিল সেদিকে আর পাঁচ-পা এগোলেই সে পুলটার উপর এসে পড়ত, কিন্তু পাঁচটা পা আর সে এগোয় নি। তার বদলে ডান-দিকে ঘুরে বাজারের দিকে কিছুটা পথ গিয়ে ফিরেছে, তারপর তীর্থপথ ধরে চলে গিয়েছে উত্তর দিকে। সে রাস্তায় মাইল-খানেক যাওয়ার পর আমি তার থাবার দাগ হারিয়ে ফেললাম।

দু-দিন পরে খবর পেলাম, আগের দিন সন্ধ্যায় তীর্থপথের সাত মাইল উপরে একটা গরু মারা পড়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছিল নরখাদকটাই সেটাকে মেরেছে, কারণ তার আগের রাতেই কুকুরটা মারা পড়েছিল। পরের সন্ধ্যায় গরুটা সেখানে মারা পড়ে তার খুব কাছেই। নরখাদকটা একটা বাড়ির দরজা ভাঙার চেষ্টা করেছিল।

রাস্তায় দেখলাম কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছে। তারা জানত যে রুদ্র-প্রয়াগ থেকে হেঁটে যাওয়াটা বিশেষ ক্লান্তিকর হবে, কাজেই বুদ্ধি করে এক বাটি চায়ের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। আমরা একটা আমগাছের ছায়ায় বসে ধূমপান করছি আর আমি সেইসঙ্গে চায়ের বাটিতে চুমুক দিচ্ছি, এমন সময় লোকগুলো জানাল সে গরুটা পালের সঙ্গে আগের সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে নি, এবং পরের দিন তল্লাসীর সময় সেটাকে রাস্তা আর নদীটার কাছাকাছি জায়গায় পাওয়া গিয়েছে।

তাদের প্রত্যেকেই গত আট বছরের মধ্যে নরখাদকটার হাত থেকে কে কিভাবে অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়ে গিয়েছে সেসব কাহিনীও অনেক শুনলাম। নরখাদকটার দরজা ভেঙে মানুষ ধরার চেষ্টা, আর বহু ক্ষেত্রে তাতে সফল হওয়ার বর্তমান অভ্যাসটা যে মাত্র বছর তিনেকের, এ কথা শুনে আমার খুবই আশা হল। তার আগে সে ঘরের বাইরে থেকে বা দরজা-খোলা বাড়ি থেকে মানুষ ধরেই সন্তুষ্ট থাকত। 'এখন', তারা বলল, 'শয়তানটার সাহস এতটা বেড়ে গিয়েছে যে কখনো-কখনো দরজা ভাঙতে না পেরে সে মাটির দেয়ালে গর্ত খুঁড়েও মানুষ ধরে নিয়ে যায়।'

যারা আমাদের পাহাড়ী লোকদের চেনে না বা তাদের অলৌকিকে বিশ্বাস বা ভয়ের কথা জানে না তাদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। সাহসের

জন্যে যাদের খ্যাতি আছে, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা বীরত্বের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেছে, তাদের ঘরে কুঠার, কুকরি এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে তারা দরজা ভেঙে বা দেয়াল ফুঁড়ে তাকে ঘরে ঢুকতে দেয়!

এই দীর্ঘ আট বছরের মধ্যে আমি একটিমাত্র ঘটনার কথা জানি যেখানে একটি স্ত্রীলোক নরখাদকটাকে বাধা দিয়েছিল। সে তখন একটা ঘরে একা ঘুমোচ্ছিল। ঘরটার দরজায় আগল দেওয়া ছিল না। দরজাটা খুলত ভিতরের দিকে। ঘরে ঢুকে চিতাটা স্ত্রীলোকটির বাঁ-পা কামড়ে ধরে যখন বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন মেয়েটির হাতে ঠেকে একটা "গন্‌দেসা", খড় কুচোবার হেঁসো। তাই দিয়ে সে চিতাটার গায়ে কোপ বসায়। চিতাটা অবশ্য তার কামড় না ছেড়ে তাকে টেনে নিয়ে দরজার দিকে পিছোতে থাকে। এটা করার সময় হয়তো স্ত্রীলোকটিই দরজাটা ঠেলে দেয় অথবা সেটা দৈবক্রমেই বন্ধ হয়ে যায়। সে যাই হ'ক, চিতাটা থাকে দরজার বাইরে আর স্ত্রীলোকটি দরজার ভেতরে, এবং চিতাটার প্রচন্ড টানে স্ত্রীলোকটির পা-টা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তৎকালীন যুক্তপ্রদেশ বিধান পরিষদে গাড়োয়ালের সদস্য শ্রীমুকুন্দীলাল সে সময় নির্বাচনী সফরে বেরিয়ে পরের দিন ঐ গ্রামে উপস্থিত হন এবং ঐ ঘরে একটা রাত কাটান, কিন্তু চিতাটা আর সেখানে ফিরে আসে নি। বিধান পরিষদে এক রিপোর্ট পেশের সময় মুকুন্দীলাল বলেন যে সেই এক বছরের মধ্যে পঁচাত্তরটি মানুষ ঐ নরখাদকটার হাতে প্রাণ হারিয়েছে। তিনি গভর্মেন্টকে নরখাদকটার বিরুদ্ধে জোরাল অভিযান শুরু করতে বলেন।

মাধো সিংকে এবং পথ দেখানোর জন্যে গ্রামের একজনকে নিয়ে মড়িটার কাছে গেলাম। রাস্তা থেকে সিকি মাইল ও নদীর একশো গজ দূরে একটা গভীর খাদের মধ্যে গরুটা মারা পড়েছে। খাদের এক দিকে ঘন ঝোপ জঙ্গল ও বড়-বড় পাথর, অন্যদিকে ছোট-ছোট কয়েকটা গাছ ; কোনোটাই বসার উপযুক্ত নয়। গাছগুলোর নিচে, মড়িটা থেকে গজ ত্রিশেক দূরে একটা পাথর, আর তার গোড়ায় ছোট্ট একটা গর্ত। আমি এই গর্তটায় বসব ঠিক করলাম।

মাধো সিং এবং গ্রামবাসীটি আমার মাটির ওপর বসে থাকার সিদ্ধান্তে ঘোরতর আপত্তি তুলল। কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগে আসার পর এই প্রথম মড়ি হিসেবে একটি প্রাণীকে পেলাম, আর এমন জায়গায়, যেখানে চিতাটা বেশ বেলাবেলি, সূর্যাস্ত নাগাদ এসে পড়বে বলে আশা করা যায়। অতএব সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে তাদের গ্রামে ফেরত পাঠালাম।

জায়গাটা বেশ শুকনো ও আরামদায়ক। একটা ছোট ঝোপের পিছনে গা লুকিয়ে, পাথরটায় ঠেস দিয়ে বসে আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে চিতাটা

আমাকে দেখতে পাবে না এবং আমার উপস্থিতি টের পাওয়ার আগেই আমি তাকে বধ করতে পারব। সঙ্গে এনেছিলাম একটা টর্চ-লাইট এবং একটা ছুরি। রাইফেলটা হাঁটুর ওপর রেখে এই একান্ত প্রান্তে বসে আমার মনে হল যে চিতাটাকে মারার সম্ভাবনা এখানে আগের চেয়ে অনেক বেশি।

নড়াচড়া না করে, চোখদুটো সামনের পাথরগুলোর উপর রেখে সারা বিকেল বসে রইলাম। প্রতি মুহূর্তে নিরুদ্বেগ, নিঃসন্দিগ্ধ, চিতাটার মড়ির উপর ফিরে আসার সময় ঘনিয়ে আসছে। যে-মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছি তা এসে চলে যাচ্ছে। কাছের জিনিস ঝাপসা, অস্পষ্ট হতে শুরু করেছে। প্রত্যাশিত সময় পেরিয়ে দেরি করে আসছে চিতাটা, কিন্তু সেজন্যে আমি উদ্বিগ্ন হচ্ছিলাম না। সঙ্গে রয়েছে টর্চ, আর মড়িটা মাত্র ত্রিশ গজ দূরে। খুব সতর্ক হয়েই আমি গুলি করব যাতে আবার একটা আহত প্রাণীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে না হয়।

খাদের গভীরে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। যে-পাড়ে বসে আছি সেখানকার ঝরা পাতার রাশ গত কয়েক দিনের প্রখর রৌদ্রের তাপে মচমচে হয়ে শুকিয়ে আছে। এটা অত্যন্ত আশ্বস্ত হওয়ার মত ঘটনা, কারণ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে এবং আগে যেমন আমায় আত্মরক্ষার জন্যে চোখদুটোর উপর নির্ভর করতে হয়েছে, এখন তেমনি নির্ভর করতে হবে আমার কানদুটোর উপর। ট্রিগারে একটা আঙুল ও টর্চের বোতামে বুড়ো আঙুল রেখে যে-কোনো সামান্য শব্দ পেলেই গুলি করবার জন্যে তৈরি হয়ে বসে রইলাম।

চিতাটা এসে না-পৌঁছনোয় এবার আমি অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলাম। এও কি সম্ভব যে পাথরগুলোর মধ্যে কোনো লুকানো জায়গা থেকে সে এতক্ষণ আগাগোড়া আমাকে লক্ষ করে আসছে, আর এখন আমার গলায় দাঁত বসানোর আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ঠোঁট চাটতে শুরু করেছে? কেননা বহুদিন তো তার মানুষের মাংস জোটে নি! এখন যদি সৌভাগ্যক্রমে খাদ ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলে যেতে পারি তবে আমার কানদুটোর সাহায্যের প্রয়োজন হবে খুবই বেশিরকম। এ-হেন দুরূহ কর্তব্য তাদের আর কখনো পালন করতে হয় নি।

উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি, যেন কত ঘণ্টা ধরে। অন্ধকার অস্বাভাবিক গাঢ় হয়ে আসছে দেখে উপরদিকে তাকিয়ে দেখলাম, একপ্রস্থ ঘন মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, তারাগুলো ঢেকে যাচ্ছে একে-একে। একটু পরেই বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল। অখণ্ড ও পূর্ণ নিস্তব্ধতার পরিবর্তে এখন চারিদিকে শুধু নড়াচড়া আর শব্দ। চিতাটা যে-সুযোগের অপেক্ষা করছিল তা বোধ করি এবার পাবে।

তড়িৎ-গতিতে কোটটা খুলে ফেলে গলায় জড়িয়ে নিলাম, হাতা দিয়ে বেঁধে

নিলাম ভাল করে। রাইফেল এখন নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং সেটাকে বাঁ হাতে বদলি করে ছোরাটা বের করে ডান হাতে বাগিয়ে ধরলাম। ছোরাটা হল, যাকে বলে আফ্রিদি ছোরা। একান্তভাবেই আশা করতে লাগলাম যে এটা আগের মালিকের প্রয়োজন যেমন সিদ্ধ করেছে আমার প্রয়োজনও ঠিক সেইমত সিদ্ধ করবে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের হাঙ্গুতে অবস্থিত সরকারী মালখানা থেকে এটা কেনার সময় কমিশনার এর সঙ্গের লেবেল এবং এর হাতলে কাটা তিনটে খাঁজের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন যে তিন-তিনটে খুনের সঙ্গে ছোরাটা জড়িত। এটা একটা বীভৎসতার স্মারক-চিহ্ন বটে, কিন্তু এটা হাতে পেয়ে আমি খুশিই হয়েছিলাম। সেই মুষলধার বৃষ্টির মধ্যেও শক্ত মুঠোয় বাগিয়ে ধরে বসে ছিলাম।

জঙ্গলের সাধারণ চিতারা বৃষ্টি পছন্দ করে না এবং বৃষ্টি হলেই আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু নরখাদক চিতা সাধারণ চিতা নয়, তার পছন্দ-অপছন্দের কিছুই আমার জানা নেই। সে কী করবে না-করবে তারও কিছু ঠিক নেই।

গ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় মাধো সিং জিগ্যেস করেছিল আমি কতক্ষণ বসে থাকব, আর আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'যে-পর্যন্ত না চিতাটাকে গুলি করতে পারি।'

তার কাছ থেকে এ-সময়ে কোনো সাহায্যই আমি প্রত্যাশা করতে পারি না, অথচ সাহায্যের তখন আমার বিশেষ দরকার। বসে থাকব, না উঠে যাব—এই দুটো প্রশ্নই আমার মনে আলোড়িত হতে লাগল। দুটোই সমান সংকটের। যদি এ পর্যন্ত চিতাটা আমাকে না দেখে থাকে তবে উঠে গিয়ে ধরা দেওয়া বোকামি হবে। তীর্থপথটায় গিয়ে উঠতে যে সংকীর্ণ জায়গাটি পার হতে হবে হয়তো সেখানেই তার কবলে পড়ে যাব।

অন্যদিকে, আরো ছ-ঘণ্টা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে একটা অনভ্যস্ত অস্ত্র হাতে জান-বাঁচানো লড়াইয়ের সম্ভাবনা নিয়ে বসে থাকলে স্নায়ুর উপর এমন চাপ পড়বে যে তা সহ্য করা সম্ভব হবে না। কাজেই উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেল ঘাড়ে ফেলে আমি রওনা দিলাম।

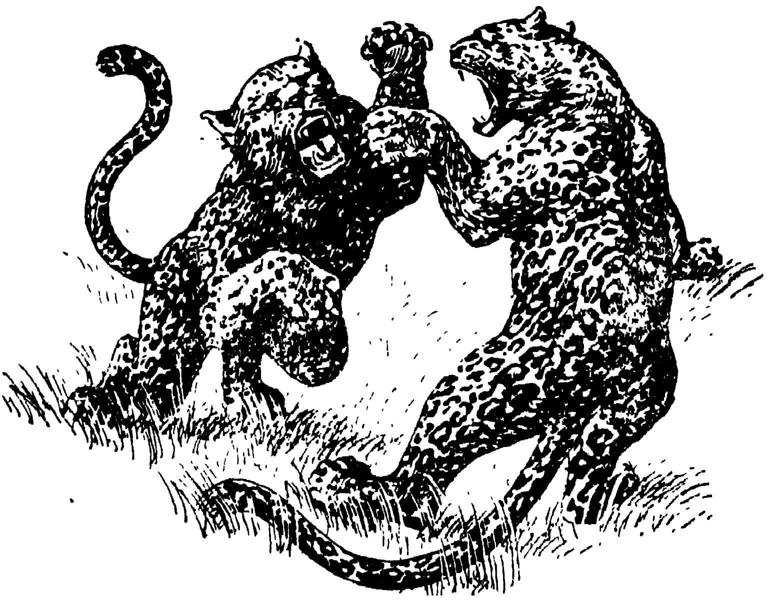
খুব বেশি দূরে যেতে হবে না, মাত্র ৫০০ গজের মত পথ। তার অর্ধেকটা কাদায় ভর্তি আর অন্য অর্ধেক তেলতেলে মসৃণ পাথরের উপর দিয়ে। চিতাটার দৃষ্টি আকর্ষণের ভয়ে টর্চ জ্বালাতে পারছি না। এক হাতে রাইফেল, অপর হাতে বাগিয়ে-ধরা ছুরি, এইভাবে প্রতি পদে আছাড় খেতে খেতে চললাম। তারপর যখন রাস্তার উপর গিয়ে পৌঁছলাম তখন জোরে একটা 'কু' ডাক ছাড়লাম এবং মুহূর্ত-পরেই দেখতে পেলাম উপরে গ্রামের একটা ঘরের দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে আসছে মাধো সিং ও তার সঙ্গী।

দু-জন যখন কাছে এল, মাধো সিং বলল যে বৃষ্টি নামার আগে পর্যন্ত

সে আমার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হয় নি। কিন্তু তার পর হতেই সে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দরজায় কান লাগিয়ে অপেক্ষা করছে। দু-জনই আমাকে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে প্রস্তুত, অতএব সাত মাইল হাঁটা-পথ রওনা দিলাম; আগে আগে বাচি সিং, মধ্যে লণ্ঠন হাতে মাধো সিং, শেষে আমি। পরদিন সকালে এসে দেখলাম মড়িটা কেউ ছোঁয়ও নি, কিন্তু রাস্তার ওপর নরখাদকটার থাবার ছাপ। আমরা চলে যাওয়ার কতক্ষণ পরে নরখাদকটা আমাদের অনুসরণ করেছে তা জানবার উপায় ছিল না।

ঐ রাতটার কথা যখনই আমার মনে পড়ে, গভীর আতঙ্কের রাত্রি বলেই ওটাকে মনে হয়। আগেও আমি ভয় পেয়েছি অসংখ্যবার, কিন্তু সে-রাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে বৃষ্টি এসে আমার প্রতিরোধের সব পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্যে আমার হাতে ছিল শুধু এক খুনীর হাতের একটি মাত্র ছোরা। তখনকার মত ভয়ঙ্কর ভয় জীবনে আর কখনো পাই নি।





২৩

চিতা বনাম চিতা

রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত আমাদের অনুসরণ করে চিতাটা চলে গিয়েছে তীর্থপথ ধরে গোলাবরাইয়ের ভিতরে দিয়ে। কয়েকদিন আগে যে নালাটা সে পার হয়ে গিয়েছিল সেটা পার হয়ে সে একটা বন্ধুর পায়ে-চলা পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগের পূর্বদিকের পাহাড়ের অধিবাসীরা হরিদ্বার যাতায়াতের জন্যে এটাকে সংক্ষিপ্ত পথ হিসেবে ব্যবহার করত।

কেদারনাথ ও বদ্রীনাথে তীর্থযাত্রা মৌসুমী ব্যাপার, এবং যাত্রারম্ভ ও যাত্রীদের যাতায়াতের সময়-সীমা নির্ভর করে প্রথমত তুষার গলার উপর। দ্বিতীয়ত তীর্থদুটো যে-সব উঁচু পাহাড়ে অবস্থিত সে-সব এলাকায় তুষার-পাতের উপর। বদ্রীনাথের প্রধান পুরোহিত মাত্র কয়েকদিন আগে সারা ভারতের পুণ্যার্থী হিন্দুদের বহু-প্রতীক্ষিত তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন যে রাস্তা খুলে গিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরেই ছোটখাট তীর্থযাত্রীর দল রুদ্রপ্রয়াগের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছিল।

গত কয়েক বছর ধরে নরখাদকটা রাস্তার উপর অনেকগুলো তীর্থ-যাত্রীর প্রাণ নিয়েছে। এই তীর্থযাত্রার মৌসুমে রাস্তা ধরে তার এলাকার মোটামুটি একটা সীমান পর্যন্ত নেমে যাওয়া, আর তারপর রুদ্রপ্রয়াগের পূব-

দিকের পাহাড়গুলোয় অবস্থিত গ্রামগুলোর ভিতর দিয়ে ঘুরে গিয়ে রুদ্রপ্রয়াগের পনের মাইল পর্যন্ত উপরের দিকে যে-কোনো জায়গায় আবার রাস্তায় গিয়ে পড়া, তার প্রায় নিয়মিত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই বৃত্তাকারে ঘুরে আসার সময় লাগত বিভিন্ন রকম, কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগ ও গোলাবরাইয়ের মধ্যবর্তী রাস্তাটুকুর উপর গড়ে প্রতি পাঁচ দিন অন্তর চিতাটার থাবার ছাপ দেখতে পাওয়ায় বাংলোয় ফেরার পথে একটা জায়গা দেখে নিলাম যেখান থেকে রাস্তাটার উপর নজর রাখতে পারি। পরের দু-রাত্রি আমি আরাম করে একটা খড়ের গাদার উপর বসে পাহারা দিলাম, কিন্তু চিতাটার কোনো চিহ্নই দেখতে পেলাম না।

আশেপাশের গ্রাম থেকে দু-দিন নরখাদকটার কোনো খবর পেলাম না এবং তৃতীয় দিন সকালে আমি তীর্থপথ ধরে ছ-মাইল নেমে সেদিককার গ্রামে কোনো হদিস পাই কি না দেখতে গেলাম। বার মাইল হেঁটে ফিরে এলাম দুপুরবেলায়। দেরি করে প্রাতরাশ খাচ্ছি, এমন সময় দু-জন লোক এসে খবর দিল যে রুদ্রপ্রয়াগের আঠারো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভৈঁসোয়ারা গ্রামে আগের সন্ধ্যায় একটা ছেলে মারা পড়েছে।

ইবটসনের চালু-করা সংবাদ-সংগ্রহ-পদ্ধতিটা বেশ ভাল কাজ করছে। এই পদ্ধতিতে নরখাদক-উপদ্রুত এলাকার মড়ির খবরগুলোর জন্যে ক্রমবর্ধমান হারে পুরস্কার দেওয়া হয়। ছাগলের জন্যে দু-টাকা থেকে শুরু করে মানুষের জন্যে কুড়ি টাকা পর্যন্ত। এই পুরস্কারগুলোর জন্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলে। এর ফলে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যেই আমরা খবরগুলো পেয়ে যাই।

লোকদুটোর হাতে দশ টাকা করে দেওয়ার পর একজন বলল যে সে আমাকে পথ দেখিয়ে ভৈঁসোয়ারা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। অপর জন বলল, যে সে ঐ রাতটা রুদ্রপ্রয়াগেই কাটাবে কারণ তার জ্বর হয়েছে। আবার আঠারো মাইল পথ হাঁটা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। লোকদুটো তাদের কাহিনী শোনাতে লাগল।

আমি প্রাতরাশ শেষ করলাম এবং একটা বাজবার কিছু আগেই আমার রাইফেল, কয়েকটা কার্তুজ ও টর্চ-লাইটটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ইনসপেকশন বাংলোর কাছে রাস্তাটা পার হয়ে যখন ওদিকের খাড়া পাহাড়টায় উঠছি তখন আমার সঙ্গীটি জানাল যে অনেকটা পথ যেতে হবে এবং অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর বাইরে থাকা আর নিরাপদ হবে না।

এ কথায় আমি তাকে গতিবেগ বাড়িয়ে আগে-আগে যেতে বললাম। উপায়ান্তর থাকলে আমি কক্ষনো খাওয়ার ঠিক পরেই পাহাড়ে চড়ি না। কিন্তু এখানে আর উপায় নেই। প্রথম তিন মাইল আমার পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে তাল

রেখে প্রায় চার হাজার ফুট উঠতে আমার রীতিমত কষ্টই হচ্ছিল। তিন মাইলের শেষে খানিকটা সমতল পথ পাওয়ায় আবার দম ফিরে পেলাম ও এবার আগে-আগে চলতে লাগলাম।

রুদ্রপ্রয়াগ আসার সময়েই লোকদুটো পথের দু-পাশের গ্রামগুলোয় ছেলেটির মৃত্যুর খবর দিয়ে গিয়েছিল।

তারা বলে গিয়েছিল যে আমাকে তাদের সঙ্গে ভৈঁসোয়ারায় আসতে রাজী করাবে। আমি যে রাজী হব তাতে কারুর সন্দেহ ছিল না বলেই মনে হয়, কারণ প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত অধিবাসীই আমার জন্যে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছিল। কেউ-কেউ আমাকে আশীর্বাদ জানাল, কেউ-কেউ আবেদন জানাল তাদের শত্রু নিধন না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন সে এলাকা ছেড়ে চলে না যাই।

আমার সঙ্গীটি আমাকে বলেছিল যে আমাদের ঠিক আঠারো মাইল পথ যেতে হবে। পাহাড়ের পর পাহাড় এবং মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলি অতিক্রম করতে করতে আমি বুঝতে পারলাম যে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাকে জীবনের দীর্ঘতম ও কঠিনতম আঠারোটি মাইল আজ পাড়ি দিতে হচ্ছে।

সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু, এই সময় ঐ সীমাহীন পাহাড়গুলোর একটা থেকে দেখতে পেলাম—কয়েকশো গজ সামনে একটা শৈলশিরার উপর কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখেই কয়েকটি লোক ও-পিঠে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং বাকি ক-জন আমাদের দিকে এগিয়ে এল। গাঁয়ের মোড়ল ছিল শেষোক্ত দলে, এবং আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর পর বেশ খুশি হওয়ার মত সংবাদই দিল সে। তার গ্রামটা এই পাহাড়ের ঠিক ও-পিঠেই, এবং তখনই সে তার ছেলেকে চা তৈরি রাখার জন্যে গ্রামে পাঠিয়ে দিল।

১৯২৬ সালের চোদ্দই এপ্রিল তারিখটা গাড়োয়াল বহুদিন মনে রাখবে। ঐ তারিখে রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতাটা তার শেষ মানুষটি শিকার করে। ঐদিন বিকেলে এক বিধবা ও তার দুটি সন্তান—একটি ন-বছরের মেয়ে এবং একটি বারো বছরের ছেলে—প্রতিবেশী আট বছরের একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভৈঁসোয়ারা গ্রাম থেকে কয়েক গজ দূরের এক ঝরনায় জল আনতে যায়।

ঐ বিধবা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে লম্বা একসার বাড়ির মাঝামাঝি একটা ঘরে থাকত। বাড়িগুলো দোতলা। নিচু একতলাটা শস্য ও জ্বালানি রাখার কাজে ব্যবহৃত হত—উপরতলাটাই ছিল বাসগৃহ। চার-ফুট চওড়া এবং বাড়ি-বরাবর লম্বা একটা বারান্দা চলে গিয়েছে। দু-ধারে দেওয়াল-দেওয়া ছোট-ছোট পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বারান্দাটায় ওঠা যায়, প্রত্যেকটা সিঁড়ি দুটো করে পরিবার ব্যবহার করে। বাড়িটার সামনে নিচু দেওয়ালে ঘেরা ষাট ফুট চওড়া তিনশো ফুট লম্বা একটা উঠোন।

বিধবা ও তার ছেলেমেয়ের সঙ্গে প্রতিবেশী ছেলেটিই সবার আগে সিঁড়ির কাছে আসে এবং সিঁড়িতে ওঠার সময় সিঁড়ির সংলগ্ন নিচের ঘরে একটা প্রাণীকে শুয়ে থাকতে দেখে। সেটাকে সে একটা কুকুর বলে মনে করে। সে-সময় সে প্রাণীটার কথা কাউকে বলে নি বা অন্য কেউ সেটা দেখতেও পায় নি। ছেলেটির পিছনে ছিল মেয়েটি, তারপর বিধবা, সব-শেষে বিধবার ছেলে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে মা ছেলের মাথার পিতলের কলসিটা সিঁড়ির উপর গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল। অসাবধানতার জন্য ছেলেকে বকুনি দিয়ে সে নিজের কলসিটা বারান্দার উপর নামিয়ে রেখে পিছনে ফিরে দেখে, সিঁড়ির গোড়ায় কলসিটা কাত হয়ে পড়ে আছে। নেমে সেটা তুলে নিয়ে সে ছেলের খোঁজে চারিদিকে তাকাল। কোথাও তাকে দেখতে না পেয়ে সে ভয় পেয়ে পালিয়েছে ভেবে মা ছেলেকে ডাকাডাকি শুরু করল।

আশে-পাশের প্রতিবেশীরা কলসি পড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, এখন মায়ের ডাকাডাকি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপার কি জানতে চাইল। ঘটনা শুনে সবাই বলল, ছেলেটি নিচের তলায় কোনো ঘরে বোধহয় লুকিয়ে আছে। ঘরগুলোর ভেতরে ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে দেখে একজন একটি লণ্ঠন এনে স্ত্রীলোকটির কাছে এগিয়ে গেল। গিয়েই সে দেখে, সেখানে পাথরের উপর রক্তের ফোঁটা। লোকটির ভীত-চকিত কণ্ঠস্বর শুনে অন্যান্য লোকজনও নেমে এল।

তাদের মধ্যে ছিল এক বুড়ো সে আগে তার মনিবের সঙ্গে বহুবার শিকার-অভিযানে বেরিয়েছে। লণ্ঠনটা নিয়ে বুড়ো রক্তের দাগ ধরে উঠোন পেরিয়ে দেওয়ালের কাছে গেল। দেওয়ালের ও-পিঠে আট ফুট নিচে একটা খেত। সেখানে নরম মাটির ওপর চিতার থ্যাবড়া থাবার ছাপ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। সেই মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ সন্দেহ করে নি যে ছেলেটি নরখাদকের কবলে পড়েছে, কারণ নরখাদকটার কথা সবাই শুনলেও সেটা কোনোদিনই তাদের গ্রামের দশ মাইলের মধ্যেও আসে নি।

কী ঘটেছে, তা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল এবং পুরুষদের কেউ-কেউ ছুটে গেল ঢাক আনতে, কেউ বা ছুটল বন্দুক আনতে। সে গ্রামে তিনটে বন্দুক ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তুমুল শোরগোল শুরু হয়ে গেল। সারা রাত ধরে ঢাক পেটানো, বন্দুক ছোড়া চলতে লাগল। দিনের আলো ফুটলে ছেলেটার দেহ পাওয়া গেল এবং রুদ্রপ্রয়াগে আমাকে খবর দেওয়ার জন্যে দু-জন লোক পাঠানো হল।

মোড়লের সঙ্গে গ্রামের কাছে পৌঁছে নারীকণ্ঠের বিলাপ শুনতে পেলাম, ছেলেটির মা কাঁদছে। গ্রামে পৌঁছলে সে-ই আমাকে প্রথম অভ্যর্থনা জানাল। আমার অনভ্যস্ত চোখেও ধরা পড়ল, কিছুক্ষণ আগেই একটা বিলাপের ঝড় বয়ে

গিয়েছে এবং শিগগিরই আর-একটা ঝড় শুরু হবে। এ অবস্থায় লোকের সঙ্গে বাক্যালাপের কলাকৌশলে আমি অপটু। তাই স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে আগের সন্ধ্যার ঘটনাবলী বর্ণনা না-শুনতেই চাচ্ছিলাম। কিন্তু সে আমার কাছে তা বলার জন্যে খুব আগ্রহ প্রকাশ করায় শুনতেই হল।

শুনতে-শুনতে বুঝলাম যে তার বক্তব্যে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগই বেশি,—কেন তারা চিতাটার পিছনে ছুটে গিয়ে তার ছেলেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করল না, "ছেলের বাপ বেঁচে থাকলে তো তাই করত!"

এই অভিযোগের উত্তরে আমি বললাম যে তার বিচার ঠিক হয় নি এবং সে যে ভাবছে তার ছেলেকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা যেত তাও ঠিক নয়। কারণ যখনই চিতাটা তার ছেলের গলায় কামড় বসিয়েছে তখনই ঘাড় থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং চিতাটা উঠোন পেরিয়ে যাওয়ার আগেই ছেলেটির মৃত্যু ঘটেছে। সমবেত গ্রামবাসী বা অন্য কারুর পক্ষেই তখন আর করার কিছু ছিল না।

উঠোনে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে এবং শতখানেক বা ততোধিক লোককে জড় হতে দেখে আমি বুঝতেই পারলাম না, চিতার মত অত বড় একটা প্রাণী কী করে দিনের বেলায় লোকজনের চোখ এড়িয়ে উঠোনটা পার হয়ে এল, আর গ্রামের কুকুরগুলোর পক্ষেই বা তার উপস্থিতি টের না পাওয়া কি ভাবে সম্ভব হল।

ছেলেটাকে নিয়ে চিতাটা যে আট ফুট উঁচু দেওয়ালটা লাফিয়ে পার হয়েছে তার উপর উঠে, খেতের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ অনুসরণ করে বার ফুট উঁচু আরেকটা দেওয়ালের ওপারের খেতের উপর দিয়ে গেলাম।

এই দ্বিতীয় খেতটার অপর পাশে ছিল চার ফুট উঁচু ঘন লতা-গোলাপের বেড়া। এখানে চিতাটা ছেলেটার গলার কামড় ছেড়ে দিয়ে বেড়ার মধ্যে ফাঁক খুঁজেছে। ফাঁক না পেয়ে ছেলেটার পিঠ কামড়ে ধরে বেড়াটা লাফিয়ে পার হয়ে গিয়েছে। এই তৃতীয় দেওয়ালটার তলা দিয়ে ছিল একটা গরু-বাছুর চলার পথ, এ-পথ দিয়ে সামান্য যাওয়ার পরই গ্রামে শোরগোল উঠেছে। রাস্তার ওপরই ছেলেটাকে নামিয়ে রেখে চিতাটা পাহাড় দিয়ে নেমে গিয়েছে এবং সারা রাত গ্রামে বন্দুক ও ঢাকের আওয়াজ হওয়ায় আর মড়ির কাছে ফিরে আসতে পারে নি।

আমার এখানে স্বাভাবিক কর্তব্য ছিল যেখানে চিতাটা মৃতদেহটা রেখে গিয়েছিল সেখানেই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কাছাকাছি বসে অপেক্ষা করা। কিন্তু এ ব্যাপারে দুটো অসুবিধে দেখা গেল—বসার মত উপযুক্ত জায়গার অভাব, এবং অনুপযুক্ত জায়গায় বসার বিপক্ষে আমার স্বভাবজ অনীহা।

সবচেয়ে কাছের গাছটা হল তিনশো গজ দূরের একটা পাতাশূন্য আখরোট গাছ। অতএব হিসেবের বাইরে সেটা। এবং সত্যি বলতে, মাটির ওপর

বসতে আমার সাহসে কুলোচ্ছিল না। আমি গ্রামে এসেছি সূর্য ডোবার সময়। কিছুটা সময় গিয়েছে চা খেতে, মায়ের কাহিনী শুনতে এবং চিতাটার দাগ অনুসরণ করতে।

তখন আর আত্মরক্ষার মত কোনো আশ্রয় তৈরি করে নেওয়ার সময় অবশিষ্ট নেই। যদি আমাকে মাটিতে বসতেই হয় তবে কোন্ দিক দিয়ে চিতাটা আসবে তা না আন্দাজ করেই যে-কোনো জায়গাতে বসে পড়তে হবে। এবং এটাও পরিষ্কার যে, চিতাটা আমাকে আক্রমণ করলে আমার একমাত্র পরিচিত অস্ত্র রাইফেলটি ব্যবহারের কোনো সুযোগই আমি পাব না। কারণ সুস্থ চিতা অথবা বাঘের সঙ্গে প্রকৃত মোলাকাত হবার পর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা আর সম্ভবপর হয় না।

পরিদর্শনের কাজ সেরে আমি উঠোনটায় ফিরে এসে মোড়লের কাছে একটা শাবল, একটা শক্ত কাঠের গোঁজা, একটা হাতুড়ি ও একটা কুকুরের চেন চাইলাম। শাবল দিয়ে উঠোনের পাথর তুলে গোঁজটা শক্ত করে মাটিতে পুঁতে তাতে চেনটা বেঁধে দিলাম এবং মোড়লের সহায়তায় ছেলেটির মৃতদেহ সেখানে বয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ চেনের সঙ্গে আটকে রাখলাম।

যে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে জীবন-যাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় তা বুদ্ধির অগম্য। তাকে কেউ বলে নিয়তি, কেউ বলে কিসমৎ। গত কিছুদিনের মধ্যে এই শক্তি এক উপার্জনক্ষম লোকের জীবনে ছেদ টেনে দিয়ে পরিবারটিকে পথে বসিয়েছে। এক বৃদ্ধা সারাজীবন হাড়ভাঙা খাটুনির পর শেষের কয়েকটা বছর একটু আরামে কাটাবে আশা করছিল। অতীব যন্ত্রণাদায়কভাবে তার দিনগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে, আর আজ এই ছেলেটির জীবনকে শেষ করে দিয়েছে।

একে দেখলে বোঝা যায় যে তার বিধবা মা তাকে বহু যত্নে মানুষ করে তুলেছিল। কাজেই মর্মভেদী কান্নার মধ্যে শোকাতুরা মায়ের বার-বার এ বিলাপ আশ্চর্যের কিছুই নয়—'হায় পরমেশ্বর, আমার ছেলে কী দোষ করেছে? তাকে সবাই ভালবাসত, তাকে জীবনের শুরুতেই এমন ভয়ংকরভাবে কেন মৃত্যু বরণ করতে হল?

উঠোনটায় পাথরটা ওঠানোর আগে আমি বিধবা ও তার মেয়েকে দূরে এক-পাশের একটা ঘরে স্থানান্তরিত করেছিলাম। তারপর আমার অন্যান্য প্রস্তুতির কাজ সারা হওয়ার পর আমি ঝরনায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে এক আঁটি খড় চাইলাম। খড়টা রাখলাম বিধবার খালি করা ঘরটার সামনের বারান্দায়।

ততক্ষণে পুরো অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। সমবেত লোকজনকে রাত্রে যথা-সম্ভব চুপচাপ থাকতে বলে তাদের নিজের-নিজের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি বারান্দায় উঠে বসলাম, সেখানে সামনে কিছু খড় জড় করে পাশ ফিরে শুয়ে পরিষ্কারভাবে মড়িটার উপর নজর রাখা সম্ভব হল এবং আমাকে দেখতে

পাওয়ার সম্ভাবনা আর খুব একটা থাকল না।

আগের রাতে প্রচুর হৈ-হল্লা হওয়া সত্ত্বেও আমার ধারণা হয়েছিল যে চিতাটা ফিরে আসবে, আর যথাস্থানে মৃতদেহটা না পেলে নতুন শিকারের সন্ধানে গ্রামের মধ্যেই চলে আসবে। কারণ ভেসোয়ারার প্রথম শিকার সে যত সহজে পেয়ে গিয়েছিল তাতে আবার নতুন প্রচেষ্টায় উৎসাহ পাবারই কথা। বেশ আশা নিয়েই আমি পাহারা দেওয়া শুরু করলাম।

সারা সন্ধ্যা ঘন মেঘ জমে উঠেছে, আটটার সময় মায়ের বিলাপ-ধ্বনি ছাড়া গ্রামের আর সমস্ত শব্দ স্তব্ধতায় লীন হয়ে গিয়েছে। একটা বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল। তারপর দূর থেকে গুর-গুর বজ্রের নির্ঘোষ ঝড়ের আগমনবার্তা ঘোষণা করল। এক ঘণ্টা ধরে ঝড়ের মাতামাতি চলল, বিদ্যুৎ-চমক এত তীব্র ও ঘন-ঘন হতে লাগল যে উঠোনে একটা ইঁদুর এসে পড়লেও আমি তা পরিষ্কার দেখতে এবং খুব সম্ভব গুলিও করতে পারতাম। অবশেষে বৃষ্টি থামল, কিন্তু আকাশ মেঘে ভারি হয়ে থাকল, এবং দৃষ্টিসীমা কয়েক ইঞ্চির ভিতরে সঙ্কুচিত হয়ে এল। এখনই ঠিক সময়। ঝড়ে চিতাটা যেখানেই আশ্রয় নিয়ে থাকুক সেখান থেকে রওনা হওয়ার সময় হয়েছে। তার এসে পৌঁছনোর সময়টা শুধু নির্ভর করবে সেই জায়গা থেকে গ্রামটার দূরত্বের ওপর।

স্ত্রীলোকটির কান্না এতক্ষণে থেমেছে, পৃথিবীর কোথাও যেন কোনো শব্দ নেই। আমিও এইটিই আশা করছিলাম, কারণ চিতাটার আসার খবরের জন্যে আমাকে কানের উপরই নির্ভর করতে হবে এবং সেইজন্যেই আমি দড়ি ব্যবহার না করে কুকুরের চেন দিয়ে মড়িটা বেঁধে রেখেছি।

যে খড়গুলো আমাকে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো শুকনো, মচমচে। উদ্‌গ্রীব হয়ে কালো অন্ধকারে কান পেতে শুয়ে আছি। প্রথম শব্দটা শুনতে পেলাম,—আমার পায়ের কাছে আমার শোবার জন্যে বিছানো খড়ের উপর দিয়ে গুড়ি মেরে-মেরে কিছু একটা আসছে। হাফ-প্যান্ট পরে ছিলাম, হাঁটুর কাছটা ছিল খালি। হঠাৎ ওই খালি চামড়ার উপর একটা প্রাণীদেহের রোমশ স্পর্শ অনুভব করলাম। নির্ঘাত নরখাদকটা গুড়ি মেরে এগিয়ে এসেছে আমার গলা চেপে ধরার জন্যে!

বাঁ কাঁধের উপর পা রাখার একটা হালকা চাপ পড়ল এবং যে-মুহূর্তে আমি রাইফেলের ট্রিগারটা টিপতে যাব, অমনি একটা ছোট্ট প্রাণী আমার বাহু ও বুকের মাঝখানটায় লাফিয়ে পড়ল। একটা ভিজে সপ্‌সপে ছোট্ট বেড়ালের বাচ্চা ঝড়ের সময় বাইরে ছিল, এখন সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ দেখে একটু উষ্ণতা ও আশ্রয়ের আশায় আমার কাছে এসেছে।

বেড়ালছানাটা সবেমাত্র আমার কোটের মধ্যে আরাম করে বসেছে এবং আমিও সেই আতঙ্কের ঝাপটা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছি, এমন সময় ধাপে-ধাপে

সাজানো খেতগুলোর উপর থেকে একটা চাপা গর্জন শোনা গেল,—শব্দটা ক্রমেই বাড়তে লাগল।

তারপর সেটা এমন একটা ভয়ঙ্কর হিংস্র লড়াইয়ে রূপান্তরিত হল যেমনটি জীবনে কখনো শুনি নি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নরখাদকটা যথাস্থানে ফিরে এসেছিল এবং যখন সে তার রেখে-যাওয়া মড়িটার খোঁজ করেছে, তখন তার মেজাজটাও খুব ভাল ছিল না। ঠিক এই সময় আরেকটি চিতা, এ-চিতাটা হয়তো এই এলাকাটাকে তারই নিজস্ব বিচরণ-ভূমি বলে মনে করে, আকস্মিক-ভাবেই তার মুখোমুখি এসে পড়েছে।

যে ধরনের লড়াইয়ের শব্দ পাচ্ছি সেটা অত্যন্ত অসাধারণ, কারণ মাংসাশী প্রাণীরা সর্বদাই তাদের নিজের-নিজের গণ্ডীর ভিতর থাকে, এবং দৈবাৎ যদি কখনো দুটোর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে যায় তবে এক নজরেই দু-জনে দু-জনের শক্তি সামর্থ্যের পরিমাপ করে ফেলে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বলটি সবলের জন্যে পথ ছেড়ে দেয়।

নরখাদকটার বয়স হলেও তার প্রকাণ্ড শরীরে যথেষ্ট শক্তি ছিল এবং যে পাঁচশো বর্গ-মাইল এলাকা জুড়ে তার আনাগোনা তার মধ্যে তার রাজত্বের বিরোধিতা করার শক্তিও বোধহয় অন্য কোনো পুরুষ-চিতার ছিল না। কিন্তু এখানে, এই ভৈঁসোয়ারাতে সে আগন্তুক ও অনধিকার-প্রবেশকারী। আর যে গণ্ডগোলে সে নিজেকে এখন জড়িয়ে ফেলেছে তা থেকে উদ্ধার পেতে হলে তাকে প্রাণপণে লড়াই করতে হবে, এবং বলা বাহুল্য, তাতে সে পরাঙ্মুখও হয় নি।

এখন আমার গুলি করার সম্ভাবনা হয়েছে, কারণ নরখাদক তার আক্রমণ-কারীকে পরাস্ত করতে পারলেও তার নিজের ক্ষতগুলোর জন্যে আপাতত আর মড়ির উপর তার কিছুদিন টান না থাকাটাই সম্ভব। এমনকি লড়াইয়ে তার ঘায়েল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সে-ক্ষেত্রে সত্যিই এটা হবে তার জীবনের অপ্রত্যাশিত উপসংহার। আট বছর ধরে সরকার ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর আকস্মিক লড়াইয়ে স্বজাতির হাতেই তার মৃত্যু নিঃসন্দেহে অভিনব।

পাঁচ মিনিটব্যাপী প্রথম রাউণ্ড লড়াই চলল মারাত্মক হিংস্রতার সঙ্গে। ফলাফল অনির্ধারিত রইল, কারণ তখনও আমি দুটোরই গর্জন শুনতে পাচ্ছি-লাম। দশ পনের মিনিট বিরতির পর লড়াই আবার শুরু হল, কিন্তু যেখানে প্রথম সূত্রপাত সেখান থেকে দু-তিনশো গজ দূরে। স্পষ্টতই লড়াইয়ে স্থানীয় যোদ্ধাটিরই সুবিধে হচ্ছিল এবং সে ধীরে ধীরে অনধিকার-প্রবেশকারীকে সীমানার বাইরে বের করে দিচ্ছিল।

তৃতীয় রাউণ্ডটা আগের দুটোর চেয়ে স্বল্পস্থায়ী হল, কিন্তু কম জোরদার

হল না। অবশেষে অনেকটা নিস্তব্ধতার পর যখন আবার লড়াই শুরু হল তখন লড়াইয়ের ক্ষেত্র শৈলশিরাটির উপর সরে গিয়েছে। কয়েক মিনিট পরে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তখনও ছ-ঘণ্টা রাত ছিল, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে আমার ভেঁসো-য়ারা আসার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। বাঁচা-মরার লড়াই শেষ হবে, নরখাদকটা খতম হবে, আমার এ ধারণাও ক্ষণস্থায়ী হয়েছে। লড়াই খতম, নরখাদকটা জখম হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতে তার মানুষের মাংসে অরুচি ঘটবে না বা তার মানুষ মারার ক্ষমতারও কমতি হবে না।

বেড়ালছানাটা সারা-রাত ধরে আরামে ঘুমোলো। পুব আকাশে প্রথম ঊষার আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গে আমি উঠোনে নেমে গিয়ে, যে চালা থেকে ছেলেটাকে আনা হয়েছিল সেই চালার নিচে তাকে সরিয়ে রাখলাম। যে কম্বলে তার শরীরটা আগে ঢাকা ছিল সেটা দিয়েই ঢেকে দিলাম। মোড়ল তখনও ঘুমোচ্ছিল, তার দরজায় গিয়ে ঘা দিলাম। চা হতে কিছুটা সময় নেবে বলে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম যে নরখাদকটা কোনোদিনই আর তাদের গ্রামের দিকে ফিরে আসবে না। মোড়ল তখনই ছেলেটির দেহ শ্মশানঘাটে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেওয়ার পর আমি রুদ্রপ্রয়াগের দীর্ঘ পথে পা বাড়ালাম।

কোনো প্রচেষ্টায় আমরা যতবারই ব্যর্থ হই না কেন, প্রত্যেক ব্যর্থতার পর যে নৈরাশ্যবোধ, তাতে কোনোদিনই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারি না। কয়েক মাস ধরে দিনের পর দিন আমি এই আশা নিয়ে ইন্‌সপেক্‌শন বাংলো থেকে বেরিয়ে এসেছি যে এই বিশেষ দিনটিতে আমি নিশ্চয়ই সফলকাম হব, কিন্তু প্রতিদিনই আমি নিরাশ ও ম্রিয়মাণ অবস্থায় ফিরে এসেছি।

আমার ব্যর্থতাগুলোয় যদি শুধু আমারই ব্যক্তিগত ভালমন্দ জড়িত থাকত তবে কিছু যেত-আসত না। কিন্তু যে কাজ হাতে নিয়েছি সে কাজে ব্যর্থতার সঙ্গে আমার নিজের চেয়ে অন্যান্য লোকই বেশি জড়িত। দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কোনো কিছুর উপরই আমার ব্যর্থতার দায়িত্ব চাপাতে পারি না। দুর্ভাগ্যের ক্রমবর্ধমান চাপ আমার পিছনে তাড়া করেছিল এবং এ-সবের সম্মিলিত প্রভাব আমাকে হতাশ্বাস করে তুলেছিল।

আমার মনে হচ্ছিল যে এ কাজ নিষ্পন্ন করা আমার ভাগ্যে নেই। নরখাদকটা মড়িটা এমন জায়গায় রাখল যার ধারে-কাছে একটিও গাছ নেই, এটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী? আরো দেখুন, যে চিতাটার বিচরণ-ক্ষেত্র অন্তত ত্রিশ বর্গ-মাইল জায়গা জুড়ে, সেটা কী করে এমন মুহূর্তে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পড়ল,—যখন সে মড়ি খুঁজে না পেয়ে গ্রামের দিকে যেখানে তার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি সেইদিকেই চলে আসছে?

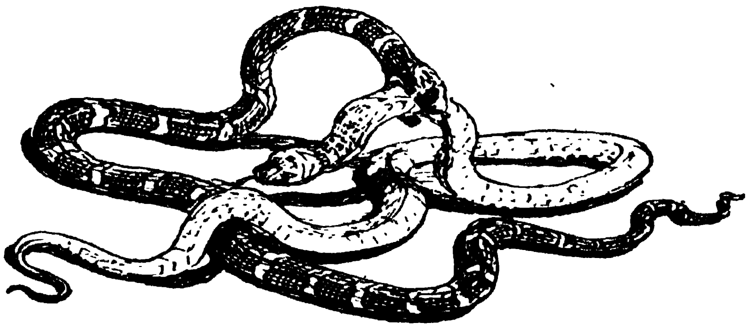
গতকাল আঠারটা মাইল দীর্ঘ পথ মনে হচ্ছিল, আজ মনে হল দীর্ঘতর, এবং পাহাড়গুলো আরো খাড়াই। যে সব গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম লোকজন আগ্রহভরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল, এবং যদিও আমার কাছে তারা শুধু দুঃসংবাদই শুনেছিল তবু তাদের মুখে একবারও নৈরাশ্য দেখি নি। কোনো মানুষ বা কোনো প্রাণী তার নির্দিষ্ট সময়ের আগে মরতে পারে না—এই তত্ত্বে তাদের সীমাহীন বিশ্বাস। সে বিশ্বাস পাহাড়কেও টলিয়ে দিতে পারে। হতোদ্যম বুকে সান্ত্বনা তাদের অপার। তা কোনো ব্যাখ্যা বা যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা রাখে না। নরখাদকটার সময় এখনো আসে নি।

সারা সকাল যে ব্যর্থতা ও হতাশার বোঝায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম তার জন্যে লজ্জিত হয়ে শেষ গ্রামটা ছেড়ে বের হলাম বেশ উৎফুল্ল চিত্তে। এ গ্রামের অধিবাসীরা আমাকে থামিয়ে এক পেয়ালা চা এনে দিল। রুদ্রপ্রয়াগের শেষ চার মাইলের পথে যখন মোড় নিয়েছি তখন খেয়াল হল আমি নরখাদকটার থাবার ছাপের উপর দিয়েই যাচ্ছি।

আশ্চর্য, মানুষের মানসিক অবস্থা তার পর্যবেক্ষণ শক্তিতে কতখানি ভোঁতা বা ধারাল করে তুলতে পারে! নরখাদকটা খুব সম্ভব বহু মাইল আগেই এই পথটার উপর এসে পড়েছে। সরল গ্রামবাসীদের সংগে কথাবার্তা বলে এক পেয়ালা চা খাওয়ার পর সারা সকালের মধ্যে এই প্রথম আমি চিতাটার থাবার ছাপগুলো লক্ষ করলাম। পথটা এখানে লাল মাটির উপর দিয়ে গিয়েছে, বৃষ্টিতে মাটি নরম। থাবার ছাপ দেখে বুঝলাম যে নরখাদকটা তার স্বাভাবিক চালেই এখান দিয়ে চলে গিয়েছে। আরো আধ মাইল পরে সে গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এই গতিতে চলে গিয়েছে গোলাবরাইয়ের উপর খাদটার মাথা পর্যন্ত। তারপর সে খাদের ভেতর দিয়ে নেমে গিয়েছে।

কোনো বাঘ বা চিতা স্বাভাবিক গতিতে হাঁটলে মাটিতে শুধু তার পিছনের পায়ের ছাপগুলোই দেখা যায়, কিন্তু কোনো কারণে গতি বেড়ে গেলে পিছনের পা সামনের পায়ের আগে-আগে মাটিতে পড়ে, এবং ফলে মাটিতে চারটে পায়ের ছাপই দেখা যায়। পিছনের ও সামনের পায়ের ছাপগুলোর দূরত্ব থেকে বিড়াল-জাতীয় প্রাণীর চলার বেগ নির্ণয় করা সম্ভব। দিনের আলো ফুটে ওঠাই এ ক্ষেত্রে নরখাদকটার গতিবেগ বাড়িয়ে দেওয়ার প্রধান কারণ।

নরখাদকটার চলার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার আগেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল তার খাবারের খোঁজে পথ চলা। বর্তমান ক্ষেত্রে তার দীর্ঘ পথ চলার যথেষ্ট কারণ ছিল। যে চিতাটা তাকে অনধিকার প্রবেশের জন্যে শিক্ষা দিয়ে ছেড়েছে, তার কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে যেতেই সে এখন ব্যগ্র। শিক্ষাটা কতখানি কঠিন হয়েছিল তা নরখাদকটার একটা বিবরণ থেকেই বুঝতে পারা যাবে। বিবরণটা পরে দেওয়া হচ্ছে।



২৪

অন্ধকার ঃ একটি গুলি

ভারতবর্ষে আহারের সময় বছরের ঋতু এবং ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে। বেশির ভাগ পরিবারে তিনটি প্রধান আহারের সর্বসম্মত সময় হল ঃ প্রাতরাশ ৮ থেকে ৯, দুপুরের খাওয়া ১ থেকে ২ এবং রাতের খাওয়া ৮ থেকে ৯।

আমি যত মাস রুদ্রপ্রয়াগে ছিলাম আমার খাওয়া দাওয়া খুব অনিয়মিত হয়েছিল। এটাই স্বীকৃত বিশ্বাস যে আহারের নিয়মানুবর্তিতা এবং দ্রব্য মিশ্রণের উপর স্বাস্থ্য নির্ভর ক'রে। কিন্তু আমার অভ্যাসবিরোধী। অনিয়মিত আহার এই বিশ্বাসের বিরোধিতা করে আমাকে খুব মজবুত রেখেছিল। রাত আটটায় পরিজ, সকাল আটটায় সুপ, দিনে একবার আহার কিংবা অনাহার আমার কোনো ক্ষতি করে নি। শুধু হাড় থেকে একটু মাংস কমে গিয়েছিল।

গতকালের প্রাতরাশের পর আমি কিছু খাই নি। যেহেতু আমি বাইরে রাত কাটাব বলে ঠিক করেছি, আমি ভৈংসোয়ারা ফিরে বর্ণনারহিত একটা আহার গ্রহণ করলাম। এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে স্নান করলাম, তারপর চললাম গোলাব্-রাই-এর দিকে। তীর্থশালার পাণ্ডিতকে সাবধান করতে যে ওর এলাকায় নরখাদকটা এসেছে।

রুদ্রপ্রয়াগে প্রথম আসার পর আমি এই পাণ্ডিতের সংগে বন্ধুত্ব করেছিলাম, এবং ওর বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কখনো ওর সংগে দু-একটা কথা না বলে যাই নি। কেননা নরখাদক এবং গোলাবরাই দিয়ে যাতায়াত করা তীর্থযাত্রীদের নিয়ে বহু চিত্তাকর্ষক গল্প জান্য ছাড়া, ও ছিল আমার দেখা গাড়োয়ালের দুজনের একজন, যে নরখাদকের আক্রমণ থেকে বেঁচে ফিরেছে। অন্যজন হল সেই মহিলা যে ছেঁড়া-হাত নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছিল।

ওর একটা গল্প ছিল এক রমণীর বিষয়ে। সে এই রাস্তারই একটু দূরের এক গ্রামে থাকত। তার সঙ্গে ওর আলাপ ছিল। একদিন মহিলাটি রুদ্র-প্রয়াগের বাজার থেকে ফেরার সময় গোলাবরাইয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে। ওর ভয় হল যে সে অন্ধকার হওয়ার আগে বাড়ি পেঁছিতে পারবে না।

সে তখন ওকে তীর্থশালায় রাত কাটাতে দেওয়ার জন্য পণ্ডিতকে অনুরোধ করল। পণ্ডিত অনুমতি দিল। ওকে বলল যে ও যেন গুদাম-ঘরের দরজার সামনে শোয়। সে ঘরে তীর্থযাত্রীদের কিনবার জন্য রসদ থাকত। তাহলে ওর একদিকে থাকবে ঘর এবং অন্যদিকে পঞ্চাশজন কি আরো বেশি তীর্থযাত্রী, যারা তীর্থশালায় রাত কাটাচ্ছে।

ঘরটা ছিল ঘাস এবং মাটি দিয়ে তৈরি। রাস্তার দিকটা খোলা, পাহাড়ের দিকটা তক্তামারা। গুদাম-ঘর এই ছাউনির মাঝামাঝি পাহাড়ের ভিতরে ঢোকানো। তাতে ছাউনির মেঝেতে কোনো অসুবিধা হত না। মহিলাটি যখন গুদাম-ঘরের দরজায় শুয়ে পড়ল, তখন ওর এবং রাস্তার মাঝে এক সারি তীর্থযাত্রী ছিল।

রাত্রিবেলা এক সময়ে একজন মহিলা তীর্থযাত্রী চিৎকার করে ওঠে, বলে যে ওকে কাঁকড়াবিছে কামড়েছে। কোনো আলোর ব্যবস্থা ছিল না। দেশলাই-এর আলোয় মহিলার পা দেখা হল। দেখা গেল পা একটু কেটে গেছে। সামান্য রক্ত পড়ছে। তীর্থযাত্রীরা সবাই অসন্তোষ প্রকাশ করল যে মহিলা মিছামিছি ঝামেলা করেছে। তাছাড়া কাঁকড়াবিছের কামড় থেকে রক্তপাত হয় না। এই বলে তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে আমগাছের উপরের পাহাড়ের বাড়ি থেকে পণ্ডিত নামল। সে দেখল আশ্রমের সামনে রাস্তার উপর পাহাড়ী মেয়েদের একটা শাড়ি পড়ে আছে। শাড়িতে রক্ত। পণ্ডিত ভেবেছিল যে সে তার বন্ধুকে ঘরের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাটা দিয়েছে। কিন্তু যদিও মহিলাকে ঘিরে জন পঞ্চাশ তীর্থ-যাত্রী শুয়েছিল, চিতাটা ঘুমন্ত লোকদের উপর হেঁটে গিয়ে তাকে মারে, এবং রাস্তায় ফিরবার সময় দৈবাৎ ঘুমন্ত তীর্থযাত্রীটির পা আঁচড়ে দেয়।

পণ্ডিতের ব্যাখ্যা হল যে চিতাটা বাকি তীর্থযাত্রীদের ছেড়ে ওই পাহাড়ী মহিলাটিকে নিয়ে যায় কেননা সে রঙিন পোশাক পরে ছিল। এই ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। চিতারা ঘ্রাণশক্তি দিয়ে শিকার করে না, না হলে বলতাম যে যাত্রীশালায় সব লোকদের মধ্যে ওই পাহাড়ী মহিলাটির গায়ের গন্ধটাই চিতাটার কাছে পরিচিত লেগেছিল। দুর্ভাগ্য? না অদৃষ্ট? কিংবা হয়তো ঘুমন্ত লোকদের মধ্যে ওর একার খোলা ঘরে শোয়ার বিপদের ভয়? নিহত মহিলাটির ভয়টা কি কোনো অজানা উপায়ে নরখাদকটি বুঝতে পেরেছিল? তাতেই কি ও আকৃষ্ট হয়?

এই ঘটনার কিছুদিন পরে পণ্ডিত নিজে নরখাদকের মুখোমুখি হয়। ঠিক তারিখটা বলার প্রয়োজন নেই, যদিও রুদ্রপ্রয়াগের হাসপাতালের কাগজপত্র দেখলে সেটা জানা যাবে। এই বললেই যথেষ্ট হবে, যে ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯২১ সালের গ্রীষ্মের সবচেয়ে গরম সময়ে, আমার সঙ্গে পণ্ডিতের দেখা হওয়ার চার বছর আগে।

সেই গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যার শেষের দিকে মাদ্রাজবাসী দশজন তীর্থযাত্রী ক্লান্ত এবং ক্ষত-পদ অবস্থায় গোলাব্রাইয়ে আসে এবং তীর্থশালায় রাত কাটাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। পণ্ডিতের ভয় ছিল যে গোলাব্রাইয়ে আরো লোক মারা গেলে ওর তীর্থশালার বদনাম হয়ে যাবে। পণ্ডিত তাই ওদের বলার চেষ্টা করল যে ওরা আরো দু মাইল দূরে রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় পাবে। কিন্তু ওর কোনো কথায় ক্লান্ত তীর্থযাত্রীরা রাজী হল না। শেষ পর্যন্ত ও তাদের ওর নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে রাজী হয়। বাড়িটা ছিল আম গাছটার পঞ্চাশ গজ উপরে, যে গাছটার কথা আমি আগেই বলেছি।

পণ্ডিতের বাড়িটা ভেঁসোয়ারার অন্যান্য বাড়ির ছাঁদে গড়া। নিচে একটা ঘর যেখানে জ্বালানী কাঠ জমা থাকে। উপরতলার ঘরটা থাকার জন্য। পাথরের ছোট সিঁড়ির ধাপ চলে যায় একটা সরু বারান্দায়। থাকার ঘরের দরজাটা সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপের উল্টো দিকে।

পণ্ডিত এবং ওর অযাচিত দশজন অতিথি সান্ধ্য-আহার শেষ করে নিজেদের ঘর বন্ধ করল। ঘরে বাতাস চলাচলের কোনো পথ ছিল না। ঘরের ভিতরে অসহ্য গরম, এবং রাত্রে কোনো সময়ে পণ্ডিতের মনে হল যে ওর দম আটকে যাবে।

সে তখন দরজা খুলে বাইরে এসে সিঁড়ির দুপাশের থাম ধরে দাঁড়ায়। যে থামের ওপর বারান্দার ছাদটা দাঁড়িয়ে আছে। সে বুক ভরে রাতের হাওয়া টেনে নেয়, এবং ওর গলাটা কে যন্ত্রে চেপে ধরে।

ও তখন থামদুটি ধরে আততায়ীর গায়ে পায়ের পাতা লাগিয়ে এক মরিয়া লাথিতে চিতাটার দাঁত নিজের গলা থেকে খুলে ফেলে এবং সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দেয়। অজ্ঞান হয়ে যাবে এই ভয়ে ও এক পাশে ঘুরে বারান্দার রেলিং দু-হাত দিয়ে ধরে।

সেই মুহূর্তে চিতাটা আবার নিচ থেকে লাফ দিয়ে ওর বাঁ-হাতে নখ বসিয়ে দেয়। নিচের দিকে টান পড়তে ওর রেলিং-এ রাখা হাতটা বাধা দেয়।

চিতাটার দেহের ভারে নখগুলি কব্জি পর্যন্ত মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে।

চিতাটা দ্বিতীয়বার লাফাবার আগে তীর্থযাত্রীরা পণ্ডিতের ছেঁড়া গলা দিয়ে নিশ্বাস নেওয়ার ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পায়। ওরা ওকে ঘরের ভিতরে

টেনে দরজায় ছিটকিনি মেরে দেয়। সেই দীর্ঘ গরম রাতের বাকিটুকু পণ্ডিত নিশ্বাসের জন্য হাঁপাতে থাকে, ক্ষত থেকে অঝোরে রক্তপাত হয়। এ-দিকে চিতাটা গর্জন করে ঠুনকো দরজাটা আঁচড়াতে থাকে। তীর্থযাত্রীরা সন্ত্রাসে আর্তনাদ করতে থাকে।

দিন হতে তীর্থযাত্রীরা সৌভাগ্যবশত অচেতন পণ্ডিতকে বয়ে নিয়ে যায় রুদ্রপ্রয়াগের কালাকমলী হাসপাতালে। সেখানে তিন মাস তাকে খাওয়ানো হয় গলায় রুপোর নল ঢুকিয়ে। ছ-মাসের অনুপস্থিতির পর সে তার গোলাবরাইয়ের বাড়িতে ফিরে আসে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে।

ওর চুলও সব পেকে গিয়েছিল। পাঁচ বছর পরে তোলা ছবিতে পণ্ডিতের মুখের বাঁদিকে, গলায় দাঁতের দাগ এবং হাতে নখের দাগ দেখা যায় নি। যদিও সেগুলি এমনিতে স্পষ্ট দেখা যেত।

আমার সঙ্গে আলোচনার সময় পণ্ডিত নরখাদককে সব সময়ে দুষ্ট আত্মা বলত। প্রথম দিনে সে বলেছিল যে ওর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কি প্রমাণ দিতে পারি যে দুষ্ট আত্মারা দৈহিক আকার ধারণ করতে পারে না? আমিও সেই জন্য নবখাদকটাকে দুষ্ট আত্মা বলে ডাকতাম।

সেই সন্ধ্যায় গোলাবরাইয়ে পেঁাছে আমি পণ্ডিতকে ভৈঁসোয়ারার নিষ্ফল যাত্রার কথা বললাম। ওকে সাবধান করে দিলাম যে ও যেন নিজের এবং ওর তীর্থশালার আশ্রয়প্রার্থী তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়। কেননা সেই দুষ্ট আত্মা দীর্ঘদিন পাহাড়ে কাটিয়ে আবার এই এলাকায় ফিরেছে।

সেই রাত্রে এবং পর-পর আরো তিন রাত আমি খড়ের গাদায় বসে রাস্তার উপর নজর রাখলাম। চতুর্থ দিনে ইবটসন পাউরি থেকে ফিরল।

ইবটসন সবসময় আমাকে নতুন করে প্রাণবন্ত করত। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে ওরও মতবাদ একই. যে নরখাদকটা যে গতকাল মরে নি তার জন্য কারুর দোষ নেই। কেননা সেটা আজ না হয় আগামীকাল মরবে। ওকে সব খবর এবার বললাম। যদিও আমি ওকে নিয়মিতভাবে চিঠি লিখতাম, এবং চিঠিগুলির কিছু-কিছু অংশ ওর গভরমেন্টের কাছে পাঠানো রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করা হত, এবং সেখান থেকে সংবাদপত্রে ছাপানো হত। তবুও, যেগুলি শুনবার জন্য ওর আগ্রহ ছিল, ওকে সব খুঁটিনাটি বলতে পারি নি।

ইবটসনেরও আমাকে অনেক কিছু বলার ছিল। সংবাদপত্রে নরখাদকটাকে মারা নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছে, এবং তারা প্রস্তাব করেছে যে ভারতবর্ষের নানান অঞ্চল থেকে শিকারীদের গাড়োয়ালে গিয়ে চিতাটাকে মারতে সাহায্য করা উচিত। এই সংবাদপত্রের প্রচারের ফল হল যে ইবটসনের কাছে একজন মাত্র খবর নেয় এবং আরেকজন একটি প্রস্তাবই করে।

খবর নেয় একজন শিকারী। সে বলে, যদি তার আসাযাওয়া, থাকা এবং খাবারের সুবন্দোবস্ত করা হয় সে ভেবে দেখতে পারে যে গাড়োয়ালে আসাটা পোষাবে কিনা। আর, প্রস্তাব করে একজন বলে, চিতাটাকে মারার সবচেয়ে সহজ এবং ত্বরিত পদ্ধতি হল একটা ছাগলের গায়ে আর্সেনিক মাখিয়ে তার মুখ সেলাই করে দিতে হবে যাতে সে নিজেকে চাটতে না পারে। তাকে এক জায়গায় বেঁধে রাখলে চিতাটা ওকে দেখে খেয়ে ফেলবে এবং বিষক্রিয়ায় মারা যাবে।

সেদিন আমরা অনেক কথা বলাবলি করলাম। আমার বহু অকৃতকার্য চেষ্টা খুঁটিয়ে বিচার করা হল। লাঞ্চ খেতে-খেতে আমি ইবটসনকে বললাম যে চিতাটা প্রতি পাঁচ দিন অন্তর একবার রুদ্রপ্রয়াগ এবং গোলাব্‌রাইয়ের রাস্তায় আসাযাওয়া করে। আমি ওকে বোঝালাম যে আমার চিতাটাকে মারার শেষ আশা হল রাস্তার ধারে দশ রাত বসে থাকা।

আমি বললাম যে এই সময়ের মধ্যে চিতাটা রাস্তাটা অন্তত একবার ব্যবহার করবেই। ইবটসন অনিচ্ছাসত্ত্বে আমার পরিকল্পনায় রাজী হল, কেননা আমি এর মধ্যে বহু রাত জেগেছি, এবং আরো দশ রাত জাগা আমার পক্ষে খুব কষ্টকর হবে।

শেষ পর্যন্ত আমার কথাই রইল। আমি এবার ইবটসনকে বললাম যে এই সময়ের মধ্যে আমি যদি চিতাটাকে না-মারতে পারি আমি নৈনিতাল ফিরে যাব। অন্য নতুন শিকারীরা তখন ইচ্ছামত আমার জায়গা নিতে পারে।

সেই সন্ধ্যায় ইবটসন আমার সঙ্গে গোলাব্‌রাইয়ে এসে একটা আমগাছে মাচান খাটাবার সময়ে আমাকে সাহায্য করল। আমগাছটা তীর্থশালা থেকে একশো গজ দূরে, এবং পণ্ডিতের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ নিচে। গাছটার ঠিক নিচে, রাস্তার মাঝখানে শক্ত কাঠের খুঁটি পুঁতলাম। তার সাথে একটা ছাগল বাঁধলাম। সেটার গলায় ঘণ্টা বাঁধা ছিল।

চাঁদ প্রায় পূর্ণিমার কাছাকাছি, তবুও গোলাব্‌রাইয়ের পূবের উঁচু পাহাড়ের জন্য এই গভীর গঙ্গা-উপত্যকা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য চাঁদের আলো পায়। যদি অন্ধকার হতে চিতাটা আসে ছাগলটাই আমাকে ওর আগমনের বিষয়ে সতর্ক করবে।

আয়োজন শেষ হওয়ার পর ইবটসন বাংলোয় ফিরে গেল। বলে গেল যে ভোর হলে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার দু-জন লোককে পাঠাবে। গাছের নিচে একটা পাথরের উপর বসে আমি ধূমপান করতে করতে সন্ধ্যা ঘনাবার জন্য অপেক্ষা করলাম। পণ্ডিত এসে আমার পাশে বসল।

সে ভক্তি সম্প্রদায়ের লোক, ধূমপান করে না। সন্ধ্যার আগে সে আমাকে সারা রাত গাছে বসে থাকা থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করল। কেননা আমি

ইচ্ছা করলে আরাম করে বিছানায় ঘুমাতে পারি। আমি ওকে ভরসা দিলাম যে আমি রাতটা গাছেই কাটাব, এবং পরের আরো নয় রাতও ওইভাবেই যাবে।

আমি যদি দুষ্ট আত্মাকে মারতে না পারি, অন্ততপক্ষে আমি ওর বাড়ি পাহারা দিতে পারব এবং ওর তীর্থশালার যে-কোনো শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারব।

আমার উপরের পাহাড় থেকে রাত্রে একবার কাকার হরিণ ডাকল। তারপর রাত আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পর দিন সূর্যোদয়ে আমার দুটি লোক এল। আমি ইন্‌সপেক্‌শন বাংলোর দিকে যেতে-যেতে রাস্তাটায় থাবার ছাপ আছে কি না, দেখতে লাগলাম। পিছনে আমার লোকরা কম্বল এবং রাইফেল বয়ে আনল।

পরের ন-দিন আমার কর্মসূচীতে কোনো ব্যত্যয় ঘটে নি। সন্ধ্যা হতে-হতে আমি দু-জন লোক নিয়ে বাংলো থেকে বেরোতাম। মাচানে উঠে তাদের সময় থাকতে পাঠিয়ে দিতাম। যাতে ওরা সন্ধ্যা ঘনাবার আগে বাংলোয় ফিরতে পারে। ওদের উপর কড়া হুকুম ছিল, যে ওরা যেন পুরো আলো হওয়ার আগে বাংলো থেকে না-বেরোয়। প্রতি সকালে নদীর ওপারের পাহাড়ে সূর্যোদয় হলে ওরা আসত এবং আমার সঙ্গে বাংলোয় ফিরত।

এই দশ রাতে প্রথম রাতের কাকারের ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যায় নি। নরখাদকটা যে এলাকাতেই আছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছিলাম। এই দশ রাতের মধ্যে সে দু-বার কয়েকটি বাড়িতে ঢুকেছিল। প্রথমবার সে একটা ছাগল তুলে নিয়ে যায়, দ্বিতীয়বার একটা ভেড়া।

দুটি মড়িকে খুঁজতে আমায় বেগ পেতে হয়েছিল কেননা দুটোকেই অনেক দূর টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং দুটোকেই এমন নিঃশেষে খাওয়া হয়েছিল, যে ওগুলি আমার কোনো কাজে আসে নি।

এই দশ রাতের মধ্যে চিতাটা একটা বাড়ির দরজা ভেঙে ঢোকে। গৃহ-বাসীদের সৌভাগ্য যে বাড়িতে দুটি ঘর ছিল, এবং ভিতরের ঘরের দরজাটা চিতাটার আক্রমণ রুখবার পক্ষে যথেষ্ট মজবুত ছিল।

আমগাছে দশম রাত কাটাবার পর বাংলোয় ফেরার পর আমি ও ইবটসন আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলাম। সেই শিকারীর কাছ থেকে আর কোনো চিঠি আসে নি। কেউই গভরমেন্টের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করে নি। এবং সংবাদপত্রের আবেদনে কেউ সাড়া দেয় নি।

আমার এবং ইবটসনের রুদ্রপ্রয়াগে আর সময় কাটানো সম্ভব ছিল না। ইবটসন দশ দিন ধরে ওর সদর শহর পাউরির বাইরে আছে। আমারও আফ্রিকায় কাজ আছে এবং আমি আমার যাওয়া তিন মাস পিছিয়েছি। আর দেরি করা

সম্ভব ছিল না। গাড়োয়ালকে নরখাদকের দয়ার ওপর ফেলে যেতে আমাদের দু-জনেরই অনিচ্ছা। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে আমরা কি করব ঠিক করতে পারছিলাম না।

এক উপায় ছিল যে ইবটসন ছুটির দরখাস্ত করে, এবং আমি যা খেসারত দেওয়ার দিয়ে আফ্রিকা যাওয়ার টিকেট বাতিল করে দিই। আমরা শেষে ঠিক করলাম যে রাতে কোনো সিদ্ধান্ত নেব না, বরং সকালে উঠে মনস্থির করব। এই সিদ্ধান্তে এসে আমি ইবটসনকে বললাম যে গাড়োয়ালে আমার শেষ রাতটা আমগাছে কাটাব।

ইবটসন এই একাদশ এবং শেষ সন্ধ্যায় আমাকে সঙ্গ দিল। গোলাব্‌রাইয়ের কাছে এসে দেখলাম একদল লোক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমগাছের পিছনের মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকগুলি আমাদের দেখতে পায় নি এবং আমরা ওদের কাছে পৌঁছবার আগে তীর্থশালার দিকে যেতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন ফিরে তাকিয়ে দেখল আমি হাতছানি দিয়ে ডাকছি। সেই দেখে ও ফিরে এল। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ও বলল যে ও এবং ওর সঙ্গীরা এক ঘণ্টা ধরে মাঠের মধ্যে দুটি বড় সাপের লড়াই দেখছিল।

দেখে মনে হল যে গত এক বছর কি তার বেশি দিন ওখানে কোনো ফসল ফলে নি। মাঠের মাঝখানে একটা বড় পাথরের কাছে সাপদুটিকে দেখা গিয়েছিল। পাথরের উপর রক্তের দাগ ছিল। লোকটা বলল ও সাপগুলির রক্ত। ওরা পরস্পরকে কামড়েছে এবং ওদের দেহের বহু জায়গা থেকে রক্তপাত হচ্ছে। আমি পাশের একটা ঝোপ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে মাঠে নেমে দেখতে গেলাম পাথরটার কাছে, কোনো গর্ত আছে কি-না, এবং সেই সময় রাস্তার ঠিক নিচের একটা ঝোপের ভিতরে সাপদুটিকে দেখতে পেলাম।

ইবটসনও একটা শক্ত লাঠি যোগাড় করে ফেলেছিল, যেমনি একটা সাপ রাস্তায় উঠবার চেষ্টা করল ইবটসন সেটাকে মেরে ফেলল। অন্যটা একটা উঁচু মাটির স্তূপের মধ্যে একটা গর্তে ঢুকে গেল। সেখান থেকে আমরা সেটাকে বার করতে পারলাম না। ইবটসন যে সাপটাকে মেরেছে সেটা সাত ফুট লম্বা, এবং গায়ের রং হালকা খড়ের মত। সেটার ঘাড়ে অনেকগুলি কামড় লেগেছিল। ওটা দাঁড়াস সাপ নয়। ওটার বেশ বড় বিষদাঁত ছিল।

তাই মনে হল যে ওটা এক ধরনের ফণাহীন গোখরো সাপ। শীতল-রক্ত জীবরা সাপের বিষ থেকে অনাক্রম্য নয়। আমি দেখেছি একটা ব্যাঙকে গোখরোর কামড়ে কয়েক মিনিটের ভিতরে মারা যেতে। তবে আমি জানি না এক শ্রেণীর সাপরা পরস্পরকে বিষ দিয়ে ঘায়েল করতে পারে কিনা। যে সাপটা গর্তে ঢুকেছে সেটা হয়তো কয়েক মিনিটের ভিতরে মরে যায় কিংবা হয়তো বেঁচে গিয়ে পরে জরাগ্রস্ত হয়ে মারা যায়।

ইবটসন চলে যাওয়ার পরে পণ্ডিত আমার গাছের নিচে দিয়ে এক বালতি দুধ নিয়ে তীর্থশালার দিকে গেল। ও বলল যে সেই দিন দেড়শো তীর্থযাত্রী এসেছে এবং তারা ওর আশ্রয়ে রাত কাটাতে বদ্ধপরিকর। ও ওদের সেই সংকল্পের বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীন। আমার পক্ষে কিছু করার আর সময় ছিল না। আমি ওকে বললাম তীর্থযাত্রীদের সতর্ক করে দিতে যে ওরা যেন দলবদ্ধ হয়ে থাকে এবং অন্ধকার হয়ে গেলে যেন চলাফেরা না করে। ও কয়েক মিনিট পরে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফিরবার সময় বলে গেল যে ও তাদের সতর্ক করে দিয়েছে।

আমার গাছ থেকে প্রায় একশো গজ দূরে রাস্তার পাশে এক মাঠে একটা কাঁটা ঝোপের ঘেরা জায়গা ছিল। সেখানে একজন মালবাহক—আমার সেই পুরনো বন্ধু নয়—সন্ধ্যার আগে ওর ছাগল এবং ভেড়ার পাল ঢুকিয়েছিল। মালবাহকটির সঙ্গে দুটি কুকুর ছিল। আমরা যখন রাস্তা ধরে আসি ওদুটি আমাদের দেখে প্রচণ্ডভাবে ঘেউ ঘেউ করেছিল, এবং ইবটসনকে দেখে আমাকে ছেড়ে বাংলোয় ফিরে যায়।

পূর্ণিমা কয়েক দিন আগে হয়ে গেছে। উপত্যকা অন্ধকারে ঢাকা। রাত ন-টার একটু পরে আমি দেখলাম একজন লোক লণ্ঠন হাতে তীর্থশালার বাইরে এসে রাস্তা পার হল। দু-এক মিনিট পরে সে আবার রাস্তা পার হয়ে আশ্রয়ে ঢুকবার সময় লণ্ঠনটা নেভাল। ঠিক এই সময় মালবাহকের কুকুরদুটি অভ্রান্তভাবে চিতাটার দিকে মুখ করে ডাকছিল। চিতাটা সম্ভবত লণ্ঠন হাতে লোকটাকে দেখেছে, এবং এখন রাস্তা ধরে যাত্রীশালার দিকে আসছে।

প্রথমে কুকুরদুটি রাস্তার দিকে তাকিয়ে ডাকছিল। একটু পরে ওরা ঘুরল এবং আমার দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগল। তার মানে চিতাটা নিশ্চয় ঘুমন্ত ছাগলটাকে দেখেছে এবং কুকুরদুটির দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।

কুকুরদুটি ডাক থামিয়েছে। চিতাটা নিশ্চয় এবার কি চাল চালবে, ভাবছে। আমি জানতাম যে চিতাটা এসেছে, আর এটাও জানতাম যে আমার গাছের আড়াল থেকে ছাগলটাকে অকস্মাৎ আক্রমণ করবে।

দীর্ঘ মিনিটগুলি কেটে যাচ্ছিল। যে প্রশ্নটা আমাকে উত্ত্যক্ত করছিল, সেটা হল, যে চিতাটা কি ছাগলটাকে ছেড়ে তীর্থযাত্রীদের একজনকে মারবে না ও ছাগলটাকে মেরে আমাকে গুলি করার সুযোগ দেবে।

এতগুলি রাত গাছে কাটিয়ে আমি একটা কায়দা শিখেছিলাম, যার ফলে ন্যূনতম নড়াচড়া এবং সময়ের মধ্যে রাইফেল চালাতে পারতাম। আমার মাচান এবং ছাগলটার মধ্যে ব্যবধান প্রায় কুড়ি ফুট, কিন্তু গাছের ঘন ডালপালার নিচে রাত এত অন্ধকার লাগছিল আমি অনেক চেষ্টা করেও এত অল্প দূরত্বেও

ঠিক দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি চোখ বন্ধ করে কানদুটি সজাগ করলাম।

আমার রাইফেলে একটা ছোট ইলেকট্রিক টর্চ লাগানো ছিল। রাইফেলের নিশানা ছাগলটার দিকে। আমি ভাবতে শুরু করলাম যে চিতাটা—যদি অনুমান করা যায় ওটাই নরখাদকটা—যাত্রীশালায় ঢুকে মানুষ শিকার করা স্থির করছে। ঠিক এই সময়ে গাছের নিচে থেকে কে যেন ছুট মারল। ছাগলের ঘণ্টা তীক্ষ্ন সুরে বেজে উঠল। টর্চের বোতাম টিপে দেখলাম যে রাইফেলের মাছি চিতাটার কাঁধের উপর নিবন্ধ, এবং আমি রাইফেল এক ইঞ্চিও না সরিয়ে ঘোড়া টিপলাম। টর্চ নিভে গেল।

আজকালের মতন সেকালে টর্চের এত প্রচলন ছিল না। এই টর্চটা আমার প্রথম কেনা। ওটা বহু মাস ধরে বয়ে বেড়িয়েছি। ব্যবহার করার কোনো সুযোগ হয় নি। ব্যাটারির আয়ু জানা ছিল না, এবং সেটা পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে কিনা জানতাম না। এবার যখন বোতাম টিপলাম, টর্চটা একটু ক্ষীণ আলো জ্বালিয়ে নিভে গেল। আমি আবার অন্ধকারে। জানতেও পারলাম না আমার গুলির কোনো ফলাফল হল কিনা।

আমার গুলির আওয়াজের প্রতিধ্বনি উপত্যকায় মিলিয়ে গেল। পণ্ডিত দরজা খুলে হেঁকে প্রশ্ন করল আমার কোনো সাহায্য দরকার আছে কিনা। আমি কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করছিলাম চিতাটা কোনো আওয়াজ করছে কি না। সেই জন্য আমি কোনো জবাব দিলাম না। ও তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

আমি যখন গুলি করি তখন চিতাটা রাস্তার উপর। মাথা অন্য দিকে ঘুরিয়ে রেখেছিল। আমার অস্পষ্টভাবে মনে হল যে ও ছাগলটার উপর দিয়ে লাফিয়ে পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে গেছে। পণ্ডিত ডাকার ঠিক আগে আমার মনে হল যে আমি একটা গলার ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনেছিলাম। তবে আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না।

আমার গুলির আওয়াজে তীর্থযাত্রীরা জেগে উঠেছিল। কয়েক মিনিট নিচু গলায় কথা বলে ওরা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ছাগলটা মনে হল আহত হয় নি, কেননা ওর ঘণ্টার আওয়াজ শুনে মনে হল যে ওটা চলাফেরা করে ঘাস খাচ্ছে। ওকে প্রত্যেক রাত্রে প্রচুর পরিমাণে ঘাস দেওয়া হয়।

আমি রাত দশটায় গুলি চালিয়েছি। চাঁদ উঠতে এখনো কয়েকঘণ্টা বাকি। ইতিমধ্যে কিছু করার নেই বলে আমি আরাম করে বসে কান পেতে ধূমপান করলাম।

কয়েক ঘণ্টা পরে চাঁদ উঠল। গঙ্গার ওপারের পর্বতশিখরগুলি আলোকিত করল। উপত্যকা গড়িয়ে চলে এল, একটু পরে আমার পিছনের পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা দিল।

চাঁদ মাথার উপর উঠতে আমি গাছের মগডালে উঠলাম, কিন্তু ছড়ানো ডালপালার জন্য ঠিক দেখতে পেলাম না।

আবার মাচানে নামলাম, রাস্তার উপরে ছড়ানো ডালে উঠলাম, কিন্তু এখান থেকেও পাহাড়ের যে দিকে চিতাটা গেছে বলে মনে হল সেদিকটা দেখা যাচ্ছিল না। তখন বাজে রাত তিনটা। দু-ঘণ্টা পরে চাঁদ অস্ত যেতে লাগল। পূবে আকাশে ঊষা জন্ম নিল। কাছের জিনিসগুলি দেখা গেল। আমি গাছ থেকে নামলাম। ছাগলটা বন্ধুসুলভ গলায় ডেকে আমাকে অভ্যর্থনা করল।

ছাগলটার পিছনে, রাস্তার ধারে, একটা নিচু লম্বা পাথর। পাথরের উপর একইঞ্চি চওড়া রক্তের দাগ। যে চিতাটার গা থেকে এই রক্ত পড়েছে, সে নিশ্চয় দু-এক মিনিট মাত্র বেঁচেছে।

যে সতর্কতা সাধারণত মাংসাশী পশুর রক্তের দাগ অনুসরণ করতে গেলে অবলম্বন করতে হয়, আমি তা উড়িয়ে দিলাম।

রাস্তা থেকে নামলাম, পাথরের অন্য পাশে রক্তের দাগ দেখলাম, পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত অনুসরণ করলাম। দেখলাম চিতাটা মরে পড়ে আছে। ও জমির একটা গর্তে লেজের দিক দিয়ে পিছলে পড়ে গেছে। তার মধ্যে গুটিসুটি মেরে আছে। গর্তের ধারে থুতনিটা।

মৃত জন্তুটাকে শনাক্ত করার মত কোনো দাগ দেখা যাচ্ছিল না। তবুও আমার এক মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হয় নি যে গর্তে পড়ে থাকা চিতাটাই নরখাদকটা। এ কোনো পিশাচ নয়, যে দীর্ঘ রাতের প্রহর ধরে আমাকে লক্ষ করেছে। ওকে কাবু করবার আমার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নিঃশব্দ পৈশাচিক হাসিতে গড়াগড়ি দিয়েছে। সেই সুযোগের আশায় ঠোঁট চেটেছে, যখন আমাকে অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে আমার গলায় দাঁত বসাবে।

এখানে পড়ে আছে একটি বুড়ো চিতা, অন্য চিতাদের সঙ্গে ওর এইমাত্র তফাত, যে ওর মুখটা ধূসর, ঠোঁটের উপর গোঁফ নেই। ভারতবর্ষে সবার চেয়ে ঘৃণ্য এবং সন্ত্রাসসঞ্চারকারী জন্তু, যার একমাত্র অপরাধ—প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু মানুষের নিয়মের বিরুদ্ধে—সে মানুষের রক্তপাত করেছে। মানুষকে আতঙ্কিত করার জন্য নয়, শুধু নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য।

সে এখন গর্তের ধারে থুতনি রেখে শুয়ে আছে, চোখদুটি আধবোজা, তার শেষ ঘুমে শান্তিতে মগ্ন।

আমি দাঁড়িয়ে আমার রাইফেল গুলিশূন্য করলাম যে রাইফেলের একটি গুলিতে ঘুমন্ত জীবটির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত হিসাব চুকে গেছে। একটা কাশির শব্দ শুনলাম। উপর দিকে চেয়ে দেখলাম পণ্ডিত রাস্তার ধার থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি হাতছানি দিতে সে সন্তর্পণে পাহাড় বেয়ে নামল। চিতাটার মাথা

দেখে সে থামল, ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল যে সেটা মৃত কি না। এবং সেটা কি!

আমি যখন বললাম যে সেটা মৃত, এবং সেটা হল সেই দুষ্ট আত্মা যে পাঁচ বছর আগে ওর গলা ছিঁড়ে দিয়েছিল, যার ভয়ে সে গত রাত্রে দরজা বন্ধ করেছিল। ও হাতজোড় করে আমার পায়ে মাথা ঠেকাতে গেল। পরের মিনিটেই রাস্তা থেকে ডাক এল "সাহেব, তুমি কোথায়?"

আমার একজন লোক উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে ডাকছে। আমার উত্তর, গঙ্গার উপর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। চারটি মাথা দেখা গেল। আমাদের দেখে চারজন লোক হুড়মুড় করে পাহাড় বেয়ে নামল। একজনের হাতে লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনটা সে নেভাতে ভুলে গেছে।

চিতাটা গর্তের মধ্যে শক্ত হয়ে জমে গিয়েছিল। ওকে বার করতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। ওকে লোকদের আনা শক্ত বাঁশের লম্বা ডান্ডায় বাঁধা হল। ওরা বলল যে ওরা রাত্রে ঘুমোতে পারে নি। ইবটসনের জমাদারের ঘড়িতে সাড়ে চারটা বাজতে দেখেই ওরা লণ্ঠন জ্বালিয়ে, হাতে লম্বা ডান্ডা এবং একগাছা দড়ি নিয়ে আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে।

কেননা ওদের ধারণা হয়েছিল যে আমার ওদেরকে দরকার। আমাকে মাচানে না দেখে, ছাগলটাকে অনাহত দেখে, এবং পাথরে রক্তের দাগ দেখে ওরা ধরে নিল যে নরখাদকটা আমাকে মেরে ফেলেছে। ওরা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মরিয়া হয়ে আমাকে ডাকল।

পণ্ডিতকে রেখে এলাম মাচান থেকে আমার কম্বলটা উদ্ধার করতে এবং ভিড়-করা তীর্থযাত্রীদের রাত্রের ঘটনা বিষয়ে ওর কাহিনী শোনাতে। চারজন লোক এবং আমি—আমার পাশে ছাগল—ইন্‌সপেক্‌শন বাংলোর দিকে চললাম। যে মুহূর্তে চিতাটা ছাগলটাকে ধরেছিল, সেই মুহূর্তেই আমি গুলি করার জন্য ছাগলটা বেশী আহত হয় নি। সে জানত না যে ওর রাতের অ্যাডভেঞ্চারের জন্য সে সারা জীবনের মত বিখ্যাত হয়ে থাকবে। ওর গলায় থাকবে পিতলের আংটা, এবং যার কাছ থেকে ওকে আমি কিনেছিলাম সেই লোকটির আয়ের একটি উৎস হয়ে দাঁড়াবে ও। কেননা আমি ছাগলটা ফেরত দিয়েছিলাম।

আমি যখন ঘষা কাঁচের দরজায় টোকা মারলাম ইবটসন ঘুমাচ্ছিল। আমাকে দেখে ও খাট থেকে লাফিয়ে উঠে দরজার কাছে দৌড়ে এল। দড়াম করে দরজা খুলে আমাকে জড়িয়ে ধরল। পরের মিনিটে ও লোকদের বারান্দায় রাখা চিতাটার চারপাশে নাচতে লাগল।

চিৎকার করে চা বানাতে বলল, আমার জন্য গরম জল করতে বলল, স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে গভর্নমেণ্ট, সংবাদপত্র, আমার বোন এবং জীনকে তার পাঠাল।

ও একটাও প্রশ্ন করল না, কেননা ও জানত যে এই সকালে যে চিতাটাকে আমি এনেছি সেটা নরখাদকটা—কোনো প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। আগের বার, বহু প্রমাণ সত্ত্বেও, আমি বলেছিলাম যে জাঁতিকলে পড়া চিতাটা নরখাদক নয়। এবার আমি কিছু বললাম না।

গত বছরের অকটোবর মাস থেকে ইবটসন খুব গুরুভার দায়িত্ব বয়ে বেড়াচ্ছিল, কেননা নির্বাচকদের সন্তোষপ্রয়াসী কাউন্সিলার, ক্রমবর্ধমান মৃত-সংখ্যাতে উদ্বিগ্ন সরকারী কর্মচারী, সাফল্য প্রয়াসী সংবাদপত্র এদের সবার প্রশ্নের জবাব ওকেই দিতে হয়েছিল।

বহুদিন ধরে ওর অবস্থা পুলিসের বড়কর্তার মত হয়েছিল, যে, কোনো দাগী অপরাধীর পরিচয় জানা সত্ত্বেও, তারদ্বারা কৃত অপরাধগুলি বন্ধ করতে পারছিল না। আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই যে ১৯২৬ সালের মে মাসের দু' তারিখে ইবটসনের মত সুখী লোক আমি আর দেখি নি, কেননা সে কর্তৃপক্ষ ছাড়া, বাজারের লোক আশেপাশের গ্রামবাসী, তীর্থযাত্রী, এবং ইন্সপেক্শন বাংলোর মাঠে ভিড় করা সব লোকদের বলতে পেরেছিল যে, যে দুষ্ট আত্মা ওদের দীর্ঘ আট বছর ধরে উৎপীড়ন করেছে আজ সে মৃত।

এক পট্ চা খেয়ে, গরম জলে স্নান করে আমি একটু ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পা অসাড় হয়ে খিঁচ ধরার ভয়ে আমি উঠে পড়লাম—যে খিঁচুনি থেকে একমাত্র ইবটসনের জোর মালিশ আমাকে বাঁচায়। ইবটসন এবং আমি চিতাটাকে মাপলাম, ভাল করে নিরীক্ষণ করলাম। আমাদের মাপ এবং নিরীক্ষণের ফলাফল এবার লিখছিঃ—

মাপ

খুঁটির মধ্যে মাপ	—	সাত ফুট, ছয় ইঞ্চি
দেহের বক্রতা সুদ্ধ মাপ	—	সাত ফুট, দশ ইঞ্চি

(দ্রষ্টব্যঃ চিতাটার মৃত্যুর বার ঘণ্টা পরে মাপ নেওয়া হয়েছিল)।

বর্ণনা

রঙ	—	হালকা খড়ের মত
লোম	—	ছোট, শক্ত
গোঁফ	—	ছিল না
দাঁত	—	ক্ষয়প্রাপ্ত, বিবর্ণ, একটা বড় দাঁত ভাঙা
জিভ এবং মুখের ভিতর	—	কাল
ক্ষত	—	ডান কাঁধে তাজা গুলির আঘাত।

পিছনের বাঁ পায়ের থাবায় পুরনো গুলির আঘাত, একই থাবা থেকে একটি আঙুলের কিছুটা অংশ এবং নখ ছিল না।

মাথায় অনেক গভীর এবং অল্প শুকানো কাটা দাগ।

পিছনের ডান পায়ে একটা গভীর এবং অল্প শুকানো কাটা দাগ।

লেজে অনেক অল্প শুকানো কাটা দাগ।

পিছনের বাঁ পায়ের হাঁটুর উপরে অল্প শুকানো কাটা দাগ।

চিতাটার জিভে এবং মুখের ভিতরটা কেন কাল ছিল বলতে পারব না। বলা হয়েছিল যে এটা সায়ানাইডের প্রতিক্রিয়ায় হয়েছিল। তবে সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। অল্প শুকানো ক্ষতগুলির মধ্যে মাথা, পিছনের ডান পা এবং লেজের ক্ষতগুলি ভৈঁসোয়ারার লড়াইয়ের ফল।

পিছনের বাঁ পায়ে হাঁটুরটা জাতিকলে পড়ে, কেননা আমরা যে একগোছা লোম এবং চামড়ার অংশ পেয়েছিলাম সেগুলি এই ক্ষতে ঠিক মাপসই হয়ে বসে গেল। পিছনের বাঁ পায়ের থাবার ক্ষতটা হয়েছিল, যখন ১৯২১ সালে পুলের উপর যুবক আর্মি-অফিসার ওকে গুলি করে। চিতাটার চামড়া ছাড়াতে গিয়ে দেখলাম বুকের চামড়ার নিচে অনেকগুলি ছররাগুলি বিঁধে আছে। একজন দেশীয় খ্রীষ্টধর্মী বহু বছর পরে বলে যে, যে-বছর চিতাটা নরখাদক হয় তার আগের বছর ও চিতাটাকে গুলি করেছিল।

ইবটসন এবং আমি চিতাটাকে মাপ এবং পরীক্ষা করে গাছের ছায়ায় শুইয়ে দিলাম। সারাদিন ধরে হাজার-হাজার পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশুরা ওকে দেখতে এল।

আমাদের পাহাড়ী লোকরা যখন কোনো লোকের কাছে কোনো বিশেষ কারণে আসে, যেমন তাদের কৃতজ্ঞতা দেখাতে, কিংবা ধন্যবাদ জানাতে, ওদের প্রথা হল খালি হাতে না আসা। একটি গোলাপ, একটি গাঁদা, কিংবা এই ফুলদুটির যে কোনো একটির কয়েকটি পাপড়িতে কাজ হয়ে যায়, এবং শ্রদ্ধার্ঘ্যটি দুহাতে অঞ্জলি করে দিতে হয়। গ্রহীতা শ্রদ্ধার্ঘ্যটিকে ডান হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে ছোঁয়ার পর যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে আসে, সে যেন সেটি গ্রহীতার পায়ে—দুহাতে অঞ্জলি করে জল ঢালার মত করে ঢেলে দেয়।

আমি এর আগেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার দেখেছি, কিন্তু সেই দিন রুদ্রপ্রয়াগের ইন্‌সপেক্‌শন বাংলো এবং পরে বাজারে যেমন দেখেছিলাম, সে-রকম কখনো দেখি নি।

"আমাদের একমাত্র ছেলেকে মেরেছে, সাহেব, আমরা বুড়ো হয়েছি—আমাদের ঘর খাঁ-খাঁ করছে।"

"আমার পাঁচ সন্তানের মা-কে খেয়েছে। ছোটটার মাত্র কয়েক মাস বয়স। বাচ্চাদের দেখবার জন্য ঘরে কেউ নেই—রান্না করবার কেউ নেই।"

"আমার ছেলের রাত্রে অসুখ করে। ভয়ে কেউ হাসপাতালে ওষুধ আনতে যেতে পারে নি। ও মারা যায়।"

একটির পর একটি করুণ কাহিনী আমি শুনতে থাকলাম। আমার পায়ের নিচের মাটি ফুলে ভরে উঠল।



২৫

শেষ কথা

যে ঘটনাগুলোর বর্ণনা করলাম সেগুলো ঘটেছিল ১৯২৫-২৬ সালে। ষোল বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৪২ সালে, যুদ্ধের কাজে মীরাটে আছি, এক উদ্যান-পার্টিতে, আহত সৈনিকদের আপ্যায়নে সাহায্য করতে কর্নেল ফ্লাই আমাকে ও আমার বোনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমাগত পঞ্চাশ ষাট জন সৈনিক একটা টেনিস কোর্টের চারদিকে বসে ছিল। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছিলাম তখন সবে চা জলখাবার শেষ হয়ে ধূমপানের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। কোর্টের দুই বিপরীত প্রান্ত থেকে আমি ও আমার বোন অভ্যাগতদের মধ্যে ঘুরতে লাগলাম।

সৈনিকদের সকলেই মধ্য-প্রাচ্য থেকে এসেছিল, কিছুদিন বিশ্রামের পর তাদের কাউকে ছুটি দিয়ে, কাউকে বা কাজ থেকে অবসর দিয়ে নিজের নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মিসেস ফ্লাই গ্রামোফোন রেকর্ডে ভারতীয় সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। পার্টি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে ও আমার বোনকে থেকে যেতে অনুরোধ করা হয়েছিল।

কাজেই ঘুরে-ঘুরে আহত সৈনিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার মত ঘণ্টা-দুই সময় আমরা পেয়েছিলাম।

অর্ধেকটা ঘোরার পর একটি তরুণের সামনে এসে পৌঁছিলাম। সে একটু নিচু চেয়ারে বসে আছে। চেয়ারের কাছে মাটিতে পড়ে আছে একজোড়া ক্রাচ। বুঝলাম মারাত্মকভাবেই আহত হয়েছিল। আমি এগিয়ে যেতে সে বহু কষ্টে চেয়ার থেকে নেমে আমার পায়ের উপর তার মাথাটা রাখতে চেষ্টা করল। অত্যন্ত হালকা তার দেহ, ক-মাস সে হাসপাতালে কাটিয়ে এসেছে।

তাকে তুলে নিয়ে চেয়ারের উপর বসিয়ে দিতে সে বলল, 'আমি আপনার ভগ্নীর সঙ্গে কথা বলছিলাম ; যখন আমি বললাম আমি গাড়োয়ালের লোক তখন তিনি জানালেন, আপনি কে। আপনি যখন নরখাদকটাকে মারেন তখন

আমি খুব ছোট। আমাদের বাড়ি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অনেক দূরে হওয়ায় আমি সেখানে হেঁটে যেতে পারি নি, আর আমার বাবার গায়েও তেমন জোর না থাকায় আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারে নি। সুতরাং আমাকে বাড়িতেই থাকতে হয়েছিল। বাবা আমাকে ফিরে এসে বলেছিল যে সে নরখাদকটাকে দেখেছে, আর নিজের চোখে দেখে এসেছে তাকে, যে সাহেব সেটাকে মেরেছে।

আরো বলেছিল যে সেখানে বহু লোক জড় হয়েছিল, মিষ্টিও বিলানো হয়েছিল. আর তার নিজের ভাগটা সে আমার জন্যে বাড়িতে বয়ে নিয়ে এসেছিল। আর এখন, সাহেব, আমি বহুত খুশি মনে বাড়ি ফিরে যাব, কারণ আমি বাবাকে বলতে পারব যে আমিও আমার নিজের চোখে আপনাকে দেখেছি এবং নরখাদকটার মৃত্যু-স্মরণে প্রতি বছর রুদ্রপ্রয়াগে যে মেলাটা হয় সেখানে কেউ যদি আমাকে নিয়ে যায় তবে মেলায় যাদের সঙ্গে দেখা হবে তাদের সবাইকে ডেকে বলতে পারব যে আপনাকে আমি দেখেছি, আপনার সঙ্গে কথা বলেছি!'

জীবনের প্রারম্ভেই পঙ্গু, যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছে ভগ্ন দেহ নিয়ে—বীরত্বের কোনো কাহিনী শোনানোর চিন্তা তার নেই, শুধু বাবাকে একটা কথা বলার জন্যেই সে এত ব্যগ্র যে, বহু বছর আগে যাকে তার দেখার সুযোগ হয় নি তাকে সে নিজের চোখে দেখে এসেছে—এমন একটি লোক, যাকে মনে রাখার একমাত্র দাবি এই যে, সে একটা নিখুঁত গুলি ছুড়তে পেরেছিল।

এ সেই সরল ও পরিশ্রমী পাহাড়ী মানুষদের সন্তান, আদত গাড়োয়ালের ছেলে : অল্পসংখ্যক যারা তাদের মধ্যে বসবাস করছে, এই বৃহত্তর ভারতবর্ষের সন্তানদের শুধু তারাই ঠিক চিনেছে, এরাই সেই উদারহৃদয় মাটির মানুষ, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একদিন যারা সমস্ত যুযুধান শক্তিগুলোকে সম্পূর্ণ সংহত করে ভারতবর্ষকে একটি মহান জাতিতে পরিণত করবে।

সমাপ্ত

আমার ভারত

উৎসর্গ

আপনি যদি এই পাতাগুলিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস খোঁজেন, কিংবা ব্রিটিশ রাজের অভ্যুদয় ও পতনের একটি বিবরণ; অথবা জানতে চান যে এই উপমহাদেশটি কী কারণে পরস্পর-বৈরভাবাপন্ন দুটি অংশে খণ্ডিত হল; এবং পরিণামে খণ্ডদেশ দুটির শেষ অবধি এশিয়ার কি হবে; এখানে তা পাবেন না। কারণ, যদিও এই দেশেই আমি একটি জীবন-কাল কাটিয়ে দিয়েছি, তবু আমি ঘটনাগুলির কেন্দ্রের এতটা কাছে ছিলাম আর এই রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের সঙ্গে এত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম যে, সে সব নিরপেক্ষভাবে লিপিবদ্ধ করতে হলে যে পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন তা আমি পাই নি।

আমার ভারত, যে ভারতকে আমি জানি, সেই ভারতে যে চল্লিশ কোটি মানুষের বাস, তার মধ্যে শতকরা নব্বই জনই সরল, সৎ, সাহসী, আর কঠোর পরিশ্রমী। ভগবানের কাছে—তা সে ক্ষমতায় যে-কেউই আসীন থাকুক না কেন—তাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা শুধু এইটুকুই যে, তাদের ধনপ্রাণ যেন নিরাপদ থাকে, যাতে তারা তাদের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করতে পায়। সত্যিই এরা বড় গরিব। এদের প্রায়শই 'ভারতের বুভুক্ষু কোটি-কোটি মানুষ' বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যেই আমি বাস করেছি এবং এদের আমি ভালবাসি। এই নরনারীদের কথাই এই বইয়ের পাতায় বলার চেষ্টা করেছি। আমার বন্ধু, ভারতের সেই গরিবদের উদ্দেশে আমি আমার এই বইখানি শ্রদ্ধাভরে উৎসর্গ করলাম।

প্রস্তাবনা

আমার উৎসর্গপত্রটির পর আপনি প্রশ্ন করতে পারেন ঃ যাদের কথা বলছেন ভারতের সেই গরিব মানুষ কারা? 'আমার ভারত' কথাটা দিয়ে আপনি কি বোঝাতে চান? প্রশ্ন দুটি ন্যায্য। উত্তর-দক্ষিণে দু' হাজার মাইলের কিছু বেশি, এবং পূর্ব-পশ্চিমেও প্রায় ততটাই বিস্তৃত এই বিশাল উপ-মহাদেশের যে-কোনো অধিবাসীকে বোঝাতে হলেই 'ভারতীয়' শব্দটা ব্যবহার করা দুনিয়ার লোকের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ভূগোলের দিক থেকে দেখলে শব্দটিতে আপত্তি করা চলে না বটে, কিন্তু খোদ মানুষগুলির বেলায় এ শব্দটা ব্যবহার করার সময় আর-একটু স্পষ্ট করে বলাই উচিত।

এই শব্দটা যথেচ্ছ ব্যবহার করার ফলে অনেক ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের চল্লিশ-কোটি নরনারী একদিকে যেমন সারা ইউরোপের চাইতেও অনেক বেশিসংখ্যক জাতি উপজাতি এবং বর্ণে বিভক্ত, অপর দিকে তারা ধর্ম-বিশ্বাসের দিক থেকেও পৃথক। যে সব পার্থক্য এক দেশ থেকে আর এক দেশকে পৃথক বলে চিহ্নিত করে, এই বিভেদগুলি তার চাইতে কম গভীর নয়। জাতি নয়, ধর্মই ভারত-সাম্রাজ্যকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত করেছিল। তাই, এই বইখানির নামের অর্থ কি, সেটা বলি।

'আমার ভারতে' গ্রামের জীবন ও কাজকর্ম সম্বন্ধে যে চিত্রগুলি দেওয়া হয়েছে, তা প্রকাণ্ড এক দেশের শুধু এমন কয়েকটি জায়গা নিয়ে, যা আমার ছোটবেলা থেকে চেনা, যেখানে আমার কর্মক্ষেত্র ছিল। আর, যে সরল মানুষগুলির জীবনযাত্রা এবং স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি আলেখ্য আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে চেয়েছি, সেই ধরনের লোকের মধ্যেই আমি জীবনের ৭০ বছরের বেশির ভাগ কাটিয়েছি।

ভারতবর্ষের একখানা ম্যাপের দিকে তাকান। ভারত-উপদ্বীপের দক্ষিণতম বিন্দু, কন্যাকুমারিকা অন্তরীপটি খুঁজে বের করুন। সেখান থেকে চোখ সোজা উপরে নিয়ে যান যেখানে উত্তরপ্রদেশের উত্তরে গাঙ্গেয় সমতলভূমি ক্রমে উঁচু হয়ে উঠতে-উঠতে গিয়ে হিমালয়ের পাদ-শৈলশ্রেণীকে ছুঁয়েছে। এখানেই উত্তরপ্রদেশ সরকারের গ্রীষ্মবাস শৈলনগরী নৈনিতাল। এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মের হাত এড়াতে ইউরোপীয় এবং ধনী ভারতীয়রা সমতল থেকে এখানে এসে ভিড় জমায়।

শীতকালে সেখানে বাস করে শুধু কয়েকজন স্থায়ী বাসিন্দা। জীবনের বেশির ভাগ সময় আমি এদেরই একজন ছিলাম। এবার এই শৈলনগরী ছেড়ে আপনার দৃষ্টিকে নামিয়ে নিয়ে চলুন গঙ্গানদীর সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্রের পথে—

এলাহাবাদ, বারাণসী আর পাটনা ছাড়িয়ে। শেষে পেঁছবেন মোকামা ঘাট। ভারতের এই দুটি জায়গাকে কেন্দ্র করেই আমার এই চিত্রগুলির পটভূমিকা।

অনেকগুলি পায়ে-চলার পথ ছাড়াও একটি মোটর-রাস্তা দিয়েও নৈনিতালে পৌঁছনো যায়। রাস্তাটির জন্যে আমরা গর্বিত। সে গর্ব অহেতুক নয়, কারণ সমানভাবে তৈরি করা এবং ভারতের সবচেয়ে সুন্দর ও সুরক্ষিত পাহাড়ী রাস্তা বলে এর খ্যাতি আছে।

রেল-পথের শেষ স্টেশন কাঠগুদাম থেকে বেরিয়ে বাইশ মাইল লম্বা এই রাস্তাটি এমন সব জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গিয়েছে যার মধ্যে কখনও-কখনও বাঘ আর মারাত্মক শঙ্খচূড় সাপের দেখা মেলে। ক্রমশ উঁচু হতে-হতে রাস্তাটি সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচুতে উঠে নৈনিতালে এসে পেঁছেছে। নৈনিতাল পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি উন্মুক্ত উপত্যকা। তিন দিক তার পাহাড়ে ঘেরা। এটাই নৈনিতালের সবচেয়ে ভাল বর্ণনা। তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু 'চিনা' পাহাড়টির উচ্চতা ৮৫৬৯ ফুট। মোটরের রাস্তাটি এসে যেদিক দিয়ে ঢুকছে সেইদিকটাই এর খোলা।

উপত্যকাটির কোলে একটি হ্রদ। তার পরিধি হবে মাইল-দুয়েক। হ্রদটির উপরের মাথায় একটি ঝরনা বার মাস তাকে জল যোগাচ্ছে। অপর প্রান্তে মোটরের রাস্তাটি যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে জল উপচে পড়ছে। উপত্যকাটির উপরে আর নিচের প্রান্তে বাজার। চারিদিক গাছে-ঢাকা পাহাড়ে ঘেরা। তার গায়ে ঘরবাড়ি, গির্জা, স্কুল, ক্লাব, হোটেল ইত্যাদি যেন ছিটনো রয়েছে। হ্রদটির তীরের কাছে কয়েকটা নৌকো রাখার ঘর, ছবির মত একটি অতি পবিত্র শিলা-মন্দির। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুরোহিত এর অধ্যক্ষ। তিনি আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু।

হ্রদটির উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ-কেউ বলেন যে এর সৃষ্টি হয়েছে হিমবাহ এবং পাহাড়ের ধস থেকে, আবার কেউ বলেন, আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ থেকে।

হিন্দু কিংবদন্তীতে কিন্তু হ্রদটির জন্যে কৃতিত্ব দেওয়া হয় তিনজন প্রাচীন ঋষি—অত্রি, পুলস্ত্য এবং পুলহকে। পবিত্র গ্রন্থ স্কন্দ-পুরাণে লেখা আছে যে এই তিনজন ঋষি একবার প্রায়শ্চিত্তের জন্যে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে চিনা পর্বতের শিখরে এসে পড়েন। সেখানে তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে জল না পেয়ে তাঁরা পর্বতের পাদদেশে একটি গর্ত খুঁড়ে, তিব্বতের পবিত্র হ্রদ মানস-সরোবর থেকে জল এনে তাতে ঢালেন। ঋষিরা চলে যাওয়ার পর নৈনী দেবী এখানে এসে হ্রদের জলে তাঁর আসন পাতেন।

কালক্রমে খাতটির চারপাশ অরণ্যে ছেয়ে যায়, এবং জল আর গাছপালার আকর্ষণে পশুপাখিরা প্রচুর সংখ্যায় এসে এই উপত্যকায় বাসা বাঁধে। বেদীর

মন্দিরের চার মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্যান্য জীবজন্তু ছাড়াও আমি বাঘ, চিতা, ভালুক আর সম্বর হরিণ দেখেছি, এবং একশো আটাশ জাতের পাখি চিনতে পেরেছি।

অনেকদিন আগেই এই হ্রদটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে জনরব ভারতের এই অঞ্চলের শাসকদের কানে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু পাহাড়ী লোকেরা তো তাদের পবিত্র হ্রদটির অবস্থানের কথা প্রকাশ করতেই চায় না। তখন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্যতম এক শাসক একটি কূট-কৌশল বের করলেন। একজন পাহাড়িয়ার মাথায় একখানা পাথর চাপিয়ে দিয়ে তাকে বলা হল যে নৈনী দেবীর হ্রদে না পৌঁছনো পর্যন্ত তাকে ওটা বইতে হবে। অনেকদিন ধরে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে পাথরখানা বয়ে বয়ে লোকটি শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন সে আর না পেরে তার অনুগামী দলটিকে পথ দেখিয়ে হ্রদটিতে নিয়ে গেল।

যে-পাথরখানা সে বয়ে নিয়ে এসেছিল বলে বলা হয়, সেটা একজন আমাকে দেখিয়েছিল। তখন আমি ছোট ছিলাম। যখন আমি বললাম যে একজন লোকে বইবার পক্ষে পাথরখানা একটু বেশী বড় (তার ওজন প্রায় সাড়ে সাত মণ হবে), তখন যে পাহাড়ী লোকটি আমাকে ওটা দেখিয়েছিল সে বললে, 'হ্যাঁ, পাথরখানা বড়ই বটে ; কিন্তু একথাটা ভুল না যে আমাদের জাতের লোকেরা সেকালে ভীষণ জোয়ান হত।'

এবার একজোড়া ভাল দূরবীন যোগাড় করে আমার সঙ্গে চলে আসুন চিনা-র চূড়ায়। নৈনিতালের চারপাশের এলাকাটা আপনি এখান থেকে মোটা-মুটি এক-নজরে দেখতে পাবেন। যাবার পথটা খাড়া ঠিকই। কিন্তু পাখি, গাছ আর ফুল সম্বন্ধে যদি আপনার কৌতূহল থাকে তাহলে এই তিন মাইল চড়াই ভাঙা আপনি গ্রাহ্যই করবেন না। চূড়ায় পৌঁছতে-পৌঁছতে যদি সেই তিনজন ঋষির মত আপনিও তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠেন, তাহলে পিপাসা মেটাবার জন্যে আমি আপনাকে স্ফটিক-স্বচ্ছ একটা ঠাণ্ডা জলের ঝরনা দেখিয়ে দেব।

একটু বিশ্রাম করে আর দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিয়ে উত্তর-দিকে ফিরুন এবার। আপনার ঠিক নিচেই ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটি উপত্যকা চলে গিয়েছে কোশী নদী পর্যন্ত। নদীর ওপাশে কয়েকটা সমান্তরাল শৈলশিরা, তাদের গায়ে এখানে-সেখানে ছিটেফোঁটার মত কয়েকটা গ্রাম। এর একটা শৈলশিরার উপরে আলমোড়া শহর অন্য একটার উপরে রানীখেত ছাউনি। তারও ওধারে আরও অনেকগুলি শৈলশিরা। তাদের মধ্যে উচ্চতম শিখর 'ডুংগার বাক-ওয়াল' ১৪০০০ ফুট পর্যন্ত মাথা তুলেছে বটে, কিন্তু তুষারাবৃত হিমালয়ের সুবিপুল আকারের সামনে সেটা নেহাত ছোট আর নগণ্য।

আপনার নাক-বরাবর ষাট মাইল উত্তরে হচ্ছে ত্রিশূল। ২৩৪০৬ ফুট

উঁচু এই চূড়াটির পূবে আর পশ্চিমে শত-শত মাইল ধরে একটানা চলে গিয়েছে তুষার-পর্বতের সারি। সেই তুষার ত্রিশূল থেকে পশ্চিমে গিয়ে যেখানে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গিয়েছে, সেখানে প্রথমে হচ্ছে গঙ্গোত্রী পর্বতসমষ্টি, তারপর কেদারনাথ আর বদ্রীনাথের পবিত্র মন্দির দুটির ঊর্ধ্বে হিমবাহ ও পর্বতশ্রেণী। তারও পরে কামেট শৃঙ্গ, স্মাইদ্ যাকে বিখ্যাত করে গিয়েছেন। ত্রিশূলের পূর্বদিকে, খানিকটা দূরে আর পিছনে নন্দা দেবীর শুধু চূড়াটিই আপনি দেখতে পাবেন। ২৫৬৮৯ ফুট উঁচু এই পর্বতটি ভারতের উচ্চতম পর্বত।

আপনার সামনেই ডানদিকে নন্দা কোট—ভগবতী পার্বতীর শুভ্র উপাধান। আরও একটু পূবে পঞ্চচুলির রমণীয় শৃঙ্গমালা—তিব্বতে কৈলাস পর্বতে যাবার পথে পাণ্ডবেরা নাকি এই পাঁচটি উনুনে রান্না করেছিলেন। উষার প্রথম আবির্ভাবকালে যখন চিনা থেকে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত মধ্যবর্তী জায়গা রাত্রির আঁচলের তলায় চাপা পড়ে থাকে, ঐ বরফের চূড়াগুলি তখন নীল থেকে ক্রমে গোলাপী হয়ে উঠতে থাকে। তারপর সূর্য সবচেয়ে উঁচু শিখরগুলিকে স্পর্শ করে, তখন সেই গোলাপী রঙটা ধীরে-ধীরে চোখ-ঝলসানো সাদা রঙে পরিবর্তিত হয়ে যায়। বেলা বেড়ে গেলে এই পাহাড় গুলিকে দেখায় বর্ণহীন এবং নিরুত্তাপ। প্রত্যেক চূড়ায় সেই চূর্ণ তুষারের একটি করে পালক গোঁজা রয়েছে। অস্তরবির আলোয় দৃশ্যপটটি স্বর্গের শিল্পীর খেয়াল মত গোলাপী, সোনালী কিংবা লাল রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।

এবার তুষারের দিকে পিছন ফিরিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকান। আপনার দৃষ্টির শেষ সীমায় দেখবেন তিনটি শহর : বেরিলি, কাশীপুর আর মোরাদাবাদ। এদের মধ্যে সবচেয়ে কাছে হচ্ছে কাশীপুর—নাক-বরাবর ধরলে এর দূরত্ব ৫০ মাইল। যে প্রধান রেলপথ কলকাতা থেকে পঞ্জাব গিয়েছে, এই তিনটি শহরই তার উপরে।

রেলপথ থেকে পাদ-শৈলশ্রেণী পর্যন্ত যতটা জায়গা, তাকে তিনটি ফালিতে ভাগ করা যায়। প্রথমে মাইল-কুড়িক চওড়া একফালি চাষের জায়গা ; তারপর দশ মাইল চওড়া একফালি ঘাসের রাজ্য, তাকে বলে 'তরাই' ; তারপর মাইল-দশেক চওড়া একফালি জমিতে বড় বড় গাছ হয়, তাকে বলে 'ভাবর'। এ অঞ্চলটা একেবারে পাদ-শৈলশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে জায়গায়-জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে। বহু ছোট-ছোট নদীর জলে পুষ্ট এই উর্বর ভূমিতে ছোট-বড় অনেক গ্রাম গড়ে উঠেছে।

নিকটতম গ্রামসমষ্টি কালাধুঙ্গি হল নৈনিতাল থেকে পনের মাইলের পথ। এরই উপরকার মাথায় দেখতে পাবেন তিন মাইল লম্বা এক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আমাদের গ্রাম ছোটি-হলদোয়ানিকে। নৈনিতাল থেকে নেমে গিয়ে রাস্তাটি

যেখানে পাদ-শৈলশ্রেণীর পাশের রাস্তায় এসে পড়েছে, সেই মোড়ের উপরেই আমাদের কুটিরটি। ওখান থেকে শুধু তার চালটা দেখা যাচ্ছে অনেকগুলি বড়-বড় গাছের মধ্যে।

এই এলাকার পাহাড়গুলি প্রায় পুরোপুরিই লৌহ আকরিকে গড়া। উত্তর ভারতে আকরিক গলিয়ে প্রথম লোহা তৈরি হয়েছিল এই কালাধুঙ্গিতেই। তখন কাঠই ছিল জ্বালানি। তাই 'কুমাওনের রাজা' স্যার হেনরি র‍্যামজের ভয় হল যে ভাবর অঞ্চলের তামাম জঙ্গলটাই শেষে এইসব চুল্লির পেটে যাবে। তিনি সব লোহার কারখানা বন্ধ করে দিলেন।

চিনার উপরে আপনি যেখানে রয়েছেন, সেখান থেকে কালাধুঙ্গি পর্যন্ত পাহাড়গুলি নিবিড় শালবনে আচ্ছন্ন। শালগাছ থেকেই আমাদের রেল লাইনের স্লীপারগুলো তৈরি হয়। এর একেবারে কাছেই শৈলশিরার একটি ভাঁজের কোলে শুয়ে আছে ছোট্ট খুরপা-তাল হ্রদটি। তার চারপাশের খেত-গুলিতে ভারতের শ্রেষ্ঠ আলু উৎপন্ন হয়। দূরে ডানদিকে দেখতে পাবেন সূর্যের আলো গঙ্গার বুকে পড়ে ঠিকরে আসছে, বাঁয়ে দেখতে পাবেন সারদার জলেও তার ঝলকানি। পাদ-শৈলশ্রেণী থেকে এই দুই নদীর নির্গমের দুই জায়গার মধ্যকার ব্যবধান আন্দাজ শ-দুই মাইল হবে।

এবার পূর্বদিকে ফিরুন। আপনার সামনের দিকে, কাছ থেকে খানিক দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে পুরনো গেজেটিয়ার বইয়ে 'ষাট হ্রদের এলাকা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে অনেক হ্রদই মজে গিয়েছে—কয়েকটা তো আমার জীবন কালেই শুকিয়ে গেল। এখন যে-কটা আছে, তাদের মধ্যে বলবার মত চেহারা আছে শুধু নৈনি-তাল, সাত-তাল, ভীম-তাল, আর নকুচিয়া-তালের।

নকুচিয়া তালের ওধারে মোচার ডগার মত চেহারার পাহাড়টি হচ্ছে ছোটি-কৈলাস। ঐ পবিত্র পাহাড়ে জীবহত্যা করা দেবতারা পছন্দ করেন না। শেষ যে লোকটি তাঁদের এই ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল সে ছিল একজন সৈন্য। যুদ্ধের সময় সে তখন ছুটিতে ছিল। একটা পাহাড়ী ছাগলকে মারতেই কি করে যে তার পা ফসকে গেল, তা বলা যায় না। তারপর, তার দুই সঙ্গীর একেবারে চোখের সামনেই সে হাজার ফুট নিচে উপত্যকায় পড়ে গেল। ছোটি-কৈলাস ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে কালা-আগর শৈলশিরা, যেখানে দু-বছর ধরে আমি চৌগড়ের মানুষখেকো বাঘটাকে খুঁজে বেড়িয়েছিলাম। তারও পিছনে নেপালের পর্বতশ্রেণী অস্পষ্ট হতে-হতে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গিয়েছে।

এবার মুখ ফেরান পশ্চিমদিকে। কিন্তু তার আগে আপনাকে কয়েকশো ফুট নেমে, চিনা-সংলগ্ন একটি পাথর-ছড়ানো ৭৯৯১ ফুট উঁচু চূড়া দেও-পাট্টার উপর গিয়ে জায়গা নিতে হবে। আপনার ঠিক নিচেই গভীর, বিস্তীর্ণ

আর ঘন বনে ঢাকা একটি উপত্যকা চিনা আর দেওপাট্টার মাঝের থেকে শুরু হয়ে ডাচৌরির ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে কালাধুঙ্গি পর্যন্ত। এখানে যত ফুল আর যত পশুপাখি, হিমালয়ের আর কোথাও এত নেই।

এই অপরূপ উপত্যকাটির ওধারে পাহাড়ের পর পাহাড় একটানা গঙ্গা পর্যন্ত চলে গিয়েছে—দেখতে পাবেন যে একশো মাইলেরও বেশি দূরে তার জল রোদে চকচক করছে। আর, গঙ্গার ওধারে রয়েছে শিবালিক পর্বতমালা। মহান হিমালয় যখন জন্মায় নি, তখনও এই পর্বতমালা প্রাচীন বলেই গণ্য হত।





১

গাঁয়ের রানী

চিনা শিখর থেকে আপনি এক-নজরে যে-সব গ্রাম দেখেছিলেন, এবার আমার সঙ্গে তার একটিতে আসুন। পাহাড়ের গায়ে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত যে সমান্তরাল দাগের আঁচড়গুলি দেখছেন, সেগুলো হল ধাপে-ধাপে তৈরি খেত। এদের মধ্যে কয়েকটা হাত-ছয়েকের বেশি চওড়া নয়, তাদের ঠেকনো-দেওয়া পাথরের দেওয়ালগুলো জায়গায়-জায়গায় বিশ হাত উঁচু। এই সরু-সরু খেতের একধারে খাড়া পাহাড়ের গা, অন্যধারেও পাহাড় অনেকটা খাড়া নেমে গিয়েছে।

চাষ করা এখানে ভারি শক্ত আর বিপজ্জনক কাজ। সেটা সম্ভব হয় শুধু এই কারণে যে এখানকার লাঙলের বাঁট ছোট, আর হালের বলদগুলো পাহাড়িয়া বলে ছোট আর গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার। ছাগলের মত, তাদেরও পা কখনও ফসকায় না।

যেসব সাহসী মানুষ অসীম পরিশ্রম করে এই ধাপওয়ালা খেতগুলো তৈরি করেছে, তারা বাস করে স্লেটপাথরের ছাউনি-দেওয়া পাথরের একসারি বাড়িতে। ভাবর অঞ্চল আর তার ওপারের সমতল ভূমি থেকে এসে যে সরু এবড়ো-খেবড়ো পথটি হিমালয়ের মধ্যে চলে গিয়েছে, তারই ধারে এই কুটিরগুলি রয়েছে।

এই গ্রামের লোকেরা আমাকে জানে। মোকামা ঘাটে কাজ করতে-করতে আমি একবার তাদের একখানা জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে একটা মানুষখেকো বাঘের হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্যে তৎক্ষণাৎ চলে এসেছিলুম। টেলিগ্রামটা করবার জন্যে সারা গ্রামের লোককে চাঁদা দিতে হয়েছিল, আর হরকরা দিয়ে সেটাকে পাঠানো হয়েছিল নৈনিতালে।

যে-ঘটনার ফলে টেলিগ্রামটা পাঠানো হয়েছিল, সেটা ঘটেছিল ঐ কুটির-শ্রেণীর ঠিক উপরকার একটা খেতে, দিন-দুপুরে। একটি স্ত্রীলোক আর তার বার বছরের একটি মেয়ে গমের ফসল কাটছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা বাঘ এসে পড়ল। মা তাকে রক্ষা করবে এই ভেবে মেয়েটি মার কাছে ছুটে যাবার চেষ্টা করতেই বাঘটা এক লাফে তার ধড় থেকে মাথাটা খসিয়ে ফেলে, শূন্যেই তার দেহটাকে লুফে নিয়ে এক লাফে খেতের ধারের জঙ্গলে চলে গেল। মুণ্ডুটাকে ফেলে গেল মার পায়ের কাছে।

সব টেলিগ্রামই—এমনকি জরুরী টেলিগ্রামও—পেঁছতে অনেক সময় লেগে যায়। আমাকেও হাজারখানেক মাইল আসতে হল রেলগাড়ি আর অন্য গাড়ি করে। শেষ কুড়ি মাইল পায়ে হেঁটে। তাই টেলিগ্রাম পাঠানো আর আমার এসে গ্রামে পেঁছনোর মধ্যে কেটে গেল একটি সপ্তাহ।

ইতিমধ্যে বাঘটা আরও একজনকে মারল। এবারকার শিকার হল একটি স্ত্রীলোক, সে তার স্বামী আর সন্তানদের নিয়ে নৈনিতালে আমাদের পাশের বাড়ির হাতার মধ্যে বাস করত। স্ত্রীলোকটি তখন আর কয়েকজনের সঙ্গে মিলে গ্রামের উপরের পাহাড়ে ঘাস কাটছিল, এমন সময় বাঘটা সকলের চোখের সামনেই তাকে আক্রমণ করে মেরে বয়ে নিয়ে চলে যায়। ভয় পেয়ে অন্য স্ত্রীলোকেরা চিৎকার করে ওঠে এবং সে চিৎকার গ্রামে শোনা যায়। স্ত্রীলোক-গুলি যখন এই দুর্ঘটনার কথা বলবার জন্যে নৈনিতালের দিকে ছুটে আসছিল, তখন গ্রামের লোকেরা একজোট হয়ে খুবই সাহস দেখিয়ে বাঘটাকে তাড়িয়ে দেয়।

তাদের স্বভাবজ সরল-বিশ্বাসে তারা জানত যে তাদের পাঠানো টেলিগ্রাম পেয়ে আমি সাড়া দেবই। তাই তারা মৃতদেহটাকে একটা কম্বলে জড়িয়ে বিশহাত উঁচু একটা রডোডেনড্রন গাছের মগডালে বেঁধে রেখে দেয়। এরপর বাঘটা যা করেছিল তা থেকে বোঝা যায় যে সে খুব কাছেই বসে-বসে এইসব

ব্যাপার লক্ষ করেছিল। কেননা, সে যদি দেহটাকে গাছে তুলতে না দেখত তাহলে সে কখনও সেটাকে খ‍ুঁজে বের করতে পারত না। বাঘের ঘ্রাণশক্তি নেই।

স্ত্রীলোকগ‍ুলি নৈনিতালে এসে খবরটা দেবার পর ম‍ৃত স্ত্রীলোকটির স্বামী আমার বোন ম্যাগি-র কাছে এসে তাকে তার স্ত্রী-বিয়োগের কথা জানাল। পরদিন ভোর হতেই ম্যাগি আমাদের কয়েকজন লোককে পাঠিয়ে দিল। যতক্ষণ না আমি গিয়ে পে'ৌছই,—তারা মড়ির উপর একটা মাচান বে'ধে তাতে বসে থাকবে। সেইদিনই আমার পে'ৌছবার কথা। মাচান বাঁধবার সাজসরঞ্জাম গ্রাম থেকে যোগাড় করে, গ্রামের লোক-জনদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের লোকেরা রডো-ডেনড্রন গাছটার কাছে গিয়ে দেখে যে, তার আগেই বাঘটা গাছে চড়ে, কম্বল ফ‍ুটো করে মড়াটা নিয়ে চলে গিয়েছে।

আবার তাদের সাহসের প্রশংসা করতে হয়। কেননা নিরস্ত্র হলেও, আমার লোকেরা আর গ্রামবাসীরা মড়াটাকে টেনে নিয়ে যাবার চিহ্ন ধরে আধমাইলটাক এগিয়ে গেল। সেখানে আধখাওয়া দেহটাকে দেখতে পেয়ে তারা তার কাছেই একটা ওক গাছে মাচান বাঁধতে লেগে গেল। সেটা যেই শেষ হয়েছে অমনি এক শিকারী নৈনিতাল থেকে সেখানে দৈবাৎ এসে পড়লেন। তিনি সারাদিনের জন্যে শিকারে বেরিয়েছিলেন। তিনি আমার বন্ধ‍ুলোক—এই বলে, এবং নিজেই বাঘটার জন্যে অপেক্ষা করবেন এই ভরসা দিয়ে আমার লোকদের চলে যেতে বললেন।

ইতিমধ্যে আমি নৈনিতালে এসে পে'ৌছেছি। তাই, খবরটা আমাকে দেবে বলে সবাই নৈনিতালে ফিরে এল। ততক্ষণে শিকারী মশায়, তাঁর বন্দ‍ুক-বরদার এবং খানা আর লণ্ঠন বহনের এক ভ‍ৃত্য মাচানে উঠে জায়গা করে নিয়েছেন। আকাশে চাঁদ ছিল না। অন্ধকার হবার ঘণ্টাখানেক পরে বন্দ‍ুক-বরদারটি জিগ্যেস করল, "শিকারীমশায়, বাঘটাকে গ‍ুলি না করে মড়িটা নিয়ে চলে যেতে দিলেন কেন?"

বাঘটা যে কাছেপিঠে কোথাও এসেছিল, সে-কথা বিশ্বাস করতে না পেরে শিকারীমশায় লণ্ঠনটি জ্বাললেন। তারপর, মাটিতে আলো ফেলবার জন্যে লণ্ঠনটাকে খানিকটা দড়ি বে'ধে যেই সেটাকে নামিয়ে দিতে গিয়েছেন, অমনি তাঁর আঙ‍ুলের ফাঁক গলে দড়ি গিয়েছে ফসকে, লণ্ঠনটা মাটিতে পড়ে গিয়েছে ভেঙে, আর আগ‍ুন উঠেছে জ্বলে।

তখন মে মাস, আমাদের বন-জঙ্গল তখন খটখটে শ‍ুকনো। দেখতে-দেখতে গাছের তলাকার মরা-ঘাস আর ঝোপ-ঝাড় দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। খ‍ুব সাহস দেখিয়ে শিকারীমশায় গাছ বেয়ে নেমে পড়ে তাঁর ট‍ুইডের কোটটা দিয়ে পিটিয়ে আগ‍ুন নেবাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে হঠাৎ তাঁর সেই

মানুষখেকোটার কথা মনে হতেই তিনি তাড়াতাড়ি মাচানে ফিরে এলেন। কোটটাতে আগুন ধরে গিয়েছিল, সেটা পড়ে রইল।

আগুনের আলোয় দেখা গেল যে মড়িটা বাস্তবিকই আর নেই। কিন্তু ততক্ষণে শিকারীমশায়ের সে সব বিষয়ে সমস্ত আগ্রহ উবে গিয়েছে। তখন তাঁর উদ্বেগ শুধু নিজের নিরাপত্তার জন্যে, আর আগুন লেগে সরকারী বনের কতটা ক্ষতি হবে, তারও জন্যে।

প্রবল হাওয়ার তাড়নায় আগুনটা গাছের কাছ থেকে সরে যেতে লাগল। আধঘণ্টা বাদে মুষলধারে বৃষ্টি আর শিলাবৃষ্টি হওয়ায় সেটা নিভে গেল। কিন্তু ততক্ষণে বেশ কয়েক বর্গমাইল বন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কোনো মানুষখেকো বাঘের মহড়া নেবার চেষ্টা শিকারীটির জীবনে এই প্রথম। আর, যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা তাঁর হল, তার ফলে এই তাঁর শেষ চেষ্টাও বটে। কেননা, প্রথমে তিনি আগুনে আধপোড়া হন, তারপর শীতে প্রায় জমে গিয়েছিলেন।

পরদিন ভোরবেলা তিনি যখন ক্লান্তভাবে একটা পথ ধরে নৈনিতালে ফিরে আসছিলেন, আমি তখন আর এক পথে সেই গ্রামের দিকে চলেছি। আগের রাত্রে কি হয়েছে, তার কিছুই আমি জানতুম না।

আমি বলায় গ্রামের লোকরা আমাকে রডোডেনড্রন গাছটার কাছে নিয়ে গেল। মড়িটাকে আবার বাগাবার জন্যে বাঘটা যে কতটা কৃতসংকল্প হয়েছিল, তার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হলুম। ছেঁড়া কম্বলটা জমি থেকে ফুট পাঁচিশেক উঁচুতে ছিল। গাছের গায়ে বাঘটার নখের দাগ, নরম জমিটার অবস্থা আর গাছের তলাকার ভাঙা ঝোপ-ঝাড় দেখে বোঝা গেল, যে সে অন্তত কুড়িবার গাছটাতে উঠে তা থেকে পড়ে যাবার পর শেষ পর্যন্ত কম্বলটা ছিঁড়ে ফেলে দেহটাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে।

ওখান থেকে দেহটাকে বয়ে নিয়ে বাঘটা আধমাইল দূরে, যেখানে মাচান বাঁধা, সেই গাছটার কাছে গিয়েছে। তার ওধারে দেহটাকে টেনে নিয়ে যাবার সব চিহ্ন আগুনের ফলে লোপ পেয়েছে। কিন্তু বাঘটা যেদিকে যেতে পারে বলে আমার মনে হল, সেইদিকে মাইলখানেক এগিয়ে আমি স্ত্রীলোকটির আধ পোড়া মাথাটা হঠাৎ দেখতে পেলাম। সেখান থেকে শ-খানেক গজ দূরে খুব ঘন ঝোপ-ঝাড়—আগুন সে-পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

কয়েক ঘণ্টা ধরে তার মধ্যে খোঁজ করতে-করতে একেবারে পাঁচ মাইল দূরে উপত্যকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেলাম, কিন্তু বাঘটার কোনো চিহ্ন মিলল না। (সেই শিকারীটি যখন দৈবাৎ মাচানের কাছে এসে পড়েন, আর বাঘটাকে যখন মারা হয়, এর মধ্যে পাঁচজন লোক প্রাণ হারিয়েছিল।)

বৃথাই এত খোঁজাখুঁজি করে আমি সন্ধের অনেক পরে গ্রামটিতে ফিরে এলাম। গ্রামের মোড়লের বউ আমার জন্যে খাবার তৈরি করে রেখেছিল।

তার মেয়েরা পিতলের থালায় করে তা আমার সামনে এনে রাখল। খাদ্য যেমন প্রচুর, তেমন সময়মতও হল, কারণ সারাদিন কিছু খাই নি।

খাওয়া শেষ হলে আমি থালাগুলো তুলে নিলাম। ইচ্ছে এই, যে কাছাকাছি কোনো ঝরনায় নিয়ে সেগুলো ধোব। তা দেখে মেয়ে তিনটি ছুটে এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে বাসনগুলো নিয়ে, মাথা নাচিয়ে হেসে বললে যে তারা ব্রাহ্মণ হলেও, একজন গোরা সাধু যে থালা থেকে খেয়েছেন, তা ধুলে তাদের জাত যাবে না।

মোড়ল এখন আর নেই, তাঁর মেয়েরাও বিয়ের পর গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে, কিন্তু মোড়লগিন্নী এখনও বেঁচে আছেন। চিনা থেকে একনজর দেখবার পর আপনি আমার সঙ্গে এই গ্রামে এলে কিন্তু তাঁর তৈরি চা খাবার জন্যে তৈরি হয়ে আসবেন। সেই চা জল দিয়ে নয়, ঘন টাটকা দুধ ফুটিয়ে গুড় মিশিয়ে তৈরি।

গ্রামের সামনেই পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে আমরা যে এগিয়ে আসছি, গ্রাম থেকে তা দেখা গিয়েছে। ছোট একখানা চৌকো কানা-ছেঁড়া কার্পেটের উপর পাহাড়ী ছাগলের চামড়া দিয়ে মজবুত করে বানানো খান-দুই বেতের চেয়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের জন্যে। আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে মোড়লগিন্নী সেই চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

এখানে পরদা-প্রথা নেই। আপনি যদি তাঁকে বেশ ভাল করে দেখেন, তাতেও তিনি বিব্রত হবেন না। দেখবার মত চেহারাও বটে। এখন তাঁর চুল দুধের মত সাদা, কিন্তু আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন তা ছিল কাকের পালকের মত কাল। সেই দূর অতীতে তাঁর যে গালদুটিতে টুকটুকে আভা দেখা যেত, আজ তা হাতির দাঁতের মত সাদা। তাতে এতটুকু দাগ বা কুঞ্চন নেই। অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে তিনি। বংশের আদিপুরুষের মতই তাঁর রক্ত খাঁটি ব্রাহ্মণেরই রক্ত।

অকলুষিত বংশধারার গর্ব সব মানুষেরই মধ্যে সহজাত বটে, কিন্তু তার মর্যাদা ভারতে যেমন, তেমন আর কোথাও নয়। সকলের প্রিয় এই বৃদ্ধা মহিলার পরিচালনাধীন গ্রামটিতে নানা জাতের লোক আছে, কিন্তু তাঁর শাসন নিয়ে কোনো আপত্তি কখনও ওঠে না। তাঁর মুখের কথাই আইন। তার কারণ এ নয় যে তাঁর অনুচরদের দোর্দণ্ড প্রতাপ—তাঁর কোনো অনুচরই নেই। যে ব্রাহ্মণ জাতি ভারতের মাটির প্রাণরস, তিনি সেই ব্রাহ্মণ—তাই তাঁকে সবাই মানে।

খেতের ফসলের জন্যে সম্প্রতি কয়েক বছর চড়া দাম পাওয়া গিয়েছে বলে, ভারতে 'সমৃদ্ধি' বলতে যা বোঝায় তা এ গ্রামের হয়েছে। তার একটা অংশ আমাদের এই মোড়লগিন্নী পুরোপুরি পেয়েছেন।

যৌতুকের অংশ হিসেবে যে ছিলে-কাটা সোনার মটর-মালা তিনি পেয়েছিলেন সেটা এখনও তাঁর গলায় আছে বটে, কিন্তু রুপোর হালকা হারছড়া তাঁর পারিবারিক ব্যাংকে, অর্থাৎ উনুনের নিচে মাটির তলায় এক গর্তে—রেখে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে তাঁর গলায় উঠেছে নিরেট সোনার একটি হাঁসুলি। অনেকদিন আগে তাঁর কানে গয়না ছিল না, কিন্তু এখন তাঁর উপর-কানে বেশ কয়েকটা হালকা সোনার মাকড়ি ঝুলছে, আর তাঁর নাকে দুলছে পাঁচ ইঞ্চি ফাঁদের একটি সোনার নথ। ডান-কানে জড়ানো একটি পাতলা সোনার চেন সেই নথটির ভার কতকটা বহন করেছে। উঁচু জাতের পাহাড়ী মেয়েদের যা পোশাক, এঁরও তাই। একখানা শাল, গরম কাপড়ের একটি আঁটো-সাঁটো কাঁচুলি, আর একটি ছাপা কাপড়ের মস্ত বড় ঘাগরা। তাঁর পা খালি, কেননা এই প্রগতির যুগেও পাহাড়ীদের মধ্যে জুতো পায়ে দেওয়া হল অসতীত্বের লক্ষণ।

বৃদ্ধা মহিলাটি এখন চা তৈরি করতে বাড়ির ভিতরে গিয়েছেন। তিনি যতক্ষণ এই উত্তম কাজটি করছেন, ততক্ষণ আপনি সরু রাস্তার ওধারকার বেনের দোকানটির দিকে মন দিতে পারেন।

বেনেও আমার এক পুরনো বন্ধু। আমাদের সম্ভাষণ করে আর এক প্যাকেট সিগারেট উপহার দিয়ে সে ফিরে গিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে একটি কাঠের মাচার উপর—তার উপরেই তার বেসাতি খুলে সাজানো রয়েছে।

গ্রামের লোকদের আর রাহী লোকদের যা দরকার, এমন অল্প কয়েকটা জিনিস নিয়েই তার পসরা, যেমন—আটা-চাল-ডাল-ঘি-লবণ আর নৈনিতাল বাজারে কম দামে কেনা কিছু বাসি মেঠাই—রাজারাজড়ার খাওয়ার যোগ্য পাহাড়ী আলু—প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শালগম (সেগুলো এমন ঝাঁজালো যে লোকের সামনে তা খেলে দর্শকের চোখেও জল এসে যায়)—সিগারেট আর দেশলাই। আর এক টিন কেরোসিন। আর আছে মাচার কাছে তার নাগালের মধ্যে একটি লোহার কড়াই—তাতে সারাদিন দুধ ফোটানো হচ্ছে।

দোকানদার তার মাচায় গিয়ে বসতেই তার অল্প কয়েকটি খদ্দের তার সামনে এসে জড় হয়েছে। প্রথম জন একটি ছোট ছেলে, তার সঙ্গে রয়েছে তার একটি ছোট বোন। তার ভারি দেমাক যে তার গোটা একটা পয়সা আছে। তার সবটাই সে মেঠাই কিনে খরচ করবার জন্যে ছটফট করছে। তার ছোট্ট নোংরা হাত থেকে পয়সাটা নিয়ে দোকানদার সেটাকে একটা খোলা কাঠের বাক্সে ফেলল। তারপর বোলতা আর মাছি তাড়াবার জন্যে বারকোশটার উপর তার হাতখানাকে নেড়ে সে চৌকো একটি ক্ষীরের মিঠাই তুলে নিয়ে, সেটাকে আধখানা করে ভেঙে, ব্যগ্রভাবে বাড়ানো দু-খানি হাতে এক-একটি করে টুকরো দিয়ে দিল।

তারপর আসছে নিচু জাতের একটি স্ত্রীলোক। সে বাজার করবার জন্যে দু-আনা নিয়ে এসেছে। এক আনা লেগে গেল আটা কিনতে, কেননা আমাদের পাহাড়ীদের প্রধান খাদ্যই হচ্ছে এই মোটা-করে-পেষা গম। দোকানে তিন-রকম ডাল আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা ডালটা কিনতে গেল আরও দুটি পয়সা। বাকি পয়সা-দুটি দিয়ে একটু নুন আর একটি সেই ঝাঁজালো শালগম কিনে নিয়ে সে দোকানীকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করছে, কেননা দোকানী একজন মান্য ব্যক্তি। এর-পর সে তার পরিবারের দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবার জন্যে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে।

এই স্ত্রীলোকটিকে যখন জিনিস দেওয়া হচ্ছে তখন কর্কশ শিস আর মানুষের হাঁকডাক থেকে বোঝা গেল যে একপাল মাল-বওয়া খচ্চর এসে পৌঁছেছে। এরা মোরাদাবাদ থেকে তাঁতের কাপড় নিয়ে চলেছে পাহাড়ের মাঝখানকার সব বাজারে। পাদ-শৈলশ্রেণী থেকে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় শক্ত চড়াই উঠতে ঘেমে উঠেছে খচ্চরগুলো। তারা যতক্ষণে একটু দম নিয়ে নিচ্ছে, ততক্ষণে তাদের রক্ষক চারজন গিয়ে দোকানীর দেওয়া বেঞ্চিখানাটাতে বসেছে। এক-একটি সিগারেট এবং এক-এক গ্লাস দুধ খাচ্ছে খুব আয়েশ করে।

এই দোকানেই হ'ক, কিংবা এই পাহাড়ী এলাকায় সর্বত্র পথের ধারে-ধারে যে শত-শত দোকান আছে তার যে-কোনোটাতেই হ'ক, দুধের চেয়ে কড়া কোনো পানীয় কখনও পাওয়া যায় না। কেননা, শুধু যারা তথা-কথিত সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে তারা ছাড়া আমাদের পাহাড়ী লোকেরা মদ খায় না। স্ত্রীলোক-দের মধ্যে মদ খাওয়াটা আমার ভারতে একেবারেই অজানা।

কখনও কোনো খবরের কাগজ এই গ্রামে আসে নি। এখানকার লোকেরা বাইরের জগতের খবর পায় শুধু কালেভদ্রে নৈনিতাল গেলে, নয় তো রাহী লোকের কাছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খবর রাখে মালবাহকরা। পাহাড়ের ভিতরদিকে যাবার পথে তারা সুদূর সমতলভূমির খবর নিয়ে আসে, আর মাস-খানেক বাদে ফিরে যাবার পথে তারা যেখানে তাদের মাল বেচে এসেছে সেইসব বাণিজ্য-কেন্দ্রের সংবাদ দিয়ে যায়।

বৃদ্ধা মহিলাটি আমাদের জন্যে যে চা বানাচ্ছিলেন তা এতক্ষণে তৈরি হয়ে গিয়েছে। কানায়-কানায় ভর্তি কাঁসার বাটিটাতে খুব সাবধানে হাত দেবেন। কেননা সেটা এত গরম যে আপনার হাতের চামড়া উঠে আসতে পারে। সকলের দৃষ্টি এখন ফেরিওয়ালাদের দিক থেকে আমাদের দিকে ফিরেছে। মিষ্টি আর গরম এই তরল পদার্থটি ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক, আপনাকে ওর শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত খেতেই হবে। আপনি সারা গ্রামটির অতিথি। সারা গ্রামের সব-কটি চোখ রয়েছে আপনার উপর। বাটিতে

কোনো তলানি ফেলে রাখার এই মানে দাঁড়াবে যে, আপনার বিবেচনায় চা-টা আপনার খাবার যোগ্য হয় নি।

অন্য লোক হলে এই অতিথি-সৎকারের জন্যে দাম দিতে চাইতে পারে, কিন্তু সে ভুল আমরা করব না। কেননা এই সরল অতিথি-বৎসল মানুষগুলি বেজায় গর্বিত। বৃদ্ধা মহিলাটিকে একবাটি চায়ের দাম দিতে চাইলে তাঁকে ভয়ানক অপমান করা হবে, আর দোকানদারকে তার এক বাক্স সিগারেটের দাম দিতে গেলেও তা ই।

চিনা-র চূড়া থেকে ভাল দূরবীনের সাহায্যে আপনি যে বিস্তীর্ণ এলাকা দেখেছেন, তার মধ্যে ছড়ানো হাজার-হাজার একই ধরনের গ্রামের মধ্যে এই গ্রামও একটি। এই অঞ্চলেই আমার জীবনের বেশির ভাগ কাটিয়েছি আমি। এই গ্রামটি ছেড়ে যাবার সময় আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, এখানে পেঁছে আমরা যে অভ্যর্থনা পেয়েছি এবং শিগগির আবার আসবার যে আমন্ত্রণ পেয়েছি, তা হচ্ছে আমার ভারতের লোকদের ভালবাসা আর শুভেচ্ছার অকপট অভিব্যক্তি।



কুঁয়ার সিং

কুঁয়ার সিং জাতে ছিল ঠাকুর, আর চাঁদনি-চক গ্রামের সে-ই ছিল মোড়ল। মোড়ল হিসেবে সে ভাল ছিল না মন্দ ছিল, তা আমি জানি না। যেজন্যে তাকে আমি ভালবাসতুম তা হচ্ছে এই যে, কালাধুঙ্গিতে তার মত ওস্তাদ চোরা-শিকারী আর ছিল না, এবং আমার ছেলেবেলার আদর্শ বীরপুরুষ যিনি, আমার সেই বড়দাদা টমের সে ছিল গোঁড়া ভক্ত।

টমের বিষয়ে বলবার মত অনেক গল্প কুঁয়ার সিং জানত, কেননা সে তার সঙ্গে অনেক শিকার-অভিযানে গিয়েছিল। একটা গল্প আমি সবচেয়ে পছন্দ করতুম, বারবার বলা হলেও তার মজা কিছু কমত না। সেটা হচ্ছে, আমার দাদা টম আর এলিস নামে এক ভদ্রলোকের মধ্যে একটা আচমকা প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে। এর আগের বছরে টম তাকে এক পয়েন্টে হারিয়ে দিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাইফেল-কুশলী হিসেবে বি. পি. আর. এ. স্বর্ণপদক পেয়েছিল।

টম আর এলিস কেউ কারু কথা না জেনে গারুপুর কাছে একই বনে শিকার করছিল। একদিন ভোরবেলা যখন সবে গাছের মাথার উপরে কুয়াশা উঠে এসেছে, তখন তাদের দেখা হয়ে গেল একটা উঁচু জায়গায় যাবার মুখে।

সেই উঁচু জায়গাটা থেকে একটা বিস্তীর্ণ নাবাল জমি দেখা যায়, ভোরের এই সময়টায় সেখানে হরিণ আর শুয়োর চোখে পড়বেই। টমের সঙ্গে ছিল কুঁয়ার সিং, আর এলিসের সঙ্গী ছিল বুধু বলে নৈনিতালের একজন

শিকারী। জাতে ছোট আর বনজঙ্গলের সব ব্যাপারে অজ্ঞ বলে কুঁয়ার সিং তাকে হেয় জ্ঞান করত। যথাযোগ্য সম্ভাষণ ইত্যাদির পর এলিস বলল যে টম তাকে চাঁদমারির মাঠে তুচ্ছ একটা পয়েন্টে হারিয়েছিল বটে, কিন্তু সে আজ টমকে দেখিয়ে দেবে, যে সে, শিকারের ব্যাপারে তার চাইতে ভাল। সে-ই প্রস্তাব করল যে এই কথাটা যাচাই করবার জন্যে দু-জনেই দু-বার করে গুলি চালাবে।

টসে জিতে এলিস ঠিক করল যে সে-ই আগে বন্দুক চালাবে। তখন খুব সাবধানে সেই নাবাল জায়গাটার দিকে যাওয়া হল। এলিসের সঙ্গে ছিল ·৪৫০ মার্টিনি-হেনরী রাইফেলটা, যেটা সে বি. পি. আর. এ. প্রতিযোগিতায় ব্যবহার করেছিল। আর টমের হাতে ছিল ওয়েস্টলি রিচার্ডসের তৈরি একটি ·৪০০ দো-নলা এক্স্প্রেস রাইফেল, যার জন্যে সে গর্ব বোধ করত। সে গর্ব অবশ্য অসংগত নয়, কেননা তখন পর্যন্ত এই অস্ত্রটি ভারতে খুব কমই এসেছিল।

হয়ত হাওয়াটা বেঠিক ছিল, কিংবা এগোনোটা তেমন সাবধানে হয় নি। যাই হ'ক, উঁচু জায়গাটার মাথায় পৌঁছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো জীব-জন্তু দেখতে পেল না নাবাল জায়গাটাতে। সেটার কাছের দিকটাতে একফালি শুকনো ঘাস-জমি ছিল, তার ওধারকার ঘাস পুড়ে গিয়েছিল। এই পোড়া জায়গাটায় ঘাসের অংকুর বেরিয়ে এখন সবুজ-সবুজ দেখাচ্ছিল। এখানেই সকাল-সন্ধ্যায় জীবজন্তুদের দেখা পাওয়া যেত। কুঁয়ার সিংয়ের ধারণা যে ঐ শুকনো ঘাসজমির মধ্যে কোনো জীব-জন্তু লুকিয়ে থাকতে পারে। তার কথায় বুদ্ধু আর সে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

ঘাস তখন বেশ জ্বলে উঠেছে। আগুন থেকে বাঁচবার জন্যে গঙ্গাফড়িং ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়তে শুরু করেছে, আর তাদের খেতে এসে জুটেছে আকাশের চার কোণ থেকে যত রাজ্যের ভিমরাজ, নীলকণ্ঠ, জোয়ারি ইত্যাদি পাখি। এমন সময় ঘাস-জমির দূরপ্রান্তে একটা চঞ্চল্য দেখা গেল।

একটু বাদেই মস্ত দুটো শুয়োর বেরিয়ে এসে পোড়া জমিটা ধরে বিদ্যুদ্বেগে ছুটল তার ওধারে শ-তিনেক গজ দূরে বড়-বড় গাছের জঙ্গলে আশ্রয় নেবার জন্যে। আড়াই-মণী এলিস ধীরে-সুস্থে হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেলটি তুলে পিছনকার শুয়োরটার দিকে গুলি ছুঁড়ল। গুলিটা তার পিছনের দুই পায়ের মাঝখানে ধুলো উড়িয়ে দিল। বন্দুকটা নামিয়ে এলিস তার মাছিটাকে দুশো গজের মত করে বসিয়ে নিয়ে, খালি কার্তুজটিকে বের করে নতুন টোটা ভরে নিল। তার গুলি এবার গিয়ে সামনেকার শুয়োরটার ঠিক সামনে এক ধুলোর ঝড় তুলে দিল।

দ্বিতীয় গুলিটা চালাবার পর শুয়োর-দুটো ডানদিকে ফিরল। তাতে

তাদের পাশের দিকটা বন্দুকের মুখোমুখি হল, তাদের গতিবেগও বাড়ল। এবার টমের গুলি চালাবার পালা এবং খুব তাড়াতাড়ি তা করতে হবে, কেননা শুয়োর-দুটো খুব দ্রুতবেগে বনের কাছাকাছি অর্থাৎ পাল্লার বাইরে চলে যাচ্ছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে টম তার রাইফেল তুলল। দুটি গুলির আওয়াজ হল, আর অমনি দুটো শুয়োরই মাথায় গুলি খেয়ে খরগোশের মত লুটিয়ে পড়ল।

এই ঘটনার বর্ণনা করে প্রত্যেকবারই কুঁয়ার সিং এই বলে তার উপসংহার করত : 'তখন আমি সেই ছোট-জাতের পো, শহুরে বুদ্ধুটার দিকে ফিরে দাঁড়ালাম। ব্যাটার তেল-মাখা চুলের গন্ধে আমার বমি আসছিল। তাকে বললাম, "দেখলি তো রে? তুই না জাঁক করেছিলি যে তোর সাহেব আমার সাহেবকে বন্দুক চালানো শিখিয়ে দেবে! আমার সাহেব যদি তোর ঐ মুখে কালি লেপে দিতে চাইতেন, তাহলে তিনি দুটো গুলিও ছুঁড়তেন না— একটি গুলিতেই দুটোকে সাবাড় করতেন, বুঝলি?"

ঠিক কী করে যে অসাধ্য সাধন হত, সে কথা কুঁয়ার সিং কখনও আমাকে বলে নি। আমিও তাকে জিগ্যেস করি নি। কারণ আমার আদর্শ পুরুষের উপর আমার এতটা আস্থা ছিল যে এক মুহূর্তের জন্যেও একথা অবিশ্বাস করি নি যে, সে ইচ্ছে করলেই তা করতে পারত।

যেদিন আমি প্রথম বন্দুক পেলুম, সেই পরম দিনটিতে কুঁয়ার সিং আমাকে প্রথম দেখতে এসেছিল। সে সকালের দিকেই এল। মহা গর্বিত হয়ে আমি যখন আমার পুরনো দোনলা গাদাবন্দুকটা তার হাতে তুলে দিলুম, তখন সে আমাকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিল না, যে সে দেখতে পেয়েছে বন্দুকটার ডান-দিকের নলটা ফেটে হাঁ হয়ে গিয়েছে। পিতলের তার দিয়ে জড়িয়ে সেটার বাঁট আর নলদুটোকে জুড়ে রাখা হয়েছে। এর শুধু বাঁ-দিককার নলটির যে কত গুণ তা বলল, আর সেটার প্রশংসা করল : সেটা কেমন লম্বা, কত পুরু, কতদিন কাজ দেবে, ইত্যাদি।

তারপর বন্দুকটিকে সরিয়ে রেখে আমার দিকে ফিরে সে এই কথা বলে আমার আট বছরের মনটাকে আনন্দে ভরে দিল এবং আমার বন্দুকটির জন্যে আমাকে আরও গর্বিত করে তুলল : 'তুমি আর ছোট ছেলেটি নও, এখন বড় হযে গিয়েছে। এই সুন্দর বন্দুকটিকে নিয়ে তুমি আমাদের জঙ্গলে যেখানে খুশি সেখানে নির্ভয়ে চলে যেতে পার—শুধু যদি তুমি গাছে চড়তে শিখে নাও। কী করে গাছে চড়তে হয় সেটা জানা যে বনে-জঙ্গলে শিকার করতে হলে আমাদের পক্ষে কত দরকার, সে কথা বোঝাবার জন্য আমি তোমাকে এখন একটা গল্প বলব।

'গত বৈশাখ মাসে একদিন আমি আর হর সিং শিকারে বেরিয়েছিলুম।

আর সবই ঠিক ছিল, কিন্তু গ্রাম থেকে বেরোবার মুখেই একটা শেয়াল আমাদের রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। জানই তো যে হর সিংটা একটা আনাড়ী শিকারী, আর বনের প্রাণীদের ব্যাপারে কিছু জানে না। শেয়ালটাকে দেখবার পর আমি যখন বললুম যে আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত, সে তখন আমাকে ঠাট্টা করতে লাগল আর বলল যে, শেয়াল দেখলে অমঙ্গল হয়, এটা ছেলেমানুষী কথা। কাজেই আমরা চলতে লাগলুম।

আমরা যখন রওনা হয়েছিলুম তখন আকাশে তারারা ফিকে হয়ে আসছিল। গারুপ্পুর কাছে আমি একটা চিতল হরিণকে গুলি করলুম, কিন্তু কেন যে সেটা ফস্‌কে গেল তা বলতে পারি না। হর সিং-এর গুলিতে একটা ময়ূরের ডানা ভেঙে গেল। সেটাকে যতদূর সাধ্য তাড়া করে গেলুম বটে, কিন্তু সেটা লম্বা ঘাসের মধ্যে ঢুকে গেল, আর তাকে পেলুম না। তারপর বন-জঙ্গল আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও শিকার করবার মত কিছু চোখে পড়ল না। বেলা পড়ে এলে আমরা বাড়ির দিকে চললুম।

'দুবার গুলি ছুঁড়েছি, বনের পাহারাওলারা তা শুনে হয়তো আমাদের এখন খুঁজছে—এই ভেবে আমরা বনের পথগুলোকে এড়িয়ে একটা বালি-ভরা নালার পথ ধরলুম। সেটা ঘন ঝোপ-ঝাড়ে আর কাঁটা-বাঁশের বনে ভর্তি।

আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে-বলতে চলেছি, এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাঘ নালার মাঝখানে এসে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। দীর্ঘ এক মিনিট ধরে একদৃষ্টে আমাদের দেখে বাঘটা ফিরল, তারপর যে-দিক থেকে এসেছিল সে-দিকেই চলে গেল।

'যতক্ষণ উচিত, ততক্ষণ অপেক্ষা করে আমরা আবার চলতে শুরু করতেই বাঘটা আবার নালার মধ্যে বেরিয়ে এল। এবার সে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখতে-দেখতে গজরাতে আর লেজ নাড়তে লাগল। আবার আমরা একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলুম। খানিক বাদে বাঘটা ঠাণ্ডা হয়ে নালা ছেড়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে, নিশ্চয় ওই বাঘটার ভয়েই, একটা ঘন ঝোপ থেকে অনেকগুলো বন-মুরগি ক্যাঁ-ক্যাঁ করে উঠে পড়ল। তাদের মধ্যে একটা এসে ঠিক আমাদের সামনেই একটা হলদু গাছে বসল।

পাখিটাকে চোখের সামনে একটা ডালের উপর নামতে দেখে হর সিং বললে যে সে ওটাকে মারবে—তাহলে আর খালি হাতে ঘরে ফিরতে হবে না। সে এও বললে যে বন্দুকের শব্দে বাঘও ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। আমি তাকে বাধা দেবার আগেই সে বন্দুক ছুঁড়ে বসল।

'পরমুহূর্তেই ভয়ানক এক গর্জন করে বাঘটা ঝোপ-ঝাড় ভেঙে আমাদের দিকে ধেয়ে এল। এইখানটাতে নালার কিনারায় কয়েকটা রুনি গাছ হয়েছিল। তার একটার দিকে আমি ছুটে গেলুম, আর অন্য একটার দিকে হর সিং ছুটে

গেল। আমার গাছটা ছিল বাঘটার কাছাকাছি, কিন্তু সে এসে পেঁছবার আগেই আমি তার নাগালের বাইরে উঠে গেলুম। হর সিং ছেলেবেলায় আমার মত গাছে চড়তে শেখে নি—সে তখন মাটিতে দাঁড়িয়ে হাত তুলে একটা ডাল ধরবার চেষ্টা করছিল।

বাঘটা তখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে লাফিয়ে পড়ল। হর সিংকে কামড়ালও না, আঁচড়ালও না—শুধু পিছনের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে হর সিংকে চেপে গাছটাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর থাবা চালিয়ে গাছটার ওধার থেকে ছালের তার কাঠের বড়-বড় টুকরো ছাড়িয়ে ফেলতে লাগল। এই করতে-করতে সেও গর্জন করতে লাগল, হর সিং-ও চেঁচাতে লাগল।

আমি বন্দুকটাকে নিয়েই গাছে উঠে পড়েছিলুম। এখন আমি আমার খালি পা দিয়ে ডাল আঁকড়ে ধরে, ঘোড়াটা ঠিক করে নিয়ে শূন্যে বন্দুকরে আওয়াজ করে দিলুম। এত কাছে গুলির শব্দ শুনে বাঘটা লাফ দিয়ে ফেলেছে। তাতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছিল।

'বাঘটা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে আমি খুব চুপি-চুপি নেমে এসে হর সিং-এর কাছে গেলুম। গিয়ে দেখি যে বাঘের একটা নখ তার পেটে ঢুকে চামড়াটা নাভির কাছ থেকে শিরদাঁড়ার কয়েক আঙুল দূর পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলেছে। তাতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছিল।

আমার তখন হল মহা মুশকিল। হর সিং-কে ফেলে পালিয়ে যেতেও পারি না, অথচ এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা না থাকায় ঠিক করতেও পারি না যে কী করলে ভাল হয়। সেই নাড়ি-ভুঁড়ির সবটা হর সিং-এর পেটে আবার ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টাই করি, না, কেটেই বাদ দিই। এ বিষয়ে হর সিং-এর সঙ্গে কথা বললুম—ফিসফিস করে, কেননা ভয় হচ্ছিল পাছে বাঘটা শুনতে পেয়ে ফিরে এসে আমাদের মেরে ফেলে। হর সিং-এর মতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি তার পেটের মধ্যে তুলে রাখাই ভাল। কাজেই সে চিত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল, আর আমি শুকনো ঘাস পাতা আর কাঠের টুকরো-টাকরা যা লেগেছিল সবসুদ্ধ নাড়ি-ভুঁড়ি আবার ভরে দিলুম তার পেটে। তারপর আমি আমার পাগড়ি খুলে তার পেটে বেশ করে জড়িয়ে দিয়ে কষে গাঁট বাঁধলুম, যাতে সবকিছু আবার বেরিয়ে না পড়ে। তারপর আমরা আমাদের গ্রামের দিকে সাত মাইল পথ হাঁটা শুরু করলুম—দুই বন্দুক নিয়ে আগে-আগে আমি, আমার পিছনে চলল হর সিং।

'আমাদের আস্তে-আস্তে চলতে হল, কেননা হর সিং-কে পাগড়িটা ঠিক করে ধরে রাখতে হচ্ছিল। পথে রাত হয়ে গেল। হর সিং বললে যে আমাদের গ্রামে ফিরে না গিয়ে সোজা কালাধুঙ্গির হাসপাতালে যাওয়াই ভাল। তাই বন্দুকগুলিকে লুকিয়ে রেখে আমরা তিন মাইল পথ বেশি হেঁটে হাসপাতালেই

গেলুম

যখন পৌঁছলুম হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ডাক্তারবাবু কাছেই থাকতেন। তিনি জেগে ছিলেন। আমাদের ব্যাপারটা শুনে আমাকে পাঠালেন তামাকওলা আলাদিয়াকে ডেকে আনতে। সে ছিল কালাধুঙ্গির পোস্টমাস্টার। সরকার থেকে মাসে পাঁচ টাকা মাইনে পেত। ওদিকে ডাক্তারবাবু একটা লণ্ঠন জেবলে হর সিং-কে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেলেন। আলাদিয়াকে নিয়ে ফিরে এসে দেখি যে ডাক্তারবাবু হর সিংকে একটা দড়ির খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়েছেন। আমি তার মাংসের খণ্ডদুটোকে একসঙ্গে করে চেপে ধরলুম, আর ডাক্তারবাবু তার পেটের ফাঁকটা সেলাই করে দিলেন। তাঁর ভারি দয়া, আর বয়সটাও কাঁচা। আমি তাঁকে দুটো টাকা দিতে গেলুম, তিনি তা নিলেন না। তারপর তিনি হর সিংকে খুব ভাল একটা ওষুধ খাইয়ে দিলেন যাতে সে তার পেটের যন্ত্রণাটা ভুলে থাকে।

তারপর আমরা বাড়ি গেলুম। দেখলুম মেয়েরা কাঁদছে, কেননা তারা মনে করেছিল যে হয় ডাকাতে, নয় বনের জন্তুতে আমাদের মেরে ফেলেছে। তাহলেই দেখ সাহেব, আমরা যারা বনে শিকার করি, গাছে চড়তে জানাটা তাদের পক্ষে কতটা দরকারী। হর সিং যখন ছোট ছেলেটি ছিল, তখন যদি তাকে পরামর্শ দেবার কেউ থাকত তাহলে সে আমাদের এত ঝঞ্ঝাটে ফেলত না।'*

প্রথম যে ক-বছর আমি গাদা-বন্দুকটা নিয়ে ঘুরেছি ফিরেছি, সেই সময়টাতে আমি কুঁয়ার সিংয়ের কাছে থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, মনে-মনে ম্যাপ আঁকা। যে জঙ্গলে আমরা শিকার করতুম সেটা ছিল আয়তনে কয়েকশো বর্গমাইল। তার ভিতর দিয়ে একটি মাত্র রাস্তা গিয়েছে। আমরা একসঙ্গেও গিয়েছি বটে, কিন্তু অনেক সময়েই আমাকে একা যেতে হত, কেননা কুঁয়ার সিংয়ের বড্ড ডাকাতের ভয় ছিল বলে সে

* বোঝাই যায় যে ওটা ছিল একটা বাঘিনী। ওখানেই তার নতুন বাচ্চা হয়েছিল বলে ওখানে মানুষ এসে পড়াটা তার পছন্দ হয় নি। যে রুনি গাছটাতে সে হর সিং-কে চেপে ধরেছিল, সেটা হাতখানেক মোটা ছিল। রাগের চোটে সে তার এক-তৃতীয়াংশই আঁচড়ে তুলে ফেলেছিল। গারুপ্পুর জঙ্গলে যারা লুকিয়ে কিংবা প্রকাশ্যে শিকার করত, তাদের কাছে গাছটা একটা নিশানা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষে, বছর পঁচিশেক বাদে একদিন দাবানলে সেটা পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

তার তিন বন্ধুর এই আসুরিক চিকিৎসা সত্ত্বেও, আর তার পেটে অত কাঠি-কুটো চলে যাওয়া সত্ত্বেও হর সিং তার এই ঘা নিয়ে বিশেষ ভোগে নি। সে বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল।

হয়তো এক নাগাড়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে গ্রাম ছেড়ে কোথাও যেত না।

শিকার থেকে ফেরবার পথে আমি অসংখ্যবার কুঁয়ার সিংয়ের গ্রাম হয়ে এসেছি। আমার বাড়ি থেকে যতটা, তার থেকে সেটা জঙ্গলের তিন মাইল কাছে। তাকে এই কথা বলতে যেতুম যে আমি একটা চিতল কিংবা সম্বর হরিণ কিংবা হয়তো একটা বড় বরা মেরে রেখে এসেছি, সে যেন গিয়ে সেটাকে নিয়ে আসে। যে জন্তুটাকে শিকার করেছি, সেটাকে শকুনদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি যতই যত্ন করে সেটাকে কোনো বড় গাছের জঙ্গলে বা ঝোপ-ঝাড়ে বা ঘাস-বনেই লুকিয়ে রেখে থাকি না কেন, সে কখনও সেটাকে না নিয়ে ফিরে আসে নি।

প্রতিটি বিশেষ গাছ, জলের কুণ্ড, পশুদের চলাচলের পথ আর নালাকে আমরা এক-একটা নাম দিয়েছিলাম। গাদা-বন্দুকটা থেকে গুলি ছুঁড়লে তার যে কাল্পনিক গতিপথ হতে পারে, সেই হিসেবে আমরা সব দূরত্ব মাপতুম, আর কম্পাসে দেখানো দিক চারটে দিয়ে আমরা সব দিক ঠিক করে নিয়েছিলুম।

যদি আমি একটা জানোয়ারকে লুকিয়ে রেখে আসতুম, কিংবা কুঁয়ার সিং কোনো গাছের উপর শকুনিদের জমায়েত হতে দেখে বুঝত যে চিতা বা বাঘে কিছু মেরেছে, তাহলে সে কিংবা আমি এ কথাটা একেবারে ঠিক জেনে রওনা হতে পারতুম যে, দিনের কিংবা রাতের যে-সময়ই হ'ক না কেন, সে জায়গাটা খুঁজে পাবই।

স্কুলের পড়া শেষ করে আমি যখন বাংলাদেশে কাজে লেগে গেলুম, তখন বছরে মোটে সপ্তাহ-তিনেকের জন্যে কালাধুঙ্গিতে আসতে পারতুম। একবার এরকম এসে দেখে বড় কষ্ট হল যে আমার পুরনো বন্ধু কুঁয়ার সিং আমাদের পাহাড়ী এলাকার অভিশাপ স্বরূপ যে আফিম, তার খপ্পরে পড়েছে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে তার ধাত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, তাই এই কু-অভ্যাসটা তার বেড়েই যাচ্ছিল।

আমার কাছে সে অনেকবার প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু তা রাখবার মত মনের জোর তার ছিল না। কাজেই একবার ফেব্রুআরি মাসে কালাধুঙ্গিতে এসে আমাদের গ্রামের লোকদের কাছে শুনে আশ্চর্য হলুম যে কুঁয়ার সিং গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমার আসার খবর সেই রাতেই কালাধুঙ্গিতে রটে গিয়েছিল। পরদিন কুঁয়ার সিংয়ের ছোট ছেলে, তার বয়স আঠার, দৌড়ে এসে আমাকে বলল যে তার বাবা যমের দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছে, আর সে মরবার আগে আমাকে দেখতে চায়।

চাঁদনি চক গ্রামের মোড়ল, সরকারকে চার হাজার টাকা খাজনা দেবার কর্তা কুঁয়ার সিং একটা কেউ-কেটা লোক ছিল। সে স্লেটপাথরের ছাদওলা

মস্ত একটা পাথরের বাড়িতে থাকত। সেখানে প্রায়ই তার আতিথ্য উপভোগ করেছি।

এবার যখন তার ছেলের সঙ্গে তার গ্রামের কাছাকাছি এলুম, তখন শুনি যে মেয়েদের কান্নার শব্দ আসছে, বাড়ি থেকে নয়। কুঁয়ার সিং তার একজন চাকরের জন্যে যে একটা কুঁড়েঘর বানিয়েছিল, সেটা থেকে। ছেলেটা আমাকে সেদিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল যে, নাতি নাতনীরা কুঁয়ার সিংয়ের ঘুমের ব্যাঘাত করে বলে তাকে এখানে এনে রাখা হয়েছে। আমাদের আসতে দেখে কুঁয়ার সিংয়ের বড় ছেলে ওই ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে জানিয়ে দিল যে তার বাবার জ্ঞান নেই, আর কয়েক মিনিট বাঁচে কি না বাঁচে।

কুটিরটির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। ঘরের মধ্যে ঘন ধোঁয়ার একটা আবরণ ঘরের মিটমিটে আলোটাকে আরও মিটমিটে করে তুলেছে। সেই অবস্থাটা যখন চোখে সয়ে এল, তখন দেখতে পেলুম যে কুঁয়ার সিং উলঙ্গ অবস্থায় মাটির মেঝের উপর পড়ে আছে, একটা চাদর দিয়ে তার দেহের খানিকটা ঢাকা।

একটি বৃদ্ধ লোক মেঝের উপর তার কাছে বসে তার অসাড় ডানহাতখানাকে তুলে ধরে রেখেছে, আর একটা গরুর লেজ ঘিরে তার আঙুলগুলিকে চেপে ধরা রয়েছে। (মুমূর্ষ মানুষের হাতে একটা গরুর লেজ ধরিয়ে দেবার একটা প্রথা আছে--গরুটা একটা কাল বকনা হলে আরও ভাল হয়। প্রথাটার কারণ এই যে, হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে মর্ত্যদেহ ছেড়ে বেরিয়ে মানুষের আত্মা একটা রক্তের নদীর সামনে এসে পড়ে, আর তার ওপারেই বসে থাকেন সেই বিচারক, যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যে আত্মাকে তার যত পাপের জন্য জবাবদিহি করতে হবেই। ওই বকনাটার লেজ ধরেই ওই প্রেতাত্মা ওই নদীটা পার হতে পারে। আর, তার পার হবার এই ব্যবস্থাটা যদি করে দেওয়া না হয়, তাহলে আত্মা অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতেই থেকে যায়, আর যারা তাকে সেই বিচারাসনের সামনে নিয়ে হাজির করতে গাফিলতি করেছে তাদের উপর উৎপাত করে।)

কুঁয়ার সিংয়ের মাথার কাছে একটা আগুনের গামলায় ঘুঁটে জ্বলছে, তার পাশে এক পুরুত বসে আছে সে মন্ত্র পড়ছে আর ঘন্টা নাড়ছে। পুরুষ-মেয়েদের গাদাগাদিতে ঘরে আর এতটুকু জায়গাও নেই। তারা বিলাপ করছে আর ক্রমাগত বলছে, 'মরে গিয়েছে! মরে গিয়েছে!'

জানি যে এ-দেশে অনেক লোক রোজই এইভাবে মারা যাচ্ছে, কিন্তু আমার বন্ধুটিও তাদের মধ্যে একজন হবে, এটা আমি হতে দেব না। বলতে কি, আমার সাধ্য থাকলে তাকে আমি মোটে মরতে দিতেই চাই না—অন্তত এখন তো নয়ই।

লম্বা-লম্বা পা ফেলে ভিতরে ঢুকে আমি লোহার চুলোটা তুলে নিলুম। সেটা অত গরম হবে ভাবি নি, হাত পুড়ে গেল। দরজা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়ে সেটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। ফিরে গিয়ে, ছালের যে দড়িটা দিয়ে ঘরের মাটির মেঝেতে পোঁতা খুঁটিতে গরুটা বাঁধা ছিল সেটা কেটে গরুটাকে বাইরে নিয়ে গেলুম। আমি কথাটি না বলে এসব কাণ্ড করছিলুম। এর মানে কি, তা বুঝতে পেরে লোকগুলো বিশেষ হইচই করল না। তারপর যখন পুরুতের হাতখানা ধরে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলুম, তখন সব গোলমাল থেমে গেল।

তখন দরজায় দাঁড়িয়ে আমি সবাইকে বাইরে যেতে বললুম। একটুও আপত্তি বা টুঁ শব্দ না করে সবাই আমার হুকুম তামিল করল। ঘর থেকে ছেলেয়-বুড়োয় এত লোক বেরোল যে বললে বিশ্বাস করবেন না। শেষ মানুষটি চৌকাঠের ওপাশে যাবার পর আমি কুঁয়ার সিংয়ের বড় ছেলেকে সের-দুই টাটকা দুধ যত শিগগির সম্ভব গরম করে নিয়ে আসতে বললুম। ছেলেটা বেজায় অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু আমি কথাটা দ্বিতীয়বার বলাতেই সে তাড়াতাড়ি ছুটল।

তখন আমি আবার ঘরে ঢুকে দেওয়ালের একটা দড়ির খাটিয়া সামনে টেনে এনে কুঁয়ার সিংকে তুলে তার উপর শোয়ালুম। প্রচুর টাটকা হাওয়ার অত্যন্ত দরকার, অথচ চারদিকে তাকিয়ে দেখি, একটা মাত্র যে জানলা সেটাও তক্তা এঁটে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

সেগুলো ভেঙে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগল না, আর বনের থেকে পরিষ্কার মিষ্টি হাওয়া সোজা এসে ঢুকল সেই ঘরটার মধ্যে যা এতক্ষণ মানুষ, গোবর, পোড়া-ঘি আর কড়া-ধোঁয়ার বদ গন্ধে ভরভর করছিল।

যখন কুঁয়ার সিংয়র জীর্ণ-শীর্ণ দেহটা তুলি, তখনই বুঝলাম যে তাতে একটু প্রাণ আছে, যদিও তা খুবই সামান্য। তার কোটরের গভীরে বসা চোখ-দুটো বন্ধ, ঠোঁট-দুটো নীল, আর তার নিঃশ্বাস থেকে-থেকে অল্প-অল্প পড়ছে। কিন্তু শিগগিরই টাটকা পরিষ্কার হাওয়া তাকে চাঙ্গা করে তুলতে লাগল, আর তার শ্বাস-প্রশ্বাসও কম কষ্টকর এবং বেশি স্বাভাবিক হয়ে এল।

কাঁদুনেদের যে-দলটাকে আমি সেই যমের ঘর থেকে খেদিয়ে দিয়েছিলুম, তারা যেরকম ছটফট করছিল, খাটিয়ায় বসে দরজার ফাঁক দিয়ে তা দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার খেয়াল হল যে কুঁয়ার সিং চোখ মেলেছে আর আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মাথা না ফিরিয়েই আমি কথা বলতে শুরু করলুম :

'দিনকাল বদলে গিয়েছে, খুড়ো, আর তার সঙ্গে তুমিও বদলেছ। এমন দিনও ছিল যখন কারও এ সাহস হত না যে তোমাকে তোমার নিজের ঘর

থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে একটা চাকরের কুঁড়েঘরের মেঝেতে ফেলে রাখবে, যাতে তোমার মরণ হয় একটা একঘরে ভিখিরীর মত। আমার কথা তো তুমি শুনলে না, এই হতভাগা নেশাই তোমার এই হাল করেছে।

'আজ তোমার ডাক শুনে এখানে আসতে আর কয়েক মিনিট দেরি করলেই তুমি এতক্ষণে শ্মশান-ঘাটের রাস্তা নিতে। চাঁদনি চকের মোড়ল আর কালাধুঙ্গির শ্রেষ্ঠ শিকারী বলে সবাই তোমাকে সম্মান করত, আর এখন তুমি সে সম্মান খুইয়ে বসেছ।

'তুমি জোয়ান মানুষ ছিলে, ভাল-ভাল জিনিস খেতে কিন্তু আজ তুমি কম-জোরী হয়ে গিয়েছ, তোমার পেট খালি। তোমার ছেলের কাছে শুনলুম যে ষোল দিনের মধ্যে তুমি কিছু খাও নি। কিন্তু দোস্ত, তুমি মরতে যাচ্ছ না, তা ওরা যাই বলুক না কেন। আরও অনেক বছর তুমি বেঁচে থাকবে। এবং যদিও আমরা হয়তো আর একসঙ্গে গারুপ্পুর বনে জঙ্গলে শিকার করতে পারব না, তবু কখনও মাংসের অভাব হবে না তোমার। বরাবর যেমন করেছি, এখনও তেমনি, আমি যা শিকার করব তার ভাগ তোমাকে দেব।

'আর এখনই, এই ঘরে, আঙুলে পইতে জড়িয়ে আর হাতে অশ্বত্থপাতা নিয়ে তোমার বড় ছেলের মাথায় হাত দিয়ে তোমায় প্রতিজ্ঞা করতেই হবে যে তুমি ওই নচ্ছার নেশা আর ছোঁবেও না। আর, এইবার তুমি যে প্রতিজ্ঞা করবে, তা রাখতেই হবে তোমাকে। এখন এস, যতক্ষণ না তোমার ছেলে দুধটা নিয়ে আসে ততক্ষণ একটু ধোঁয়া খাওয়া যাক।'

যতক্ষণ আমি কথা বলছিলুম ততক্ষণ কুঁয়ার সিং তার চোখ সরায় নি। এখন সে প্রথম তার ঠোঁট খুলল। তারপর বললে, 'যে লোকটা মরে যাচ্ছে সে সিগারেট খাবে কী করে?'

আমি বললুম, 'মরবার কথা এখন থাক। কেননা তোমাকে তো এখনই বলেছি যে তুমি মরতে যাচ্ছ না। আর, সিগারেট কী করে খাওয়া যাবে, তা আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

এই বলে, আমার খাপ থেকে দুটো সিগারেট নিয়ে একটা ধরিয়ে তার ঠোঁটে গুঁজে দিলুম। সে আস্তে এক টান টেনে একটু কাশল, তারপর খুব দুর্বল হাতখানা দিয়ে সিগারেটটা ধরল। কিন্তু কাশির ধমকটা কেটে গেলে সে আবার সেটাকে ঠোঁটে রাখল, তারপর টানতে লাগল। আমাদের ধূমপান শেষ হবার আগেই কুঁয়ার সিংয়ের ছেলে মস্ত বড় একটা পিতলের পাত্র নিয়ে এসে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি সেটা তার হাত থেকে না নিয়ে নিলে সেটাকে সে দরজায়ই ফেলে দিত।

সে কেন অবাক হয়েছিল তা বোঝা শক্ত নয়, কেননা যে বাপকে সে মাটিতে মর-মর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে গিয়েছে, সেই বাপ তখন খাটিয়ায় শুয়ে,

আমার টুপির উপর মাথা রেখে সিগারেট টানছিল। ঘরে এমন কিছু ছিল না যাতে করে দুধটা খাওয়া যেত, তাই ছেলেটাকে আবার একটা বাটি নিয়ে আসতে পাঠালুম। সেটা নিয়ে আসা হলে কুঁয়ার সিংকে আমি গরম দুধ খাইয়ে দিলুম।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেই ঘরে থাকবার পর যখন কুঁয়ার সিংকে ছেড়ে চলে এলুম, তখন সে সেরখানেক দুধ খেয়ে শান্তিতে একটি বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। চলে আসবার আগে আমি ছেলেটাকে সাবধান করে এলুম যে, কোনো কারণেই যেন আর কাউকে ঘরের কাছে আসতে দেওয়া না হয়, আর সে যেন তার বাপের কাছে বসে থেকে সে যতবার জাগবে ততবার তাকে একটু একটু দুধ খেতে দেয়। আর যদি সকালবেলা ফিরে এসে দেখি যে কুঁয়ার সিং মারা গিয়েছে, তাহলে আমি গ্রামকে-গ্রাম জ্বালিয়ে দেব!

পরদিন সকালবেলা সূর্য যখন সবে উঠেছে, তখন আমি চাঁদনি চক গ্রামে ফিরে এসে দেখি যে কুঁয়ার সিং আর তার ছেলে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, আর পিতলের পাত্রটি খালি পড়ে আছে।

কুঁয়ার সিং তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল। যদিও সে আমার সঙ্গে শিকার অভিযানে যাবার মত যথেষ্ট শক্তি আর ফিরে পায় নি, তবু সে প্রায়ই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত। এর চার বছর পরে সে নিজের বাড়িতে বিছানায় শুয়ে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে।



৩

মোতি

মোতির মুখখানা ছিল সুন্দর, যেন কুঁদে কাটা। ভারতের উঁচু জাতের সব লোকেরই বংশানুক্রমে তাই হয়। তবে, যখন তার বাপ মা তার উপর পরিবারের সব দায়িত্ব ফেলে দিয়ে মারা গেল তখন সে কচি ছেলে। থাকবার মধ্যে তার ছিল শুধু ক-খানা হাত-পা। ভাগ্য ভাল যে পরিবারটি ছিল ছোট, শুধু তার ছোট ভাই আর ছোট বোনকে নিয়ে।

তখন মোতির বয়স চোদ্দ, ছ-বছর হল তার বিয়ে হয়েছে। হঠাৎ নিজেকে পরিবারের কর্তা হয়ে পড়তে দেখে সে প্রথমেই যা-যা কাজ করল, তার মধ্যে একটা হল তার বার বছরের বউকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনিয়ে নেওয়া। বিয়ের পর থেকে তাদের আর দেখা হয় নি। বউ ছিল বাপের বাড়িতে, কালাধুঙ্গি থেকে মাইল বার দূরে, কোটা দুন গ্রামে।

ওয়ারিস সূত্রে মোতি যে আঠার বিঘে জমি পেয়েছিল, তা চাষ করা তো এই চারটি বাচ্চা ছেলেমেয়ের কর্ম নয় ; তাই মোতি একজন ভাগীদার নিল, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে "সাগী"। সে দিনরাত কাজ করার বিনিময়ে পাবে মাগনায় থাকা খাওয়া আর ফসলের অর্ধেক।

সরকারী ছাড়পত্র নিয়ে বহুদূর থেকে মাথায় আর ঘাড়ে করে বয়ে জঙ্গল থেকে বাঁশ আর ঘাস এনে সবাই মিলে থাকবার জন্যে একটি ঘর তৈরি করা মোতি আর তার সাহায্যকারীদের পক্ষে বড্ড কষ্টকর হবে বলে আমি তাদের

একটা বাড়ি বানিয়ে দিলুম। তাতে ছিল তিনখানা ঘর আর চওড়া একটা বারান্দা, তার ভিত চার ফুট উঁচু। মোতির বউ একটু উঁচু অঞ্চল থেকে এসেছিল বলে সে ছাড়া আর সবাই ছিল ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত।

ফসল রক্ষা করবার জন্যে প্রজারা সারা গ্রামটাকে ঘিরে কাঁটাগাছের বেড়া দিত। এর জন্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে কঠিন খাটুনি খাটতে হত বটে, কিন্তু এই পলকা বেড়ায় বুনো জন্তুদের বা দল-ছাড়া গরু-মোষদের ঠেকিয়ে রাখা যেত না। যখন জমিতে ফসল থাকত তখন প্রজারা কিংবা তাদের পরিবারের লোকেরা সারা রাত জেগে খেত পাহারা দিত।

বন্দুক দেওয়া সম্বন্ধে খুব কড়াকাড়ি ছিল বলে আমাদের চল্লিশ জন প্রজার জন্যে গভর্নমেন্ট থেকে মোটে একটা একনলা গাদা-বন্দুক দেওয়া হয়েছিল। এই বন্দুকটি পালা করে এক-এক জনে নিত, তাতে শুধু তার খেত পাহারা দেবার কাজ চলত বাকি সবাইকে নির্ভর করতে হত ক্যানেস্তারার উপর—তা পিটিয়ে সারা রাত কাটাত।

শুয়োর আর শজারুগুলোই ছিল যত নষ্টের গোড়া। বন্দুকটা দিয়ে মেলা শুয়োর আর শজারু মারা হত বটে, তবু প্রতি রাতেই প্রচুর ক্ষতি হত; কেননা গ্রামটার কাছাকাছি আর কোনো গ্রাম ছিল না, আর তার চারপাশেই ছিল বন। তাই, যখন মোকামা ঘাটে আমার ঠিকাদারী কাজ থেকে লাভ হতে লাগল : তখন আমি গ্রাম ঘিরে একটা পাকা পাঁচিল তুলতে শুরু করলুম। যখন শেষ হল, সেটা হল ছ-ফুট উঁচু আর তিন মাইল লম্বা। সেটা তৈরি করতে দশটি বছর লেগেছিল, কেননা, আমার লাভের পরিমাণ ছিল যৎসামান্য।

আজ মোটরে করে বোর নদীর পুল পার হয়ে হলদোয়ানি থেকে কালাধুঙ্গি হয়ে রামনগর যেতে হলে বনে ঢোকবার আগে সেই প্রাচীরটার উঁচু দিকের মাথাটার পাশ দিয়ে যেতে হবে।

একদিন ডিসেম্বরের ঠান্ডা সকালে আমি গ্রামের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম। সঙ্গে ছিল আমার কুকুর রবিন। সে আমার আগে-আগে ছুটছিল আর তাড়া খেয়ে ঝাঁকের পর ঝাঁক ছাইরঙা তিতির পাখি উঠে পড়ছিল। এক রবিন ছাড়া আর কেউ কখনও তাদের ঘাঁটাত না, কেননা গ্রামের সবাই সকাল সন্ধ্যায় তাদের ডাক শুনতে ভালবাসত। এমন সময় একটা জলসেচের নালার ধারে নরম জমিতে আমি একটা শুয়োরের খুরের ছাপ দেখতে পেলুম।

শুয়োরটা প্রায় একটা মোষের বাচ্চার মত বড়। তার গজদাঁত ছিল প্রকাণ্ড, বাঁকা, আর দেখতে ভয়ানক। গ্রামের সবাই তাকে চিনত। একেবারে বাচ্চা অবস্থা থেকে সে কাঁটাঝোপের বেড়ার ফাঁকে গলে খেতে ঢুকে ফসল খেয়ে-খেয়ে মোটা হয়েছিল। পাঁচিল হওয়ায় প্রথমে সে একটু ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু সেও কম জেদী নয়, আর পাঁচিলটার গা-ও ছিল

এবড়ো-খেবড়ো। তাই সে ক্রমে-ক্রমে পাঁচিলে উঠতে শিখে নিল। কতবার খেতের প্রহরীরা তাকে গুলি করেছে, কয়েকবার সে রক্তের দাগ রেখেও গিয়েছে। কিন্তু তার আঘাত কখনও মারাত্মক হয় নি। এর একমাত্র ফল হয়েছে এই যে, সে আরও হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছে।

ডিসেম্বরের এই ভোরে শুয়োরটার খুরের ছাপ ধরে আমি মোতির খেত অবধি গেলুম। কাছাকাছি যেতেই দেখি, মোতির বউ কোমরে দুই হাত রেখে খেতের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের আলুর খেতের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করছে।

শুয়োরটা রীতিমত ক্ষতি করে গিয়েছিল। আলুগুলো পুষ্ট হয় নি। শুয়োরটারও খিদে পেয়েছিল নিশ্চয়। উৎপাতটা কোন্ দিকে গিয়েছিল রবিন তা খুঁজে দেখতে লাগল। ততক্ষণে স্ত্রীলোকটি তার মনের ভাব ব্যক্ত করতে শুরু করেছে। সে বললে, 'সব দোষ হচ্ছে পুনোয়ার বাবার। কাল রাতে বন্দুকের পালা ছিল তারই। সে কোথায় ঘরে থেকে নিজের খেত পাহারা দেবে, না, সে গেল কালুর গম-খেতে বসে সম্বর হরিণ মারবার আশায়। সেও গেছে, আর শয়তানটা এসে এই কান্ড করে গেছে।'

ভারতে আমরা যেখানে থাকি সেই অঞ্চলে কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না, তাকে নাম ধরে ডাকেও না। ছেলেমেয়ে হবার আগে তাকে 'বাড়ির লোক' বলে উল্লেখ করা হয়, আর ছেলেমেয়ে হবার পর তাকে বলা আর ডাকা হয় তার প্রথম সন্তানের বাবা বলে। তখন মোতির তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদের মধ্যে পুনোয়া বড়। তাই সে তার স্ত্রীর কাছে 'পুনোয়া'র বাপ' আর তার স্ত্রী গ্রামের সকলের কছে 'পুনোয়ার মা' বলেই পরিচিত।

আমাদের গ্রামের স্ত্রীলোকদের মধ্যে পুনোয়ার মা যেমন সকলের চেয়ে বেশি পরিশ্রমী, তেমনি সে সকলের চেয়ে বেশি মুখরা। গত রাত্রে বাড়িতে না থাকায় পুনোয়ার বাপ সম্বন্ধে তার যা মনোভাব তা সে খুব স্পষ্ট ভাষায় বলা শেষ করে তারপর আমাকে নিয়ে পড়ল।

সে বললে যে, যে-পাঁচিলে উঠে তার আলু খেয়ে যেতে পারে, এমন পাঁচিল বানিয়ে আমি শুধু কতকগুলি টাকাই নষ্ট করেছি। যদি আমার শুয়োরটাকে মারবার ক্ষমতা না-ই থাকে তবে আমার উচিত হচ্ছে পাঁচিলটাকে আরও কয়েক ফুট উঁচু করে দেওয়া যাতে শুয়োরটা তা ডিঙোতে না পারে। ভাগ্যক্রমে আমার মাথার উপর এই ঝড় বইতে থাকার কালেই মোতি এসে পড়ল। অমনি আমি শিস দিয়ে রবিনকে ডেকে নিয়ে, মোতিকে সেই ঝাপটা সামলাবার জন্যে রেখে তাড়াতাড়ি সরে পড়লুম।

সেই সন্ধেবেলায়ই আমি পাঁচিলটার একেবারে ও-মাথায় সেই শুয়োরটার খুরের ছাপ দেখতে পেয়ে, কখনও জানোয়ারদের চলাচলের রাস্তা ধরে কখনও

বা বোর নদীর তীর ধরে ধরে মাইল-দুই চলে গেলুম। শেষে এসে পেঁছলুম ল্যান্টানা-লতায় জড়াজড়ি একটা ঘন কাঁটা-ঝোপের ধারে। এই ঝোপের ধারে আমি ঠাঁই নিলুম, কেননা গুলি চালাবার মত আলো যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণের মধ্যে শুয়োরটার এখান থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা আট-আনা রকম ছিল।

নদীর পাড়ে একটা পাথরের পেছনে বসে পড়লুম। খানিক বাদেই কাছে একটা জঙ্গলের ও-মাথায় একটা সম্বর হরিণী ডাকতে শুরু করল। সেই বনেই কয়েক বছর বাদে আমি 'পাওআলগড়ের কুমার'-কে* গুলি করে মেরেছিলুম। হরিণীটা বনের প্রাণীদের একটা বাঘের উপস্থিতি সম্বন্ধে সাবধান করে দিচ্ছিল।

দিন-পনের আগে তিনজন শিকারীর একটি দল আটটি হাতি নিয়ে কালাধুঙ্গিতে এসেছিল। জঙ্গলের একটা ব্লকে শিকার করবার একটা পাস ছিল আমার। সেই ব্লকেই তখন আস্তানা গেড়েছিল একটা বাঘ। এই শিকারীদের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল সেটাকে মারা।

তারা যে ব্লকটা নিয়েছিল, সেটার আর আমারটার মধ্যে ছিল বোর নদী। বাঘটাকে ফুসলে নিজেদের ব্লকে নিয়ে আসবার জন্যে তারা নদীর নিজেদের দিকের পাড়ে চোদ্দটা বাচ্চা মোষ বেঁধে রেখেছিল। তার মধ্যে দুটোকে বাঘটা মেরেছিল, বাকি বারটা অবহেলায় আর না-খেয়ে মারা পড়েছিল। আগের রাতে আন্দাজ ন-টার সময় আমি একটা ভারি রাইফেলের আওয়াজ শুনেছিলুম।

ঘন্টা-দুই ধরে পাথরখানার পিছনে বসে থেকে আমি সম্বরটার ডাক শুনলুম, কিন্তু শুয়োরটার কোনো চিহ্ন দেখলুম না। শেষে যখন আর শিকার করবার মত আলো রইল না, তখন আমি নদী পার হয়ে কোটা যাবার রাস্তায় পেঁছে সেটা ধরে নিচে নামতে লাগলুম।

কয়েকটা গুহার পাশ দিয়ে যাবার সময় আস্তে আর সাবধানে যেতে হল, কারণ ওখানে ছিল একটা প্রকান্ড ময়াল সাপের বাসা। তাছাড়া ওখানেই মাসখানেক আগে বন-বিভাগের বিল বেইলি একটা আট হাত লম্বা শঙ্খচূড়কে গুলি করে মেরেছিল। গ্রামের দরজায় পেঁছে আমি থেমে চেঁচিয়ে মোতিকে বললুম সে যেন পরদিন সকালে খুব ভোরেই আমার সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরি থাকে।

মোতি অনেক বছর ধরে কালাধুঙ্গিতে আমার নিত্যসাথী ছিল। সে ছিল উৎসাহী আর বুদ্ধিমান, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি-সম্পন্ন। সে নিঃশব্দে বনের মধ্যে চলাফেরা করতে পারত, আর তার সাহস ছিল মানুষের পক্ষে যতটা

* Man-Eaters of Kumaon

থাকা সম্ভব। সে কখনও নির্ধারিত কাজে দেরি করে আসত না। সেই ভোরে যখন আমরা শিশির-ভেজা বনের মধ্য দিয়ে বন-জাগানো অনেক রকম শব্দ শুনতে-শুনতে পথ চলছিলুম, তখন আমি তাকে সম্বর হরিণীটার ডাকের কথা বলে বললুম যে আমার সন্দেহ হয় সে বাঘটা দেখেছিল তার বাচ্চাকে মারছে এবং দাঁড়িয়ে থেকে বাঘটাকে মড়ি নিয়ে বসে থাকতে দেখেছিল। এরকম ঘটনা বিরল নয়। তার একটানা ডাকের আর কোনো মানে আমি করতে পারি নি।

টাটকা একটা মড়ি পেয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে জেনে মোতি উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কেননা তার যা সংগতি ছিল তাতে মাসে একবারের বেশি সে তার পরিবারের জন্যে মাংস কিনে খেতে পারত না। তাই, বাঘের কিংবা চিতার টাটকা-মারা একটা সম্বর, চিতল বা শুয়োর পাওয়া তার পক্ষে দেবতার আশীর্বাদের মত হত।

আমি গত সন্ধ্যায় যেখানে ছিলুম সম্বর ডাকার জায়গাটা সেখান থেকে সোজা উত্তরে হাজার-দেড়েক গজ দূরে বলে ঠিক করেছিলুম। কিন্তু পৌঁছে কোনো মড়ি দেখতে না পেয়ে আমরা মাটিতে রক্ত, লোম বা হেঁচড়ে নিয়ে যাবার দাগ খুঁজতে লাগলুম, যা থেকে আমরা মড়িটার হদিস পেতে পারি। আমার তখনও দৃঢ় ধারণা যে এমন একটা মড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে যেটাকে বাঘেই মেরেছে।

কয়েকশো গজ দূরে একটা পাহাড়ের তলা থেকে বেরিয়ে দুটো অগভীর খাত এসে এই জায়গায় মিলেছে। খাত-দুটো মোটামুটি সমান্তরালভাবে গজ-তিরিশেক ব্যবধানে চলে গিয়েছে। মোতি বললে যে সে ডান-দিকেরটা, আর আমি বাঁ-দিকেরটা ধরে এগিয়ে গেলে হয়। দুয়ের মাঝখানে শুধু নিচু-নিচু ঝোপ থাকায় আমরা দু-জনে দু-জনকে দেখতে পাব আর কাছাকাছিও থাকব, এই ভেবে আমি তার কথায় রাজী হয়ে গেলুম।

তন্ন-তন্ন করে জমিটা দেখব বলে আমরা খুব আস্তে-আস্তে শ-খানেক গজ এগিয়েছি, এমন সময় আমি ঘাড় ফিরিয়ে মোতিকে দেখতে যেতেই দেখি যে সে চিৎকার করে উঠে পিছু হটে গেল। তারপর সে এক ঝটকায় ফিরে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ছুট দিল। এমনভাবে সে তার দুই হাত হাওয়ায় চাপড়াতে লাগল, যেন সে একঝাঁক মৌমাছিকে খেদাচ্ছে।

জঙ্গলে যেখানে এক মুহূর্ত আগে সব নিস্তব্ধ ছিল, হঠাৎ সেখানে মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদ শুনতে ভয়ানক লাগে। তা বর্ণনা করা অসম্ভব। সহজ বুদ্ধিতে বুঝে নিলুম কী হয়েছে। রক্ত বা লোম দেখবার জন্যে মাটির দিকে চোখ রেখে যেতে-যেতে মোতি খেয়াল করে নি সে কোথায় চলেছে। এইভাবে সে পড়েছে একেবারে বাঘটার উপর।

সে বেশি আঁচড়-কামড় খেয়েছে কি না দেখতে পেলুম না, কেননা ঝোপ-ঝাড়ের উপরে শুধু তার মাথা আর কাঁধ জেগে ছিল।

সে যখন দৌড়চ্ছিল আমি তখন তার এক ফুট পিছনে বন্দুক তাক করে ছিলুম, কিছু নড়তে দেখলেই ঘোড়া টিপব, এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমি ঘুরে দাঁড়ানো পর্যন্ত কিছু নড়ল না দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। মোতি দৌড়ে শ-খানেক গজ যাবার পর আমি মনে করলুম যে আর বিপদ নেই। চিৎকার করে তাকে থামতে বলে বললুম যে আমি তার কাছে যাচ্ছি। তারপর কয়েক গজ পিছু হটে গেলুম, কেননা বাঘটা তার জায়গা ছেড়েছে কি না জানা যাচ্ছিল না। তারপর খাতটা ধরে তাড়াতাড়ি মোতির দিকে গেলুম।

সে একটা গাছে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখে খুব নিশ্চিন্ত হলুম যে তার গায়ে কিংবা পায়ের তলার মাটিতে রক্ত দেখা যাচ্ছে না। কাছে পৌঁছতেই সে আমায় জিগ্যেস করল কী হয়েছিল। কিছুই হয় নি বলায় সে অবাক হয়ে গেল। জিগ্যেস করল, 'বাঘটা কি আমার দিকে লাফ দেয় নি, কিংবা পিছনে আসে নি?' আমি বললুম সে বাঘটা যাতে তা করে, তার জন্যে মোতির চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয় নি। তখন সে বললে, 'জানি সাহেব, তা জানি আমি। আমার দৌড়নো আর চেঁচানো উচিত হয় নি, কিন্তু আমি—তা না করে পা-র-লু-ম না!' তার গলার আওয়াজ জড়িয়ে এল, মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়ল।

আমি তার গলাটা ধরতে যেতেই সে আমার হাত ফসকে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। তার মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল, দেহ একেবারে স্থির হয়ে পড়ে রইল। তার দিকে চেয়ে আমার প্রতিটি মিনিট অতি দীর্ঘ মনে হতে লাগল, আর ভয় হল যে এই মানসিক আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে।

এ-ধরনের আকস্মিক দুর্বিপাকে এই জঙ্গলে সামান্যই করবার থাকে। সেই সামান্য কাজটুকুই করলুম। মোতিকে চিত করে শুইয়ে, তার জামা-কাপড় সব ঢিলে করে দিয়ে তার বুকের কাছটা ডলতে লাগলুম। যখন আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি এবং তাকে বয়ে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, তখন সে চোখ খুলল।

মোতি যখন সুস্থ হয়ে ঠোঁটের ফাঁকে একটি আধপোড়া সিগারেট চেপে ধরে গাছে পিঠ দিয়ে মাটিতে বসল, তখন আমি ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছিল তাকে বলতে বললুম।

সে বললে, 'আপনাকে ছেড়ে যাবার পর আমি জমিতে রক্ত কিংবা লোমের চিহ্ন আছে কি না তা ভাল করে দেখতে-দেখতে খাতটা ধরে খানিকটা এগিয়ে যেতেই একটা পাতার উপর কি যেন একটা দেখতে পেলুম। সেটা একফোঁটা শুকনো রক্তের মত দেখতে। কাজেই আরও কাছে থেকে সেটাকে দেখবার জন্যে আমি হেঁট হলুম। তারপর যেই না মুখ তুলেছি, অমনি সোজা বাঘটার মুখের

উপর আমার চোখ পড়ল। সেটা তিন কি চার পা দূরে মাটিতে নিচু হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মাথাটা একটু উঁচু করা ছিল, মুখটা একেবারে খোলা। থুতনিতে আর বুকে রক্ত মাখানো।

দেখে মনে হল যে সে আমার দিকে লাফ মারে আর কি! তাই দেখে আমার মাথা বিগড়ে গেল, আমি চিৎকার করে দৌড় লাগালুম।' সম্বরের মুড়িটার কিছুই সে দেখতে পায় নি। সেখানে জমিটা ফাঁকা, ঝোপ-ঝাড় কিছু নেই। বাঘটা যেখানে শুয়ে, কোনো মুড়ি নেই সেখানে।

মোতিকে সেখানেই থাকতে বলে আমি সিগারেটটা নিবিয়ে তদন্তে বেরিয়ে পড়লুম। যে-বাঘের মুখ হাঁ হয়ে রয়েছে, যার থুতনিতে আর বুকে রক্ত লেগে রয়েছে, সে যে কেন মোতিকে খোলা জমির উপর দিয়ে তার কয়েক হাতের মধ্যে আসতে দিল, আর মোতি তার মুখের সামনে চিৎকার করে উঠলেও তাকে মেরে ফেলল না—এর কোনো কারণ আমি ভেবে পেলুম না।

চিৎকার করে ওঠবার সময় মোতি যেখানটায় ছিল, খুব সাবধানে এগিয়ে গেলুম সেখানে। দেখি, যে সামনেই একটা ফাঁকা জায়গা। বাঘটা এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি খেয়ে সেখানে বিছানো মরা পাতাগুলোকে যেন ঝেঁটিয়ে দিয়েছে। খালি জমিটার এধারে ধনুকের আকারে চাপ-বাঁধা জমাট রক্ত। যাতে জায়গাটা ওলট-পালট না হয়, সেইজন্যে বাঘটা যেখানে শুয়ে ছিল তার ধার দিয়ে ঘুরে গিয়ে, আমি ওধারে একটা টাটকা রক্তের দাগ চলে গেছে দেখতে পেলুম। সেটা যে কেন এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের দিকে চলে গিয়েছিল, আপাতদৃষ্টিতে তার কোনো কারণ দেখা গেল না।

সেখান থেকে পাহাড় ধরে কয়েকশো গজ এগিয়ে গিয়ে দাগটা যে গভীর আর সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্যে চলে গিয়েছে, সেখানে ছোট একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। পাদ-শৈলমালার মধ্যে অনেকখানি চলে গিয়েছে এই গিরিখাতটা। বাঘটা এটা ধরে উপর দিকে গিয়েছে। খোলা জমিটাতে ফিরে এসে চাপ-বাঁধা রক্তটা পরীক্ষা করে দেখলুম। তার মধ্যে হাড়ের আর দাঁতের ভাঙা টুকরো দেখা গেল। আমি যা জানতে চাইছিলুম, এই কুচিগুলো আমাকে সে কথাটা বলে দিল। দু-রাত আগে যে রাইফেলের গুলির শব্দ পেয়েছিলুম, সেটা বাঘটার নিচের চোয়াল চূর্ণ করে দিয়েছিল। তারপর সে যে-বনে থাকত সে বনে চলে গিয়েছিল।

যন্ত্রণায় আর রক্তক্ষয়ে কাতর হয়ে সে যতদূর পারে চলে এসেছিল। তারপর সে যেখানে এসে লুটিয়ে পড়ল, সেইখানেই সেই সম্বর হরিণীটা তাকে ছটফট করতে দেখতে পেয়েছিল। তার তিরিশ ঘণ্টা বাদে মোতি সেইখানেই তার কাছে গিয়ে পড়েছিল। কোনো পশুর নিচের চোয়াল চূর্ণ হয়ে যাওয়াটা হচ্ছে তার পক্ষে সবচাইতে কষ্টকর।

সেই জখমের তাড়সে বাঘটার প্রবল জ্বর এসেছিল বোঝা গেল। মোতি যখন তার মুখের উপরেই চিৎকার করে উঠেছিল, বেচারার তখন বোধহয় আধা-বেহুঁশ অবস্থা। সে নিঃশব্দে উঠে সেই গিরিখাতটাতে পৌঁছবার জন্যে চরম চেষ্টা করবে বলে টলতে-টলতে চলে গিয়েছিল, কারণ সে জানত যে সেখানে জল আছে।

আমার অনুমানগুলো সত্যি কি না যাচাই করবার জন্যে মোতি আর আমি নদীটা পার হয়ে ওধারের ব্লকে যেখানে চোদ্দটা মোষ বাঁধা হয়েছিল সে জায়গাটা দেখতে গেলুম। এখানে একটা গাছে খুব উঁচুতে যে মাচানে শিকারী তিনজন বসেছিল সেটা দেখতে পেলুম, আর গুলিটা খাবার সময় বাঘটা যে মোষটাকে খাচ্ছিল, সেটাও পড়ে ছিল। সেই মড়ি থেকে মোটা একটা রক্তের দাগ নদীটা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, তার দু-পাশে হাতির পায়ের ছাপ।

মোতিকে নদীর ডান-পাড়ে রেখে আমি নদী পার হয়ে আমার ব্লকে গেলুম। সেখানে আবার রক্তের দাগ আর হাতির পায়ের ছাপ খুঁজে বের করে পাঁচ-ছশো গজ গিয়ে ঘন ঝোপ মিলল। হাতিগুলো এর ধারে এসে থেমেছিল, তারপর কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে ডাইনে ফিরে কালাধুঙ্গির দিকে গিয়েছিল। আগের দিন সন্ধেবেলা আমি যখন সেই শুয়োরটাকে শিকার করবার চেষ্টায় চলেছি, তখন সেই ফিরতি হাতিগুলোকে দেখেছিলুম।

একজন শিকারী আমাকে জিগ্যেস করেছিল যে আমি কোথায় চলেছি। আমি তাকে সে কথা বলায় সে আমায় যেন কিছু একটা বলতে চাইল, কিন্তু তার সঙ্গীরা তাকে বাধা দিল। কাজেই তিন শিকারীর দলটি যে বন-বিভাগের বাংলোটায় উঠেছিল, সেইদিকেই হাতি চড়ে চলে গেল। যে-জঙ্গলে তারা একটা আহত বাঘকে ফেলে রেখে গেল, পায়ে হেঁটে আমি তার ভিতরে গিয়েছিলুম—কেউ সাবধান করেও দিল না।

মোতিকে যেখানে রেখে গিয়েছিলুম সেখান থেকে গ্রামে ফিরে যেতে তিন মাইল পথ, কিন্তু সে-টুকু যেতে আমাদের তিন ঘন্টাই লাগল, কারণ—বলতে পারি না কেন—মোতি ভারি দুর্বল হয়ে পড়েছিল আর ঘন-ঘন বিশ্রাম নিচ্ছিল। তাকে তার বাড়িতে রেখে আমি সোজা বন-বিভাগের বাংলোয় চলে গেলুম। গিয়ে দেখি তিন জনের সেই দলটি মোট-ঘাট বেঁধে রওনা হচ্ছে হলদোয়ানিতে গিয়ে সন্ধের ট্রেন ধরবার জন্যে। বারান্দায় সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তাদের সঙ্গে কথা হল। বেশির ভাগ কথা অবশ্য আমিই বললুম। যখন শুনলুম যে বাঘটাকে আহত করেও সেটার পিছনে না যাবার একমাত্র কারণ এই যে তাদের একটা নেমন্তন্ন রাখতে যেতে হবে, তখন তাদের বললুম যে মোতি যদি ঐ ধাক্কায় মারা যায়, কিংবা যদি বাঘটা আমার কোনো প্রজাকে মারে তাহলে তাদের খুনের মামলায় পড়তে হবে।

আমার সঙ্গে কথা বলেই দলটা চলে গেল। পরদিন সকালে ভারি একটা রাইফেল নিয়ে আমি বাঘটা যে গিরিখাত দিয়ে গিয়েছে সেটার মধ্যে ঢুকলুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল অপরের শিকারের একটা স্মারক নিয়ে আসা নয়, বাঘটাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়ে তার চামড়াটাকে পুড়িয়ে ফেলা।

গিরিখাতটার প্রতি ফুট জায়গা আমি জানতুম, কিন্তু একটা আহত বাঘকে খুঁজবার জন্যে কোনো-মতেই আমি সেখানে যেতুম না। তবু সে জায়গাটা আর দু-পাশের দুই পাহাড় আমি সারাটা দিন ধরে আগাপাশতলা খুঁজে দেখলুম, কিন্তু বাঘের কোনো চিহ্ন পেলুম না, কারণ সে গিরিখাতটার মধ্যে ঢোকবার পরই রক্তের চিহ্ন হঠাৎ লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

দশদিন পরে একজন বন-রক্ষী তার রোঁদে বেরিয়ে শকুনিতে খাওয়া একটা বাঘের দেহাবশেষ দেখতে পায়। সেই বছর গ্রীষ্মকালে সরকার থেকে নিয়ম করা হল যে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে বাঘ মারবার জন্যে কেউ বসতে পারবে না, এবং কোনো শিকারী যদি কোনো বাঘকে জখম করে তাহলে সে সেটাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করতে বাধ্য। আর তাছাড়া তাকে সবচেয়ে কাছের বন-বিভাগের কর্মচারীকে আর পুলিসের ফাঁড়িতে তখনই খবরটা জানিয়ে দিতে হবে।

মোতির এই অভিজ্ঞতা হল ডিসেম্বর মাসে। পরের এপ্রিলে আমরা যখন নৈনিতাল চলে যাই, তখন তাকে এই চোটটার জন্যে বিশেষ কাহিল দেখলুম না। কিন্তু তার বরাত মন্দ। মাসখানেক বাদেই তার খেতে একটা চিতাকে গুলি করে সেটার পিছনে-পিছনে একটা ঘন ঝোপ পর্যন্ত যায়। সেখানে সেটা তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। এই জখমগুলো থেকে সেরে উঠতে না উঠতেই সে দুর্ভাগ্যক্রমে একটি গরুর মৃত্যুর কারণ হয়—যা হল হিন্দুর পক্ষে সবচেয়ে বড় পাপ।

বুড়ো জরাজীর্ণ গরুটা পাশের একটা গ্রাম থেকে ভুলে এসে মোতির খেতে চরছিল। সেটাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেই সেটার পা একটা ইঁদুর-গর্তে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। গরুটা মোতির খেতে পড়ে রইল। মোতি কয়েক সপ্তাহ ধরে যথাসাধ্য তার সেবা করা সত্ত্বেও সেটা শেষ পর্যন্ত মরেই গেল। ব্যাপারটা এতই গুরুতর যে গ্রামের পুরোহিত আর এতে হস্তক্ষেপ না করে মোতিকে হরিদ্বারে তীর্থে যেতে আদেশ করলেন। কাজেই মোতি রাহাখরচ ধার করে হরিদ্বার গেল।

সেখানে প্রধান মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কাছে গিয়ে মোতি তার পাপের কথা স্বীকার করল। কেষ্ট-বিষ্টু ভদ্রলোক বেশ ভাল করে বিবেচনা করে মোতিকে আদেশ করলেন, মন্দিরে কিছু টাকা দিতে হবে। তাতে তার পাপটা ঘুচে যাবে বটে, কিন্তু সে যে অনুতপ্ত হয়েছে তা দেখাবার জন্যে তাকে একটা

প্রায়শ্চিত্তও করতে হবে। এই বলে তিনি মোতিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তার সবচাইতে বেশি সুখ কিসে। মোতি মানুষটা সরল, তাই সে বলে ফেলল যে শিকার করা আর মাংস খাওয়াতেই তার সবচেয়ে বেশি আনন্দ। পুরোহিত তখন তাকে বললেন যে ভবিষ্যতে তাকে এ দুটো সুখ ত্যাগ করতে হবে।

মোতি পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে তীর্থ করে ফিরে এল বটে, কিন্তু জীবনভোর এক প্রায়শ্চিত্তের বোঝা তার ঘাড়ে পড়ল। শিকার করবার সুযোগ তার খুবে কমই হত, কেননা সেই দোনলা বন্দুকটা সে অন্য সকলের সঙ্গে ভাগে-যোগে ব্যবহার করতে পেত বই তো নয়! তা ছাড়া, তা দিয়ে সে শুধু গ্রামের মধ্যেই শিকার করতে পেত। তার অবস্থার লোকে সরকারী বনে শিকারের অনুমতি পেত না। তা হলেও সেই পুরনো বন্দুকটা চালিয়ে সে খুব আনন্দ পেত, আর আমি মধ্যে-মধ্যে যদিও একেবারে বেআইনীভাবে তাকে আমার রাইফেলটাও ছুড়তে দিতুম।

তার প্রায়শ্চিত্তের এই অংশটা খুবই কষ্টকর ছিল তা ঠিক, কিন্তু অপার অংশটা মোতির পক্ষে একেবারে মারাত্মক হয়ে উঠল। তা ছাড়া, এতে তার স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে গেল। যদিও তার সামান্য অবস্থায় সে মাসে বড়জোর একবার অল্প একটু মাংস কিনে খেতে পারত, তাহলেও শুয়োর আর শজারু পাওয়া যেত প্রচুর, হরিণও মধ্যে-মধ্যে রাতের বেলায় খেতে এসে পড়ত।

আমাদের গ্রামে একটা প্রথা ছিল—আমিও সেটা মেনে চলতুম—যে, একজন কিছু শিকার করলে সবাই তার ভাগ পাবে। কাজেই মোতি শুধু যে-টুকু মাংস কিনে খেতে পারত, তার উপরেই নির্ভর করে থাকতে হত না তাকে।

হরিদ্বার থেকে তীর্থ করে ফিরে আসবার পরেই শীতকালটাতে মোতির সাংঘাতিক কাশি দেখা দিল। আমরা যে ওষুধ দিলুম তাতে আরাম না হওয়ায় আমি তাকে ডাক্তার দেখালুম। তিনি সে সময় কালাধুঙ্গি হয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম যে মোতির যক্ষ্মা হয়েছে। ডাক্তারের কথায় মোতিকে তিরিশ মাইল দূরে ভাওয়ালী স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠিয়ে দিলুম। পাঁচদিন বাদে সে সেখানকার কর্তার কাছ থেকে এক চিঠি নিয়ে ফিরে এল, তাতে লেখা যে, এর বাঁচবার কোনো আশা নেই বলে একে ভর্তি করে নেওয়া গেল না, তার জন্যে অধ্যক্ষ-মশায় দুঃখিত।

একজন ডাক্তার পাদরি তখন আমাদের ওখানে ছিলেন। তিনি এক স্বাস্থ্য-নিবাসে কয়েক বছর কাজ করেছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে মোতি যেন খোলা হাওয়ায় শুয়ে থাকে, আর রোজ সকালে কয়েক ফোঁটা প্যারাফিন দিয়ে আধসের দুধ খায়। তাই সারা শীতটা মোতি খোলা হাওয়ায় শুয়ে কাটাল। সকালবেলা সে আমাদের বারান্দায় বসে সিগারেট খেতে-খেতে আমার সঙ্গে কথা বলত আর আমাদের গরুর টাটকা দুধ আধসেরটাক করে খেত।

ভারতের গরিবরা একে অদৃষ্টবাদী, তার উপর আবার রোগের সঙ্গে যুঝবার তাগদ তাদের নেই। আমাদের সাহায্য থেকে মোতি বঞ্চিত হয় নি। কিন্তু আমাদের সঙ্গ থেকে সে বঞ্চিত হয়ে পড়ল। আমরা গ্রীষ্মকালে নৈনিতালের বাড়িতে চলে যাবার মাসখানেক বাদে সে মারা গেল।

আমাদের পাহাড়ী মেয়েরা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরিশ্রম করে থাকে। তাদের মধ্যে আবার সবচেয়ে পরিশ্রমী ছিল মোতির বিধবা, পুনোয়ার মা। ছোটখাট আঁটসাঁট গড়নের পাথরের মত শক্ত আর পিঁপড়ের মত কর্মঠ এই কমবয়সী মেয়েটি আবার বিয়ে করতেও পারত, কিন্তু তাতে তার জাতের বাধা ছিল। সে সাহসভরে কোমর বেঁধে ভবিষ্যতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হল। শিশুসন্তানগুলির সহায়তায় সে অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে তার কর্তব্য পালন যেতে লাগল।

তার তিনটি সন্তানের মধ্যে পুনোয়াই বড়, তার বয়স তখন বার। সে প্রতিবেশীদের সাহায্যে লাঙল দিতে আর অন্য সব খেতের কাজ করতে লাগল।

তার বোন কুন্তী দশ বছরের মেয়ে, বিবাহিত। পাঁচ বছর পরে সে স্বামীর ঘর করতে যায়। সে-পর্যন্ত সে তার মাকে তার হাজারো কাজে সাহায্য করত। তার মধ্যে ছিল রান্না করা, বাসন মাজা, কাপড়-চোপড় ধোয়া আর মেরামত করা (পুনোয়ার মা তার নিজের আর ছেলেমেয়েদের কাপড়-চোপড় সম্বন্ধে হুঁশিয়ার ছিল? সেসব পোশাক যতই পুরনো আর তালি-দেওয়া হ'ক না কেন, তা পরিষ্কার থাকা চাই)। তাছাড়া, ঘরের কাজের জন্যে সেচের খাল থেকে কিংবা বোর নদী থেকে জল নিয়ে আসা ; জঙ্গল থেকে জ্বালানির জন্যে কাঠ ; আর দুধালো গাই আর তাদের বাছুরদের জন্যে ঘাস আর কচি পাতা নিয়ে আসা ; ফসল নিড়ানো আর তা কাটা ; পাথরের মধ্যে কাটা একটা গর্তে একটা লোহা-বাঁধানো ডান্ডা দিয়ে ধান ভানা (ডান্ডাটা এত ভারি যে তা চালাতে পুরুষ মানুষেরও হাত ভেরে যাবার কথা) ; গম ঝেড়ে পুনোয়াকে দেওয়া, যাতে সে গমগুলো নিয়ে গিয়ে পানিচাক্কিতে পেষাই করে আটা বানিয়ে নিয়ে আসতে পারে। আর প্রায়ই দু-মাইল দূরের বাজারে গিয়ে কষে দরাদরি করে, তাদের সামর্থ্যে কুলোয় এমন যৎসামান্য খাদ্যদ্রব্য বা কাপড় কেনা।

সবচেয়ে ছোট শের সিং-এর বয়স ছিল আট। একটা ছেলে যা কিছু করতে পারে, ভোরবেলা চোখ খোলা থেকে রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর চোখ বোজা পর্যন্ত সে তার সবকিছুই করত। এমনকি সে পুনোয়াকে লাঙল চালাতেও সাহায্য করত ; তবে, লাঙল ফেরাবার সময় তাকে সাহায্য করতে হত, কেননা ততটা জোর তার ছোট্ট দেহে ছিল না।

সংসারে শের সিং-এর ভাবনা কিছু ছিল না। গ্রামে তার মত হাসি-খুশি ছেলে ছিল না একটিও। যখন তাকে দেখা যেত না, তখনও তার গলা শোনা

যেত, কেননা সে গাইতে ভালবাসত। গরুগুলো বিশেষ করে তার জিম্মায় ছিল—চারটে বলদ, বারটা গাই, আটটা বাছুর, আর লালু বলে একটা ষাঁড়।

রোজ ভোরে দুধ দোহা হয়ে গেলে সে তাদের আগের দিন সন্ধ্যায় যে খুঁটি-গুলিতে বেঁধে রেখেছিল তা থেকে খুলে দিয়ে, গোয়ালঘর থেকে বের করে দিয়ে, ঘেরা দেওয়ালের মধ্যেকার একটা কাটা দরজার ভিতর দিয়ে এসে গোয়াল পরিষ্কার করতে লেগে যেত। ততক্ষণ ভোরের খাবার খাওয়ার সময় হয়েছে। মা কিংবা কুন্তীর ডাক শুনতে পেলেই সে দুধের পাত্রটা হাতে করে খেত মাঠ পার হয়ে বাড়িতে চলে আসত।

সকালবেলার যৎসামান্য খাওয়ার মধ্যে থাকত গরম-গরম রুটি আর নুন দিয়ে সরষের তেলে সাঁতলানো প্রচুর কাঁচা লঙ্কার ফোড়ন-দেওয়া ডাল। এই খাওয়া সেরে, আর ঘরের কাজ কিছু তাকে করতে বলা হলে তা করে সে তার আসল দৈনন্দিন কাজ শুরু করত। তা হচ্ছে গরুগুলিকে জঙ্গলে চরাতে নিয়ে যাওয়া, তারা হারিয়ে না যায় তা দেখা আর বাঘ এবং চিতার হাত থেকে তাদের রক্ষা করা।

ঘেরা দেওয়ালের বাইরে খোলা জায়গাটায় চারটে বলদ আর বারটা গাই রোদ পোহাত। সেখান থেকে তাদের নিয়ে, আর কুন্তীকে বাছুরগুলোর উপর নজর রাখতে বলে এই ঝাঁকড়া-মাথা বাচ্চা ছেলেটা কাঁধে কুড়ুল আর পিছনে লালুকে নিয়ে, প্রত্যেকটি গরুকে নাম ধরে ডেকে-ডেকে বোর নদী পেরিয়ে ও-পারের গভীর বনের মধ্যে নিয়ে যেত।

লালু ছিল একটা অল্পবয়সী বেঁটে ষাঁড়। তার কাজ ফুরোলে হালে বলদ করা হবে তা ঠিক করাই ছিল। কিন্তু যে-সময়ের কথা লিখছি সে-সময় সে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াত। সে আর শের সিং একই মায়ের দুধ খেয়েছিল বলে দু-জনে হল পাতানো ভাই। শের সিং-এর বড় গর্বের জিনিস ছিল লালু।

পাতানো ভাইটির লালু নাম শের সিং-ই দিয়েছিল—যার মানে হচ্ছে, লাল। কিন্তু লালুর রঙ লাল ছিল না—ছিল হালকা মেটে। তার ঘাড়ের রঙটা একটু বেশি গাঢ় ছিল, আর পিঠজোড়া ছিল আগাগোড়া একটা প্রায় কাল দাগ। তার শিংদুটো শক্ত, ছুঁচলো। সে সময়কার লোকের সজ্জিত ড্রেশিং টেবিলে যে রঙের শু-হর্ন দেখা যেত, তার শিংটা ছিল সেইরকম ফিকে আর কাল দাগ দেওয়া।

মানুষ আর প্রাণীরা যখন ঘনিষ্ঠভাবে মিলে মিশে এমন অবস্থার মধ্যে বাস করে, তারা উভয়েই প্রতিদিন একই রকমের বিপদাপদের মুখোমুখি হয়, এবং একে অপরকে সাহস আর ভরসা যোগায়।

শের সিং-এর বাপ-ঠাকুরদারা মানুষের হাটের চাইতে বনে-জঙ্গলেই বেশি

ভাল থাকত। চলন্ত কোনো কিছুকে তাই শের সিং-ও ভয় করত না। অল্পবয়সী এবং তেজস্বী লালুরও নিজের উপর ভরসা ছিল অগাধ। ~~তাই শের সিং-এর~~ থেকে লালু পেত সাহস, আর লালুর থেকে শের সিং পেত ভরসা। তার ফলে যেখানে অন্যেরা যেতে ভয় পেত, সেখানে পর্যন্ত শের সিং-এর গরুরা চরত। আর গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট গরু বলে আর বাঘ কিংবা চিতা কখনও তাদের একটাকে মারে নি বলে শের সিং যে গর্ব করত, সেটা অন্যায্য নয়।

আমাদের গ্রাম থেকে মাইল-চারেক দূরে একটা পাঁচ মাইল লম্বা উপত্যকা আছে। সেটা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। উত্তরপ্রদেশের সারা পাঁচ হাজার বর্গ-মাইল বন-জঙ্গলের মধ্যে সৌন্দর্যে এবং বন্য প্রাণীর প্রাচুর্যে এই উপত্যকাটির তুলনা নেই। তার উত্তর প্রান্তে, একটি প্রাচীন জামগাছের শিকড়ের নিচেকার একটি গুহায় একটি ময়াল সাপের বাস।

সেই গুহা থেকে একটি স্বচ্ছ ঝরনার জল হু-হু করে বেরিয়ে এসে ক্রমেই আকারে বেড়ে চলেছে। কোথাও গভীর, কোথাও বা অগভীর এই স্ফটিক-স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীটিতে ছোট-ছোট অনেক জাতের মাছ কিলবিল করে, আর তাদের খেয়ে বেঁচে থাকে অন্ততপক্ষে পাঁচ জাতের মাছরাঙা পাখি। উপত্যকার নানারকমের ফুলের আর গাছের এবং ঝোপ-ঝাড়ের আকর্ষণে মধু আর ফল খেতে আসে দলে-দলে পাখি আর পশু। আবার, তাদের দেখে চলে আসে শিকারী পাখিরা আর মাংসাশী প্রাণীরা। সেখানকার ঘন ঝাড়-জঙ্গলে আর জট-পাকানো বাঁশ-বেতের ঝোপে তারা বেশ লুকিয়ে থাকবার জায়গা পায়।

জলধারার গতিবেগে কোথাও কোথাও ছোট ধস নেমেছে। সে-সব জায়গায় শরের মত এক ধরনের ঘাস জন্মায়। তাদের চওড়া সবুজ পাতা সম্বরদের আর কাকার হরিণদের খুব প্রিয় খাদ্য।

এই উপত্যকাটিতে যেতে আমিও ভালবাসতুম। একবার আমরা গ্রীষ্ম-কালের বাসস্থান ছেড়ে কালাধুঙ্গিতে নেমে আসবার কিছু পরেই এক শীতের সন্ধ্যায়, যেখান থেকে উপত্যকাটা পরিষ্কার দেখা যায় আমি তেমনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলুম।

হঠাৎ বাঁদিকে একটা ঘাসঝোপে কি যেন একটা নড়ে উঠল। অনেকক্ষণ লক্ষ করবার পর দেখা গেল যে, খাড়া একটা ঢালের গায়ে সবুজ ঘাসের মধ্যে একটা প্রাণী চরছে। তার রঙটা সম্বরের চাইতে ফিকে, অথচ আকারে সেটা কাকারের চাইতে বড়।

আমি চুপে-চুপে তার দিকে চললুম। এমন সময় কয়েক গজ নিচে উপত্যকার মধ্যে একটা বাঘ ডাকতে শুরু করল। আমার লক্ষ যে প্রাণীটি, সেও তা শুনল। সে মাথা তুলতে অবাক হয়ে দেখি যে সে হচ্ছে লালু। মাথাটি তুলে, একেবারে স্থির হয়ে সে বাঘের ডাক শুনতে লাগল। তারপর

যখন সে ডাক থেমে গেল, তখন সে নির্লিপ্তভাবে আবার ঘাস খেতে শুরু করল।

এ জায়গাটা লালুর পক্ষে নিষিদ্ধ, কেননা সংরক্ষিত সরকারী জঙ্গলে গরু চরাবার হুকুম নেই। তাছাড়া, বাঘটা লালুর বিপদ ঘটাতেও পারে। তাই আমি নাম ধরে তাকে ডাকতে লাগলুম। একটুখানি ইতস্তত করে সে পাহাড়ের খাড়া ধার বেয়ে উঠে এল, আমরা একসঙ্গে গ্রামে ফিরে এলুম।

যখন গ্রামে পৌঁছেছি, শের সিং তখন গোয়ালঘরে তার গরুগুলোকে বেঁধে রাখছিল। লালুকে যে কোথায় পেয়েছি সে কথা তাকে বলতে সে হেসে বললে, সাহেব, এর জন্যে ভয় কর না। বনের পাহারাওলা আমার বন্ধু, সে লালুকে খোঁয়াড়ে নিয়ে যাবে না। আর, বাঘের কথা? তা, লালুর নিজেকে সামলাবার ক্ষমতা বেশ আছে।

এই ঘটনার বেশি পরের কথা নয়। মুখ্য বনপাল মিস্টার স্মাইদিস আর তাঁর স্ত্রী ট্যুর উপলক্ষে কালাধুঙ্গি এলেন। উটেরা তাঁদের ক্যাম্পের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে জঙ্গলের পথে বোর নদীর পুলের দিকে আসবার সময় তাদের সামনেই একটা বাঘ পথের উপর একটা গরুকে মারল। উটগুলো এসে পড়ায়, আর লোকদের চিৎকারে বাঘটা গরুটাকে ছেড়ে দিয়ে লাফ মেরে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

স্মাইদিস পরিবার আমাদের বাড়ির বারান্দায় বসে সকালবেলাকার কফি খাচ্ছিলেন, এমন সময় উটওয়ালারা গরু মারবার খবরটা নিয়ে এল। মিসেস স্মাইদিসের খুব ইচ্ছে যে বাঘটাকে শিকার করেন। তাই আমি তাঁর জন্যে একটা মাচান বাঁধব বলে চলে গেলুম। গিয়ে দেখি যে বাঘটা ইতিমধ্যে ফিরে এসে গরুটাকে জঙ্গলের চল্লিশ হাত ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়েছে। মাচানটা তৈরি হলে আমি মিসেস স্মাইদিসকে আসবার জন্যে লোক পাঠিয়ে দিলুম। সঙ্গী হিসেবে একজন বন-রক্ষীকে সুদ্ধ তাঁকে মাচানে বসিয়ে দিয়ে বাঘটার একখানা ফটো নেব এই আশায় আমি নিজে রাস্তার ধারের একটা গাছে উঠে পড়লুম।

তখন বেলা চারটে। আধঘণ্টা হল আমরা জায়গায় বসেছি। বাঘটা যেদিকে লুকিয়ে আছে বলে জানি সেইদিকে একটা কাকার সবে ডাকতে শুরু করেছে, এমন সময় রাস্তা ধরে লালু এসে পড়ল। গরুটা যেখানটায় মারা পড়েছিল সেখানটায় এসে সে সযত্নে জমিটা আর রক্তের একটা মস্ত চাপ শুঁকে দেখল। তারপর সে পথের ধারের দিকে ফিরে, মাথা উঁচু করে, নাক বাড়িয়ে, যেদিকে গরুটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে সেদিকে চলতে শুরু করল। যখন সে গরুটাকে দেখতে পেল, তার পাশে ঘুরে খুর দিয়ে মাটিটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলে রাগে গজরাতে লাগল।

আমি ক্যামেরাটাকে একটা গাছের ডালে বেঁধে গাছ থেকে নেমে পড়ে লাল্‌কে খেদিয়ে গ্রামের ধার পর্যন্ত নিয়ে গেল্‌ম, সে অবশ্য রাগ আর আপত্তি জানাতে ছাড়ল না। আমি ফিরে এসে সবে গাছে আমার দাঁড়টিতে উঠে বসেছি, অমনি লাল্‌ আবার রাস্তা দিয়ে এসে মরা গর্‌টাকে ঘিরে-ঘিরে ঘ্‌রে তার রাগ দেখাতে লাগল।

তখন মিসেস স্মাইদিস তাকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে বন-রক্ষীটিকে পাঠিয়ে দিলেন। লোকটি কাছ দিয়ে যাবার সময় আমি তাকে বলে দিল্‌ম যে সে যেন লাল্‌কে বোর নদীর প্‌লটা পার করে নিয়ে গিয়ে, যে-হাতিটা পরে মিসেস স্মাইদিসকে নিতে আসবে সেই হাতিটার কাছে ওকে নিয়ে অপেক্ষা করে। কাকারটা খানিকক্ষণ আগেই থেমে গিয়েছিল। এখন মাচানের কয়েক গজ পিছনে একঝাঁক বনমোর্‌ ক্যাঁচ-ম্যাচ করতে শ্‌র্‌ করল। আমি ক্যামেরা ঠিক করে নিয়ে মিসেস স্মাইদিসের দিকে তাকাল্‌ম। দেখি যে তিনি বন্দ্‌ক বাগিয়ে ধরেছেন। ঠিক সেই ম্‌হ্‌র্তে লাল্‌ তৃতীয় বার এসে হাজির হল। (পরে জেনেছি যে তাকে প্‌লের ওধারে নিয়ে যাবার পর সে খানিকটা ঘ্‌রে গিয়ে নদীতে নেমে সেটা পার হয়ে জঙ্গলের ভিতরে অদ্‌শ্য হয়ে গিয়েছিল।)

এবার লাল্‌ গর্‌টার কাছে ছ্‌টে চলে এল। বাঘটাকে দেখেই হ'ক কিংবা তার গন্ধ পেয়েই হ'ক, সে মাথা নিচ্‌ করে সজোরে গাঁক-গাঁক করতে করতে গিয়ে ঝোপটার উপর পড়ল। সে এরকম করল তিন বার। প্রত্যেক বার সে ঝোপে গ‍ঁ্‌তো মেরেই উপর দিকে শিং চালাতে চালাতে পিছ্‌ হ্‌টে গর্‌টার কাছ পর্যন্ত এল।

মোষেরা মড়ি থেকে বাঘকে তাড়িয়েছে, এ আমি দেখেছি। গর্‌রা দল বেঁধে চিতাকে তাড়া করেছে, এও দেখেছি। কিন্তু এর আগে, শ্‌ধ্‌ একবার একটা হিমালয়ের ভাল্‌ক ছাড়া—বেঁটে একটা ষাঁড় তো দ্‌রে থাকুক—আর কোনোও প্রাণীকে একা একটা বাঘকে তার মড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে দেখি নি।

অসমসাহসী হলেও লাল্‌ কিছ্‌ই নয় বাঘটার কাছে। বাঘটার মেজাজ ক্রমে খারাপ হয়ে উঠছিল। সে লাল্‌র হাঁক-ডাকের জবাবে ক্র্‌দ্ধভাবে গর্জন করতে লাগল। প্রিয় সঙ্গীটির একটা কিছ্‌ হলে তার ব্‌ক একেবারে ভেঙে যাবে গ্রামের এমন একটি ছেলের কথা মনে হল। তাই আমি লাল্‌কে বাঁচাবার জন্যে যাবার উদ্যোগ করছিল্‌ম, এমন সময় মিসেস স্মাইদিস দয়া করে বাঘ শিকারের স্‌যোগটা ছেড়ে দিলেন। কাজেই আমি চেঁচিয়ে মাহ্‌তকে বলল্‌ম হাতিটাকে নিয়ে আসতে।

লাল্‌ খ্‌ব দমে গিয়ে আমার পিছন-পিছন তার গোয়ালে ফিরে এল। সেখানে শের সিং তাকে বেঁধে রাখার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মনে হল যে,

মরা গরুটাকে রক্ষা করবার সময় লালুর হাঁক-ডাক শুনে বাঘটা যে তাকে আক্রমণ করে নি, তাতে আমার মত শের সিং-ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

বাঘটা সেই রাত্তিরে আর পরদিন সন্ধ্যায় এসে গরুটাকে খেল। মিসেস স্মাইদিস আর একবার সেটাকে শিকার করবার বৃথা চেষ্টা করলেন। আমি সেই ফাঁকে বাঘটার একটা সিনেমা-ছবি তুলে নিলুম। যাঁরা এ-কাহিনী পড়েছেন, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ সে ছবি দেখে থাকতে পারেন। ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে যে বাঘটা একটা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে আর একটা ছোট গর্তে জল খাচ্ছে।

জঙ্গলই ছিল শের সিং-এর খেলার জায়গা, এ-ছাড়া আর কোনো খেলার জায়গা সে জানত না। আমি যখন ছোট ছিলুম, আমারও ঠিক তাই ছিল। যত লোককে জানি, তার মধ্যে এক শের সিং-ই জঙ্গলে যেতে আমার মতই আনন্দ পেত। তার যেমন বুদ্ধি তেমনি নজর ছিল, আর জঙ্গলের ব্যাপারে তার জ্ঞান ছিল অবিশ্বাস্য। কিছুই তার নজর এড়াত না। যে জীবটির নামে তার নাম সেই জীবটির মতই ভয়শূন্য ছিল সে।

বোর নদীর পুলের ও-মাথায় এসে যে তিনটে রাস্তা মিলেছে, তার যে-কোনো একটা ধরে সন্ধেবেলা বেড়াতে ভালবাসতুম আমরা। তার একটা হল মোরাদাবাদ যাবার পরিত্যক্ত রাস্তাটা, একটা হল কোটা যাবার সড়ক, আর তৃতীয়টা হল রামনগর যাবার বনপথ।

প্রায়ই সন্ধেবেলা সূর্যাস্তের পর শের সিং-কে চোখে দেখতে পাবার আগে তার গলা শুনতে পেতুম। গরু নিয়ে ঘরে ফেরবার সময় সে বেপরোয়া, স্পষ্ট, উঁচু গলায় গান গাইতে-গাইতে আসত। সব সময় সে হেসে আর নমস্কার করে আমাদের সম্ভাষণ জানাত। আর সব সময়েই তার কিছু-না-কিছু কৌতূহলজনক খবর দেবার থাকত।

'আজ সকালবেলা সেই বড় বাঘটার থাবার ছাপ দেখলুম। কোটার দিক থেকে এসে নয়া গাঁওয়ের দিকে চলে গিয়েছে সেগুলো। দুপুরবেলা ধুনিগড়-এর বেতবনের নিচের মাথায় সে ডাকছিল, তা শুনতে পেলুম।'

'আজ সরাইয়া পানির কাছে শিঙের খটখটানি শুনে একটা গাছে উঠে দেখি দুটো চিতল হরিণ লড়াই করছে। সাহেব, তার মধ্যে একটার শিঙ যেমন বড়, দেহটাও তেমনি মোটা। ওঃ, অনেকদিন মাংস খেতে পাই নি!'

'আমি এটা কী নিয়ে চলেছি?' (তার ঝোড়ো কাকের মত মাথাটার উপরে বড়-বড় সবুজ পাতা দিয়ে মোড়া আর গাছের ছাল দিয়ে বাঁধা কি যেন একটা জিনিস বসানো ছিল।) 'ও একটা শুয়োরের রাঙ।'

'দেখলুম একটা গাছে কয়েকটা শকুনি বসে রয়েছে। তাই একবার দেখতে গেলুম। একটা ঝোপের তলায় দেখি যে গত রাত্তিরে একটা চিতা একটা

শুয়োরকে মেরে তার আধখানা খেয়ে রেখে গিয়েছে। সাহেব, আপনি যদি চিতাটাকে শিকার করতে চান তাহলে আপনাকে মড়িটার কাছে নিয়ে যেতে পারি।'

একদিন সে লম্বা-লম্বা কাঁটা দিয়ে গাঁথা মস্ত একটা পাতার ঠোঙায় দুধের মত সাদা একটুকরো মৌচাক আমাকে দেখিয়ে গর্বিতভাবে বলল, 'আজ একটা হলদু গাছের খোঁড়লের মধ্যে একটা মৌচাক পেয়েছি। মধুটা আপনার জন্যে নিয়ে এলুম।' তারপর আমার হাতের রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কাজকর্ম সেরে মধুটা আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব। নইলে যদি এখন একটা শুয়োর কিংবা কাকার দেখতে পান তাহলে এই মধু হাতে নিয়ে আপনি তো গুলি চালাতে পারবেন না!'

তার ছোট কুড়ুলটি দিয়ে হলদু গাছ থেকে মৌচাকটা কেটে বের করতে তার বোধহয় ঘণ্টা-দুই কিংবা তারও বেশি লেগেছিল। আর ততক্ষণ মৌমাছিরা তাকে বেজায় হুল ফুটিয়েছে বোঝা গেল—কেননা তার হাত ফুলে উঠেছিল আর একটা চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সে কথা সে তুলল না। আমি তুললে তাকে বিব্রত করা হত। তারপর, রাত্রে যখন আমরা খেতে বসেছি, তখন সে নিঃশব্দে ঘরে এসে আমাদের টেবিলের উপর থালাখানা রাখল। মেজে-ঘষে সেটাকে সোনার মত করে তোলা হয়েছে। থালা রেখে সে তার বাঁ হাতের আঙুলগুলো তার ডান হাতের কনুইয়ে ঠেকাল। পাহাড়ীদের এই সম্মানসূচক প্রথাটি সেকেলে। আজকাল এটা উঠে যাচ্ছে।

উপহারটি এইভাবে টেবিলে রাখা হল। থালাখানা রইল, পরদিন সকালবেলা কুন্তী এসে সেটা নিয়ে যাবে। চলে যাবার সময় শের সিং হয়তো দরজার কাছে গিয়ে থেমে, মাথা নিচু করে, পায়ের আঙুল দিয়ে কার্পেটটাকে আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, 'সহেব, যদি কাল পাখি মারতে যান তাহলে গরুগুলোর সঙ্গে কুন্তীকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আপনার সঙ্গে যাব। আমি জানি কোথায় অনেক পাখি আছে।' বাড়িতে এলে সে লাজুক হয়ে পড়ত। তখন সে এমন বাধ-বাধ গলায় কথা বলত, যেন তার মুখে অনেক কথা এসে পড়েছে, আর সে অনেক কষ্টে তার মধ্যে কতগুলো গিলে-গিলে পথ পরিষ্কার করছে।

পাখি শিকারের সময় শের সিং তার স্বভাব-গুণটি ফিরে পেত। আমার সঙ্গে সে আর গ্রামের ছেলেরা এতে খুবই আমোদ পেত। কেননা, এর যে উত্তেজনা, আর একটা পাখি নিয়ে বাড়ি ফেরবার সম্ভাবনা—তা ছাড়াও এর মধ্যে আর একটা ব্যাপার থাকত। আগে থেকে ঠিক করা একটা জায়গায় গিয়ে দুপুরবেলা আমরা বিশ্রাম করতুম। একটি লোক আগেই সেখানে ছোলা ভাজা আর টাটকা মেঠাই নিয়ে অপেক্ষা করত। সবাই মিলে তা খেতুম।

আমি গোছগাছ করে দাঁড়াবার পর শের সিং তার সঙ্গীদের লাইন করে সাজিয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট ঝোপটা ঠেঙাতে-ঠেঙাতে আমার দিকে আসত। সে-ই সকলের চেয়ে বেশি জোর চেঁচাত, আর সবচেয়ে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে এদিকে এগিয়ে আসত। পাখি-টাখি তাড়া খেলে সে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠত, 'আসছে, সাহেব! আসছে!' কিংবা ভারি কোনো জানোয়ার বনবাদাড় ভেঙে চলে যাবার শব্দ হলে—প্রায়ই তা হত—সে তার সঙ্গীদের ডেকে তাদের পালাতে বারণ করত, আর তাদের ভরসা দিত যে ওটা একটা সম্বর কিংবা হয়তো একপাল শুয়োর—এ ছাড়া আর কিছু নয়।

সারাদিন এরকম গোটা দশ-বার ঝোপ-ঝাড় ঠেঙানো হত, তাতে গোটা দশ-বার ময়ূর আর বনমোরগ, দু-তিনটে খরগোশ, আর হয়তো একটা ছোট শুয়োর কি শজারু পাওয়া যেত। ঝোপ ঠেঙানো শেষ হলে এইসব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হত শিকারী আর ঐ ছোকরাদের মধ্যে। শিকার কম হলে ভাগটা হত শুধু ছোকরাদের মধ্যেই। দিনের শেষে শের সিং যখন একটা পুরো-পেখমওলা ময়ূর কাঁধের উপর ঝুলিয়ে গর্বভরে বাড়ি যেত তখন তাকে যেমন খুশি দেখাত, এমন আর কখনও নয়।

ইতিমধ্যে পুনোয়ার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, আর শের সিং-এর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। কেননা, তাদের ছোট আঠার বিঘের খেতটি দিয়ে দু-ভায়ের কুলোতে পারে না। জানতুম যে নিজের গ্রাম আর প্রাণাধিক জঙ্গলটি ছেড়ে যেতে হলে শের সিং-এর বুক ফেটে যাবে। তাই ঠিক করলুম যে কাঠগুদামে আমার এক বন্ধুর মোটর-মেরামতের কারখানায় তাকে শিক্ষা-নবীশ করে দেব। নৈনিতালের মোটর-চলা সড়কে বন্ধুটির অনেকগুলো গাড়িও চলত।

আমার ইচ্ছে ছিল যে শের সিং কাজ শিখলে তাকে আমাদের গাড়ি চালাবার কাজে নিযুক্ত করব। শীতকালে সে আমার সঙ্গে শিকারে যাবে, আর গরমকালে আমরা যখন নৈনিতালে থাকব, তখন সে আমাদের কালাধুঙ্গির বাড়ি আর বাগান দেখাশুনা করবে। তার জন্যে কী পরিকল্পনা করেছি সে-কথা তাকে যখন বললুম তখন সে আনন্দে বোবা হয়ে গেল। এ ব্যবস্থা হলে তো গ্রামে তার পাকাপাকিভাবে থাকা যায়—জন্মাবধি যে-বাড়ি ছেড়ে কখনও যায় নি, সেই বাড়ির কাছাকাছি সে থাকতে পারে।

জীবনে আমরা কত পরিকল্পনাই না করি। তার কোনো-কোনোটা যখন বিগড়ে যায়, তখন যে সেটা দুঃখের কারণ হবেই এমন কথা জোর করে বলতে পারি না।

কথা ছিল যে নভেম্বর মাসে আমরা কালাধুঙ্গিতে ফিরে এলে শের সিং তার শিক্ষানবিশী কাজে যাবে। কিন্তু অক্টোবরে তার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া

হল এবং সেটা ক্রমে নিউমোনিয়াতে দাঁড়াল, তারপর আমরা ফিরে আসবার ক-দিন আগে সে মারা গেল। ছেলেবেলায় সে সারাটা দিন ধরে গান গেয়ে আনন্দে কাটিয়েছে। সে যদি বেঁচে থাকত, তাহলে এই পরিবর্তনশীল জগতে তার জীবনটা প্রথমদিককার দিনগুলোর মত আনন্দময় ও নিরুদ্বেগ হত কি না তা কে বলতে পারে?

হিটলারের যুদ্ধে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় আমরা নতুন জায়গায় হাওয়া-বদল করতে কিছুকালের জন্যে বাড়ি ছেড়ে যাই। যাবার আগে আমাদের প্রজাদের সপরিবারে ডেকে আনিয়ে তাদের বলি যে তাদের খেত-খামার তারা নিয়ে নিক, আর গ্রামটা নিজেরাই চালাক। আগেও দু-বার একথা বলেছিলুম।

এবার প্রজাদের মুখ-পাত্র হয়ে এসেছিল পুনোয়ার মা। আমার যা বলবার তা বলা হলে সে উঠে দাঁড়িয়ে কাটাছাঁটা গলায় বলল, 'আপনি মিছিমিছিই আমাদের কাজ থেকে ডেকে নিয়ে এসেছেন। আগেও আপনাকে বলেছি, আজও আবার বলছি যে আপনার জমি আমরা নেব না। কেননা, যদি তা করি, তাহলে তার মানে হবে এই যে আমরা আর আপনার আপন জন থাকব না।—আচ্ছা সাহেব, সেই যে শয়তানটা আপনার তৈরি পাঁচিল ডিঙিয়ে আমার আলু খেয়ে গিয়েছিল, তার বাচ্চাটার কী ব্যবস্থা হল? না পুনোয়া না এরা, কেউই তাকে মারতে পারছে না, এদিকে আমি সারারাত বসে থেকে টিনের ক্যানেস্তারা পিটিয়ে-পিটিয়ে হয়রান হয়ে গেলুম যে!'

উল্লিখিত বুড়ো শয়তানটা বিস্তর গুলি হজম করে, বুড়ো বয়সে একদিন একটা বাঘের সঙ্গে সারারাত যুদ্ধ করে মারা পড়ে। এই শুয়োরটা তারই উপযুক্ত পুত্র। পাদ-শৈলশ্রেণীর ধারে-ধারে যে পথ, একদিন তা ধরে আমার বোন ম্যাগি আর আমি যাচ্ছিলুম, ডেভিড আমাদের পিছনে ছিল। এমন সময় দেখি যে শুয়োরটা ছুটে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল।

তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে, পাল্লাটাও বড়ই দূর—পুরো তিনশো গজই হবে—কিন্তু গুলি চালানো উচিত বলেই মনে হল, কেননা, দেখা গেল যে সেটা গ্রামের দিকেই চলেছে। আমি বন্দুকের নিশানা ঠিকঠাক করে নিয়ে বন্দুকটাকে একটা গাছের উপর রেখে অপেক্ষা করতে লাগলুম। শেষে শুয়োরটা একটা গভীর নাবাল জমির ধারে এসে থামতেই আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম। অমনি শুয়োরটা নিচু জমিটায় লাফিয়ে পড়ে তার ওধারের গা বেয়ে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠে তীর বেগে পালিয়ে গেল।

আমার বোন বললে, 'ফসকে গেল বুঝি?' ডেভিডের চোখেও সেই প্রশ্ন। এক যদি পাল্লার দূরত্ব হিসেব করতে ভুল হয়ে থাকে! নইলে গুলি শুয়োরটার গায়ে না লাগবার তো আর কোনো কারণ ছিল না! কেননা রুপোলী রঙের সামনেকার মাছিটা তার কাল চামড়া বরাবর স্পষ্ট দেখা

গিয়েছিল। তাছাড়া, গাছটা থাকতে আমি স্থিরভাবে তাক করতেও পেরেছিলুম। যাই হ'ক, তখন বাড়ি ফিরে যাবার সময় হয়ে এসেছে, আর যে পথ ধরে শুয়োরটা যাচ্ছিল সেটাও যখন বোর নদীর পুলের দিকেই গিয়েছে, তখন আমার গুলির ফল কী হল তা দেখবার জন্যে আমরা রওনা হলুম। শুয়োরটা যেখান থেকে লাফ মেরেছিল সেখানে তার পা মাটিতে গভীর হয়ে কেটে বসে গিয়েছিল। নিচু জমিটার ওপাশে যেখানে সে বেয়ে উঠেছিল, সেখানে রক্ত দেখা গেল।

শুয়োরটা যেদিকে গিয়েছে সেদিকে শ-দুই গজ দূরে অল্প খানিকটা ঘন ঝোপ ছিল। হয়তো এর মধ্যেই তাকে কাল সকালবেলা মরে পড়ে থাকতে দেখব, কেননা ওখানে রক্তের দাগ খুব মোটা। যদি সেটা মরে না থাকে তবে একটা হাঙ্গামা বাধাবে। ম্যাগি তখন সঙ্গে না থাকাই ভাল। আর, এখনকার চাইতে সকালবেলা বেশি আলোও থাকবে গুলি চালাবার পক্ষে।

পুনোয়া আমার বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে, পুলের উপর এসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তার আগ্রহ-ভরা প্রশ্নের উত্তরে আমি বললুম, 'হ্যাঁ, সেই ধাড়ী শুয়োরটাকেই গুলি করেছি। রক্তের দাগ দেখে তো মনে হয় যে তার খুব বেশিই চোট লেগেছে।' আরও বললুম যে, পরদিন সকালবেলা সে যদি পুলের কাছে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে তাহলে শুয়োরটা কোথায় আছে তা আমি তাকে দেখিয়ে দেব, সে যেন পরে দল-বল নিয়ে গিয়ে সেটাকে নিয়ে আসে।

পুনোয়া জিগ্যেস করল, 'বুড়ো হাবিলদারকে নিয়ে আসব?' আমি তাতে রাজী হলুম। এই অমায়িক বুড়ো হাবিলদারকে সবাই ভালবাসত আর শ্রদ্ধা করত। সে ছিল জাতে গুর্খা। সৈন্যদল ছেড়ে সে পুলিসে যোগ দিয়েছিল, তারপর বছর-খানেক আগে পেনশন নিয়ে তার স্ত্রী আর দুই ছেলে-সহ আমাদের গ্রামে এসে আমাদের দেওয়া একখণ্ড জমিতে বসবাস করছিল।

সব গুর্খাদের মত এই হাবিলদারটিরও শুয়োরের মাংস খাবার লোভ কিছুতেই মিটত না, তাই, যদি আমাদের মধ্যে কেউ একটা শুয়োর শিকার করত, তাহলে তাকে তার ভাগ দিতেই হবে এ কথা সবাই জানত। তাকে দিতে গিয়ে অন্য কেউ বাদ পড়ে তো নাচার।

পরদিন সকালবেলা পুনোয়া আর হাবিলদার পুলের কাছে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। গরু চলাচলের পথটা ধরে আমরা শিগগিরই গিয়ে সেই জায়গাটাতে পৌঁছলুম যেখানে গত সন্ধেবেলায় আমি রক্তটা দেখতে পেয়েছিলুম। সেখান থেকে আমরা রক্তের সুস্পষ্ট চিহ্ন ধরে-ধরে গিয়ে, যেমনটি আশা করেছিলুম সেই ঘন ঝোপটার কাছে এসে পড়লুম। সঙ্গীদের রেখে গেলুম ঝোপের ধারে।

আহত শুয়োর বড় মারাত্মক জানোয়ার। আমাদের জঙ্গলে শুধু ভাল্লুক ছাড়া একমাত্র শুয়োরেরই একটি বিশ্রী স্বভাব আছে—তা হচ্ছে মানুষকে আক্রমণ করে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাকে গুঁতিয়ে মাড়িয়ে ক্ষত-বিক্ষত করা। এইজন্যেই আহত শুয়োরদের—বিশেষ করে দাঁতাল শুয়োরদের—খুব সমীহ করে চলতে হয়।

যেখানে আশা করেছিলুম সেখানে শুয়োরটা থেমেছিল বটে, কিন্তু সেখানে সে মরে নি। যেখানে সে সারা রাত শুয়ে ছিল, সকালবেলা সেখান থেকে উঠে সে ঝোপ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমি শিস দিয়ে পুনোয়াকে আর হাবিলদারকে ডাকলুম। তারা এলে আমরা দাগ ধরে এগোতে শুরু করলুম।

চিহ্ন ধরে এগোতে এগোতে আমরা পথটা পেরিয়ে গেলুম। আহত জানোয়ারটা যেদিকে গিয়েছে তা দেখে বোঝা গেল যে সে পাহাড়ের ওদিককার ঘন জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। আমার সন্দেহ হল যে সে আগের দিন সন্ধেবেলা ওই দিক থেকেই এসেছিল। সকালবেলাকার রক্তের দাগটা ছিল হালকা। যতই এগিয়ে যাচ্ছিলুম, ততই সেটা ফিকে হয়ে আসছিল। শেষে একসারি গাছের কাছে এসে সেটা একেবারে মিলিয়ে গেল।

গাছের ঝরা পাতাগুলো হাওয়ার ঝাপটায় এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। এই জায়গায় আমাদের সামনেই কোমর-ভর উঁচু খটখটে শুকনো ঘাসে ভরা একফালি জমি। তখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শুয়োরটা পাহাড়ের ওধারকার ঘন জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছে। তাই আমি ঘাসের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। আশা হল যে ওটা পার হয়ে গিয়ে আবার পায়ের চিহ্ন পাব।

হাবিলদার একটু পিছনে পড়েছিল বটে, কিন্তু পুনোয়া ছিল ঠিক আমার পিছনে। ঘাসের ভিতরে কয়েক গজ যেতেই একটা নিচু কাঁটা-ঝোপে আমার পশমের মোজা আটকে গেল। আমি নিচু হয়ে সেটা ছাড়াতে গেলুম, আর পুনোয়া কাঁটা-ঝোপটাকে এড়াবার জন্যে ডানদিকে কয়েক পা সরে গেল।

আমি সবে কাঁটাটা ছাড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়েছি, এমন সময় শুয়োরটা ঘাসের ভিতর থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এসে সোজা পুনোয়ার দিকে তেড়ে গেল। পুনোয়ার গায়ে একটা সাদা শার্ট ছিল। কোনো বিপজ্জনক শিকারের পেছনে জঙ্গলে ঢুকবার সময় আমি সর্বদা সঙ্গীদের বলে রাখতুম যে আমাকে কোনো আহত জন্তু আক্রমণ করলে তাদের তখন কি করতে হবে। এখন আমিও তাই করলুম। বন্দুকের মুখ শূন্যে তুলে তার ঘোড়া টিপে আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলুম।

মোজায় কাঁটা বিঁধে এক লহমা সময় নষ্ট না হলে সবই ভালয়-ভালয় হয়ে যেত—পুনোয়ার কাছে পৌঁছবার আগেই শুয়োরটাকে গুলি করতে পারতুম। কিন্তু একবার সেটা পুনোয়ার উপর গিয়ে পড়লে তাকে বাঁচবার

জন্যে শুয়োরটার মন অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। সেটার দিকে গুলি করলে পুনোয়ার জীবনই আরও বিপন্ন হত।

বন্দুক থেকে বেরিয়ে গুলিটা যখন মাইল-খানেক দূরের জঙ্গলের দিকে চলেছে, পুনোয়া তখন হতাশভাবে 'সাহেব!' বলে আর্তনাদ করে ঘাসের মধ্যে চিত হয়ে পড়ল, আর শুয়োরটা একেবারে তার উপর চড়াও হল। কিন্তু আমার চিৎকার আর বন্দুকের দুড়ুম শব্দ শুনেই শুয়োরটা চাবুকের দড়ির মত সপাং করে ফিরেই সোজা আমার দিকে তেড়ে এল। আমি খালি টোটাটা বের করে রাইফেলের খোপে নতুন টোটা ভরবার আগেই সে এসে পড়ল। বন্দুক থেকে ডান হাতটা সরিয়ে আমি হাতখানা বাড়িয়ে দিলুম। সে হাতটা তার কপালে ঠেকতেই সে একেবারেই থেমে গেল—তার একমাত্র কারণ নিশ্চয় এই যে, আমার অন্ত তখনো ঘনায় নি।

শুয়োরটা এতই বড় আর এমনই রেগে ছিল যে একটা গাড়ির ঘোড়াকে পর্যন্ত সে গুঁতিয়ে ফেলে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে পারত। তার দেহটা থেমে গেলেও মাথাটা খুব চলছিল। প্রকাণ্ড দুই দাঁত দিয়ে সে একবার এদিকে আর একবার উপর দিকে খোঁচা মারছিল, তবে, ভাগ্যক্রমে তাতে শুধু হাওয়াই কাটল। তার খসখসে কপালের ঘষায় আমার হাতের তেলোর ছাল খানিকটা ছড়ে গেল। তারপর, কেন তা জানি না, সে হুমড়ি খেয়ে মাথায় ভর দিয়ে পড়ে গেল।

সেই এক মরিয়া চিৎকারের পরে পুনোয়া আর শব্দও করে নি, নড়েও নি। ভয়ানক ভাবনা হল, তার মাকে কি বলব। তার চাইতেও বেশি ভয়াবহ কথা হল যে, সে আমাকে কি বলবে! পুনোয়া সেখানে ঘাসের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে পড়ে ছিল, ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে আমি সেখানে গেলুম। আশঙ্কা হয়েছিল যে দেখতে পাব শুয়োরটা তাকে আগাগোড়া চিরে ফেলেছে। সে চিত হয়ে সটান পড়ে ছিল, তার চোখ বন্ধ। কিন্তু দেখে ধড়ে প্রাণ এল যে তার সাদা কাপড়-চোপড়ে রক্তের কোনো দাগ নেই। তার কাঁধটা ধরে নেড়ে তাকে জিগ্যেস করলুম সে কেমন আছে, আর তার কোথায় লেগেছে। খুব দুর্বল স্বরে সে বলল যে সে মরে গিয়েছে, আর তার পিঠটা ভেঙে গিয়েছে। তার দুই পাশে পা রেখে আমি আস্তে-আস্তে তাকে তুলে বসিয়ে দিলুম, তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে দেখলুম যে সে সেইভাবে থাকতে পারছে। তা দেখে আমার অত্যন্ত আনন্দ হল।

তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেখে তাকে আশ্বাস দিলুম যে তার পিঠ ভাঙে নি। সে নিজে হাত দিয়ে সে কথাটা যাচাই করে নিয়ে, তারপর মুখটা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল যে শুকনো একটা কাটা গুঁড়ি মাটি থেকে ইঞ্চি-তিনেক উঁচু হয়ে রয়েছে। স্পষ্ট বোঝা গেল যে শুয়োরটার ঢুঁ খেয়ে পড়ে

গিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তারপর জ্ঞান হয়ে যখন সে টের পেল যে কাটা গুঁড়িটা তার পিঠে খোঁচা মারছে, তখন সে চট করে ধরে নিয়েছিল যে তার পিঠটা ভেঙে গিয়েছে।

এইভাবে শয়তানের বাচ্চা সেই ধাড়ী শুয়োরটার লীলা-খেলা ফুরোল। তবে, মরবার আগে সে আমাদের দু-জনের প্রাণপাখিকে ভয় দেখিয়ে খাঁচা-ছাড়া করেছিল আর কি! কিন্তু শুধু আমার হাতের তেলোর খানিকটা চামড়া ঘষে তুলে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো ক্ষতি সে করে নি, কেননা পুনোয়া একটি আঁচড়ও না খেয়ে পার পেয়ে গিয়েছিল। আর, বলবার মত চমৎকার একটি গল্পও পেয়ে গেল সে।

হাবিলদার নেপথ্যেই ছিল—তার মত বিজ্ঞ ঝানু সৈন্যের পক্ষে তো সেটাই স্বাভাবিক। তাহলেও সে শুয়োরটার একটা বড় ভাগই দাবি করে বসল। দরকার হলে সাহায্য করবার জন্যে তৈরি হয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল না বুঝি? তা ছাড়া, যারা শিকারের সময় হাজির থাকে তারা ডবল ভাগ পাবে, এটাই কি দস্তুর নয়? আর, যে-গুলিতে শিকার মরে, তা দেখার আর তার শব্দ শোনার মধ্যে তফাত কিছু আছে নাকি? কাজেই তার ডবল ভাগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হল না। সেই সকালবেলাকার ব্যাপারে তার কী ভূমিকা ছিল, সে বিষয়ে তারও বলবার মত একটা জাঁকালো গল্প ক্রমে-ক্রমে তৈরি হয়ে গেল।

পুনোয়ার বাবার জন্যে আমি যে-বাড়ি বানিয়ে দিয়েছিলুম এখন সেই বাড়িতে পুনোয়াই কর্তা, সেখানে তার নিজের একটি সংসার গড়ে তুলছে সে। কুন্তী এ গ্রাম ছেড়ে তার স্বামীর ঘর করতে চলে গিয়েছে। আর শের সিং অপেক্ষা করে রয়েছে স্বর্গের আনন্দময় মৃগয়ার রাজ্যে। পুনোয়ার মা আজও বেঁচে আছে।

আপনি যদি গ্রামের ফটকে গাড়ি থামিয়ে খেতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে পুনোয়ার বাড়িতে আসেন তাহলে দেখতে পাবেন যে পুনোয়ার মা পুনোয়া আর তার স্ত্রী-পুত্রের সংসার চালাচ্ছে, আর, যখন সে মোতির বউ হয়ে প্রথম আমাদের গ্রামে এসেছিল, তখনকার মতই এখনও সে তার হাজারো কর্তব্য অক্লান্তভাবে এবং সানন্দে করে চলেছে।

যুদ্ধের ক-টা বছর প্রতি শীতে আমার বোন ম্যাগি একা আমাদের কালাধুঙ্গির কুটিরে কাটিয়েছিল—গাড়ি-টাড়ি ছিল না, সবচাইতে কাছের শহর ছিল সেখান থেকে চোদ্দ মাইল দূরে। তবু তার নিরাপত্তার জন্যে আমার এতটুকুও উদ্বেগ ছিল না, কেননা আমি জানতুম, যে সে আমার বন্ধু, আমার ভারতের গরিব মানুষদের মধ্যে নিরাপদেই থাকবে।



৪

লাল-ফিতের আগেকার আমল

হিমালয়ের পাদদেশে যে অনুচ্চ ভূ-খণ্ডকে তরাই বলে, একবার শীতকালে সেখানে আমি অ্যান্ডারসনের সঙ্গে এক ক্যাম্পে ছিলুম। জানুআরির গোড়ার দিকে একদিন ভোরবেলা জল খাবার পর আমরা বিন্দুখেরা ছেড়ে আমাদের পরবর্তী ক্যাম্প বোকসার-এর দিকে বেরিয়ে পড়লুম। চাকর-বাকররা যাতে বাঁধা-ছাঁদা করে মাল-পত্র নিয়ে গিয়ে সেখানে আমরা পৌঁছবার আগেই তাঁবু ফেলতে সময় পায়, এইজন্যে আমরা অনেকটা ঘুরপথে গেলুম।

বিন্দুখেরা আর বোকসারের মধ্যে পুল-শূন্য দুটি নদী পার হতে হয়। দ্বিতীয় নদীটিতে পৌঁছে, আমাদের তাঁবু-বওয়া একটা উট কাদার মধ্যে হড়কে গিয়ে নদীর মধ্যে তার পিঠের বোঝা ফেলে দিল। ফলে আমাদের লোকদের যেতে অনেক দেরি হয়ে গেল। সারাদিন ধরে সাধ মিটিয়ে পাখি শিকার করে বোকসারে এসে দেখি যে তখনও উটের পিঠ থেকে মাল-পত্র নামানো চলছে।

বোকসার গ্রাম থেকে মাত্র কয়েকশো গজ দূরে তাঁবু ফেলা হল। অ্যান্ডারসনের সেখানে আসাটা তো একটা মস্ত বড় ঘটনা, তাই সারা গাঁয়ের লোক তাকে সম্মান দেখাবার জন্যে আর শিবির-স্থাপনে যথাসাধ্য সাহায্য করবার জন্যে সেখানে চলে এসেছিল।

স্যার ফ্রেডারিক অ্যান্ডারসন সে সময়ে ছিলেন তরাই আর ভাবরের সরকারী মহলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। মানুষটি সহৃদয় ছিলেন বলে তাঁর

শাসনাধীন বহু সহস্র বর্গমাইল এলাকার বাসিন্দা সব জাতি আর সব ধর্মের লোকদের তিনি প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। দয়ালু ছাড়াও তিনি দক্ষ শাসকও ছিলেন, এবং তাঁর মত স্মরণশক্তি আমি মোটে আর একজনেরই দেখেছি—তিনি হলেন জেনেরাল স্যার হেনরি র‍্যাম্‌জে। আটাশ বছর ধরে তিনি এই একই ভূখণ্ডের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। চাকরিতে থাকার সময় আগাগোড়া তাঁকে লোকে জানত 'কুমায়ুনের মুকুটহীন রাজা' বলে।

র‍্যাম্‌জে আর অ্যাণ্ডারসন—দুজনেই ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক। তাঁদের বিষয়ে লোকে বলত যে একবার কারও নাম শুনলে কিংবা মুখ দেখলে তাঁরা কখনও তা ভুলে যেতেন না। সরল, অশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে যাঁদের কারবার আছে শুধু তাঁরাই বুঝবেন যে ভাল স্মরণশক্তির মূল্য কত। কেননা, সাধারণ একজন লোকের নামটা যদি কেউ মনে করে রাখে, কিংবা কী পরিস্থিতিতে এর আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে-কথা যদি কেউ বলতে পারে, তাহলে তার যেমন ভাল লাগে, এমন আর কিছুতে নয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ও পতনের ইতিহাস যখন লেখা হবে, তখন এ কথা বিবেচনা করতে হবে যে তার পতনের ব্যাপারে 'লাল-ফিতে'-র প্রভাব কতখানি ছিল। র‍্যাম্‌জে আর অ্যাণ্ডারসনের আমলে ভারতে সে জিনিসটা অজানা ছিল, এবং তাঁদের জনপ্রিয়তা এত অধিক হয়ে উঠেছিল এবং তাঁদের শাসনও এতটা সফল হতে পেরেছিল।

কুমায়ুনের জজ ছাড়াও র‍্যাম্‌জে ছিলেন সে-অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস, বন-পাল এবং ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর অসংখ্য এবং দুরূহ কাজগুলির মধ্যে অনেকগুলিই তিনি এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে হেঁটে যেতে-যেতেই সেরে ফেলতেন।

এইসব পদ-যাত্রার সময়ে দলে-দলে লোক তাঁর সঙ্গ নিত। সেই সময়েই তিনি তাঁর দেওয়ানী আর ফৌজদারী মামলার বিচার করতেন। বাদী আর তার সাক্ষীদের কথা আগে শোনা হত, আর তারপর শোনা হত বিবাদী আর তার সাক্ষীদের কথা। তারপর রীতিমত ভেবে-চিন্তে র‍্যাম্‌জে তাঁর রায় দিতেন। হয় জরিমানা, নয় তো কারাদণ্ড হত। সে রায় নিয়ে কখনও কেউ প্রশ্ন তুলেছে বলে জানা যায় নি। আর, যাকে তিনি জরিমানা করতেন বা কারাদণ্ড দিতেন, সে সরকারী খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে জরিমানাটা দিয়ে দিত, কিংবা সবচেয়ে কাছের জেলে নিজেই গিয়ে হাজির হয়ে র‍্যাম্‌জের হুকুম-মত বিনাশ্রম বা সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে কখনও গাফিলতি করে নি।

আগে র‍্যাম্‌জে যা কাজ করতেন, তরাই আর ভাবর অঞ্চলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হিসেবে অ্যাণ্ডারসনকে তার খানিকটা মাত্র করতে হত, বটে, কিন্তু তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতার ক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল। সেদিন বিকেলবেলা যখন

বোকসারে আমাদের তাঁবু ফেলা হচ্ছিল, তখন অ্যান্ডারসন জমায়েত-হওয়া লোকদের বসে পড়তে বললেন। তিনি এ কথাও বললেন যে কারও যদি কোনো নালিশ থাকে শুনবেন কিংবা কোনো দরখাস্ত থাকে তা নেবেন।

প্রথম আবেদন জানাল বোকসারের পাশের এক গ্রামের মোড়ল। জানা গেল, যে সেই গ্রাম ও বোকসারের লোকরা একটা যৌথ জলসেচের নালা থেকে জল নেয়। নালাটা বোকসারের ভিতর দিয়েই গিয়েছে। সেবার ভাল বৃষ্টি না হওয়ায় নালায় দু-গ্রামের পক্ষে পর্যাপ্ত জল হয় নি। সব জলটাই বোকসার নিয়ে নিয়েছে। ফলে নিচের গ্রামে ধানের ফসল নষ্ট হয়েছে। বোকসারের মোড়ল স্বীকার করল যে নালার জল নিচের গ্রামে যেতে দেওয়া হয় নি, কিন্তু সাফাই হিসেবে সে বলল যে, জলটা ভাগাভাগি করে নিলে দুই গ্রামেরই ধান নষ্ট হত। ফসলটা আমাদের আসার কয়েকদিন আগে কাটাই আর মাড়াই হয়ে গিয়েছিল।

দুই মোড়লের বক্তব্য শোনবার পর অ্যান্ডারসন হুকুম দিলেন যে দুই গ্রামের জমির পরিমাণের অনুপাতে সমস্ত ধান ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে। বোকসারের লোকরা মেনে নিল যে বিচারটা ন্যায্য হয়েছে, কিন্তু তারা ফসল কাটাই আর মাড়াইয়ের মেহনতের মজুরি দাবি করল। নিচের গ্রামটি এই বলে এই দাবিতে আপত্তি করল যে সে সময়ে তাদের সাহায্য করতে ডাকা হয় নি। এই আপত্তি ন্যায্য বলে অ্যান্ডারসন মেনে নিলেন। অমনি দুই মোড়লে ধান ভাগ করতে চলে গেল, আর এর পরের দরখাস্ত অ্যান্ডারসনের কাছে পেশ করা হল।

এটা করল ছেদী। তার বউ তিলনীকে কালু ভুলিয়ে নিয়ে গেছে, এই তার নালিশ। দিন-কুড়িক আগে নাকি কালু তিলনীকে প্রেম নিবেদন করে। ছেদী আপত্তি করলেও সে ক্ষান্ত হয় নি। শেষে তিলনী তার ঘর ছেড়ে কালুর সঙ্গে গিয়ে বাস করে। অ্যান্ডারসন যখন জিগ্যেস করলেন যে কালু হাজির আছে কি না, তখন আমাদের সামনে গোল হয়ে বসে-থাকা লোকদের এক পাশ থেকে একটি লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল যে সে-ই কালু।

ধানের ব্যাপার নিয়ে যতক্ষণ কথা চলছিল ততক্ষণ জমায়েত-হওয়া মেয়েরা আর বউরা আগ্রহ দেখায় নি, কেননা তার মীমাংসা করবে পুরুষেরা। কিন্তু এখন তাদের মুখের ভাব আর দম-বন্ধ অবস্থা দেখে বেশ বোঝা গেল যে এই ফুসলানোর মামলায় তাদের বেজায় আগ্রহ আছে।

অ্যান্ডারসন যখন কালুকে জিগ্যেস করলেন, নালিশটি সত্যি কি না, তখন সে স্বীকার করল যে তিলনী তার দেওয়া একখানা কুটিরেই থাকে বটে কিন্তু ফুসলে আনার কথাটা সে জোর করেই অস্বীকার করল। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে সে তিলনীকে তার বৈধ স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে কি না, তখন কালু জবাব দিল যে তিলনী তার কাছে স্বেচ্ছায় এসেছে—ছেদীর

কাছে ফিরে যেতে তাকে বাধ্য করতে সে পারবে না।

অ্যান্ডারসন জিগ্যেস করলেন, 'তিলনী হাজির আছে?'

স্ত্রীলোকদের দল থেকে এগিয়ে এসে একটি মেয়ে বলল, 'আমিই তিলনী। আমার উপর হুজুরের কী হুকুম?'

তিলনী মেয়েটি অল্পবয়সী, তার বয়স বছর আঠার হবে। তার গড়নটি পরিষ্কার, চেহারাটি চটকদার। তরাইয়ের মেয়েদের চিরাচরিত প্রথায় তার মাথার চুলগুলো ফুটখানেক উঁচু একটা বিড়ে করে বাঁধা, তাতে একখানা সাদাপাড়ের কাল শাড়ি জড়ানো। তার দেহে একটা আঁট লাল রঙের কাঁচুলি আর খুব-ঘের-ওয়ালা একটা রঙচঙে ঘাগরা এই তার সাজ।

যখন অ্যান্ডারসন তাকে জিগ্যেস করলেন যে সে তার স্বামীকে কেন ছেড়ে গিয়েছে, তখন সে ছেদীর দিকে দেখিয়ে বললে, 'ওর দিকে তাকান। ও যে শুধু নোংরা তাই নয়,—তা তো দেখতেই পাচ্ছেন, তার উপর আবার হাড়-কেপ্পনও। বিয়ে হওয়া থেকে এই দু-বছরের মধ্যে ও আমাকে কাপড় কিংবা গয়না কিচ্ছু দেয় নি। আমার জামাকাপড় এই যা দেখছেন, আর এইসব গয়না'—এই বলে সে তার হাতের কয়েকগাছা রুপোর চুড়ি আর তার গলার কয়েক ছড়া পুঁতির মালায় হাত দিল—'কালু আমাকে দিয়েছে।' ছেদীর কাছে ফিরে যেতে সে রাজী আছে কি না সে কথা জিগ্যেস করায় সে মাথা ঝেঁকে বলল যে কিছুতেই সে যাবে না।

অস্বাস্থ্যকর তরাই অঞ্চলের বাসিন্দা এই আদিবাসী জাতটি দুটি মস্ত গুণের জন্যে বিখ্যাত—তা হল পরিচ্ছন্নতা, আর স্ত্রী-স্বাধীনতা। ভারতের আর কোনো অংশে গ্রাম আর ঘরবাড়ি তরাই অঞ্চলের মত এমন নিখুঁতভাবে পরিষ্কার রাখা হয় না। আর, ভারতের অন্য কোথাও অল্পবয়সী মেয়ে নিজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে স্ত্রী-পুরুষের সমাবেশের মধ্যে দু-জন সাহেবের সামনে দাঁড়াতে সাহস পেত না—তাকে তা করতে দেওয়াই হত না!

এবার অ্যান্ডারসন ছেদীকে জিগ্যেস করলেন যে সে কিছু বুদ্ধি দিতে পারে কি না। তার উত্তরে সে বললে, 'হুজুর আমার মা, হুজুরই আমার বাপ। সুবিচার পাবার জন্যে আপনার কাছে এসেছিলুম, এখন হুজুর যদি আমার বউকে আমার কাছে ফিরে যেতে বাধ্য করতে না পান, তাহলে আমি ওর বদলে খেসারত চাই।'

অ্যান্ডরসন জিগ্যেস করলেন, 'সেটা কত চাও?'

ছেদী উত্তর দিল, 'আমি দেড়শো টাকা চাই।' এবার চারদিক থেকে আওয়াজ শোনা গেল, 'লোকটা বেশি চাইছে!' 'বড্ড বেশি!' 'মেয়েটার দাম অত নয়!' ইত্যাদি।

তিলনীর জন্যে সে দেড়শো টাকা দিতে ইচ্ছুক কি না অ্যান্ডারসন সে

কথা কালুকে জিগ্যেস করায় সে বললে যে দাবিটা বড়ই বেশি, কেননা এ কথা সেও জানে, বোকসারের সবাই জানে যে তিলনীর জন্যে ছেদী মোটে একশো টাকা দিয়েছিল। সে যুক্তি দেখাল যে এই দামটা যখন দেওয়া হয় তখন তিলনী 'টাটকা' ছিল। এখন তো আর তিলনী তা নেই, কাজেই তার জন্যে সে বড়জোর পঞ্চাশটি টাকা দিতে পারে।

সমবেত জনতা এবার পক্ষাবলম্বন করতে লাগল। কেউ কেউ বললে যে দাবির পরিমাণ নিতান্তই বেশি, অন্যরা তেমনি জোট করে বলতে লাগল যে যা দিতে চাওয়া হয়েছে সে-টাকাটা একেবারেই কম। সপক্ষে-বিপক্ষে সমস্ত যুক্তিই যথাযোগ্যভাবে বিবেচনা করে (সে-সব যুক্তি নিতান্ত সূক্ষ্ম এবং একান্ত ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি-ঘটিত, এবং তিলনী তার সুন্দর মুখখানায় হাসি মাখিয়ে তা সব শুনল) অ্যান্ডরসন তিলনীর দাম পঁচাত্তর টাকা ধার্য করে কালুকে হুকুম করলেন ছেদীকে টাকাটা দিয়ে দিতে।

কোমরবন্ধ খুলে কালু তা থেকে একটা সুতোর থলি বের করে অ্যান্ডারসনের পায়ের কাছে সেটাকে ঝেড়ে খালি করে দিল। তাতে ছিল মোট বাহান্নটি টাকা। তারপর কালুর দুই বন্ধু তাকে সাহায্য করে আরও তেইশ টাকা তাতে যোগ করল। তখন ছেদীকে টাকাটা গুনে নিতে বলা হল। সে গুনে বলল যে টাকাটা ঠিক আছে। খানিকক্ষণ আগেই আমি লক্ষ করেছিলুম যে সবাই বসে পড়ার পর একটি স্ত্রীলোক গ্রামের দিক থেকে অত্যন্ত যন্ত্রণা-কাতরভাবে খুব ধীরে-ধীরে এসে একটু তফাতে বসে ছিল। সে এখন অতি কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার তবে কী হবে, হুজুর?'

অ্যান্ডরসন জিগ্যেস করলেন, 'তুমি আবার কে?'

সে জবাব দিল, 'কালুর বউ।'

তার চেহারা লম্বা আর হাড়-বের-করা। হাতির দাঁতের মত সাদা মুখখানায় একফোঁটা রক্ত নেই। পেটজোড়া পিলেতে তার চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছে, তার পা দু-খানাও ফুলে উঠেছে। তরাই অঞ্চলের অভিশাপ যে ম্যালেরিয়া, এ-সব হল তারই ফল।

ক্লান্ত, একঘেয়ে গলায় স্ত্রীলোকটি বলল যে, কালু এখন আর-এক বউ কিনল, কাজেই সে আর ঘর করতে পারবে না। গ্রামে তার আপন জন কেউ নেই, আর অসুস্থ বলে সে কাজ করতেও পারবে না। কাজেই তাকে অবহেলায় আর অনাদরে মরতে হবে। এই বলে তার মুখ শাড়ি দিয়ে ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। রুদ্ধ আবেগে তার জীর্ণ দেহ কাঁপতে লাগল, তার ভাঙা শরীর বেয়ে টপ-টপ করে চোখের জল পড়তে লাগল।

এই এক উড়ো ফ্যাসাদ এসে জুটল। অ্যান্ডারসনের পক্ষে এটা মেটানো শক্ত, কেননা ব্যাপারটা যখন আলোচনা করা হচ্ছিল, তখন ঘুণাক্ষরেও

এ-কথা ওঠে নি যে কালুর এক বউ আছে।

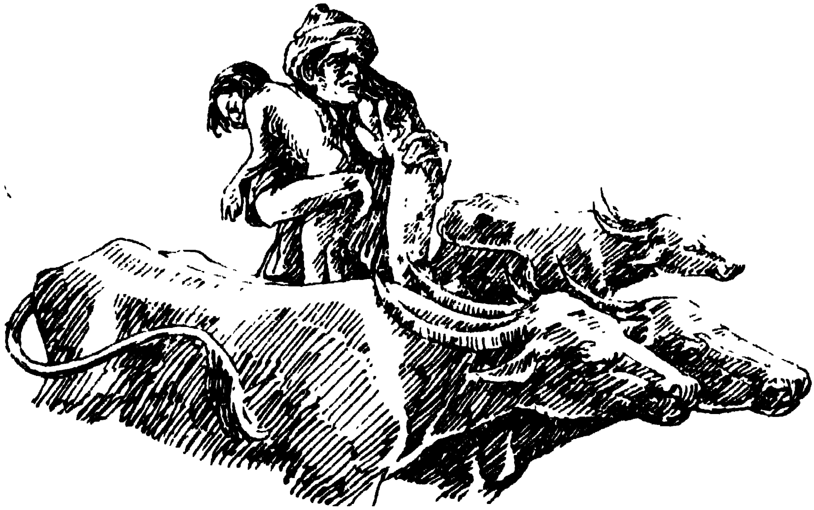
স্ত্রীলোকটির করুণ বিলাপের পর খানিকক্ষণ ধরে একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা চলল। তিলনী দাঁড়িয়ে ছিল। সে হঠাৎ দৌড়ে সেই দুঃখী ক্রন্দনরতা স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়ে নিজের সবল দু-খানা হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'কেঁদো না দিদি, কেঁদো না। তোমার ঘর নেই, একথাও ব'লো না। কালু আমাকে যে ঘরখানা বানিয়ে দিয়েছে, সেটা আমি তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেব। আমিই তোমার সেবা-যত্ন করব। কালু আমাকে যা দেবে, তার অর্ধেক আমি তোমাকে দেব। তাই বলি, দিদি, আর কেঁদো না। আমার সঙ্গে এস। চল তোমাকে আমাদের ঘরে নিয়ে যাই।'

রুগ্ন স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে তিলনী যখন চলে যাচ্ছে, তখন অ্যান্ডারসন উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে নাক ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন যে, পাহাড়ের হাওয়া লেগে তাঁর বিচ্ছিরি রকমের সর্দি হয়েছে, তাই সব কাজ সেদিনকার মত মুলতুবী হল। দেখা গেল যে পাহাড়ী হাওয়াটার ছোঁয়া অ্যান্ডারসনের মত অনেকেরই লেগেছে। কেননা, নাক ঝাড়বার বেজায় দরকার যে একা তাঁরই হয়েছিল : এমন নয়।

কাজ কিন্তু তখনও শেষ হয় নি, কেননা এবার ছেদী অ্যান্ডারসনের কাছে এসে তার দরখাস্তখানা ফেরত চাইল। সেটাকে নিয়ে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ছেদী পকেট থেকে সেই পঁচাত্তর টাকা বাঁধা ন্যাকড়াটা বের করে তা খুলে বললে, 'কালু আর আমি একই গাঁয়ের মানুষ। তাকে এখন দুটো মুখে ভাত যোগাতে হবে, তার মধ্যে একটার জন্যে আবার বিশেষ খাদ্য চাই। এ টাকাটা সবই তার দরকার হবে। তাই বলি, হুজুর, আপনার হুকুম হলে এই টাকাটা তাকে ফিরিয়ে দি।'

নিজেদের এলাকায় ট্যুর করবার সময় অ্যান্ডারসন আর তাঁর পূর্ববর্তীরা 'লাল-ফিতে'র আগেকার আমলে এইভাবে, সকলের সন্তোষ-মতে, শত-শত কেন, হাজার-হাজার এই ধরনের মোকদ্দমার ফয়সালা করে দিতেন—তাতে কোনো পক্ষের একটি পয়সা খরচ হত না।

কিন্তু এখন 'লাল ফিতে'র ব্যবস্থা হবার পর থেকে মামলাগুলো আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে বাদী-প্রতিবাদী দুজনেরই রক্ত চুষে খাওয়া হয়। আরও বিবাদের বীজ বোনা হয়। তা থেকে অনিবার্যভাবে ক্রমেই বেশি-বেশি করে আদালতে মামলা হতে থাকে যাতে আইন-ব্যবসায়ীদের ধনবৃদ্ধি হয়, আর গরিব, সরল, সৎ, পরিশ্রমী-চাষীরা ছারখার হয়ে যায়।



৫

জংলী কানুন

হরকোয়ার আর কুন্তীর বয়স যোগ করলে যখন দশও হয় না, তখনই তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনে ভারতে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। হয়তো আজও থাকত, যদি মহাত্মা গান্ধী আর মিস্ মেয়ো না জন্মাতেন।

বিরাট দুনাগিরি পর্বতের পাদদেশে কয়েক মাইল তফাতের দুই গ্রামে বাস করত হরকোয়ার আর কুন্তী। তারা আগে কখনও কেউ কাউকে দেখে নি। শেষে এক পরম দিনে, ঝকঝকে নতুন কাপড়-চোপড়ে সেজে, খুব অল্প একটু সময়ের জন্যে তারা মস্ত একদল আত্মীয় আর বন্ধুদের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

সেদিন তারা পেটভরে হালুয়া আর পুরি খেতে পেয়েছিল বলে এই দিনটির কথা অনেকদিন তাদের মনে ছিল। তাদের বাপেদেরও মনে ছিল, কেননা সেইদিন তাদের 'বাপ-মা'-স্থানীয় গ্রামের বেনে মশায় বেজায় দায় দেখে কয়েকটা করে টাকা দিয়েছিলেন আর তাঁর খাতায় তাদের নামের পাশে নতুন একটি সংখ্যা লিখে রেখেছিলেন। সেই টাকা দিয়েই তো তাদের ছেলেমেয়েদের যে বয়সে বিয়ে হওয়া উচিত সেই বয়সে, আর গ্রামের পুরুত মহাশয়ের ঠিক-করা শুভদিনে বিয়ে দিয়ে সমাজে নিজেদের মানসম্ভ্রম রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

অবশ্য একথা ঠিক যে এই অনুগ্রহটুকুর জন্যে মহাজন যে শতকরা পঞ্চাশ

টাকা হারে সুদ দাবি করেছিলেন, সেটা বড্ড বেশি। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে হলে তার অন্তত কিছুটা শোধ করা যাবেই। আরও ছেলেমেয়ের বিয়ে তো বাকি আছে—তখন ঐ দয়ালু মহাজনটি ছাড়া আর কে সাহায্য করবে তাদের?

বিয়ের পর কুন্তী তার বাপের বাড়িতেই ফিরে এল। তারপর কয়েক বছর ধরে সে, খুব গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের যে সব ঘরের কাজ করতে হয় সেই সব কাজ করে কাটাল। বিয়ে হওয়ায় তার জীবনে শুধু এইটুকু তফাত এল যে, অবিবাহিত মেয়েরা যে পোশাক পরে, তা আর সে পরতে পেত না। তার নতুন পোশাক এখন হল তিনটি জিনিস নিয়ে—ছোট্ট একটি হাতকাটা কাঁচুলি, কয়েক ইঞ্চি লম্বা একটি ঘাগরা, আর তিন হাত লম্বা একখানা চাদর যার একটা কোনা ঘাগরাটায় গোঁজা, আর অন্য দিকটা মাথার উপর জড়ানো।

কুন্তীর কয়েকটা বছর নিশ্চিন্তে কেটে গেল, উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটল না। শেষে সেই দিনটি এল যখন ঠিক হল যে তার স্বামীর কাছে যাবার উপযুক্ত বয়স হয়েছে। আবার মহাজনটি এসে তাদের উদ্ধার করলেন। তখন নতুন জামা-কাপড়ে সেজে, কাঁদতে-কাঁদতে একটি ছোট্ট বউ তার বাচ্চা বরের ঘরের দিকে রওনা হয়ে গেল।

কুন্তীর ক্ষেত্রে এই বাড়ি-বদলের অর্থ শুধু এইটুকু হল যে, আগে সে তার মা-র জন্যে যে-সব কাজ করে দিত, এখন সেগুলো তার শাশুড়ীর জন্যে করতে হবে। ভারতে গরিবদের ঘরে কেউ বসে বসে খায় না। ছোট-বড় সবাইকে নির্দিষ্ট কাজ করতে হয়, এবং তারা তা খুশি হয়েই করে থাকে। কুন্তী এখন রান্নার কাজে সাহায্য করার মত বড় হয়েছিল।

সকালবেলার খাওয়া শেষ হয়ে গেলেই, মজুরির বিনিময়ে খাটতে পারে এমন সবাই যার-যার কাজে বেরিয়ে যেত। সে কাজ যত তুচ্ছ হ'ক না কেন, তাতেই পরিবারের তহবিলে কিছু যোগ হত। হরকোয়ারের বাপ ছিল রাজমিস্ত্রী। সে তখন আমেরিকান মিশন স্কুলে একটা গির্জা তৈরির কাজ করছিল। হরকোয়ারের উচ্চাশা ছিল যে সে তার বাপের লাইনেই যাবে। যতদিন না তার সে কাজ করবার শক্তি হয়, ততদিন সে, তার বাপ আর অন্য সব রাজমিস্ত্রীর যোগালের কাজ করে, দৈনিক দশ ঘন্টা খেটে দু-আনা মজুরি এনে সংসারের আয় বাড়াত।

ওদিকে সেচ-দেওয়া নিচু জমিগুলিতে ফসল পেকে উঠেছিল। সকালবেলা খাওয়ার পর এঁটো বাসনপত্র ধুয়ে-মেজে কুন্তী তার শাশুড়ী আর তার অনেকগুলো জা-ননদের সঙ্গে গাঁয়ের মোড়লদের খেতে চলে যেত। সেখানে গ্রামের মেয়েদের আর বউদের সঙ্গে সেও দশ ঘন্টা খেটে তার স্বামীর অর্ধেক মজুরি রোজগার করত।

দিনের কাজ শেষ হলে গোধূলির সময়ে সমস্ত পরিবারটা ঘরে ফিরে

আসত। মোড়লের জমিতে এই ঘরখানা বানিয়ে নেবার অনুমতি পেয়েছিল হরকোয়ারের বাপ। বড়রা যখন বাড়ি ছিল না, তখন বাড়ির বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে রেখেছিল। তা দিয়ে রাত্রের খাবার রান্না করা হল, খাওয়া হল। এই আগুন ছাড়া ঘরে কখনও অন্য কোনো রকম আলো জ্বলে নি। থালাবাটিগুলো পরিষ্কার করে সেগুলো তুলে রেখে পরিবারের সবাই নিজের-নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেল। হরকোয়ার শুল তার বাবা-ভাইদের কাছে, আর কুন্তী শুল বাড়ির আর সব মেয়ের মধ্যে।

যখন হরকোয়ারের বয়স আঠার আর কুন্তীর ষোল, তখন তারা তাদের সামান্য মালপত্র নিয়ে গিয়ে সংসার পাতল আর একটা কুঁড়েঘরে। রানীখেত ছাউনি থেকে তিন মাইল দূরে এক গ্রামে হরকোয়ারের এক কাকা সেই ঘরখানায় তাদের থাকতে দিয়েছিল।

ছাউনিতে তখন অনেকগুলো গোরা-বারিক তৈরি হচ্ছিল, তাই রাজমিস্ত্রীর কাজ পেতে কোনো অসুবিধা হল না হরকোয়ারের। কুন্তীরও মজুরনীর কাজ পেতে কষ্ট হল না—সে একটা খাত থেকে পাথর বয়ে এনে দিয়ে আসত বাড়ি-তৈরির জায়গাটাতে।

চার বছর ধরে এই ছেলেমানুষ বর আর বউ রানীখেতের গোরা-বারিকে কাজ করল। এর মধ্যে তাদের দুটি সন্তান হল। চতুর্থ বছরের নভেম্বর মাসে বাড়িগুলো শেষ হয়ে গেল। হরকোয়ার আর কুন্তীকে নতুন কাজ খুঁজতে হল। তারা সামান্য টাকাই জমিয়েছিল, তাতে তাদের দিনকয়েক মাত্র খাওয়া চলতে পারত।

শীতটা সে-বছর তাড়াতাড়ি এসে পড়ল, বরাবর যেমন হয় তার চাইতে এবার বেশি শীত পড়বে এমন লক্ষণও দেখা গেল। পরিবারের কারও গরম জামা ছিল না। দিন-সাতেক ধরে কাজ খুঁজে-খুঁজে ব্যর্থ হয়ে হরকোয়ার প্রস্তাব করল যে পাদ-শৈলশ্রেণীতে নেমে যাওয়া যাক। সে শুনেছে যে সেখানে নাকি একটা সেচ-খালের মুখটি খননের কাজ চলছে। সেই অনুসারে ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে গোটা পরিবারটি মহা উৎসাহে পাদ-শৈলশ্রেণীর দিকে তাদের দীর্ঘ পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়ল।

যে গ্রামে তারা বার বছরের জন্যে সংসার পেতেছিল, সেখান থেকে কালাধুঙ্গিতে সেচ-খালের কাজ যেখানে চলছিল, তার দূরত্ব হবে মোটামুটি মাইল-পঞ্চাশেক।

রাত্রিতে গাছতলায় ঘুমিয়ে, আর দিনের বেলায় পালা করে ছেলেমেয়ে-দুটিকে আর তাদের সামান্য মালপত্র বয়ে নিয়ে খাড়া এবড়ো-খেবড়ো পথে প্রাণান্ত করে চড়াই আর উৎরাই ভেঙে, ছয় দিনে ক্লান্ত আর ক্ষত-বিক্ষত পায়ে হরকোয়ার আর কুন্তী কালাধুঙ্গিতে এসে তাদের যাত্রা শেষ করল।

অনুন্নত শ্রেণীর অন্যান্য ভূমিহীন লোকেরা এই শীতের আরও গোড়ার দিকেই উঁচু পাহাড় থেকে পাদ-শৈলশ্রেণীতে এসে দলবদ্ধভাবে বাস করার জন্যে কুড়েঘর বানিয়ে নিয়েছিল। তার এক-একটাতে ত্রিশটি পরিবার অবধি বাস করত। হরকোয়ার আর কুন্তী সেখানে ঠাঁই না পাওয়ায় তাদের নিজেদের জন্যে একটি কুটির বেঁধে নিল।

বনের কিনারায়ই তারা এর জন্যে জায়গা ঠিক করল। সেখানে যথেষ্ট জ্বালানী কাঠ জোটে। বাজারেও সহজে যাওয়া যায়। দিনরাত খেটে-খেটে তারা ডাল আর পাতা দিয়েই ছোট একটি কুড়েঘর বানিয়ে নিল। তাদের নগদ টাকার পুঁজি তখন কয়েকটি মাত্র টাকাতে এসে ঠেকেছিল, আর এখানে এমন কোনো বন্ধুভাবাপন্ন মহাজন ছিল না যার কাছে তারা সাহায্যের জন্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারত।

যে বনের ধারে হরকোয়ার আর কুন্তী তাদের কুড়েঘরটি বানিয়েছিল, সেই বনটি আমার একটি প্রিয় জায়গা ছিল। আমার সেকেলে গাদা-বন্দুকটি নিয়ে প্রথম আমি এই বনে ঢুকেছিলুম বাড়ির জন্যে লাল বনমোরগ আর ময়ূর মেরে আনব বলে। তারপর আমি আধুনিক একটি রাইফেল নিয়ে বড়-বড় শিকারের খোঁজে এর প্রতিটি অংশে গিয়েছি।

যে সময় হরকোয়ার আর কুন্তী তাদের দুটি সন্তানকে নিয়ে কুড়েঘরটিতে বাস করতে আসে (পুনোয়া নামে ছেলেটির বয়স তখন তিন, আর পুতলি বলে মেয়েটির বয়স দু-বছর), তখন আমি নিশ্চিত করে জানতুম যে সে বনটাতে এই এই জন্তু ছিল : পাঁচটা বাঘ ; আটটা চিতা : চারটি স্লথ ভালুকের একটি পরিবার : দুটি কালো হিমালয়ের ভালুক—তারা বুনো কুল আর মধু খাবে বলে উঁচু পাহাড় থেকে এসেছিল। অনেকগুলি হায়েনা পাঁচ মাইল দূরের ঘাস-জমিতে গর্তের মধ্যে বাস করত আর বাঘ ও চিতাদের মারা জীবজন্তুর দেহের ফেলে-যাওয়া অংশগুলি খাবার জন্যে প্রতি রাত্রে এই বনে আসত। এক জোড়া বন-কুত্তা ; প্রচুর শেয়াল, খেঁকশেয়াল আর পাইন-মার্টেন। নানারকমের খট্টাস আর অন্য রকম বিড়ালজাতীয় জীব। এ ছাড়াও গোটা-দুই ময়াল সাপ, অনেক রকমের ছোট সাপ, ঝুঁটিওয়ালা ঈগল, ধূসর ঈগল, এবং শত-শত শকুন এই বনে থাকত।

মানুষের ক্ষতি যারা করে না সেই হরিণ, কৃষ্ণসার, শুয়োর, বাঁদর ইত্যাদির কথা তো বললুমই না, কেননা আমার এ গল্পের মধ্যে তাদের কোনো ভূমিকা নেই।

যেদিন তাদের পলকা কুড়েঘরটি তৈরি করা শেষ হল, তার পরদিনই হরকোয়ার আট আনা রোজে ক্যানেলের ঠিকাদারের কাছে রাজমিস্ত্রীর কাজ পেয়ে গেল। আর কুন্তী বনবিভাগ থেকে দু-টাকা দিয়ে এক পারমিট নিয়ে

পাদ-শৈলে ঘাস কাটবার অধিকার পেল। সেই ঘাস সে বাজারের দোকানদারদের কাছে গরু-মোষের খাদ্য হিসেবে বিক্রি করত।

প্রায় একমণ ওজনের সেই সবুজ ঘাসের বোঝা নিয়ে আসতে রোজ তাকে বার-চোদ্দ মাইল খাড়া চড়াই আর উৎরাই ভাঙতে হত। তার জন্যে কুন্তী পেত চার আনা। তা থেকে এক আনা নিত বাজারে বিক্রির জন্যে নিযুক্ত সরকারী ঠিকাদার।

হরকোয়ারের আয় আট আনা, আর কুন্তীর পাওয়া তিন আনা দিয়ে চারটি প্রাণীর এই পরিবারটির বলতে গেলে আরামেই চলে যেত, কেননা খাদ্য ছিল প্রচুর এবং সস্তা। জীবনে এই প্রথম তাদের মাসে একবার মাংস কিনে খাবার সংগতি হল।

হরকোয়ার আর কুন্তী যে তিন মাস কালাধুঙ্গিতে কাটাবে বলে এসেছিল তার মধ্যে দু-মাস বেশ শান্তিতে কেটে গেল। কাজে খাটতে হত অনেকক্ষণ, বিশ্রাম করবারও সুবিধে হত না বটে, কিন্তু শিশুকাল থেকেই তাতে তারা অভ্যস্ত। আবহাওয়া চমৎকার ছিল, বাচ্চাদুটির স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। যে-ক-দিন ধরে কুড়েঘরটা তৈরি হচ্ছিল, সেই ক-দিন ছাড়া তাদের কখনও খাদ্যাভাব হয় নি।

গোড়ায়-গোড়ায় শিশুদুটোকে নিয়ে ভাবনায় পড়তে হয়েছিল, কারণ তারা এত ছোট, যে তারা হরকোয়ারের সঙ্গে তার ক্যানেলের কাজের জায়গায়ও যেতে পারত না, কুন্তীর সঙ্গেও দূরে-দূরে ঘাসের খোঁজে যেতে পারত না। তারপর একদিন একটি দয়ালু পঙ্গু বৃদ্ধা তাদের সাহায্য করতে এল। সে কয়েকশো গজ দূরে একটা বারোয়ারি কুড়েঘরে থাকত। সে বললে, বাপ-মা যখন কাজে যাবে তখন সে-ই বাচ্চাদের দেখাশোনা করবে।

দু-মাস এই ব্যবস্থা বেশ ভাল-ভাবেই চলেছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় হরকোয়ার যখন চার মাইল দূরে কাজ শেষ করে ফিরে আসত আর তার খানিকক্ষণ বাদে কুন্তী তার ঘাস বিক্রি করে বাজার থেকে ফিরত, তখন তারা দেখত যে পুনোয়া আর পুতলি তাদের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

শুক্রবার হচ্ছে কালাধুঙ্গিতে হাটবার। সেদিন আশপাশের যত গ্রামের সবাই বাজারে আসবেই। সস্তায় খাবার, ফল, তরকারি ইত্যাদির জন্যে সেখানে অস্থায়ী চালাঘর তৈরি হত। এই হাটবারে হরকোয়ার আর কুন্তী অন্য দিনের চাইতে আধঘন্টা আগে কাজ থেকে ফিরে আসত, কেননা হাটে শাক-সবজি কিছু পড়ে থাকলে রাত্রে দোকান বন্ধ হবার আগে সেগুলি কম দামে কিনতে পাওয়া যেত।

এক শুক্রবার হরকোয়ার আর কুন্তী সামান্য কিছু তরকারি আর আধসের পাঁঠার মাংস কিনে ঘরে ফিরে এসে দেখে যে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে

আজ পুনোয়া আর পুতলি সেখানে নেই।

বারোয়ারি কুড়েতে গিয়ে পঙ্গু স্ত্রীলোকটির কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, সে দুপুর থেকেই তাদের আর দেখে নি। সে বললে যে তারা বোধহয় বাজারে নাগরদোলা দেখতে গিয়েছে। বারোয়ারি কুড়েঘরের সব ছেলে-মেয়েরাই সেখানে গিয়ে জমেছে তো? কথাটা যুক্তিসংগত, তাই হরকোয়ার বাজার খুঁজে দেখতে গেল আর কুন্তী ঘরে ফিরে গেল রাতের খাবার বানাবার জন্যে।

ঘন্টাখানেক বাদে কয়েকজন লোককে সঙ্গে করে হরকোয়ার ফিরে এল। এরা তাকে ছেলে-মেয়ে খুঁজতে সাহায্য করেছিল। তাদের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি। যত লোককে জিগ্যেস করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ বলে নি যে তাদের দেখেছে।

সেই সময়টাতে ভারতের সর্বত্র একটা গুজব রটেছিল যে হিন্দু ছেলে-মেয়েদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে ফকিরেরা অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োগের জন্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিক্রি করছে। বলতে পারব না যে এর মধ্যে সত্য কতটুকু ছিল। কিন্তু খবরের কাগজে প্রায়ই পড়তুম যে ফকিরেরা মারধোর খাচ্ছে, আর কখনও মারমুখী জনতার হাত থেকে পুলিস তাদের উদ্ধার করছে।

এই গুজব ভারতের সব বাপ-মার কাছেই এসেছিল নিশ্চয়। হরকোয়ার আর তার সাহায্যকারীরা ঘরে ফিরে এসে কুন্তীকে তাদের আশঙ্কার কথা জানাল যে. শিশুদুটিকে ফকিররাই চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, হয়তো তারা এই উদ্দেশ্য নিয়েই হাটে এসেছিল।

গ্রামের নিচের মাথায় একটি থানার দুজন কনস্টেবল আর একজন হেড-কনস্টেবল ছিল। হরকোয়ার আর কুন্তী চলল সেখানে। সঙ্গে গেল তাদের হিতার্থীরা। তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল। দয়ালু বৃদ্ধ হেড-কনস্টেবলটির নিজেরও ছেলেমেয়ে ছিল। সে সহৃদয়ভাবে সেই উদ্‌ভ্রান্ত বাপমায়ের কথা শুনে তা তার ডায়েরিতে লিখে নিয়ে বলল যে. সে রাত্রে তো কিছু করা যাবে না, কিন্তু পরদিন সকালবেলাই সে কালাধুঙ্গির পনেরখানা গ্রামে লোক পাঠিয়ে ছেলে-হারানোর খবরটা প্রচার করে দেবার ব্যবস্থা করবে। তারপর সে প্রস্তাব করল যে, সেই লোকটি যদি গোটা-পঞ্চাশেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করতে পারে. তাহলে শিশুদুটিকে নিরাপদে ফিরে পেতে অনেক সুবিধে হয়।

পঞ্চাশ টাকা! কথাটা শুনে হরকোয়ার আর কুন্তী স্তম্ভিত হয়ে গেল, কেননা তারা জানত না যে সারা পৃথিবীতেও এতগুলো টাকা আছে। যাই হ'ক, পরদিন সকালবেলা যখন সেই হরকরা তার রোঁদে বেরোয় তখন সে ওই পুরস্কারটা ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছিল, কেননা কালাধুঙ্গির একজন লোক হেড-কনস্টেবলের কথা শুনে টাকাটা দিতে চেয়েছিল।

সে রাত্তিরের খাওয়াটা অনেক দেরিতে সারা হল। ছেলেমেয়ের ভাগটা

সরিয়ে রাখা হল। ভয়ানক শীত বলে সারা-রাত অল্প একটু আগুন জেবলে রাখা হল। হরকোয়ার আর কুন্তী থেকে-থেকে রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে গিয়ে ছেলে-মেয়েকে ডাকতে লাগল, যদিও তারা জানত যে তাদের সাড়া পাবার কোনো আশা নেই।

দুটো রাস্তা কালাধুঙ্গিতে এসে সমকোণে পরস্পরকে কাটাকাটি করেছে। তার একটা গিয়েছে পাদ-শৈলশ্রেণী ধরে ধরে হলদোয়ানি থেকে রামনগর পর্যন্ত, অপরটা গিয়েছে নৈনিতাল থেকে বাজপুর। সেই শুক্রবার রাত্রে শীত কাটাবার জন্যে ছোট্ট আগুনটুকুর পাশে বসে হরকোয়ার আর কুন্তী ঠিক করল যে ছেলে আর মেয়েকে যদি ভোর হবার মধ্যে পাওয়া না যায়, তাহলে তারা প্রথম রাস্তাটা ধরে গিয়ে খোঁজ করবে, কেননা ছেলে-ধরার ওই পথে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

শনিবার ভোর হতেই তারা থানায় গিয়ে তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানাল। তাদের বলা হল তারা যেন হলদোয়ানি আর রামনগরের থানায় এজাহার দিয়ে আসে। হেড-কনস্টেবলের একটা কথায় তারা খুবই উৎসাহিত হল। সে বলল যে ডাকের রানারকে দিয়ে সে একখানা চিঠি পাঠাচ্ছে—আর কাউকে নয়, খোদ পুলিসের বড় দারোগা-মশায়কে। তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে যে তিনি যেন সমস্ত রেলের জংশনগুলিতে ঐ ছেলেমেয়ে-দুটির জন্যে নজর রাখতে টেলিগ্রাম করে দেন—চিঠির সঙ্গেই তাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

সেইদিন সন্ধেবেলা সূর্যাস্তের একটু আগে আটাশ মাইল রাস্তা হেঁটে হলদোয়ানি থেকে ফিরে এসে কুন্তী সোজা থানায় গিয়ে তার ছেলে-মেয়েদের খোঁজ করল, আর হেড-কনস্টেবলকে জানাল যে তার খুঁজতে যাওয়াটা বৃথা হলেও সে তাঁর কথামত হলদোয়ানি থানায় এজাহার দিয়ে এসেছে। খানিকক্ষণ পরেই হরকোয়ার ছত্রিশ মাইল হেঁটে রামনগর থেকে ফিরে এল। সেও সোজা থানায় চলে গেল খোঁজ নেবার জন্যে। সেও জানাল যে ছেলেমেয়েদের কোনো হদিস পায় নি, কিন্তু হেড-কনস্টেবলের আদেশ পালন করে এসেছে।

তাদের কুটিরে অনেক বন্ধু অপেক্ষা করে বসে ছিল, এদের মধ্যে ছিল অনেক মায়েরা ও নিজেদের সন্তানদের বিপদের ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছিল। তারা সহানুভূতি জানাতে এসেছিল হরকোয়ারকে আর পুনোয়ার মা-কে। ভারতের প্রথা অনুসারে, জন্মের সময় কুন্তী যে-নামটি পেয়েছিল সে নামটি সে বিয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই খোয়াল। পুনোয়া যতদিন হয় নি ততদিন তাকে ডাকা হত আর উল্লেখ করা হত 'হরকোয়ারের বউ' বলে, এবং পুনোয়ার জন্মের পর সে হয়ে গেল 'পুনোয়ার মা'।

ঠিক শনিবারের মতই রবিবারটা কেটে গেল। তফাতের মধ্যে শুধু এই যে সেদিন পুবে-পশ্চিমে না গিয়ে কুন্তী গেল উত্তর-দিকে নৈনিতালে, আর

হরকোয়ার গেল দক্ষিণে বাজপুরে। কুন্তী হাঁটল ত্রিশ মাইল, হরকোয়ার গেল-এল বত্রিশ মাইল।

ভোরে বেরিয়ে, রাত্রে ফিরে আসা পর্যন্ত সেই উদ্‌ভ্রান্ত পিতা আর মাতা এমন সব গহন অরণ্যে দুর্গম পথ অতিক্রম করেছিল, যেখানে লোকেরা সাধারণ অবস্থায় বড়-বড় দল না পাকিয়ে চলাফেরা করে না। ছেলে-মেয়ের জন্য উদ্বেগ ডাকাত ও হিংস্র পশুর ভয় ছাপিয়ে গিয়েছিল। নইলে ও-পথে একা যাবার কথা হরকোয়ার ও কুন্তী মনেও ভাবত না।

রবিবারের সেই সন্ধেবেলা ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় তারা একজন নৈনিতাল আর অন্যজন বাজপুর থেকে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে এসে খবর শুনল যে, হরকরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরে এবং পুলিস তদন্ত করে ছেলে-মেয়েদের কোনো চিহ্ন পায় নি। তখন তাদের মন ভেঙে গেল, আর কখনও যে তারা পুনোয়া আর পুতলিকে দেখতে পাবে, সে আশা তারা ছেড়ে দিল।

দেবতারা যে কেন এমন রাগ করলেন যার ফলে স্পষ্ট দিনের আলোয় ফকিরদের পক্ষে তাদের সন্তানদের চুরি করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল, তার কারণ তারা বুঝতে পারল না। পাহাড় থেকে বেরিয়ে এত দূরে হেঁটে আসার আগে পুরোহিতের মতামত নিয়ে তাঁর ঠিক করে-দেওয়া শুভ দিনে তারা যাত্রা করেছিল। পথে প্রত্যেক দেবস্থানে তারা যথা নিয়মে পুজো দিতে-দিতে এসেছিল।

এক জায়গায় একটুকরো শুকনো কাঠ, আর এক জায়গায় হয়তো কুন্তীর চাদর থেকে ছেঁড়া একটা টুকরো, আরও এক জায়গায় হয়তো একটি পয়সা তারা দিয়েছে, যা দেওয়া তাদের সাধ্যাতীত। আর তারপর এই কালাধুঙ্গিতে এসে যতবার তারা কোনো মন্দিরের সামনে দিয়ে গিয়েছে, ততবার হাতজোড় করে প্রণাম করতে ত্রুটি করে নি। তবে তাদের এই বিষম দুর্ভাগ্য ঘটল কেন? তারা তো দেবতারা যা চান তাই করে এসেছে, এবং কোনো মানুষের কখনও ক্ষতি করে নি!

সোমবার এই দম্পতি এত মন-মরা আর এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে তারা ঘর ছেড়ে বেরোতে পারল না। খাবার কিছু ছিল না, কাজ না করা পর্যন্ত তা জুটবেও না। কিন্তু এখন কাজ করে হবে কী? যে-সন্তানদের মুখ চেয়ে মুখটি বুজে তারা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত খেটেছে, তারাই তো নেই।

তাই, যখন বন্ধুরা যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেবার জন্যে তাদের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল। হরকোয়ার কুটিরের দরজায় বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তার আশাহীন, শূন্য ভবিষ্যৎই বোধহয় দেখতে লাগল, আর কুন্তী ঘন্টার পর ঘন্টা ঘরের এক কোণে বসে দুলতেই থাকল, দুলতেই থাকল—চোখের জল তার শুকিয়ে গিয়েছে।

সেই সোমবারই, যে-জঙ্গলে আমার উল্লিখিত বন্য জন্তু আর পাখিগুলি থাকত আমার চেনা একটি লোক সেই জঙ্গলে মোষ চরাচ্ছিল। লোকটি অতি সরল, জীবনের বেশির ভাগই সে পতাবপুর গ্রামের মোড়লের মোষগুলি জঙ্গলে চরিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। বাঘের ভয়ের কথা সে জানত। সূর্যোস্তের আগেই সে মোষগুলোকে একত্র করে নিয়ে একটা গো-পথ ধরে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

পথটা বনের নিবিড়তম অংশ দিয়ে গিয়েছে। একটু পরেই সে লক্ষ করল যে, প্রত্যেকটি মোষ পথের একটা জায়গায় এসে অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে থেমে যাচ্ছে। পেছনের মোষটার শিঙের ঠেলা খেয়ে তবে সে আবার চলছে। সে যখন সেই জায়গাটায় পৌঁছল, তখন সেও ডানদিকে মাথা ফেরাল। সে দেখল কি—পথ থেকে কয়েক ফুট তফাতে একটা নিচু জায়গায় ছোট্ট দুটি শিশু শুয়ে রয়েছে।

শনিবার যখন হরকরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরেছিল, এ লোকটি তখন মোষগুলো নিয়ে জঙ্গলে ছিল। কিন্তু সেই রাত্রে আর তার পরের রাত্রিতেও হরকোয়ারের ছেলে-মেয়ে চুরি হয়ে যাবার কথা শুধু এ গ্রামেই নয়—সারা কালাধুঙ্গির সব গ্রামেই লোকেরা আগুন ঘিরে বসে আলোচনা করেছিল। তবে এই তো সেই হারানো ছেলে-মেয়ে, যাদের জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে! কিন্তু তাদের খুন করে এই এত দূরে এনে ফেলা হয়েছে কেন? শিশুদুটির পরনে কাপড় নেই, জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে তারা।

রাখালটি নিচু জায়গাটায় নেমে গিয়ে উবু হয়ে বসে দেখতে চেষ্টা করল যে শিশুদুটি কিসে মরেছে। তারা যে আর বেঁচে নেই, এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। তাদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে সে হঠাৎ দেখল যে তাদের নিঃশ্বাস পড়ছে। আসলে তারা মরে নি, গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। সে নিজে ছেলেমেয়ের বাপ, খুব আস্তে তাদের গায়ে হাত দিয়ে তাদের জাগাল। জাত হিসেবে ওদের ছুঁলে তার পাপ হয়, কেননা সে ব্রাহ্মণ, আর ওরা হল নিচু জাতের। কিন্তু এরকম বিপদের সময় জাতে কী এসে যায়? কাজেই সে মোষগুলোকে নিজে থেকে পথ খুঁজে ঘরে ফিরে যাবার জন্যে ছেড়ে দিয়ে শিশু-দুটিকে তুলে নিল। তারা এত দুর্বল যে চলতে পারছিল না।

দু-জনকে তার দুই কাঁধে নিয়ে সে কালাধুঙ্গি বাজারের দিকে চলল। সে নিজেও দুর্বল মানুষ, কেননা ওই অঞ্চলের আর সকলের মত সেও বেজায় ম্যালেরিয়ায় ভুগত। শিশু দুটিকে বয়ে নেওয়া এক ঝঞ্ঝাট, তাদের আবার জায়গা-মত ধরেও রাখতে হয়। তার উপর আবার এই বনের সব গো-পথগুলিই উত্তর থেকে দক্ষিণে চলেছে, অথচ তাকে যেতে হল পুব থেকে পশ্চিমে। তাই, দুর্ভেদ্য ঝোপ আর গভীর গিরি-খাত এড়াবার জন্যে তাকে ক্রমাগত ঘুরে-ঘুরে যেতে হল। কিন্তু সে বীরের মত চলতে থাকল। ছ-মাইল হেঁটে আসতে তাকে বার-বার বিশ্রাম করতে হয়েছিল।

পুতলি কথা বলতে পারছিল না, কিন্তু পুনোয়া একটু-একটু পারছিল। তারা কি করে জঙ্গলে এল, এর উত্তরে সে শুধু এই বলতে পারল যে তারা খেলা করতে-করতে হারিয়ে গিয়েছিল।

রাত অন্ধকার হয়ে আসছিল। কুটিরের দরজায় বসে হরকোয়ার সেইদিকে একভাবে চেয়ে ছিল। এখানে ওখানে লণ্ঠন আর রান্নার আগুন জ্বলে ওঠায় সেই অন্ধকারের মধ্যে আলোকবিন্দু দেখা যেতে লাগল। এমন সময় সে দেখল যে ছোট একটা দল বাজারের দিক থেকে আসছে। মিছিলের সামনে একজন লোক তার কাঁধের উপর কি যেন নিয়ে হেঁটে আসছিল। চারদিক থেকে লোক এসে মিছিলটাতে যোগ দিচ্ছিল।

একটা উত্তেজনাপূর্ণ গুঞ্জন তার কানে এল : "হরকোয়ারের ছেলেমেয়ে! হরকোয়ারের ছেলেমেয়ে!" সে তার কানদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, কিন্তু তাতে কোনো ভুলও তো নেই! কেননা মিছিলটা তার কুটিরের দিকেই আসছিল।

কুন্তী দুঃখকষ্ট আর শারীরিক সহ্যশক্তির চরমে পৌঁছে কুঁড়েঘরের এক কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। হরকোয়ার তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দরজার কাছে নিয়ে আসতে-আসতে সেই রাখালটি পুনোয়া আর পুতলিকে কাঁধে নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছে গেল।

কান্নার মধ্য দিয়ে উদ্ধার-কর্তাকে সম্ভাষণ, আশীর্বাদ আর ধন্যবাদ জানানো হয়ে গেলে এবং বন্ধুবান্ধবদের অভিনন্দনের হিড়িক খানিকটা কমলে, রাখালকে পুরস্কার দেবার কথাটা উঠল। গরিব লোকের পক্ষে পঞ্চাশটা টাকা হচ্ছে অগুনতি টাকা, তা দিয়ে সে তিনটে মোষ কিংবা দশটা গরু কিনে আজীবন স্বাধীনভাবে কাটাতে পারে। কিন্তু উদ্ধার-কর্তাটিকে লোকেরা যতটা বাহাদুরি দিচ্ছিল, সে তার চাইতেও বাহাদুর লোক।

সে বললে যে, এই রাত্রিবেলা তার মাথায় যে আশীর্বাদ আর ধন্যবাদ বর্ষিত হল, তা-ই তার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার। সে ওই পঞ্চাশ টাকার একটি পয়সাও ছুঁতে একেবারেই অস্বীকার করল। হরকোয়ার আর কুন্তীও দান হিসেবে কিংবা ঋণ বলে ওই টাকাটা নিল না। যে-ছেলেমেয়েদের আবার দেখতে পাবার আশা তাদের ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাদেরই তো ফিরে পেয়েছে তারা। এখন শরীরে একটু বল পেলেই তারা আবার কাজে লেগে যাবে। সমাগত লোকদের মধ্যে কেউ-কেউ আন্তরিক আনন্দিত হয়ে বাজারে ছুটে গিয়ে যে দুধ, মেঠাই আর পুরি নিয়ে এসেছে, আপাতত তাই দিয়ে তাদের চলে যাবে।

দু-বছরের পুতলি আর তিন বছরের পুনোয়া শুক্রবার দুপুরবেলা হারিয়ে গিয়েছিল, আর রাখালটি তাদের পেয়েছিল সোমবার বিকেলে আন্দাজ পাঁচটায় —সাতাত্তর ঘন্টার ব্যাপার। এই সাতাত্তর ঘন্টা ওই শিশুদুটি যে-বনে

কাটিয়েছিল, সেখানে আমার জ্ঞানত কত বন্য প্রাণী ছিল, তার বর্ণনা আমি আগেই দিয়েছি।

এ-কথা মনে করা যুক্তি-সংগত হবে না যে অতগুলো হিংস্র পাখি আর পশুর মধ্যে কেউই শিশুদুটিকে দেখে নি, তাদের কথা কওয়া শুনতে পায় নি, কিংবা তাদের গন্ধ পায় নি। অথচ যখন রাখালটি পুনোয়াকে আর পুতলিকে এনে তাদের বাপ-মায়ের হাতে দিল, তখন তাদের গায়ে একটি দাঁতের বা নখের দাগ ছিল না।

একবার আমি দেখেছিলুম যে একটি বাঘিনী একটি এক মাসের ছাগল-ছানাকে ধরবার জন্যে গোপনে এগোচ্ছে। জায়গাটা ফাঁকা ছিল বলে বাঘিনীটা কিছু দূরে থাকতেই ছাগলছানাটা তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচাতে শুরু করল। বাঘিনীটা গোপনতা ত্যাগ করে সটান তার দিকে চলে গেল। বাঘিনীর কাছে এসে সে তার গলাটা বাড়িয়ে মুখ উঁচু করে তাকে শুঁকতে গেল। আমার বুকটা কয়েকবার ঢিপ-ঢিপ করতে যতটুকু সময় লাগল, ততক্ষণ সেই এক মাসের বাচ্চাটা আর বনের রানীজীর নাকে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রানী মুখটা ফিরিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে গেল।

হিটলারের যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন আমি এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তিনজন শ্রেষ্ঠ লোকের বক্তৃতার উদ্ধৃতি পড়েছিলুম। তাঁরা যুদ্ধে নৃশংসতার নিন্দা করে অভিযোগ করেছিলেন যে, মানুষে-মানুষে যে যুদ্ধ, তার মধ্যে 'জংলি কানুন' প্রয়োগ করছে শত্রুপক্ষ। সৃষ্টিকর্তা বনের প্রাণীদের জন্যে যে কানুন করেছেন, মানুষের জন্যে যদি তা করতেন তাহলে যুদ্ধই হত না। কেননা, তাহলে মানুষের মধ্যে যারা প্রবল, দুর্বলের জন্যে তারাও ঠিক সেই রকম সহৃদয়তাই দেখাত যা বনের প্রাণীরা চিরকাল দেখিয়ে আসছে।



৬

দুই ভাই

আরণ্য যুদ্ধে যুবকদের তালিম দেবার দীর্ঘ বছরগুলি শেষ হয়ে যাবার পর একদিন আমরা প্রাতরাশের পর আমাদের কালাধুঙ্গিব কুটিরের বারান্দায় বসে ছিলুম। আমার বোন ম্যাগি আমার জন্যে একটা খাকি পুল-ওভার বুনছিল, আর আমি দীর্ঘকাল অব্যবহৃত অতি প্রিয় একটি ছিপকে ঠিকঠাক করছিলুম।

এমন সময় একটি লোক বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। তার পরনে পরিষ্কার অথচ বেজায়-তালি-মারা একপ্রস্থ সুতীর পোশাক, মুখে বিস্তৃত হাসি। সেলাম করে সে জিগ্যেস করল আমাদের তাকে মনে আছে কি না।

ঐ সিঁড়িটি ধরে বহু লোক উপরে এসেছে—পরিচ্ছন্ন, অপরিচ্ছন্ন, ছেলে, বুড়ো, বড়লোক, গরিব (অবশ্য, বেশির ভাগই গরিব), হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সব রকমেরই লোক।

আমাদের কুটিরটি ছিল পাদ-শৈলের একটি চৌমাথার উপরেই, এবং বন আর আবাদী জমির মধ্যের সীমারেখার উপরে। অসুস্থ কিংবা দুঃখী, কিংবা যার একটু সাহায্য করবার লোকের অভাব, কিংবা যার একটু মানুষের সঙ্গ আর এক পেয়ালা চা পেলে ভাল হয়, এমন সব লোকই খুঁজে-পেতে আমাদের কুটিরে চলে আসত—তা সে আবাদী জমির বাসিন্দাই হ'ক, অথবা বনে-জঙ্গলেই কাজ করুক, কিংবা শুধু এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছে এমন লোকই হ'ক।

যে-সব রুগ্ন আর আহত লোকদের এখানে চিকিৎসা হয়েছে, এত বছর ধরে তাদের একটা হিসেব রাখলে তাতে হাজার-হাজার নাম রয়েছে দেখা যেত। আর, যত রোগী আমাদের হাত দিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে থাকত এমন সবরকমেরই রোগ দুঃখ, যা মানুষের দেহে উত্তরাধিকার-সূত্রে আসে, কিংবা যা অস্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকার ফলে, অথবা বনে-জঙ্গলে মাঝে-মাঝে যাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এমন সব জন্তুদের মধ্যে বিপজ্জনক কাজ করবার ফলে, মানুষকে পেতে হতে পারে।

সেই স্ত্রীলোকটির ব্যাপারটাই ধরুন না কেন। সে একদিন সকালবেলা এসে নালিশ জানাল যে আগের দিন সন্ধেবেলা তাব ছেলেকে একটা ফোড়ার জন্যে যে তিসির পুলটিসটা দেওয়া হয়েছিল সেটা খেতে তার বড্ড অসুবিধে হয়েছিল, তাতে তার কোনো উপকারও হয় নি। তাই সে ওষুধ বদলে দিতে বলল।

আর একদিন সন্ধের পর একটি মুসলমান স্ত্রীলোক এল, তার গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। তার স্বামী নিউমোনিয়ায় মর-মর, তাকে বাঁচিয়ে দেবার জন্যে সে ম্যাগিকে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। এম্ অ্যান্ড বি ৬৯৩ বড়িগুলো দেখে সে সন্দেহভরে তাকিয়ে বলল, একটা অত কঠিন রোগীর জন্যে এইটুকু ছাড়া আর কিছুই কি নেই নাকি! যাই হ'ক, পরদিন সে হাসিমুখে এসে জানাল যে তার স্বামী ভাল আছে, আর, সে তার চারজন বন্ধুকেও নিয়ে এসেছে। তাদের সকলেরই তার মত বুড়ো বর আছে, যাদের যে-কোনো সময়ে নিউমোনিয়ায় ধরতে পারে। তাই সে তাদের জন্যও ঠিক ঐ রকম দাওয়াই চাইল।

এ ছাড়া একটি মেয়ের কথা লিখছি। তার বয়স আট। আমাদের গেটের ছিটকিনিটার নাগাল পেতে তার বেশ অসুবিধে হয়েছিল। তার চাইতে বছর-দুয়েকের ছোট একটি ছেলের হাত শক্ত করে ধরে সে গট-গট করে বারান্দা পর্যন্ত এসে ছেলেটার চোখের ঘায়ের জন্যে ওষুধ চাইল। সে নিজে মাটিতে বসে পড়ে, ছেলেটাকে চিত করে ফেলে, তার মাথাটা নিজের দুই হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে বললে, 'মিস্ সাহেব, এবার আপনি ওকে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।' ওই মেয়েটি ছিল ছ-মাইল দূরের এক গ্রামের মোড়লের মেয়ে। তার ক্লাসের বন্ধু চোখে ঘা হয়ে ভুগছে দেখে সে নিজে দায়িত্ব নিয়ে তাকে চিকিৎসার জন্যে ম্যাগির কাছে নিয়ে চলে এসেছিল।

তারপর পুরো একটি সপ্তাহ ধরে, যতদিন না ছেলেটির চোখের ঘা একেবারে সেরে গেল ততদিন সেই পরোপকারিণী শিশুটি রোজ ছেলেটিকে নিয়ে আমাদের ওখানে আসত। যদিও এর জন্যে তাকে রোজ চার মাইল পথ বেশি হাঁটতে হত।

তারপর দিল্লীর সেই করাতির কথা। সে একদিন খোঁড়াতে-খোঁড়াতে আমাদের হাতার মধ্যে এল। একটা শুয়োর দাঁত দিয়ে তার পায়ের পিছনটা গোড়ালি থেকে হাঁটুর পিছন পর্যন্ত চিরে ফাঁক করে দিয়েছিল। যতক্ষণ তার

শুশ্রূষা চলেছিল, ততক্ষণ সে, যে-নোংরা জানোয়ারটা তার এই ভয়ানক ক্ষতিটা করেছিল সেটাকে গালাগাল করতে লাগল, কেননা সে ছিল মুসলমান।

তার কাহিনী হল এই যে, আগের দিন একটা গাছ কেটে ফেলে রেখে সে সেইদিন সকালবেলা সেটাকে করাত দিয়ে কাটতে এসেছিল, এমন সময় একটা শুয়োর ডাল-পালার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে তাকে গুঁতো মেরে তার পা ফেঁড়ে ফেলল। আমি যখন বললুম যে শুয়োরটার পথ থেকে সরে না দাঁড়ানোটা তারই নিজের দোষ, তখন সে চটে গিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'তার তো দৌড় দেবার জন্যে গোটা জঙ্গলটাই ছিল, তবে আমার গায়ে এসে পড়বার দরকারটা কি ছিল? আমি তো তার চটবার মত কিছু করি নি, এমনকি আমি আগে তাকে দেখিও নি পর্যন্ত।'

আরও একজন করাতি ছিল। একটা কাটা গাছ উলটে দিতে গিয়ে সে হাতে 'এই এত বড়' একটা কাঁকড়া বিছের কামড় খায়। চিকিৎসার পর সে মাটিতে গড়িয়ে-গড়িয়ে তারস্বরে তার দুর্ভাগ্যের কথা বলে বিলাপ করতে লাগল, আর বলতে লাগল যে ওষুধে তার কোনোই কাজ হচ্ছে না। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই দেখা গেল যে সে দু-হাতে তার পেট চেপে ধরে আছে, আর হাসির চোটে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সেদিনটা ছিল ছেলেমেয়েদের বার্ষিক উৎসবের দিন। তাদের রেস হয়ে যাবার পর দুশো ছেলেমেয়ে আর তাদের মায়েদের মেঠাই আর ফল খাওয়ানো হয়ে গিয়েছিল। তারপর সবাই গোল হয়ে বসল। দু-জন লোকে দুটো বাঁশ তুলে ধরল, তাদের মাঝখানে একটা দড়িতে একটা কাগজের ঠোঙা ঝুলিয়ে দেওয়া হল,—তার ভিতর নানারকম বাদাম ভরা। একটা ছেলেকে চোখ বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হল সেই থলিটাকে ফাটাবার জন্যে। যেই লাঠির ঘা থলিতে না পড়ে একজন লোকের মাথায় পড়েছে, অমনি সেই বিচ্ছুতে কামড়ানো রোগীটি সকলের চাইতে জোরে হেসে উঠেছে। তার ব্যথাটা কেমন, জিগ্যেস করায় সে বললে যে এমন তামাশা দেখতে পেলে সে আর বিচ্ছুর কামড়-টামড় গ্রাহ্য করে না।

আমাদের পরিবারের লোকরা যে কতকাল ধরে শখের ডাক্তারি করে আসছে তা আমার মনে নেই। ভারতীয়রা—বিশেষত যারা গরিব তারা—অনেক দিন মনে করে রাখে। যত তুচ্ছ উপকারই হ'ক, তা কখনও তারা ভোলে না। তাই, যত লোক আমাদের কালাধুঙ্গির বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠত, তারা সবাই যে রোগী এমন নয়।

এমন অনেক লোক ছিল যারা গত বছর, কিংবা হয়তো অনেক বছর আগে সামান্য একটু অনুগ্রহ পেয়েছিল বলে আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে দুর্গম পথ ধরে যে-কোনো ঋতুতে দিনের পর দিন হেঁটে এসেছে। তাদের মধ্যে

একটি ষোল বছরের ছেলে ছিল। সে একবার তার মাকে নিয়ে আমাদের গ্রামের এক বাড়িতে কিছুদিন থেকে আমার বোনকে দিয়ে তার মায়ের ইনফ্লুয়েঞ্জা আর চক্ষু-প্রদাহের চিকিৎসা করিয়ে গিয়েছিল। তারপর একদিন সে আমার বোনকে তার মায়ের কৃতজ্ঞতা জানাতে আর মায়ের 'নিজের হাতে তোলা' কয়েকটি ডালিম উপহার দিতে বহু দিনের পথ হেঁটে এসেছিল।

সেইদিনই—তালি-দেওয়া-পোশাক-পরা লোকটি আসবার ঘণ্টাখানেক আগে —একটি বৃদ্ধ সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দায় একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে শেষে অপছন্দের ভাবে মাথাটা নাড়তে নাড়তে বললে, 'সাহেব, শেষবার যখন আপনাকে দেখি, তখনকার চাইতে আপনাকে এখন বুড়ো দেখাচ্ছে।'

আমি উত্তর দিলুম, 'তা বটে, দশ বছর বাদে সকলকেই আর একটু বুড়ো দেখায়।' সে বললে, 'না সকলকে নয়, সাহেব! দশ নয়, বার বছর আগে যেবার আমি শেষ এই বারান্দায় বসে গিয়েছিলুম, তখনকার চাইতে এখন আমাকে অন্তত বেশি বুড়ো দেখায় না। আমি নিজেও বুড়ো হয়েছি বলে মনে করি না। সেবার আমি বদ্রীনাথ থেকে তীর্থ করে হেঁটে ফিরছিলুম। তখন আমি ক্লান্ত, আর আমার দশটা টাকার দরকার ছিল। আপনাদের গেট খোলা দেখে আমি এখানে একটু জিরোবার জন্যে অনুমতি, এবং কিছু সাহায্য চেয়েছিলুম আপনার কাছে।

এবার আমি আর-এক তীর্থ করে ফিরছি—পবিত্র বারাণসী ধাম থেকে। আমার টাকার দরকার নেই, শুধু আপনাকে আপনার সেবার সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি, আর বলতে এসেছি যে সেবার আমি নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছেছিলুম। এই বিড়িটি খেয়ে, আর একটু জিরিয়ে নিয়ে আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে যাব। তাদের হলদোয়ানিতে রেখে এসেছি।' অর্থাৎ এক-এক পিঠে চোদ্দ মাইল। তাছাড়া, বার বছরে সে আর বুড়ো হয় নি, সে একথা বললেও সে যে সত্যিই বুড়ো আর ক্ষীণজীবী হয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

তালি-মারা সুতীর-পোশাক-পরা যে লোকটি বারান্দায় আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, তার মুখটা অস্পষ্টভাবে চেনা-চেনা ঠেকলেও আমরা তার নাম, অথবা কি উপলক্ষে তাকে দেখেছিলুম তা মনে করতে পারলুম না। তাকে চিনতে পারছি না দেখে সে তার কোটটা খুলে ফেলে শার্টের বোতামও খুলল। তাতে তার বুক আর ডান কাঁধ দেখেই তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল যে সে হচ্ছে নরোয়া—ঝুড়িওলা নরোয়া।

তাকে না চিনতে পারার একটা কৈফিয়ত দিতে পারি। ছ-বছর আগে শেষবার তাকে যখন দেখি তখন সে ছিল অস্থিচর্মসার। এক পা ফেলতে হলেও

তার মহা কষ্ট হত, আর শরীরের ভার রাখবার জন্যে একখানা লাঠি লাগত। তার কাঁধের ভাঙা হাড়গুলো ঠিক হয়ে না বসে শুধু কড়া হয়ে জোড় লেগে যাওয়াতে তার কাঁধটা বাঁকাচোরা হয়ে গেছে, আর পিঠের চামড়া কুঁচকে বিবর্ণ হয়ে গেছে, তার ডান হাত খানিকটা শুকিয়ে গেছে। তবু তাকে দেখে আমরা —যারা তিন মাস ধরে তাকে মরণের সঙ্গে বীরের মত লড়তে দেখেছি—অবাক হয়ে গেলুম যে সে কঠিন সংকট থেকে কত ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। নরোয়া তার হাতখানা তুলে আর নামিয়ে, আর আঙুলগুলো খুলে আর মুড়ে বললে যে তার হাতখানা দিন-দিন জোরাল হয়ে উঠছে।

আমরা ভয় করেছিলুম যে তার আঙুলগুলো অচল হয়ে যাবে, কিন্তু তা হয় নি। কাজেই সে তার ব্যবসা আবার শুরু করতে পেরেছে। সে বললে যে এখন তার আসার উদ্দেশ্য হল আমাদের দেখিয়ে যাওয়া যে সে ভালই আছে, এবং সে যে-কমাস জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে পড়ে ছিল, ততদিন ধরে তার আর তার স্ত্রী আর সন্তানের সব প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ম্যাগিকে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে। বলেই সে তা জানাবার জন্যে ম্যাগির পায়ের উপর তার মাথাটা রেখে উপুড় হয়ে পড়ল।

নরোয়ার কঠিন সংকট

নরোয়া আর হরিয়া নিজেদের ভাই বলে পরিচয় দিত বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক কিছু ছিল না। আলমোড়ার কাছে একই গ্রামে তারা জন্মেছিল আর বড় হয়েছিল, এবং যখন কাজ করবার বয়স হল তখন একই পেশা ধরেছিল —তা হচ্ছে ঝুড়ি বানানো। তার মানে এই যে তারা অচ্ছুৎ ছিল,—উত্তরপ্রদেশে শুধু অচ্ছুৎরাই ঝুড়ি বোনে।

গ্রীষ্মকালে তারা আলমোড়ার কাছে নিজেদের গ্রামে নিজেদের কাজ চালাত, আর শীতকালে কালাধুঙ্গিতে নেমে আসত। আমাদের গ্রামের লোকদে'র ধান-টান রাখবার জন্যে তারা যেসব প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ঝুড়ি বানাত তার এক একটার ফাঁদ দশহাত পর্যন্ত হত। সেগুলোর খুব চাহিদা ছিল। আলমোড়ার পাহাড়ে গ্রামে তারা ঝুড়ি বানাত রিংগাল দিয়ে। রিংগাল হল এক জাতের সরু বাঁশ এক ইঞ্চি মোটা, কুড়ি ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। সেগুলো চার থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু জায়গায় জন্মায়। তা দিয়ে নিখুঁত মাছ ধরবার ছিপও তৈরি হয়। কালাধুঙ্গিতে নরোয়ারা ঝুড়ি বানাত সাধারণ বাঁশ দিয়ে।

কালাধুঙ্গিতে বাঁশ জন্মায় সরকার সংরক্ষিত বনে। সেই বনের কাছে থেকে আমরা যারা চাষবাস করি, নিজেদের ব্যবহারের জন্যে বৎসরে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় বাঁশ কেটে আনতে পেতুম। কিন্তু যাদের ব্যবসার জন্যে বাঁশের

হত। তার জন্যে দিতে হত বোঝা-পিছু দু'আনা, আর লাইসেন্সটা লেখবার
হত। তার জন্যে দিতে হত বোঝা-পিছু দু'আনা, আর লাইসেন্সটা লেখবার
মেহনতানা বাবদ বন-রক্ষীটিকে সামান্য কিছু। লাইসেন্স হত মাথা-পিছু, আর মাথায় যত বড় বোঝা আনা যায় তার জন্যেই। কাজেই, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে একটা মানুষের পক্ষে দু-বছরের পুরনো বাঁশ যতগুলি বয়ে আনা সম্ভব, তা দিয়ে বোঝাটা তৈরি করা হত—কেননা ঐরকম বাঁশই ঝুড়ি বানাবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর ভোর হতেই নরোয়া আর হরিয়া কালাধুঙ্গি বাজারের কাছে তাদের বারোয়ারি আড্ডা থেকে বেরিয়ে আট মাইল হেঁটে নালুনি গ্রামে চলল। সেখানে বন-রক্ষীর থেকে একটা লাইসেন্স নিয়ে নালুনির সংরক্ষিত বনে দুই-বোঝা বাঁশ কেটে সন্ধেবেলা তাদের কালাধুঙ্গিতে ফিরে আসবার কথা।

যখন তারা রওনা হল তখন বেজায় শীত, তাই তারা শীত কাটাবার জন্যে গায়ে মোটা সুতীর চাদর জড়িয়ে নিয়েছিল। মাইল-খানেক ধরে পথটা ক্যানেলের সেচ-খালের কিনার ধরে চলল। তারপর সেচ খালের মুখের কাছে তৈরি নানারকম উঁচু দেওয়াল পার হয়ে তারা একটা পাকদণ্ডী ধরল। সেটা একবার খানিকটা ঘন ছোট ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, আবার বোর নদীর ধারে-ধারে খানিকটা পাথর-ছড়ানো জায়গার মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে।

এইসব জায়গায় ভোরবেলায় সাধারণত একজোড়া ভোঁদড়কে দেখতে পাওয়া যায়, আর জলে যখন রোদ পড়ে তখন ছিপ দিয়ে দেড় সের দু-সের ওজনের মহাশোল মাছ ধরতে পারা যায়। আরও দু-মাইল উপরে গিয়ে তারা একটা অগভীর জায়গায় বোর নদীর ডান-পার থেকে বাঁ-পারে গিয়ে একটা বড় গাছ আর ঘাসের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। এখানে সকালে আর সন্ধেবেলায় চিতল আর সম্বর হরিণের ছোট-ছোট পাল দেখা যায়, কদাচিৎ এক-আধটা কাকার হরিণ, চিতা বা বাঘও চোখে পড়ে।

এর ভিতর দিয়ে মাইল-খানেক গিয়ে দুটো পাহাড়ের সন্ধিস্থলে তারা এসে পড়ল। এখানেই কয়েক বছর আগে রবিন 'পওয়ালগড়ের কুমার'-এর পায়ের ছাপ আবার খুঁজে পেয়েছিল। এই জায়গাটা থেকেই উপত্যকাটা চওড়া হয়ে গিয়েছে। সেখানে যারা গরু-মোষ চরায় আর বৈধ বা অবৈধভাবে শিকার করে, তারা সবাই এটাকে বলে সামাল-চৌর। এই উপত্যকায় সাবধানে চলতে ফিরতে হয়, কেননা পাকদণ্ডীটা মানুষে যত বাঘেও প্রায় ততই ব্যবহার করে।

উপত্যকাটির উপরকার দিকটায় পাকদণ্ডীটা একফালি ঘাস-জমির ভিতর দিয়ে গিয়ে তারপর খাড়া দু-মাইল উঠে গিয়ে নালুনি গ্রামে পৌঁছেছে। ঘাসগুলি আট-ফুট উঁচু, ঘাস-জমিটা ত্রিশ গজ চওড়া আর পথটার দু ধারেই গজ

পঞ্চাশেক পর্যন্ত বিস্তৃত।

নালুনি পাহাড়ে এবার খাড়া চড়াই বেয়ে উঠতে হবে বলে ঘাসের কাছে আসবার আগেই নরোয়া তার সুতীর চাদরখানা খুলে, ছোট করে ভাঁজ করে সেটাকে নিজের ডান কাঁধে রেখেছিল। হরিয়া আগে-আগে যাচ্ছিল, তার কয়েক পা পিছনেই নরোয়া। এইভাবে ঘাসের ভিতর তিন কি চার গজ যেতেই হরিয়া একটা বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে নরোয়ার এক চিৎকার।

হরিয়া ফিরে ছুটে এল। এসে দেখে যে ঘাসের কিনারায় খোলা জায়গায় নরোয়া চিত হয়ে পড়ে রয়েছে, আর একটা বাঘ কোনাকুনিভাবে তার বুকের উপর চেপে রয়েছে—তার পা দু-খানা হরিয়ার দিকে। হরিয়া দুই হাতে নরোয়ার দুই পা ধরে বাঘটার তলা থেকে টানতে শুরু করে দিল, যদি বার করতে পারে। তা করতেই বাঘটা উঠে দাঁড়াল, তারপর তার দিকে ফিরে গর্জন করতে লাগল।

চিত অবস্থায় নরোয়াকে খানিকদূর টেনে নিয়ে গিয়ে হরিয়া তাকে জড়িয়ে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু নরোয়া সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল আর ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, তার আর দাঁড়াবার বা চলবার শক্তি ছিল না। তাই, হরিয়া তাকে জাপটে ধরে তাকে খানিক হেঁচড়াতে-হেঁচড়াতে আর খানিক তুলে নিয়ে ঘাসের কিনারায় খোলা জমিটা দিয়ে নিয়ে চলল, বাঘটাও সারাক্ষণ গর্জন করে চলল।

এইভাবে সে নালুনি গ্রামে যাবার পথে আবার এসে পড়ল। তারপর অমানুষিক কষ্ট করে হরিয়া নরোয়াকে নিয়ে নালুনি এসে পেঁৗছল। সেখানে দেখা গেল যে ডান কাঁধে ভাঁজ করা চাদরখানা থাকা সত্ত্বেও বাঘটা নরোয়ার কাঁধের হাড়গুলো চূর্ণ করে দিয়েছিল। মাংস ছিঁড়ে বুক-পিঠের ডানদিকের হাড়গুলো দেখা যাচ্ছিল। নরোয়াকে টেনে আনবার সময় হরিয়া তার চাদর-খানাও কুড়িয়ে পেয়েছিল। বাঘটার চারটে কুকুরে-দাঁতই তার আট-আটটা ভাঁজ ভেদ করে গিয়েছিল। কিন্তু এই বাধাটা না পেলে দাঁতগুলো তার বুকে চেপে বসত এবং আঘাত মারাত্মক হত।

নালুনির বন-রক্ষীর আর বাসিন্দাদের নরোয়ার জন্যে কিছু করবার সাধ্য ছিল না। কাজেই হরিয়া দু-টাকা দিয়ে একটা মাল-বওয়া টাট্টু ভাড়া করে, নরোয়াকে তার পিঠে চাপিয়ে কালাধুঙ্গির দিকে রওনা হল।

আগেই বলেছি যে দূরত্বটা আট মাইল। কিন্ত হরিয়ার আবার বাঘের মুখে পড়বার ইচ্ছে ছিল না, তাই সে অনেক ঘুরে মুসাবাঙ্গা গ্রামের ভিতর দিয়ে গেল। তাতে পথ আরও দশ মাইল বেড়ে গেল—নরোয়ার প্রাণান্ত! নালুনিতে জিন পাওয়া গেল না, শস্য বইবার জন্যে যে কাঠের পাটা থাকে তারই একটার উপর

তাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার উপর আবার প্রথম ন-মাইল রাস্তা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের খাড়া আর এবড়ো-খেবড়ো জমির উপর দিয়ে।

ম্যাগি বাড়ির বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল, এমন সময় নরোয়া এসে সিঁড়ির তলায় পেঁছিল। তার শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে, হরিয়া তাকে টাট্টুর উপরে চেপে ধরে রেখেছে। এক-নজর দেখেই বোঝা গেল যে এ-ক্ষেত্রে কিছু করবার সাধ্য তার নেই। তাই সে নরোয়াকে মূর্ছিতপ্রায় দেখে তাড়াতাড়ি তাকে খানিকটা স্মেলিং সল্ট শুঁকিয়ে, তার হাতখানা একটা কাপড়ে ঝুলিয়ে দিল। তারপর ব্যাণ্ডেজের জন্যে একখানা চাদর ছিঁড়ে সে কালাধুঙ্গি হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারকে একখানা চিঠি লিখে তাঁকে অনুরোধ করল যেন তখনই নরোয়াকে তিনি দেখেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তার জন্যে। আমাদের খানসামাকে চিঠিটা দিয়ে তাকে ওই লোক দু-জনের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল আমার বোন।

আমার একদল বন্ধু তখন কালাধুঙ্গিতে আমাদের সঙ্গে বড়দিনটা কাটাচ্ছিল। ওই দিন তাদের সঙ্গে পাখি শিকার উপলক্ষে বাইরে ছিলুম। সন্ধের অনেক পরে বাড়ি ফিরে ম্যাগির কাছে নরোয়ার কথা শুনলুম। পরদিন ভোরবেলাই হাসপাতালে গিয়ে একটি নিতান্ত ছেলেমানুষ আর নিতান্ত অনভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে শুনলুম যে তিনি যা পেরেছেন করেছেন, কিন্তু রোগীর সারবার আশা প্রায় নেই। হাসপাতালে রোগী রাখবার কোনো ব্যবস্থাও নেই, তাই তিনি নরোয়ার চিকিৎসা যা করবার তা করে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মস্ত এক বারোয়ারি চালাঘরে অন্তত কুড়িটি পরিবার থাকে, আর তাদের প্রত্যেকেরই বোধহয় ছেলেপুলের সংখ্যা অগুনতি। সেইখানে এক কোণে কতকগুলো বিচালি আর পাতার উপর শুয়ে রয়েছে নরোয়া। তার মত মারাত্মক আহত লোকের পক্ষে এমন জায়গায় থাকা চলে না, কেননা তার ঘা-গুলো দূষিত হয়ে আসবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। সেই অস্বাস্থ্যকর আর গোলমালে ভরা চালাঘরের মধ্যে নরোয়া দিন-সাতেক পড়ে রইল। সে কখনও-কখনও প্রবল জ্বরে প্রলাপ বকত, কখনও বা আচ্ছন্নভাবে পড়ে থাকত। তার পতিব্রতা স্ত্রী, তার অনুগত 'ভাই' হরিয়া, এবং অন্য কয়েকজন বন্ধু তার সেবাশুশ্রূষা করতে লাগল।

আমি, যে কিছু জানি না, আমারও দেখে মনে হতে লাগল যে নরোয়ার পচা ঘা-গুলো চিরে পুঁজ বের করে পরিষ্কার করে না দিলে ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাবে নিশ্চয়। তাই, চিকিৎসার সময় তার সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করে আমি নরোয়াকে হাসপাতালে নিয়ে এলুম। ছেলেমানুষ ডাক্তারটিকে বাহাদুরি দিতে হয় যে, সে কোনো কাজের ভার নিলে তার আর শেষ রাখত না। তাই, নরোয়া তার বুকে পিঠে যে-সব লম্বা-লম্বা কাটা দাগ নিয়ে একসময় শ্মশানে যাবে, তার অনেকগুলিই বাঘের আঁচড়ের নয়, ডাক্তারের ছুরিরই দাগ। ছুরি-

খানা সে বেপরোয়াভাবে চালিয়েছিল।

পেশাদার ভিখারী ছাড়া, ভারতের গরিবরা শুধু যখন কাজ করে তখনই খেতে পায়। নরোয়ার বউ প্রথমে তাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া নিয়ে, আর তারপর সে যখন বারোয়ারি চালাটায় ফিরে গেল তখন তার সেবাশুশ্রূষা নিয়ে, তারও উপরে আবার তিন বছরের একটি মেয়ে আর ছোট আর-একটি বাচ্চাকে নিয়ে সারাক্ষণ বিব্রত থাকত বলে আমার বোনই নরোয়ার আর তার পরিবারের সব প্রয়োজন মেটাত। (ভারতের ছোট-ছোট হাসপাতালে রোগীদের শুশ্রূষার লোকও দেয় না, খাবারও দেয় না)।

তিন মাস বাদে অস্থিচর্মসার হয়ে নরোয়া কোনোরকমে চালাঘরটি থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে বিদায় নিতে আমাদের বাড়িতে এল। তার ডানহাতখানা দেখে মনে হল না যে সে আর সেখানা ব্যবহার করতে পারবে। পরদিন সে, হরিয়া আর তাদের দুই পরিবার আলমোড়ার কাছে তাদের গ্রামে ফিরে গেল।

প্রথম দিন সকালবেলা সেই বারোয়ারি চালাঘরে নরোয়াকে দেখে, আর হরিয়ার কাছে ব্যাপারটার একটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেয়ে আমার দৃঢ় ধারণা হল যে তাদের সঙ্গে বাঘটার দেখা হয়েছিল নিতান্তই দৈবাৎ।

যাই হ'ক আমার ধারণাটা ঠিক কি না তা জানবার জন্যে—আর, ঠিক না হলে বাঘটাকে মেরে ফেলবার জন্যে—সেই দুই ভাই আগের দিন নাল্‌নি গ্রামে যেতে যে-পথে গিয়েছিল আমি পায়ে-পায়ে সেই পথটি ধরে চললুম। কয়েক গজ ধরে সেই পথটি নাল্‌নি পাহাড়ের তলাকার উঁচু ঘাসের বনটার ধারে ধারে চলে গিয়ে তারপর সমকোণ ঘুরে ঘাসগুলোর ভিতরে চলে গিয়েছিল।

লোক দু-জন এখানে আসবার একটু আগেই বাঘটা একটা মদ্দা সম্বর হরিণ মেরে সেটাকে নিয়ে পথটার ডানদিকে ঘাসের ভিতর ঢুকেছিল। হরিয়া ঘাসবনে ঢোকবার সময় বাঘটা খসখসানি শুনে বেরিয়ে আসতে গিয়ে নরোয়ার উপর এসে পড়ে।

নরোয়া তখন হরিয়ার কয়েক গজ পিছনে, পথের মোড় থেকে দু-চার হাত দূরে ছিল। সংঘর্ষটা দৈবাৎ হয়ে গিয়েছিল, কেননা ঘাসগুলো অত্যন্ত ঘন আর খুব উঁচু বলে গায়ে এসে ধাক্কা লাগবার আগে পর্যন্ত বাঘটা নরোয়াকে দেখতে পায় নি। অধিকন্তু, সে নরোয়াকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলতেও চেষ্টাও করে নি, এমনকি যে মানুষটার উপর সে শুয়ে পড়েছিল তাকে টেনে নিয়ে যাবার সময় হরিয়াকে বাধাও দেয় নি। কাজেই এই বাঘটাকে বেঁচে থাকতে দিলুম। আমার 'কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘেরা' বইয়ে 'ন্যায়পরায়ণ বাঘ' পরিচ্ছেদে যেসব বাঘের কথা আছে, তাদের দলে আমি এই বাঘটিকেও ফেলেছি।

আমার দেখা অথবা শোনা অথবা পড়া যত সাহসের ঘটনার কথা আমি

জানি, তার মধ্যে হরিয়ার নরোয়াকে উদ্ধার করবার কাজটাকে আমি সবচাইতে বড় বলে মনে করি। অতি বিস্তীর্ণ এক বনের মধ্যে একা আর নিরস্ত্র হয়েও বিপন্নের আর্তনাদে সাড়া দেওয়া, এবং সেই সঙ্গীটির উপর ক্রুদ্ধ একটা বাঘ শুয়ে থাকা সত্ত্বেও তাকে টেনে বের করে এনে একটা খাড়া পাহাড় বেয়ে দু-মাইল ধরে সেই সাথীকে টেনে আর বয়ে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় আসা—অথচ এ কথা জানা নেই যে বাঘটা তার পিছনে আসছে কি না—এতে যে-পরিমাণ সাহসের দরকার তা খুব কম লোকেরই থাকে, এবং যে-কোনো লোকের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু।

যখন আমি হরিয়ার দেওয়া বিবরণ লিখে নিই—পরে তার প্রত্যেকটি কথা নরোয়া সমর্থন করেছিল—তখন তাকে সে কথা না জানালেও আমার উদ্দেশ্য ছিল যে তার এই কাজের কথা যেন লোকে জানতে পায়। সে নিজে সেটাকে কোনো প্রশংসার কাজ বলে মনে করা দূরে থাকুক, বরং আমার জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে বলল, 'সাহেব, আমার ভাইয়ের কিংবা আমার কোনো বিপদ হতে পারে আমি এমন কিছু করে ফেলেছি কি?'

কয়েকদিন বাদে, মুমূর্ষুর জবানবন্দি নিচ্ছি ভেবে নরোয়ার কথা যখন লিখে নিই, তখন সে মৃদু, যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বরে বললে, 'সাহেব, আমার ভাইয়া যেন কোনো বিপদে না পড়ে, কেননা বাঘটা যে আমাকে ধরেছিল, তাতে তার দোষ ছিল না—সে বরং আমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন দিতে বসেছিল।'

হরিয়ার এই অসমসাহসিক কাজ, আর অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যেও নরোয়ার বীরত্বপূর্ণ জীবন-যুদ্ধ সরকারের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছিল, একথা বলে কাহিনীর উপসংহার করতে পারলে সুখী হতুম। একটু প্রশংসাপত্র, কিংবা সামান্য কিছু পুরস্কার হলেও হত, কেননা দু-জনেই ছিল বড় গরিব। দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমি 'লাল-ফিতে'র সঙ্গে পেরে উঠলুম না। যেখানে নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী শপথ করে একটা ঘটনাকে সত্য বলছে না, সে ক্ষেত্রে নাকি সরকার কোনো কিছু দিতে অনিচ্ছুক।

এইভাবে, শুধু 'নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী' ছিল না বলে, মহত্তম বীরত্বের একটি কাজ অনাদৃত থেকে গেল। দুই ভাইয়ের মধ্যে হরিয়ারই ক্ষতি হল বেশি, কেননা সে যা করেছিল তার কোনো প্রমাণ তার দেখাবার ছিল না, অথচ নরোয়া তার ক্ষতচিহ্নগুলি এবং তার অনেক-ফুটোওয়ালা রক্তমাখা চাদরখানা দেখাতে পারত।

ভারত সম্রাটের কাছে এ নিয়ে একটি আবেদন করার কথা আমি অনেক দিন পর্যন্ত মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেছিলুম, কিন্তু আসন্ন এক বিশ্বযুদ্ধ এবং তার সব অনুষঙ্গগুলির কথা ভেবে আমি নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সে বাসনা ত্যাগ করলুম।



ভারতের রবিন হুড : সুলতানা

বিশাল এই ভারতবর্ষে বিপুল-বিপুল বনাঞ্চল আছে, যাতায়াতের ও যোগাযোগের সুব্যবস্থা নেই, আর অগণিত মানুষ চিরকাল খাওয়া না-খাওয়ার মাঝখানে থেকে জীবন কাটায়।

এমন দেশে যে মানুষ অপরাধ করে জীবিকা নির্বাহ করতে প্রলুব্ধ হবে, আর গভর্নমেন্টও তাদের ধরতে বেগ পাবে, এ কথা বোঝা শক্ত নয়। সব দেশেই সাধারণত যে-সব অপরাধী দেখা যায়, তাদের বাইরেও ভারতে এক-একটা গোটা জাতকেই অপরাধপ্রবণ জাত বলে চিহ্নিত করে সরকারের দেওয়া কোনো জায়গায় তাদের বসতি করিয়ে আলাদা করে রাখা হয়। তারা যে-অপরাধটিতে বিশেষজ্ঞ, সেইটি অনুসারে তাদের কম-বেশি পাহারায় রাখা হয়।

বিগত মহাযুদ্ধের কালে কিছুদিন আমি জনকল্যাণের কাজ করেছিলাম। তখন আমি এ ধরনের একটা অপরাধীদের বস্তিতে প্রায়ই যেতাম। সেখানকার লোকদের উপর বাধা-নিষেধ ততটা কড়া ছিল না। তাদের সঙ্গে আর সেখানকার ভারপ্রাপ্ত সরকারী প্রতিনিধির সঙ্গে আমার অনেক মজার মজার কথা হত।

এই জাতটার অপরাধপ্রবণতা দূর করার জন্যে সরকার থেকে তাদের মীরাট জেলায় যমুনা নদীর বাঁ পারে মস্ত একটা পলি জমি নিষ্কর দিয়ে দেওয়া হয়েএই উর্বর জমিতে প্রচুর আখ, গম, যব, সরষে ইত্যাদি ফসল ফলত।

কিন্তু অপরাধের প্রবৃত্তিটা থেকেই গেল। সরকারী কর্মচারীটি বললেন যে যত দোষ তাদের মেয়েদের। তিনি বললেন যে তারা নাকি কারিতকর্মা চোরদের ছাড়া বিয়েই করতে চায় না। এই জাতটা বিশেষ করে চুরি-ডাকাতিই করত। বস্তিতে এমন সব বুড়ো লোক ছিল, যারা লাভের বখরাদারির শর্তে ছোটদের বড়-বিদ্যায় তালিম দিত।

এখানকার লোকেরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ছুটি নিয়ে বস্তি ছেড়ে যেতে পারত, কিন্তু মেয়েদের বাইরে যেতে দেওয়া হত না। এই জাতের মোড়লরা তিনটি নিয়ম ঠিক রাখত ; প্রথমত, সব চুরি-ডাকাতি একা-একা করতে হবে ; দ্বিতীয়ত, বস্তি থেকে যত দূরে সম্ভব গিয়ে তা করা চাই, এবং তৃতীয়, তা করবার সময় খুন-জখম করা কোনো ক্ষেত্রেই চলবে না।

তালিম নেওয়া শেষ হয়ে গেলে যুবকরা সব সময় একই পথ ধরত। কলকাতা, বোম্বাই, কিংবা অন্য কোনো দূরের শহরে গিয়ে তারা কোনো বড়-লোকের বাড়িতে চাকরের কাজ নিত। তারপর সুযোগ হলেই মনিবের সোনা-দানা, গয়না, দামী পাথর ইত্যাদি যা সহজে লুকিয়ে রাখা যায় এমন জিনিস চুরি করত।

একবার এক আখের খেত থেকে আমার জন্যে কালো তিতির খেদাচ্ছিল কয়েকটা ছোকরা। আমি তাদের যখন পয়সা দিচ্ছি, তখন সরকারী কর্মচারী আমাকে জানালেন, এই যে ছোকরার হাতে এইমাত্র তার মজুরি বাবদ আট আনা আর একটা পাখি কুড়িয়ে আনার জন্যে দু-আনা দিলাম, সে এক বছর বাইরে থাকার পর এই কয়েকদিন আগে ত্রিশ হাজার টাকা দামের একখানা হীরে নিয়ে বস্তিতে ফিরেছে। ওস্তাদরা হীরেখানার দাম নির্ধারণ করবার পর সে-খানাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, এবং বস্তির সবচাইতে বেশি বাঞ্ছনীয় মেয়েটি তাকে কথা দিয়েছে যে আসছে বিয়ের মরসুমে তাকে বিয়ে করবে।

আর একটি লোক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে তিতির খেদানোয় যোগ দেয় নি। সে তার পছন্দের মেয়েটিকে চমৎকৃত করবার জন্যে নতুন একটা ফন্দি বের করেছিল। কলকাতার চুরি করা নতুন একখানা মোটরগাড়ি চালিয়ে, সাংঘাতিক একটা গরুর-গাড়ি-চলা রাস্তা ধরে সে এসে বস্তিতে হাজির হয়েছিল। এই ফন্দিকে কাজে পরিণত করবার জন্যে তাকে প্রথমে পয়সা খরচ করে গাড়ি চালানো শিখতে হয়েছিল।

যে-সব অপরাধপ্রবণ জাতকে খুব কড়াকড়িভাবে রাখা হয় না, তাদের কেউ-কেউ গিয়ে গৃহস্থের বাড়িতে রাতের পাহারাদারের কাজ নেয়। আমি এমন সব দৃষ্টান্ত জানি যেখানে এরকম মনিবের বাড়ির দোরগোড়ায় সেই পাহারাদার তার জুতোজোড়া রেখে দিলেই আর সে-বাড়িতে চুরি হবে না, এ একেবারে নিশ্চিত।

এ ব্যবস্থাটার মধ্যে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের গন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু টাকাটা কমই বলতে হবে। কারণ, ডাকাতটার যত নাম-ডাক, সে হিসেবে মাইনে হত পাঁচ টাকা থেকে তিন টাকার মধ্যে। টাকাটা অবশ্য বিনা কষ্টে রোজগার হত, কেননা শুধু রাত্তিরে তার জুতোজোড়াটা ঠিক জায়গায় রেখে দেওয়া আর সকালে তা সরিয়ে নেওয়া ছাড়া পাহারাদারটিকে আর কিছু করতে হত না।

ভান্টু জাতটা কিন্তু খুনজখম করাই বেশি পছন্দ করত। তাই উত্তরপ্রদেশে অন্য কয়েকটা জাতের মধ্যে ভান্টু জাতটাকেও কড়া বাঁধাবাঁধির ভিতর রাখা হত। সুলতানা বলে যে নামজাদা ডাকাত তিন বছর ধরে সরকারের গ্রেপ্তার করবার সব চেষ্টাকে তুচ্ছ করে দিয়েছিল, সে ছিল এই জাতের লোক। সুলতানার কথাই এই কাহিনীতে লেখা হচ্ছে।

আমি যখন প্রথম দেখি, নয়া গাঁও তখন হিমাচলের পাদ-শৈলশ্রেণী বরাবর যে ভূ-খণ্ড চলে গিয়েছে সেই তরাই আর ভাবর অঞ্চলের সবচাইতে সমৃদ্ধিশালী গ্রামের অন্যতম ছিল।

অনাহত অরণ্য থেকে জিতে নেওয়া এর প্রতি গজ উর্বর জমিতে গভীরভাবে চাষ হত, এবং ওখানকার একশোজন কি তার কিছু বেশি প্রজা বেশ সমৃদ্ধ, সন্তুষ্ট আর সুখী ছিল। কুমায়ুনের রাজা স্যার হেনরি র‍্যামজে এই কষ্টসহিষ্ণু লোকগুলিকে হিমালয় থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এক পুরুষ ধরে তারা তাদের কর্মক্ষমতা অটুট রেখে প্রচুর উন্নতি করে নিয়েছিল।

সে সময়ে ম্যালেরিয়ার নাম ছিল 'ভাবর জ্বর'। বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অবস্থায় সামান্য যে ক-জন ডাক্তারের উপর এদের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার ছিল, পাদ-শৈলাঞ্চলের এই অভিশাপের সঙ্গে যুঝবার যোগ্যতা অথবা উপকরণ তাদের কিছুই ছিল না। বনভূমির কেন্দ্রস্থলে স্থিত এই নয়া গাঁও প্রথম দিকেই এই রোগে জনহীন হতে আরম্ভ করল।

প্রজারা যেমন-যেমন মরতে থাকল, খেতের পর খেতও তেমন-তেমন অনাবাদী হয়ে যেতে লাগল। শেষে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র টিকে রইল সেই অগ্রণীদের মধ্যে। তারপর যখন আমাদের গ্রামে তাদের জমি দেওয়া হল, নয়া গাঁও তখন আবার অরণ্যে পরিণত হয়ে গেল।

পরবর্তীকালে শুধু আর একবার ওখানে চাষ করবার চেষ্টা হয়েছিল। সেবারকার দুঃসাহসিক উদ্যোক্তা ছিলেন পাঞ্জাব থেকে আসা একজন ডাক্তার। কিন্তু যখন প্রথমে তাঁর মেয়ে, তারপর তাঁর স্ত্রী, এবং সবশেষে নিজেও ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন, তখন নয়া গাঁও আবার সেই জঙ্গল হয়ে গেল।

বহু পরিশ্রমে যে-জমি পরিষ্কার করা হয়েছিল, যে-জমিতে আখ, গম, সরষে আর ধানের প্রচুর ফসল ফলত তাতে সতেজ ঘন ঘাস গজিয়ে উঠল। এই সারবান খাদ্যে আকৃষ্ট হয়ে তিন মাইল দূরে আমাদের গ্রাম থেকে গরু-

মোষেরা নয়া গাঁওয়ের পরিত্যক্ত খেতগুলোকেই তাদের নিয়মিত চারণভূমি করে নিল।

জঙ্গল-ঘেরা ফাঁকা জায়গায় দীর্ঘকাল ধরে গরু-মোষ চরলে তার টানে মাংসাশী প্রাণীরা নিশ্চয় আসবে। তাই, এক বছর নৈনিতালের গ্রীষ্মাবাস থেকে আমাদের শীতকালের আবাস কালাধুঙ্গিতে নেমে এসে যখন শুনলাম যে সেই চারণভূমির সংলগ্ন বনে আড্ডা গেড়ে একটা চিতা আমাদের গরু-মোষগুলির উপর বেজায় উৎপাত করছে, তখন আমি অবাক হই নি। ঘাস-জমিতে এমন কোনো গাছ ছিল না যাতে উঠে আমি একটা মড়িকে পাহারা দিতে পারি।

আমি ঠিক করলুম যে চিতাটাকে মারতে হবে হয় সকালবেলা, যখন সে সারাদিনের জন্যে লুকিয়ে থাকবার জন্যে ঘন জঙ্গলের মধ্যে যেতে থাকবে, নয় তো সন্ধ্যাবেলা, যখন সে মড়ির কাছে ফিরে যাবার জন্যে কিংবা নতুন একটা শিকার ধরতে বের হবে। এই ফন্দি-দুটোর যে-কোনোটাকে কাজে পরিণত করতে হলে আগে জানা দরকার যে চিতাটা চারদিক-ঘেরা জঙ্গলের কোন্ অংশে তার ডেরা নিয়েছে। তাই একদিন ভোরে রবিন আর আমি এই খবর যোগাড় করতে বেরোলুম।

বহুকাল ধরে অনাবাদী থাকা সত্ত্বেও নয়া গাঁও নামটি আজও থেকে গিয়েছে। এর উত্তর সীমানায় কান্ডি সড়ক নামে একটা রাস্তা আছে। আর, এর পূবে হচ্ছে পুরনো ট্রাঙ্ক রোড। রেল-পথের আবির্ভাবের আগে এই রাস্তাটা কুমায়ুনের ভিতরকার অংশের সঙ্গে উত্তর-প্রদেশের সমতল ক্ষেত্রের যোগাযোগ রক্ষা করত। দক্ষিণে আর পশ্চিমে নয়া গাঁও-এর সীমানায় নিবিড় অরণ্য।

আজকাল কান্ডি সড়ক আর ট্রাঙ্ক রোড দুই খুব কম ব্যবহৃত হয়। আমি ঠিক করলুম যে দক্ষিণে আর পশ্চিমে যে অসুবিধের জায়গা, সেখানে চেষ্টা করবার আগেই ঐ রাস্তাদুটো দেখব। ঐ দুটো রাস্তার সংযোগস্থলে আগেকার দিনে ডাকাতদের হাত থেকে পথিকদের বাঁচাবার জন্যে একজন পাহারাওলা থাকত।

সেখানে এসে রবিন আর আমি একটি মাদী চিতার পায়ের ছাপ দেখতে পেলুম। এই চিতাটি আমাদের দু-জনকারই খুব পরিচিত, কেননা সে আমাদের গ্রামের নিচের প্রান্তে একটা ঘন ল্যান্টানা-ঝোপে ভরা জায়গায় গত কয়েক বছর ধরেই বাস করছিল। সে কখনও আমাদের গরু-মোষের উপর উৎপাত তো করতই না, বরং তার জন্যে শুয়োর আর বাঁদরে আমাদের ফসলের ক্ষতি করতে পারত না। তাই আমরা তার পায়ের চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে ট্রাঙ্ক রোড ধরে গারুপ্পর দিকে চললুম। গত সন্ধের পর থেকে এ পথে কোনো যানবাহন চলে নি।

যে-সব প্রাণী এই পথটি ব্যবহার করেছে অথবা পার হয়ে গিয়েছে, এর ধুলোভরা বুকে তাদের পায়ের দাগ ছাপা হয়ে রয়েছে।

আমার চিরসাথী বুদ্ধিমান কুকুর রবিন আমার বাঁ হাতে রাইফেল দেখেই বুঝে নিয়েছিল যে আমরা পাখি খুঁজছি না। কাজেই যে-সব ময়ূর থেকে-থেকে ধড়ফড়িয়ে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছিল, কিংবা যে-সব বন-মুরগি পথের ধারে ঝরা পাতার স্তূপ আঁচড়ে দেখছিল, রবিন তাদের দিকে মনই দিচ্ছিল না।

আমাদের ঘণ্টাখানেক আগে একটি বাঘিনী তার আধ বয়সী দুটি বাচ্চাকে নিয়ে ঐ পথ দিয়ে গিয়েছিল---রবিন বরং তাদের থাবার ছাপ একাগ্রভাবে লক্ষ করতে লাগল। জায়গায়-জায়গায় রাস্তাটা ছোট-ছোট দূর্বা ঘাসে ছেয়ে গিয়েছিল। বাচ্চাদুটো এই শিশির-ভেজা ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিয়েছিল আর ডিগবাজি খেয়েছিল। রবিন আশ মিটিয়ে বাঘের সুমিষ্ট ও ভয়াবহ গন্ধে তার বুক ভরিয়ে নিচ্ছিল। বাঘেদের পরিবারটি পথ ধরে-ধরে মাইলখানেক গিয়ে তারপর পূর্বদিকে ঘুরে একটি পশু-চলাচল পথ ধরে চলে গিয়েছিল।

এই মোড় থেকে তিন মাইল গিয়ে, গারুপ্পুর দু-মাইল আগে, নয়া গাঁওয়ের দিক থেকে আসা একটি অতি-ব্যবহৃত পশু-চলাচল পথ বড় রাস্তাটাকে কোনাকুনিভাবে পার হয়ে গিয়েছে। আর, এই পথের উপরেই আমরা একটা মস্ত বড় পুরুষ চিতার টাটকা থাবার ছাপ দেখতে পেলুম। যা খুঁজছিলুম তা পেয়ে গেলুম। এই চিতাটা সেই চারণভূমি থেকে এসে রাস্তা পার হয়েছিল। এ একটা পূর্ণবর্ধিত গাভীকেও মারতে সক্ষম, এবং এই আকারের দু-দুটো চিতা একই এলাকায় থাকা সম্ভব নয়।

রবিনের খুব ইচ্ছে যে এই দাগগুলি অনুসরণ করে। কিন্তু নিবিড় ঝাড়-জঙ্গলের দিকে যে চিতাটা গিয়েছিল, তার মত দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তিসম্পন্ন জীবের অনুসরণ করে তাতে ঢোকা যুক্তিযুক্ত নয়। এটাই সেই জঙ্গল যেখানে কুঁয়ার সিং আর হর সিং কয়েক বছর আগে প্রাণটি খোয়াতে বসেছিল। তা ছাড়া, চিতাটার সঙ্গে যোগাযোগ করবার একটা ভাল আর সহজ ফন্দিও এঁটেছিলুম। তাই আমরা ফিরে চললুম, বাড়ি গিয়ে সকালের খাওয়াটা খাব।

দুপুরের খাওয়ার পর রবিন আর আমি ম্যাগিকে সঙ্গে নিয়ে আবার গারুপ্পুর দিকে চললুম। আগের দিন চিতাটা আমাদের কোনো গরু-টরু মারে নি, কিন্তু হয়তো ঐ চারণভূমিতে গরুদের সঙ্গে চরছিল এমন কোনো চিতল হরিণ বা শুয়োরকে মেরে থাকবে। যদি সে কিছু মেরে নাও থাকে, তাহলেও আজও তার নিত্যকার শিকারের জায়গাতে যাবার সম্ভাবনা বেশ ভালরকমই আছে। কাজেই ম্যাগি আর আমি, আর আমাদের মাঝখানে শোয়া অবস্থায় রবিন,—চিতাটা সেই সকালবেলা যে পশু-চলাচলের পথটি ধরে চলে

গিয়েছিল তা থেকে শ-খানেক গজ দূরে, রাস্তার ধারে একটা ঝোপের পিছনে জায়গা নিলুম।

সেই অবস্থায় ঘন্টাখানেক থেকে, হরেকরকম পাখির ডাক শুনতে-শুনতে হঠাৎ দেখি যে একটা পুরো পেখমধারী ময়ূর খুব ঠাটের সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে সেই পশুদের পথটা দিয়ে নেমে গেল। একটু বাদেই দশ-বারোটা চিতল, যে ঘন জঙ্গলে চিতাটা শুয়ে আছে বলে আমরা আশা করেছিলুম সেই দিক থেকেই ডেকে বনের প্রাণীদের একটা চিতার উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিল। মিনিট দশেক বাদে, আমাদের আরও একটু কাছে একটিমাত্র চিতল আবার সতর্কতা জানাল আওয়াজ করে। চিতাটা রওনা হয়েছে। সে আমাদের দিকেই আসছে। সে নিজেকে গোপন করবার চেষ্টা করছে না, বোধহয় একটা মড়ির দিকে চলেছে।

রবিন তার প্রসারিত থাবাদুটির উপর তার চিবুকটি রেখে নিশ্চল হয়ে শুয়ে-শুয়ে আমাদের মত কান পেতে শুনছিল বনের প্রাণীরা কী বলছে। যখন সে দেখল যে আমি পা গুটিয়ে নিয়ে হাঁটুর উপর রাইফেলটা রাখলুম, আমার বাঁ-পায়ের সঙ্গে ঠেকানো তার শরীরটা থর-থর করে কাঁপতে লাগল।

জঙ্গলের যে পশুকে সে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, সেই চাকা-চাকা-দাগওয়ালা খুনীটা এখনই ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর থেকে তার মাথাটা বের করবে। তারপর সেটা রাস্তার এদিক আর ওদিক দেখে নিয়ে আমাদের দিকে আসতে থাকবে। সে তার থাবার ছাপের উপরেই মরে পড়ুক, কিংবা মারাত্মক আঘাত পেয়ে গর্জন করে উলটে-পালটেই পড়তে থাকুক, রবিন একেবারে স্থির ও নীরব হয়ে থাকবে। কেননা সে এমন একটি খেলায় অংশ গ্রহণ করছে যার প্রতিটি চাল তার সুপরিচিত। তার পক্ষে সে-খেলা যেমন মনভোলানো তেমনই ভয়ঙ্কর।

পশু-চলাচলের পথটা ধরে খানিকটা গিয়ে ময়ূরটা একটা কুলগাছে উঠে খুব ব্যস্তভাবে পাকা কুল খাচ্ছিল। হঠাৎ সে একটা কর্কশ কেকা-রব করে আকাশে লাফিয়ে উঠে একটা মরা গাছের ডালের উপর গিয়ে নেমে পড়ে চিতলটার সঙ্গে তার সতর্কবাণীও যোগ করে দিল। আর কয়েকটা মিনিট, খুব বেশি হলে পাঁচটা মিনিট, কেননা চিতাটা রাস্তায় আসতে হলে খুবই সন্তর্পণে আসবে। তারপর আমার চোখের এক কোণ দিয়ে দেখলুম—অনেক দূরে পথের উপর একটা কিছু আসছে।

একটা লোক ছুটে আসছে, আর থেকে-থেকে গতিবেগ শিথিল না করেই কাঁধের উপর দিয়ে পিছনদিকে তাকাচ্ছে। সূর্য তখন ডুবু-ডুবু। এমন সময়ে সন্ধের এই আলো-আঁধারে এই রাস্তার উপর মানুষ দেখতে পাওয়া, বিশেষ করে তাকে একা দেখতে পাওয়াটা আরও বেশি অস্বাভাবিক। লোকটির প্রতিটি

পদক্ষেপের সঙ্গে আমাদের চিতাটাকে মারতে পারার সম্ভাবনা কমে আস' যাই হ'ক, আর উপায় নেই, কেননা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল যে লোকটি ভয়া বিপন্ন, এবং হয়তো তার সাহায্যেরও প্রয়োজন।

সে বেশ খানিকটা দূরে থাকতেই আমি তাকে চিনতে পারলুম—সে আমাদের পাশের এক গ্রামেরই প্রজা, শীতের ক-টা মাস সে কাটায় গারুপ্পুর তিন মাইল পূবে একটি গোশালায় রাখালের কাজ করে। আমাদের দেখতে পেয়ে ছুটন্ত লোকটি ভয়ানক হকচকিয়ে গেল, কিন্তু যখন সে আমাকে চিনতে পারল, আমাদের দিকে এসে বেজায় বিচলিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—'পালাও, সাহেব, প্রাণ বাঁচাতে চাও তো পালাও! সুলতানের লোকেরা আমাকে তাড়া করছে!'

তার দম ফুরিয়ে গিয়েছিল, কষ্টও হচ্ছিল সাংঘাতিক। আমি তাকে বসে জিরোতে বললাম। সে তা খেয়াল না করেই তার পা-খানাকে ঘুরিয়ে বললে, 'দেখুন, ওরা কী করেছে আমার! একবার ধরতে পারলে আমাকে নিশ্চয় মেরে ফেলবে ওরা! না পালালে আপনারাও মরবেন!' যে পা-টা সে ঘুরিয়ে আমাদের দেখাল, তার হাঁটুর পিছন থেকে গোড়ালি পর্যন্ত কুপিয়ে কাটা, আর সেই বীভৎস ক্ষত থেকে ধুলোর সঙ্গে চাপ-বাঁধা রক্ত বেয়ে পড়ছে।

তাকে বললাম যে সে বিশ্রাম না করে তো না করুক, কিন্তু তার আর দৌড়বার দরকার নেই। এই বলে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে যেখান থেকে রাস্তাটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যায় এমন জায়গায় দাঁড়ালুম, লোকটিও খোঁড়াতে-খোঁড়াতে তার গ্রামের দিকে চলে গেল।

চিতা কিংবা সুলতানার লোকেরা কেউই দেখা দিল না। তারপর যখন আর নিখুঁতভাবে গুলি চালাবার মত আলো রইল না, তখন ম্যাগি আর আমি কালাধুঙ্গিতে আমাদের বাড়িতে ফিরে এলাম। রবিন আমাদের পিছন-পিছন এল, যেন হতাশার প্রতিমূর্তিটি।

পরদিন সকালবেলা লোকটির কাহিনী শোনা গেল। গারুপ্পু আর সেই গোশালাটির মাঝামাঝি এক জায়গায় সে মোষ চরাচ্ছিল, এমন সময় একটা বন্দুকের আওয়াজ তার কানে এল। সেইদিনই ভোরবেলা তার গাঁয়ের মোড়লের ভাইপো চুরি করে একটা চিতল হরিণ মারবার জন্যে গোশালায় এসেছিল। তাই সে একটি গাছের ছায়ায় বসে ভাবতে লাগল যে, তার গুলি সার্থক হল কি না, আর, যদিই সার্থক হয়ে থাকে, তাহলে খানিকটা হরিণের মাংস তার খাবার জন্যে গোশালায় সন্ধেবেলা অবধি থাকবে কি না।

হঠাৎ পিছনে খস-খস শব্দ শুনে সে ফিরে চেয়ে দেখে কি, পাঁচজন লোক তার ঘাড়ের উপর এসে দাঁড়িয়েছে। তারা তাকে উঠে দাঁড়াতে বলে হুকুম করল যেখানে বন্দুক ছোঁড়া হয়েছে সেইখানে তাদের নিয়ে যেতে হবে। সে বলল,

যে সে ঘুমিয়ে থাকায় বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায় নি। তখন তাকে হুকুম করা হল তাদের পথ দেখিয়ে গোশালায় নিয়ে যেতে। তারা মনে করেছিল যে বন্দুকওয়ালা লোকটি সেখানেই ফিরে আসবে।

দলের কারও হাতে বন্দুক ছিল না, শুধু যাকে তাদের সর্দার বলে মনে হল সেই লোকটির হাতে একটি খোলা তরোয়াল ছিল। সে বললে যে, রাখালটি যদি পালাবার কিংবা চেঁচিয়ে অন্য লোকদের সাবধান করে দেবার চেষ্টা করে, তাহলে তার মাথাই কেটে ফেলবে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তলোয়ারধারী লোকটা রাখালটাকে বলল যে তারা সুলতানার দলের লোক, আর সুলতানা কাছেই আড্ডা গেড়েছে।

গুলির আওয়াজ শুনে সুলতানা বন্দুকটা নিয়ে যাবার জন্যে তাদের পাঠিয়েছে। এখন যদি গোশালাতে গিয়ে তারা কোনো বাধা পায় তাহলে তারা সেটা পুড়িয়ে দেবে আর এই পথপ্রদর্শককে মেরে ফেলবে। এই শাসানিতে আমাদের বন্ধুবর উভয় সংকটে পড়ে গেল। গোশালায় তার সঙ্গীরা একটি দুর্ধর্ষ দল, তারা বাধা দেবেই : এবং দিলে এ বেচারা মারা পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। ওদিকে, যদি তারা প্রতিরোধ না-ও করে, তাহলেও ভয়ঙ্কর সুলতানার দলকে গোশালায় নিয়ে গিয়ে সে যে অপরাধ করবে, তা কেউ কখনও ভুলবে না কিংবা ক্ষমা করবে না।

তার মাথায় যখন এই সব দুর্ভাবনা খেলছিল, হঠাৎ একপাল বনকুত্তার তাড়া খেয়ে একটা চিতল ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে তাদের কয়েক গজ দূর দিয়ে চলে গেল। তার সঙ্গের লোকটি থেমে গিয়ে এই তাড়া-দেওয়া দেখছে, এটা লক্ষ করে রাখালটি পথের ধারের লম্বা ঘাসের ঝোপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তলোয়ারধারী তাকে কেটে ফেলবার চেষ্টা করায় সে ভীষণ চোট খেল বটে, কিন্তু সে তার অনুসরণকারীদের হাত ছাড়িয়ে কোনোমতে ট্রাঙ্ক রোডটাতে এসে পৌঁছল, তারপর চিতার জন্যে অপেক্ষমান আমাদের মধ্যে যথাসময়ে এসে পড়ল।

সুলতানা ছিল অপরাধপ্রবণ ভান্টু উপজাতির লোক। গোটা একটা জাতকে 'অপরাধপ্রবণ' শ্রেণীভুক্ত করা এবং তাদের সবসুদ্ধ নাজিবাবাদ কোর্টে আটক করে রাখাটা ঠিক না ভুল, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব না। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সুলতানা তার যুবতী স্ত্রী, শিশু পুত্র এবং আরও কয়েকশো ভান্টুসহ ঐ কেল্লাতে স্যালভেশন আর্মির জিম্মায় আটক ছিল। এই বন্দী-দশা অসহ্য হওয়ায়, যে-কোনো তেজস্বী যুবকের মতই সেও এক রাত্রে কেল্লার মাটির দেওয়াল টপকে পালিয়ে গেল।

এটা হল আমার এই কাহিনীর বছর-খানেক আগের ঘটনা। আর, এই এক বছরে সহধর্মী শ-খানেক সশস্ত্র লোককে তার সঙ্গে জুটিয়ে নিয়েছিল

সুলতানা। ডাকাতি করাই এই জাঁদরেল দলটির উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল। তরাই আর ভাবরের জঙ্গলে-জঙ্গলে যাযাবরের জীবন যাপন করত এরা। এদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল পূর্বে গোন্ডা থেকে পশ্চিমে সাহারানপুর পর্যন্ত কয়েকশো মাইল জায়গা জুড়ে। সংলগ্ন-প্রদেশ পাঞ্জাবেও তারা মধ্যে-মধ্যে হানা দিত। সুলতানা আর তার দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সরকারী দপ্তরে অনেক মোটা-মোটা ফাইল আছে। সেগুলোকে আমার নাগালের মধ্যে পাই নি। কিন্তু যেসব ঘটনায় আমি অংশগ্রহণ করেছি, কিংবা যেসব ঘটনা আমার নিজের জানা, আমার কাহিনী সেগুলোকেই নিয়ে। সরকারী নথির সঙ্গে এ কাহিনীর যদি কোথাও তফাত বা বিরোধ থাকে, তাহলে, শুধু দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমার কিছু করার নেই। কিন্তু সেইসঙ্গে এও বলব যে সে-ক্ষেত্রেও আমার কাহিনীর একটি কথাও আমি ফিরিয়ে নেব না।

আমি যখন প্রথম সুলতানার কথা শুনি, সে তখন আমাদের শীতকালের আবাস কালাধুঙ্গি থেকে কয়েক মাইল দূরে গারুপ্পুর জঙ্গলে আস্তা গেড়েছিল। সে সময়ে পার্সি উইন্ডহ্যাম ছিলেন কুমায়ুনের কমিশনার। তরাই এবং ভাবর অঞ্চলের যেসব বনে সুলতানা তখন আস্তানা করেছিল সেগুলি উইন্ডহ্যামের এলাকাভুক্ত বলে তিনি কাজের জন্যে সরকারের কাছ থেকে ফ্রেডি ইয়ং-কে চাইলেন।

ফ্রেডি ছিল এক উৎসাহী তরুণ পুলিস অফিসার। সে উত্তরপ্রদেশ সরকারের অধীনে কয়েক বছর কৃতিত্ব সহকারে কাজ করেছিল। সরকার থেকে উইন্ডহ্যামের অনুরোধ মঞ্জুর করা হল। তিনশোজন বাছাই-করা লোক নিয়ে একটি 'বিশেষ ডাকাইতি পুলিস বাহিনী' সৃষ্টির প্রস্তাবও সরকার থেকে অনুমোদিত হল। ফ্রেডিকে এই বাহিনীর চরম কর্তৃত্ব, এবং তার লোক নিযুক্ত করবার ব্যাপারে তাকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হল।

আশপাশের সব জেলাগুলি থেকে সেরা-সেরা লোকগুলিকে নিয়ে তার বাহিনী গঠন করতে গিয়ে সে অনেককে চটিয়ে দিল। কেননা, সুলতানাকে ধরতে পারাটা ছিল অনেকেরই সাধনার বস্তু। সুলতানাকে ধরবার কাজে সাহায্য করতে পারে এমন সব লোককে সরিয়ে নিলে তাদের উপরওয়ালাদের তাতে ঘোরতর আপত্তি হবার কথা।

ফ্রেডি যখন তার বাহিনী সংগ্রহ করছিল, সুলতানা ততক্ষণ তরাই আর ভাবরের ছোট-ছোট শহরে হানা দিয়ে হাত পাকাচ্ছিল। সুলতানাকে ধরবার জন্যে ফ্রেডি প্রথম প্রচেষ্টা চালায় রামনগরের পশ্চিম দিকের জঙ্গলে। বন-বিভাগ থেকে ওখানকার জঙ্গলের এক অংশ কাটানো হচ্ছিল, তাতে বহু মজুর খাটছিল।

মজুরদের উপরওয়ালা ঠিকাদারদের মধ্যে একজনকে বলে কয়ে রাজী

করানো হল যে সে একটি নাস্তা আর ভোজের আয়োজন করে তাতে সুলতানাকে দলবল-সহ নিমন্ত্রণ করবে। জানা গিয়েছিল যে সুলতানা কাছাকাছি কোথাও আছে। সে আর তার আমুদে সঙ্গীরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। কিন্তু উৎসব আরম্ভ হবার ঠিক আগে তারা তাদের নিমন্ত্রণকর্তাকে উৎসব-সূচী একটুখানি বদলে দিতে রাজী করাল। সুলতানা বলল যে খালি-পেটের চাইতে ভরা-পেটেই নাচ দেখতে তাদের বেশি ভাল লাগবে, তাই খাওয়াটাই আগে হ'ক।

আমার কাহিনীটিকে এখানে একটু বন্ধ রেখে, যাঁরা কখনও পূবদেশে আসেন নি তাঁদের বুঝিয়ে বলবার জন্যে বলে দেওয়া উচিত যে, এদেশের নাচের আসরে অভ্যাগতরা নিজেরা অংশ গ্রহণ করেন না। নাচের ব্যাপারটা শুধু একদল নর্তকী আর তাদের সঙ্গের পুরুষ বাজনাদারদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।

উভয় পক্ষেরই অর্থবল যথেষ্ট। পাশ্চাত্য দেশে যেমন, পূবদেশেও তেমনি খবর কিনতে হলে টাকা জিনিসটা সমানই কাজে লাগে। তাই এই খেলার দুই প্রতিযোগীর প্রথম চালই হল সুদক্ষ গুপ্তচর বাহিনী সংগঠন করা।

এ ব্যাপারে সুলতানার সুবিধেই ছিল বেশি। কেননা, ফ্রেডি শুধু কাজের বিনিময়েই টাকা দিতে পারত, অথচ সুলতানা তা তো পারতই—তার উপর সে যারা খবর না দিত, কিংবা তার খবর পুলিসকে দিত, তাদের শাস্তি দিতেও পারত। কেউ দোষ করলে সে তাকে নিয়ে কী করে এ কথা যখন সকলে জেনে গেল, তখন কেউই সাধ করে তার বিরাগভাজন হতে চাইত না।

গরিব—সত্যিকার গরিব হওয়াটা যে কি, নাজিবাবাদ ফোর্টে সুদীর্ঘ কাল আবদ্ধ থাকার সময়ে সেটা উপলব্ধি করবার ফলে গরিবদের জন্যে সুলতানার খুব দরদ ছিল। লোকে বলে যে ডাকাতি-জীবনে সুলতানা কখনও কোনো গরিবের একটি পয়সাও কেড়ে নেয় নি, কেউ ভিক্ষা চাইলে 'না' বলেনি, এবং ছোট-ছোট দোকানদারদের থেকে জিনিস কিনে তার জন্যে দ্বিগুণ দাম দিয়েছে। এর ফলে, তার গুপ্তচরের সংখ্যা যে শত-শত হবে এবং সেই নাচ আর ভোজের উৎসবে তার নিমন্ত্রণ যে ফ্রেডিরই প্ররোচনার ফল, একথা যে সে জানতে পারবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি?

ইতিমধ্যে সেই মহারাত্রির জন্যে আয়োজন হতে লাগল। ঠিকাদারটির বড়লোক বলে খ্যাতি ছিল। সে রামনগরে আর কাশীপুরে তার বন্ধুদের আমন্ত্রণ পাঠাল। ভাল-ভাল নাচওয়ালী আর সংগতের দল ঠিক করা হল। প্রচুর খাদ্য আর পানীয়—শেষেরটি বিশেষ করে ডাকাতের জন্যে—কিনে গরুর গাড়িতে করে ঠিকাদারের ক্যাম্পে নিয়ে আসা হল।

যে রাত্রিতে সুলতানাকে ঘায়েল করা হবে সেই রাত্রিতে যথাসময়ে ঠিকাদারের অতিথিরা এল, ভোজও শুরু হল। সম্ভবত তার বন্ধুরা জানত না তাদের সহ-অতিথিরা কারা। কেননা, এ-সব উপলক্ষে এক-এক জাতের লোক

এক-এক দল করে আলাদা বসে, এবং দু-চারটে লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকার প্রায় কিছুই দূর হয় না।

সুলতানা আর তার লোকেরা বেশ ভাল করে, অথচ মাথা ঠিক রেখে খেল। তারপর ভোজ শেষ হবার আগেই ডাকাত-সর্দার তার নিমন্ত্রণ-কর্তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে তার আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে বলল যে, এখন তাদের অনেক দূরে যেতে হবে বলে নাচ দেখবার জন্যে আর থাকা হবে না। তারা সেজন্যে দুঃখিত। কিন্তু চলে যাবার আগে সে অনুরোধ করে গেল যে উৎসব যেমন চলবার কথা তেমনি যেন চলে। সুলতানার অনুরোধ কখনও উপেক্ষিত হত না।

নাচের আসরে প্রধান বাজনাই হচ্ছে ঢোল। তা বেজে উঠলেই ফ্রেডি যেখানে ছিল সে জায়গাটা ছেড়ে ঐ ক্যাম্পটা ঘিরে ফেলবার জন্যে তার বাহিনী পরিচালনা করতে শুরু করবে, এই ছিল ব্যবস্থা।

এই বাহিনীর এক অংশের নেতা ছিল এক বন-রক্ষী। রাতটা ছিল অন্ধকার, তাই সে পথ হারিয়ে ফেলল। এই দলটারই কাজ ছিল সুলতানার পালাবার পথটা আটকানো। কিন্তু তারাই সারারাতের মত হারিয়ে গেল। বন-রক্ষীটিকে বনে সুলতানার কাছাকাছিই থাকতে হত, আর তার একটু বুদ্ধি-বিবেচনাও ছিল। তবু তার কষ্ট করে পথ হারিয়ে ফেলবার কোনো দরকার ছিল না। কারণ, খাওয়াটাকে আগে করিয়ে নিয়ে, সংকেত হবার অনেক আগেই সরে পড়বার ব্যবস্থা করেছিল সুলতানা। সুতরাং আক্রমণকারীর দল গভীর বনের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ ও সুকঠিন পথ অতিক্রম করে ক্যাম্পে এসে শুধু একদল ভীত নাচওয়ালী, আর তাদের চেয়েও ভীত বাজনাদারের দল এবং ঠিকাদারের বিস্মিত বন্ধুদের দেখতে পেল।

রামনগরের বন থেকে পালাবার পর সুলতানা গিয়ে পঞ্জাবে দেখা দিল। সেখানে আশ্রয় নেবার যোগ্য বনের অভাব বলে সে যেন ধাতস্থ বোধ করছিল না। তাই সে অল্পদিন মাত্র সেখানে থেকে, লাখ-খানেক টাকার সোনার গহনা সংগ্রহ করে উত্তরপ্রদেশের গহন অরণ্যে ফিরে এল। পঞ্জাব থেকে ফেরবার পথে তাকে গঙ্গার খাল পার হতে হল।

খালটার উপর চার মাইল অন্তর-অন্তর পুল ছিল। তার গতিবিধ জানা গিয়েছিল বলে যে-সব পুলের উপর দিয়ে তার পার হবার সম্ভাবনা, সেগুলোতে প্রচুর লোকের পাহারা বসানো হল। এগুলোকে এড়িয়ে যাতে পাহারা নেই বলে খবর এনেছিল তার গুপ্তচরেরা সুলতানা এমন একটা পুলের দিকে চলল। পথে সে একটা বড় গ্রামের কাছে গিয়ে পড়ল। সেখানে বাজনাদাররা দেশী বাজনা বাজাচ্ছিল। তার পথপ্রদর্শকদের কাছে সে জানতে পেল যে এক বড়-লোকের ছেলের বিয়ে হচ্ছে। সে তাদের হুকুম করল তাকে ওই গ্রামে নিয়ে যেতে

হবে।

গ্রামটির মাঝখান বিস্তীর্ণ একটি ফাঁকা জায়গায় বিয়ের দলবল এবং হাজার-খানেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সমবেত হয়েছিল। জোরাল বাতির আলোর মধ্যে সুলতানা এসে পড়তেই একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কিন্তু সে সকলকে বসে থাকতে অনুরোধ করে বলল যে, তার কথা মেনে চললে কারও ভয় পাবার কিছু নেই।

তারপর সে গ্রামের মোড়লকে আর বরের বাপকে ডাকিয়ে এনে বলল যে এই রকম উপলক্ষে উপহার দেওয়া আর নেওয়া বড়ই প্রশস্ত। তাই সে নিজের জন্যে শুধু মোড়লমশায়ের নতুন কেনা বন্দুকটা, আর তার সঙ্গীদের জন্যে দশটি হাজার টাকা উপহার প্রার্থনা করছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্দুক এবং টাকাটা এনে দেওয়া হল। তখন সুলতানা বিদায় নিয়ে সদলে গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেল। ভোর না হওয়া পর্যন্ত সে টের পায় নি যে তার প্রধান সহকারী প্যায়লোয়ান বিয়ের কনেটিকে চুরি করে নিয়ে এসেছে। দলের কেউ কোনো স্ত্রীলোকের উপর উৎপাত করে, সুলতানা সেটা পছন্দ করত না।

প্যায়লোয়ানকে বেজায় ধমক-ধামক করে সে মেয়েটিকে ফেরত পাঠিয়ে দিল, এবং তাকে এরকম অসুবিধেয় ফেলা হয়েছে বলে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উপযুক্ত উপহারও তার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হল।

রাখালের পায়ে কোপ মারবার ঘটনাটার পর সুলতানা কিছুকাল আমাদের কাছে-পিঠে রইল। সে ঘন-ঘন তার আস্তানা বদল করত। আমি শিকারে বেরিয়ে তার পুরনো কয়েকটা থাকার জায়গা দেখতে পেয়েছি।

এই সময় আমার একটা বেজায় উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা হল। একদিন সন্ধেবেলা আমি বাড়ি থেকে মাইল-পাঁচেক দূরে খাসা একটি চিতা মেরে-ছিলুম। তখন লোকজন যোগাড় করে ওটাকে নিয়ে আসবার সময় ছিল না বলে আমি সেখানেই সেটার ছাল ছাড়িয়ে ছালটা নিয়ে বাড়ি চলে এলুম। কিন্তু পৌঁছে দেখি যে আমার প্রিয় শিকারের ছুরিখানা ফেলে এসেছি।

পরদিন ভোর হতেই ছুরিখানা উদ্ধার করবার জন্যে আমি বেরিয়ে পড়লুম। যেখানে সেটাকে ফেলে এসেছিলুম, তার কাছাকাছি আসতেই পথ থেকে খানিকটা দূরে বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গাতে আগুনের ঝিকিমিকি দেখতে পেলুম। কয়েকদিন ধরেই খবর আসছিল যে সুলতানা এই জঙ্গলেই আছে। তাই ঝোঁকের মাথায় ঠিক করে ফেললুম যে ব্যাপারটা একটু দেখতে হবে। ঝরা পাতার উপর প্রচুর শিশির থাকায় নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল। যেটুকু আড়াল পাওয়া গেল তারই পিছন থেকে আমি আগুন লক্ষ করে চললুম। আগুনটা একটা ছোট কুণ্ডের মধ্যে জ্বলছে, আর কুড়ি থেকে পঁচিশ জন লোক সেটাকে ঘিরে বসে আছে। কাছেই একটা গাছের গায়ে খাড়াভাবে

গাদাগাদি করে রাখা আছে কতকগুলো বন্দুক, তাদের নলগুলিতে আগুনের আভা ঠিকরোচ্ছে।

সুলতানা সেখানে ছিল না। আমি তাকে দেখি নি বটে, কিন্তু বর্ণনা শুনেছি যে সে অল্পবয়সী, ছোটখাট, ফিটফাট মানুষ, আর সে নাকি সবসময় আধাসামরিক খাঁকী পোশাক পরে থাকত। যাই হ'ক, এই লোকগুলো নিশ্চয়ই তার দলেরই লোক। কিন্তু এদের নিয়ে আমি এখন করি কি? কালাধুঙ্গিতে যে বুড়ো হেড কনস্টেবল আর তারই সমবয়সী দু-জন কনস্টেবল আছে, তাদের দিয়ে কিছু হবে না। হলদোয়ানিতে একগাদা পুলিস আছে বটে, কিন্তু তা তো পনের মাইল দূরে।

আমার পরের চালটা কি হবে ভাবছি, এমন সময় একটি লোককে বলতে শুনলুম যে যাবার সময় হয়েছে। এখন পিছু হটতে গেলে ওরা আমাকে দেখে ফেলবে এবং তাহলে বিপদ হতে পারে, এই আশঙ্কায় আমি তাড়াতাড়ি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে লোকগুলি আর তাদের বন্দুকগুলির মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ালুম। তা করতেই গোল হয়ে বসা লোকগুলি বিস্মিত চোখ তুলে আমার দিকে চাইল, কেননা আমি একটু উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলুম। তারা এখানে কি করছে সেকথা জিগ্যেস করায় তারা এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল।

তারপর যার বিস্মিত ভাবটা আগে কেটে গেল সে উত্তর দিল, 'কিছুই না।' আরও প্রশ্ন করা হলে তার জবাবে তারা আমাকে বলল যে তারা কাঠ পুড়িয়ে কয়লা বানায়, এসেছে বেরিলি থেকে। উপস্থিত, পথ হারিয়ে এখানে বসে আছে। তখন আমি ফিরে গাছটার দিকে চেয়ে দেখি কি, যা দেখে বন্দুকের নল বলে ভেবেছিলুম সেগুলো হচ্ছে পাঁজা-করা কুড়ুল। সেগুলোর বাঁট দীর্ঘকাল অনবরত ব্যবহারের ফলে পালিশ হয়ে গিয়ে আগুনের আলোয় চকচক করছিল।

আমার পা-দুটো ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, এই বলে আমি তাদের দলে গিয়ে যোগ দিলুম। আমার সিগারেট সকলে মিলে খেল, অনেকরকম গল্পগুজব হল, তারপর আমি তাদের কাঠকয়লাওয়ালাদের আড্ডায় যাবার পথটা বুঝিয়ে দিলুম। তারা সেটাই খুঁজছিল। তখন আমি আমার ছুরিখানা উদ্ধার করে বাড়ি ফিরে এলুম।

একটানা উত্তেজিত হয়ে থাকা অবস্থায় মানুষের কল্পনা উদ্ভট-উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি করে। বাঘে-মারা একটা সম্বরের কাছে মাটিতে বসে থাকতে থাকতে আমি শুনেই চলেছি যে বাঘটা আসছেই আর আসছেই, অথচ কাছে এসে পড়ছে না। তারপর উদ্বেগ যখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তখন আমি বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল রেখে ফিরে দেখি যে আমার মাথার কাছে একটা

শংয়োপোকা একটা মচমচে পাতা থেকে ছোট্ট-ছোট্ট কুচি কেটে-কেটে ফেলছে।

আবার, যখন আলো ক্ষীণ হয়ে আসছিল আর বাঘটার মড়ির কাছে ফিরে আসবার সময় হয়ে এসেছিল, তখন আমি চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলুম যে মস্ত একটা জানোয়ার এসে পড়েছে। কিন্তু যেই আমি বন্দুকটি চেপে ধরে গুলি চালাবার জন্যে তৈরি হয়েছি, অমনি আমার মুখের থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে একটা শুকনো ফেঁকড়িতে একটা পিঁপড়ে গুড়ি মেরে বেরিয়ে এল।

সুলতানার কথা যখন আমার মনকে ছেয়ে ছিল, তখন পালিশ-করা কুড়ুলের বাঁটে আগুনের আলোর ঝকমকিতে সেগুলো বন্দুকের নল বলে মনে হয়েছিল। আর, যতক্ষণ না লোকগুলো আমাকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিল যে তারা কয়লাওয়ালাই, ততক্ষণ আমি আর সেগুলোর দিকে তাকাইও নি।

সুদক্ষ সংগঠন-ব্যবস্থা এবং যানবাহনের উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত থাকার ফলে ফ্রেডি সুলতানার উপর চাপ দিতে শুরু করেছিল। তা এড়াবার জন্যে ডাকাত-সর্দার তার দলবল নিয়ে জেলার পূর্বপ্রান্তে পিলীভিতে চলে গেল। দলত্যাগ আর গ্রেপ্তারের ফলে দলটি অনেক ছোট হয়ে এসেছিল।

ওখানে কয়েক মাস থেকে তারা দূর গোরখপুর পর্যন্ত হানা দিয়ে সোনার ভাণ্ডার বাড়িয়ে তুলতে লাগল। তারপর আমাদের অঞ্চলের জঙ্গলে ফিরে এসে সে খবর পেল যে রামপুরের এক অত্যন্ত ধনবতী নর্তকী এসে আমাদের গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরের লামাচৌর গ্রামের মোড়ল বাড়িতে বাস করছে। আক্রমণের আশঙ্কায় মোড়ল তার বিশজন প্রজাকে পাহারায় নিযুক্ত করেছিল, কিন্তু তারা সশস্ত্র ছিল না। সুলতানা যখন এসে পড়ল, তখন তার বাড়িটা ঘিরে ফেলবার আগেই নর্তকীটি তার সমস্ত গয়নাপত্র নিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে গেল।

ওদিকে ডাকাতেরা মোড়লকে আর তার প্রজাদের তাড়িয়ে উঠোনে নিয়ে এল। কিন্তু যখন তারা বললে যে নাচওয়ালীর খবর কিছু জানে না, তখন তাদের স্মৃতিশক্তিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে তাদের বেঁধে মার লাগাবার হুকুম হল। একজন প্রজা এই হুকুমের প্রতিবাদ করল। সে বললে যে সুলতানা তাকে আর অন্য প্রজাদের নিয়ে যা চায় তা-ই করতে পারে, কিন্তু মোড়লকে বেঁধে মেরে তার মান-ইজ্জত নষ্ট করবার অধিকার তার নেই। তাকে চুপ করতে বলা হল! কিন্তু যেই একটা ডাকাত একগাছা দড়ি নিয়ে মোড়লের দিকে এগিয়েছে, অমনি এই অসমসাহসী লোকটি একটি একচালা থেকে একগাছা বাঁশ টেনে নিয়ে ডাকাতটার দিকে ধেয়ে গেল।

দলের একজন তার বুকে এক গুলি করল। এই গুলির শব্দ শুনে পাছে আশপাশের গ্রামের সশস্ত্র লোকরা জেগে ওঠে এই ভয়ে সুলতানা তাড়াতাড়ি

পালিয়ে গেল। যাবার সময় নিয়ে গেল শুধু মোড়লের সম্প্রতি-কেনা একটা ঘোড়া।

পরদিন সকালবেলা এই সাহসী প্রজাটির হত্যার খবর আমার কানে এল। মৃত ব্যক্তির পরিবারে কে কে আছে, তার খোঁজ নেবার জন্যে আমি আমার একজন লোককে লামাচৌরে পাঠালুম এবং তার পরিবারের সাহায্যের জন্যে কিছু টাকা তুলতে আশপাশের গ্রামের মোড়লরা রাজী আছে কি না, তা জিগ্যেস করে একখানা খোলা চিঠি দিয়ে মোড়লদের কাছে আর একজন লোককে পাঠিয়ে দিলুম।

যেমনটি আশা করেছিলুম, এতে সবাই মন খুলে সাড়া দিয়েছিল, কারণ গরিবেরা সব সময়েই উদার-হৃদয়। কিন্তু টাকাটা আর তুলতে হয় নি, কেননা যে লোকটি তার মনিবের জন্যে প্রাণ দিল, সে কুড়ি বছর আগে নেপাল থেকে এসেছিল। সেখানে অনেক খবর নিলুম, তার বন্ধুদের জিগ্যেস করা হল, কিন্তু তার স্ত্রী বা ছেলেপুলে ছিল কি না তা জানা গেল না।

এই ঘটনার পরেই আমি সুলতানাকে ধরবার কাজে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে ফ্রেডির কাছ থেকে এক আহ্বান পেলুম। তার মাসখানেক বাদে আমি হরিদ্বারে তার সদর আপিসে এসে তার সঙ্গে যোগ দিলুম। আঠার বছর ধরে মির্জাপুরের কালেকটর থাকার কালে উইন্ডহ্যাম বাঘ-শিকারের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে মির্জাপুরের জঙ্গলের বাসিন্দা জাতগুলির মধ্যে থেকে দশজন কোল আর দশজন ভুঁইয়াকে নিযুক্ত করেছিলেন। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চার জনকে—তারা সবাই আমার পুরনো বন্ধু—উইন্ডহ্যাম এখন ফ্রেডির কাজের জন্যে ছেড়ে দিলেন। হরিদ্বার পৌঁছে দেখি যে তারা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ফ্রেডির মতলব ছিল এই, যে ঐ চারজন বন্ধু আর আমি প্রথমে সুলতানাকে খুঁজে বের করব। সেটা করা হলে তার পুলিস-বাহিনী নিয়ে এমন একটা জায়গায় যাব যেখান থেকে আক্রমণ চালাবার সুবিধে হয়। আগে যে সব কারণের উল্লেখ করেছি, সে-সব কারণে এই দুই কাজই রাত্রিতে করতে হবে। কিন্তু সুলতানাও অস্থির হয়ে উঠেছিল। হয়তো শুধুই তার মনের চাঞ্চল্য তার কারণ, অথবা সে ফ্রেডির ফন্দির কথা টের পেয়েও থাকতে পারে। তা যাই হ'ক, সে এক দিনের বেশি কোনো এক জায়গাতে থাকত না, আর প্রতি রাত্রিতে দলবল নিয়ে বহু দূরে-দূরে সরে যেত।

তখন সাংঘাতিক গরম পড়েছিল। শেষে বেকার হয়ে বসে থেকে-থেকে বিরক্ত হয়ে আমরা পাঁচজনে এক আলোচনা করলাম।

সেইদিন রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন ফ্রেডি বারান্দার এমন এক শীতল অংশে বেশ আরাম ক'রে বসেছে যেখান থেকে আমাদের কথা অন্য কারও কানে

যাবার সম্ভাবনা নেই, সেখানে আমি এই প্রস্তাবটি পেশ করলুম : ফ্রেডি প্রচার করে দেবে যে বাঘ শিকারের জন্যে উইন্ডহ্যাম তাঁর লোক চারজনকে ডেকে পাঠিয়েছেন আর আমাকেও নিমন্ত্রণ করেছেন। তারপর সে আমাদের জন্যে হলদোয়ানির টিকিট কাটিয়ে নিজে হরিদ্বার স্টেশনে গিয়ে আমাদের রাত্রির গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে। কিন্তু ট্রেনটা যেই তার পরের স্টেশনে থামবে অমনি ফ্রেডির দেওয়া বন্দুক নিয়ে ওই চারজন, আর আমার রাইফেল নিয়ে আমি ট্রেন থেকে নেমে পড়ব। তারপর, যেমন সুবিধে হবে সেই অনুসারে জীবিত বা মৃত অবস্থায় সুলতানাকে নিয়ে আসবার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে আমাদের।

আমার প্রস্তাবটা শুনে ফ্রেডি অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইল। তার বপু-খানার ওজন ছিল পাক্কা সাড়ে তিন মণ, আর রাত্রের খাওয়ার পর একটু ঝিমুবার অভ্যেস ছিল তার। কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়ে নি, কেননা সে হঠাৎ খাড়া হয়ে বসে খুব দৃঢ়স্বরে বললে, 'না। আমি তোমাদের জীবনের জন্যে দায়ী। এই পাগলের পরিকল্পনা আমি সমর্থন করব না।' তার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা হল। কাজেই পরদিন সকালবেলা আমরা পাঁচজন যে-যার বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলুম।

প্রস্তাবটা করা আমার ভুল হয়েছিল, আর ফ্রেডি সেটা নাকচ করে দিয়ে ঠিকই করেছিল। আমাদের পাঁচজনের তো কোনো সরকারী পদ ছিল না; তাই, যদি সুলতানাকে ধরতে গিয়ে কোনো ঝঞ্ঝাট বাধত, তাহলে কৈফিয়ত দেওয়া যেত না। অবশ্য তা-ছাড়া আর কোনো মুশকিল ছিল না, কেন না, সুলতানার কিংবা আমাদের কারও প্রাণ যাবার আশংকা ছিল না। কথাই ছিল যে জ্যান্ত ধরতে না পারলে সুলতানাকে আমরা ধরবই না। আর এদিকে আমরাও নিজেদের রক্ষা করতে বেশ সমর্থ ছিলুম।

তিন মাস বাদে, যখন বর্ষা পুরোদমে চলছে, ফ্রেডি বন-বিভাগের হার্বার্টকে, তরাই আর ভাবর অঞ্চলের সুপারিণ্টেণ্ডেট ফ্রেড অ্যান্ডারসনকে, এবং আমাকে হরিদ্বারে ডেকে পাঠাল। পেঁছে শুনলুম, যে ফ্রেডি নাজিবাবাদের জঙ্গলের মধ্যে সুলতানার স্থায়ী ঘাঁটিটির হদিস পেয়েছে। সেই ঘাঁটি ঘেরাও করতে, এবং সুলতানা যদি সেই ব্যূহ থেকে ফসকে বেরিয়ে আসে তাহলে তার পালাবার পথ বন্ধ করবার জন্যে সে আমাদের সাহায্য চাইল।

সুলতানার পালাবার পথ আটকাবার জন্যে পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর নেতৃত্ব দেওয়া হল বিখ্যাত পোলো খেলোয়াড় হার্বার্টকে, এবং ফ্রেডিকে চক্র-ব্যূহ রচনায় সাহায্য করবার জন্যে ফ্রেডির সঙ্গে রইলাম অ্যান্ডরসন আর আমি।

এতদিনে সুলতানার গুপ্তচর-বিভাগের দক্ষতা সম্বন্ধে ফ্রেডির মনে আর কোনো ভুল ধারণা ছিল না। ফ্রেডির দুজন সহকারী এবং আমরা তিনজন

ছাড়া আর কেউ এই পরিকল্পিত আক্রমণের কথা জানত না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় পুলিস-বাহিনী পুরোপুরি সশস্ত্র অবস্থায় লম্বা এক মার্চ করতে বেরোত, আর আমরা চারজনও একই রকম দীর্ঘ পথ হেঁটে, রাত হয়ে গেলে বাঁধের উপর যে বাংলোতে আমরা ছিলুম সেখানে ফিরে আসতুম।

নির্দিষ্ট রাত্রিতে কুচকাওয়াজের দলটা রোজকার মত লেভেল ক্রসিং-এর উপর দিয়ে মার্চ করে না গিয়ে হরিদ্বার স্টেশনের গুড্‌স-ইয়ার্ডের ভিতর দিয়ে একটা সাইডিংএ চলে গেল।

সেখানে ইঞ্জিন আর ব্রেক ভ্যান-সহ একসারি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, ওয়াগনগুলোর সব দরজা স্টেশন-বাড়ির বিপরীত দিকে খোলা ছিল। আমরা যখন এলুম তখন শেষ দরজাটি বন্ধ করা হচ্ছে, আর আমরা গার্ডের কামরায় উঠতেই কোনও সতর্কতা-সূচক হুইস্‌ল্‌ না বাজিয়েই গাড়ি ছেড়ে দিল।

সন্দেহ দূর করবার জন্যে সবকিছুই করা হয়েছিল—এমনকি সিপাইদের ব্যারিকে তাদের খাবার রান্না হচ্ছিল, আর ওদিকে আমাদের খানার টেবিলও সাজানো হয়েছিল।

অন্ধকার হবার একঘণ্টা পরে আমরা রওনা হয়েছিলুম। রাত ন-টার সময় দুটো স্টেশনের মাঝখানে গভীর জঙ্গলের মধ্যে গাড়িটা থেমে গেল, এবং ওয়াগন থেকে ওয়াগনে হুকুম চলে গেল যে এখানেই সকলকে নামতে হবে। এই হুকুম তামিল হতেই ট্রেন চলে গেল।

ফ্রেডির বাহিনীর ৩০০ জনের ৫০ জনকে নিয়েছিল হার্বার্ট। সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনীতে থেকে ফ্রান্সে যুদ্ধ করেছিল। তারা রওনা হয়েছিল আগেকার রাত্রিতেই।

যেখানে তাদের ঘোড়াগুলি ছিল, অনেকটা পথ ঘুরে সেখানে যাবার কথা বলে দেওয়া হয়েছিল তাদের। এদিকে ২৫০ জনের আসল দলটা ফ্রেডি ও অ্যান্ডারসনকে সামনে এবং আমাকে পিছনে নিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে চলল। সেটা শুনলুম ২০ মাইল দূরে।

ঘন মেঘ সারাদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, আর যখন আমরা ট্রেন থেকে নামলুম তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। আমাদের যাবার ছিল উত্তরে এক মাইল, তারপর পূবে দু-মাইল, আবার উত্তরে এক মাইল, তারপর পশ্চিমে দু-মাইল, শেষে আবার সোজা উত্তরে।

জানতুম যে এ-ভাবে দিক পরিবর্তন করা হচ্ছে যাতে সুলতানার মাইনে-করা লোক যেখানে-যেখানে আছে এমন সব গ্রামকে এড়িয়ে চলা যায়। এইভাবে বাহিনী-সঞ্চালন যে অত্যন্ত সুকৌশলে সম্পাদিত হল তার প্রমাণ এই যে কোনো গ্রামের একটা নেড়িকুত্তাও আমাদের দেখতে পেয়ে ডাকে নি, অথচ এদের মত ভাল পাহারাদার কুকুর দুনিয়ায় আর নেই।

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে, অঝোর বৃষ্টির মধ্যে আমি ২৫০ জন লোকের পেছনে-পেছনে চললাম। তাদের ভারি শরীর নরম ভিজে মাটিতে গর্ত করে যেতে লাগল, আর আমি প্রতি দ্বিতীয় পদক্ষেপে তার মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে গিয়ে টলমল করে চলতে লাগলুম। মাইলের পর মাইল ধরে আমরা আমার মাথার চাইতে উঁচু হোগলার বনের ভিতর দিয়ে চললুম। হোগলার শক্ত ক্ষুরধার পাতার হাত থেকে আমার চোখদুটিকে বাঁচাবার জন্যে এক হাত তুলে চলতে হচ্ছিল, তাই ঐ পিছল আর খানাখন্দ-ভরা জমিতে টাল ঠিক রেখে চলা আরও শক্ত হল।

আমি ফ্রেডির সাড়ে তিনমণী দেহের কর্ম-তৎপরতা দেখে প্রায়ই চমৎকৃত হতুম বটে, কিন্তু সেই রাত্রে যেমন আশ্চর্য হয়েছিলুম তেমন কোনো দিন হই নি। এ কথা ঠিক যে সে একটু শক্ত জমিতে হাঁটছিল, আর আমি হাঁটছিলুম পাঁকের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে তাকে আমার চাইতে দেড় মণেরও বেশি দেহভার বইতে হচ্ছিল। তবু একবারও না থেমে আমাদের লোকের লাইনটা চলতেই লাগল।

আমরা রাত ন-টায় রওনা হয়েছিলুম। রাত দুটোর সময় আমি লাইন বরাবর ফ্রেডির কাছে জিগ্যেস করে পাঠালুম যে আমরা ঠিক দিকে যাচ্ছি কি না। এ-খবরটার জন্যে এই কারণে লোক পাঠাতে হল যে প্রথমে আমরা উত্তর দিকে চলেছিলুম বটে, কিন্তু ঘন্টাখানেক হল তা ছেড়ে দিয়ে আমরা পুব-মুখে চলছিলুম। অনেকক্ষণ বাদে খবর ফিরে এল যে কাপ্তেন সাহেব বলেছেন যে সব ঠিক আছে।

আবার ঘন্টা-দুই বাদে, বড় গাছের আর ঝোপ-ঝাড়ের আর কোথাও বা উঁচু ঘাসের জঙ্গল ঠেলে আমি খবর পাঠিয়ে ফ্রেডিকে জানালুম যে আমি একটা কথা বলতে তার কাছে আসছি, সে যেন সকলকে থামতে বলে। রওনা হবার আগেই সকলকে নিঃশব্দ থাকতে বলে দেওয়া হয়েছিল। সামনের দিকে যেতে আমি অত্যন্ত নীরব এবং ক্লান্ত এক লাইন্ লোকের পাশ দিয়ে গেলুম। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ ভিজে মাটিতে বসে পড়েছিল, কেউ-কেউ গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

এই সারির আগায় এসে ফ্রেডি, অ্যান্ডারসন আর তাদের চারজন পথ-প্রদর্শককে দেখতে পেলুম। ফ্রেডি জিগ্যেস করল কিছু গোলমাল হয়েছে কি না—তার মানে, কেউ দলছাড়া হয়ে পড়েছে না কি। আমি বললুম যে লোকজন ঠিকই আছে, কিন্তু আর সবই গন্ডগোল হয়ে গিয়েছে—আমরা চক্রাকারে ঘুরে মরছি।

আমার জীবনের বেশির ভাগ আমি বনে-জঙ্গলে কাটিয়েছি, এবং সে-সব জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া অতি সহজ। তাই আমার দিক সম্বন্ধে এমন একটা

ধারণা জন্মে গিয়েছে যা দিনে আর রাত্রিতে সমান কাজ দেয়। প্রথম রওনা হবার সময় যে দিক-পরিবর্তন করা হয়েছিল সেটাও যেমন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, দু-ঘন্টা আগে উত্তর থেকে পূব-দিকে ঘোরবার সময়ও সে কথাটা তেমনি স্পষ্ট বুঝেছিলুম। তাছাড়া, ঘন্টাখানেক আগে লক্ষ করেছিলুম যে আমরা একটা শিমুল গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছি যাতে একটা শকুনির বাসা রয়েছে, আর যখন আমি ফ্রেডিকে থামতে অনুরোধ করে খবর পাঠাই, তখন আমি আবার সেই গাছেরই তলায় এসেছি।

পথপ্রদর্শকদের চারজনের মধ্যে দু-জন ছিল ভান্টু জাতের লোক, সুলতানার দলের ডাকাত। তারা সম্প্রতি হরিদ্বারের বাজারে গ্রেপ্তার হয়েছিল। এদের দেওয়া খবরের উপরেই এই অভিযানের ব্যবস্থা হয়েছিল। এরা বছর-দুই ধরে মধ্যে-মধ্যে সুলতানার ঘাঁটিতে বাস করেছিল। এই রাত্রির কাজের পুরস্কার হিসেবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে বলে কথা দেওয়া হয়েছিল। আর দু-জন হল গোয়ালা। তারা সারা জীবন এই জঙ্গলে তাদের গরু চরিয়েছে, আর প্রতিদিন সুলতানাকে দুধের যোগান দিয়ে এসেছে। চারজনই পথ হারানোর কথা জোর করে অস্বীকার করল। কিন্তু ভাল করে চেপে ধরবার পর আমতা-আমতা করে শেষে স্বীকার করল যে পাহাড়টা দেখতে পেলে তাদের বুঝতে সুবিধে হত এই বাহিনীকে তারা কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এই অন্ধকার রাত্রে যখন ঘন কুয়াশা গাছগুলোর মাথা পর্যন্ত নেমে এসেছে, তখন যে পাহাড় সম্ভবত ত্রিশ মাইল দূরে রয়েছে, তা দেখতে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কাজেই এখন এমন একটা ব্যাঘাত এসে পড়ল যা ফ্রেডির এত সুন্দর-ভাবে সাজানো পরিকল্পনাটা তো মাটি করে দেবেই, তাছাড়া—যেটা আরও দুঃখের কথা—সুলতানার কাছে আমাদের উপহাসের পাত্র করে তুলবে।

ঘাঁটিটাতে আচমকা হানা দেওয়াই আমাদের ফন্দি ছিল, আর তা করতে হলে অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমাদের এত কাছে গিয়ে পড়া দরকার সেখান থেকে আমরা সেটাকে আঘাত হানতে পারি। পথপ্রদর্শকরা বলেছিল যে দিনের আলোয় ঘাঁটির কাছাকাছি যাওয়া এই দিক থেকে সম্ভব নয়, কেননা ঘাঁটির দক্ষিণে একটা বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রের সবটা দেখা যায় এমন একটা উঁচু গাছে মাচানের উপর দু-জন সান্ত্রী দিনরাত পাহারায় থাকে।

আমাদের গাইডরা খোলাখুলি-ভাবে স্বীকার করছে যে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে, এদিকে অন্ধকার আছে আর মোটে ঘন্টাখানেক। তাছাড়া সবচেয়ে মুশকিল এই যে আমরা বুঝতেও পারছি না যে ঘাঁটিটা কত দূরে এবং কোন্ দিকে—এ অবস্থায় প্রতিটি মিনিট কেটে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের আচমকা আক্রমণ করতে পারার সম্ভাবনা ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

তখন এই সংকট থেকে বেরোবার একটা উপায় আমার মাথায় এল। আমি

লোক চারজনকে জিগ্যেস করলুম যে আমরা যে-মুখো হয়ে প্রথমে রওনা হয়েছিলুম সে-মুখো এমন কোনো নদী বা সুস্পষ্ট গো-পথ আছে কি না যা দেখে তারা দিক ঠিক করে নিতে পারে। তাতে তারা বলল যে ঘাঁটিটার দক্ষিণে মাইলখানেক দূর দিয়ে একটা পুরনো কিন্তু স্পষ্ট গাড়ি চলার পথ আছে। ফ্রেডির কাছ থেকে যাবার সময় অনুমতি নিয়ে আমি দ্রুতবেগে এমন এক-দিকে চললুম যাতে আমার সঙ্গীরা সকলেই নিশ্চয় মনে করেছিল যে, সাত ঘন্টা আগে যে রেল-লাইন ছেড়ে এসেছিলুম এখন আমরা তারই দিকে ফিরে চলেছি।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, জোরাল হাওয়ায় আকাশ থেকে মেঘ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল এবং সবে পূর্বদিক ফরসা হয়ে আসছিল। এমন সময় আমি গভীর একটা চাকার দাগ হঠাৎ পেয়ে গেলুম। এই তো সেই গাইডদের বলা অব্যবহৃত গাড়ির পথ! এটা দেখে তারা খুব আনন্দিত হল। আমি আগেই সিদ্ধান্ত করেছিলুম যে তারা ইচ্ছে করে জঙ্গলে পথ হারায় নি—এতে সেটা সমর্থিত হল। তারা আবার অগ্রণী হয়ে ওই পথ ধরে আমাদের মাইলখানেক নিয়ে গেল।

এখানে একটা পশু-চলাচলের পথ একে পার হয়ে চলে গিয়েছে। এই পথে আধমাইলটাক এগিয়ে গিয়ে আমরা এসে পড়লুম ফুট ত্রিশেক চওড়া, গভীর এবং ধীরস্রোতা একটি জলপ্রবাহের ধারে। পথটা নদী পার হয়ে যায় নি দেখে খুশি হলুম, কেননা তরাইয়ের এ-সব নদীকে আমার বড় ভয়—এদের তীরে এবং জলের গভীরে আমি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ময়াল সাপদের লুকিয়ে থাকতে দেখেছি। পথটা নদীটার ডান পাড় ধরে কাঁধ-সমান উঁচু ঘাসের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে।

এই পথ ধরে কয়েকশো গজ এগিয়ে গিয়ে পথপ্রদর্শকরা গতিবেগ কমিয়ে দিল। তারা যেভাবে বাঁ দিকে তাকাতে লাগল তাতে বুঝলুম যে আমরা মাচানটাকে দেখতে পাওয়ার মত জায়গায় এসে পড়েছি। তখন দিনের ভরা আলো দেখা দিয়েছে, রোদ এসে গাছের মাথাগুলি ছুঁয়েছে। শিগগিরই সকলের আগেকার লোকটা গুড়ি মেরে বসে পড়ল। অন্য তিনজনও তাই করবার পর সে আমাদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল।

লাইন-বাঁধা লোকদের থেমে বসে পড়তে ইশারা করে ফ্রেডি অ্যান্ডারসন আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে প্রথম গাইডটির কাছে গেলুম। তার পাশে শুয়ে পড়ে, সে যেদিকে দেখাচ্ছিল সেদিকে ঘাসের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আমরা একটা মস্ত বড় গাছের উপরকার ডালগুলির মধ্যে, মাটি থেকে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উঁচুতে তৈরি একটি মাচান দেখতে পেলুম।

সরাসরি তার ওপর সূর্যের আলো পড়েছে। তাতে মাচানের উপর দুটি লোককে দেখলুম। একজন তার ডান-কাঁধটা আমাদের দিকে ফিরিয়ে হুঁকো টানছে, অন্যজন হাঁটু গুটিয়ে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে। মাচানের গাছটা, একটা

বড়-বড় গাছ এবং ঘাসে ভরা বনের একেবারে প্রান্তে, এবং তা থেকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা দেখা যায়।

গাইডরা বলল যে সুলতানার আস্তানা ওই বনের শ-তিনেক গজ ভিতরে।

আমরা যেখানে মাটিতে পড়ে ছিলুম, তারই কয়েক ফুট দূরে প্রায় কুড়ি গজ চওড়া একফালি ছোট ঘাস-ভরা জমি আমাদের ডানদিকের নদী থেকে আরম্ভ হয়ে দূরে ফাঁকা জায়গাটা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হল যে খানিকটা পিছনে হটে গিয়ে নদী পার হয়ে এগিয়ে সুলতানার ডেরার বিপরীত জায়গায় নদীটা আবার পার হওয়াই কর্তব্য, কিন্তু গাইডরা বলল যে সেটা সম্ভব হবে না। কারণ নদীটা এত গভীর যে হেঁটে পার হওয়া যাবে না, এবং অপর-পারে চোরাবালি আছে।

বাকি রইল শুধু সমস্ত দলবল নিয়ে সান্ত্রী দু-জনের অলক্ষে ছোট ঘাসে ভরা ফালি জমিটা পার হবার অনিশ্চিত সম্ভাবনা। অথচ তারা যে-কেউ যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের দিকে তাকাতে পারে।

ফ্রেডির ছিল একটা মিলিটারি রিভলবার, অ্যান্ডারসন ছিলেন নিরস্ত্র। সমস্ত দলটার মধ্যে একা আমারই হাতে ছিল একটি রাইফেল। পুলিসদের হাতে ছিল ছিটে গুলি মারবার ১২-বোরের সাধারণ বন্দুক, যার কার্যকরী-পাল্লা হল ষাট থেকে আশি গজ।

কাজেই দলের মধ্যে একমাত্র আমার পক্ষেই আমাদের তখনকার অবস্থান থেকে ঐ দু-জন সান্ত্রীকে কায়দা করা সম্ভব ছিল। গুলি ছুঁড়লে তার শব্দ অবশ্য সুলতানার ঘাঁটিতে শোনা যাবে, কিন্তু আমাদের সঙ্গের ভান্টু দু-জনের মত হল এই যে, সান্ত্রীরা খবর নিয়ে ঘাঁটিতে না গেলে তাদের খোঁজ-খবর করতে ঘাঁটি থেকে লোক পাঠানো হবে। তারা মনে করছিল যে ততক্ষণে আমাদের পক্ষে ঘাঁটিটা ঘিরে ফেলা সম্ভব হবে।

মাচানের উপরকার লোকদুটো ছিল দস্যু, তার উপর খুব সম্ভবত খুনীও। আমিও আমার হাতের রাইফেলটি দিয়ে একজনের হাত থেকে হুঁকোটি আর অন্যজনের জুতো থেকে গোড়ালিটি খসিয়ে দিতে পারতুম, তাতে তাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগত না। এ সবই ঠিক।

কিন্তু বিনা উত্তেজনায়—অথবা উত্তেজনার যে-কোনো অবস্থাতেই—মানুষকে গুলি করে মারা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই আমি এই বিকল্প প্রস্তাবটি করলুম: ফ্রেডি আমাকে অনুমতি দিক, আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে লোক দু-জনের কাছে চলে যাই। যাওয়া খুব সহজ হবে, কারণ বড় গাছের আর লম্বা ঘাসের জঙ্গলটা একেবারে মাচানের গাছটা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, আর সারারাত বৃষ্টি হওয়াতে ভিজে সপসপে হয়ে ছিল। আমি গিয়ে লোকদুটোর সঙ্গে মাচানে থাকব, ততক্ষণে ফ্রেডি তার লোক-জন নিয়ে তার কাজ সারবে।

ফ্রেডি প্রথমে আপত্তি তুলেছিল, কেননা মাচানের লোকদুটোর নাগালের মধ্যেই দুটো বন্দুক ছিল। কিন্তু শেষটায় সে মত দিতেই আমি আর কালবিলম্ব না করে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে চলতে লাগলুম। ভান্টু দু-জন বলেছিল যে সান্ত্রী বদলের সময় হয়ে এসেছে।

গাছটা পর্যন্ত যতটা পথ, তার এক-তৃতীয়াংশ যেতেই পিছনে একটা শব্দ শুনে ফিরে দেখি যে অ্যান্ডারসন তাড়াতাড়ি করে আমার পিছনে আসছেন। তাঁতে আর ফ্রেডিতে কী কথা হয়েছিল, জানি না। দু-জনেই আমার পরম বন্ধু ছিলেন।

সে যাই হ'ক, অ্যান্ডারসন আমার সঙ্গে যাবার জন্যে দৃঢ়সঙ্কল্প। তিনি স্বীকার করলেন যে তিনি বনের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে চলতে পারেন না, মাচানের লোকরা খুব সম্ভবত তাঁর শব্দ শুনতে আর তাঁকে দেখতে পাবে, এবং নিরস্ত্র বলে তাঁর পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু তবুও এবং তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে একা যেতে দেবেনই না।

ক্লাইড নদীর ও-পারের মানুষ যখন গোঁ ধরে বসে তখন সে কোনো খচ্চরের চাইতেও একগুঁয়ে হয়। হতাশ হয়ে আমি ফ্রেডির সাহায্য চাইবার জন্যে ফিরে চললুম। কিন্তু ইতিমধ্যেই ভাববার সময় পেয়ে ফ্রেডি আমাকে অনুমতি দেবার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে উঠেছিল (পরে শুনেছি যে ভান্টুরা তাকে বলেছিল যে মাচানের লোক দু-জনেরই হাতের তাক খুব ভাল)। আমাদের ফিরতে দেখে সে তার বাহিনীকে অগ্রসর হতে আদেশ দিল।

পঞ্চাশ জন কি তারও বেশি লোক খোলা জায়গায় ফালিটা পার হয়েছে, আর আমরা যারা এগিয়ে আছি তারা ঘাঁটির দু-শো গজের মধ্যে এসে পড়েছি, এমন সময় অতি-উৎসাহী একটি ছোকরা কনস্টেবল মাচানটাকে দেখতে পেয়ে বন্দুক ছুঁড়ে বসল। বিদ্যুৎ-চমকের মত লোকদুটো মাচান থেকে নেমে এসে গাছের গোড়ায় বাঁধা ঘোড়ায় চেপে আস্তানার দিকে ছুট লাগাল।

চুপচাপ থাকবার প্রয়োজন রইল না আর। এমন গলায় ফ্রেডি আক্রমণের আদেশ দিল যা মাইকের সাহায্যে বাড়াবার দরকার হয় না। একটুও না ফাঁক রেখে সারি বেঁধে আমরা ঝড়ের মত গিয়ে ঘাঁটির উপর পড়লুম। দেখি, সব ফাঁকা।

ঘাঁটিটা ছিল একটা ঘাসে-ঢাকা ঢিপির উপর। তাতে ছিল তিনটি তাঁবু, আর ঘাস দিয়ে তৈরি একটি রান্নাঘর। তাঁবুগুলির একটি ছিল ভাঁড়ারঘর। তাতে আটা, চাল, ডাল আর চিনির বস্তা, ঘিয়ের টিন, টোটার বাক্সের দুটো স্তূপ (যাতে হয়তো কয়েক হাজার ১২-বোর টোটা ছিল), আর খাপে-ভরা এগারোটা বন্দুক বোঝাই ছিল। অন্য দুটো তাঁবুতে শোবার জায়গা, তাতে কম্বল আর পরনের নানা জিনিস ছড়ানো ছিল। রান্নাঘরের কাছে একটা গাছের

ডালে তিনটে ছাল-ছাড়ানো পাঁঠা ঝুলছিল।

সান্ত্রী দু-জন হঠাৎ আস্তানায় ফিরে আসায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। তার ফলে ডাকাতরা অনেকে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় পালিয়ে গিয়েছিল। ঘাঁটির চারদিকে যে লম্বা-লম্বা ঘাস ছিল তার মধ্যে কিছুসংখ্যক ডাকাতের লুকিয়ে থাকা সম্ভব, এই মনে করে আমাদের লোকদের লম্বা একটা লাইন করে দাঁড়াতে বলা হল। উদ্দেশ্য এই যে, যেদিকে হার্বার্ট তার অশ্বারোহী পুলিসদের নিয়ে পাহারায় রয়েছে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বন ঠেঙিয়ে সেইদিকে যাওয়া হবে।

লাইনটা যতক্ষণ সাজানো হচ্ছিল, ততক্ষণ আমি ঢিপিটা ঘুরে দেখলুম। ঘাঁটির কাছে একটা নালায় দশ বারজন লোকের খালি পায়ের ছাপ দেখে আমি ফ্রেডির কাছে প্রস্তাব করলুম যে সেগুলো অনুসরণ করে দেখে এলে হয় সেগুলো কোথায় গিয়েছে। নালাটা পনের ফুট চওড়া আর পাঁচ ফুট গভীর। ফ্রেডি, অ্যান্ডারসন আর আমি সেটা ধরে শ-দুই গজ গিয়ে খানিকটা নুড়ি-ভরা জায়গা পেলুম, সেখানে পায়ের ছাপ আর দেখা গেল না।

নুড়ি যেখানে শেষ হয়েছে তার ও-ধারে নালাটা ছড়িয়ে গিয়েছে, আর তার বাঁ পাড়ে, আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলুম তার কাছেই, বহুকাণ্ডবিশিষ্ট একটি বিশাল বটগাছ রয়েছে। এর কাণ্ডগুলো একটা বন সৃষ্টি করেছিল, শাখা-প্রশাখাগুলো প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুঁকে পড়েছিল।

আমার মনে হল যে লুকিয়ে থাকবার পক্ষে এই গাছটা বড় সুবিধের জায়গা। তাই, কিনারার দিকে গিয়ে আমি উপরে উঠবার চেষ্টা করতে লাগলুম। পাড় এখানে আমার চিবুক সমান। হাতে ধরবার মত সেখানে কিছু ছিল না। যতবার লাথি মেরে দেওয়ালে পা রাখবার জায়গা করলুম, ততবারই সেটা ধসে যেতে লাগল। তারপর আমি সবে ভাবছি যে এগিয়ে গিয়ে যেখানে নালাটা ছড়িয়ে গিয়েছে সে পাড়ে উঠব, এমন সময় গুলিবৃষ্টির আর সেইসঙ্গে চিৎকারের শব্দ হল ঘাঁটির ওখানে।

যে পথে এসেছিলুম, ছুটে সেই পথে ফিরে গিয়ে ঘাঁটির কাছে এসে দেখি যে একজন হাবিলদারের বুকে গুলি বিঁধেছে এবং তারই কাছে একফালি লেংটি পরনে একটা ডাকাত দু-পায়ে গুলি লেগে পড়ে আছে।

হাবিলদারটি একটি গাছে পিঠ দিয়ে বসে ছিল। তার শার্টের বুকটা খোলা, বুকের বাঁ-দিকে একটুখানি রক্ত দেখা যাচ্ছে।

ফ্রেডি একটা ফ্লাস্ক বের করে সেটা হাবিলদারের মুখে ঠেকাল, কিন্তু লোকটি মাথা নেড়ে সেটাকে সরিয়ে দিলে : বললে, 'এ তো মদ। এ তো আমি খেতে পারি না!' পেড়াপীড়ি করায় সে বললে, 'জীবনভোর আমি মদ খাই নি, এখন সৃষ্টিকর্তার কাছে যাবার সময় মুখে মদের গন্ধ নিয়ে যেতে পারব না। আমার তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল চাই।' তার ভাই কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

একজন টুপি খুলে তাকে দিল, সেটা নিয়ে সে ছুটে সেই নদীতে চলে গেল যেটা আমাদের চলাচলের বাধা সৃষ্টি করেছিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই খানিকটা নোংরা জল নিয়ে সে ফিরে আসতেই আহত ব্যক্তি তা আগ্রহের সঙ্গে পান করল। তার ক্ষতটা হয়েছিল ছিটে গুলিতে। তার চামড়ার নিচে হাতড়ে সেটাকে না পেয়ে আমি বললুম, 'হাবিলদার সাহেব! মনটাকে চাঙা রাখুন, নাজিবাবাদের ডাক্তারবাবু আপনাকে সারিয়ে তুলবেন।' সে হাসিমুখটি তুলে আমাকে বলল, 'সাহেব, আমি মনকে চাঙা রাখব কিন্তু কোনো ডাক্তার আমাকে সারিয়ে তুলতে পারবে না।'

ডাকাতটার কিন্তু মদ খাওয়ায় কোনো বাধা ছিল না। সে কয়েক ঢোকেই ফ্লাস্কটাকে শেষ করে ফেলল। ওটা তার খুব প্রয়োজন ছিল, কেননা তাকে খুব কাছে থেকে একটা ১২-বোর বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়েছিল।

সুলতানার আস্তানা থেকে জিনিস-পত্র নিয়ে দুটো স্ট্রেচার বানানো হল। সকলে স্বেচ্ছায় সে দুটোকে তুলে নিল—উঁচু জাতের হাবিলদার আর নীচ-জাতীয় ডাকাতদের মধ্যে কোনো প্রভেদ করা হল না। অতিরিক্ত কয়েকজন লোক-সহ কয়েকজন বাহক স্ট্রেচার-দুটো নিয়ে বনের মধ্য দিয়ে ছুটল বার মাইল দূরের নাজিবাবাদ হাসপাতালের দিকে। রক্তক্ষয় এবং অভিঘাতের ফলে ডাকাতটা মারা গেল, আর হাবিলদার মরল হাসপাতালে ভর্তি হবার কয়েক মিনিট পরই।

বন হাঁকানো আর হল না। হার্বার্টকে কিছু করতে হয় নি, কেননা অশ্বারোহীদের সমাবেশের কথা সুলতানা জানতে পেরে গিয়েছিল, তাই কোনো ডাকাত হার্বার্টের পাহারা-দেওয়া জায়গা পার হবার চেষ্টা করে নি। কাজেই আমাদের সযত্ন-পরিকল্পিত আক্রমণ কারও দোষ না থাকলেও পণ্ড হয়ে গেল।

লাভের মধ্যে শুধু কয়েকটা বন্দুক বাদে সুলতানার সম্পূর্ণ আস্তানাটা, আর দু-জন মানুষের মৃত্যু। একজন ছিল একটি গরিব লোক যে বন্দী থেকে-থেকে বিক্ষুব্ধ হয়ে স্বাধীনতা পেতে চেয়েছিল, এবং তার পক্ষে জীবিকার্জনের যে একমাত্র উপায় খোলা ছিল সেইটিই সে অবলম্বন করেছিল।

নাজিবাবাদের দুর্গে একটি বিধবা হয়তো তার জন্যে চোখের জল ফেলবে। অপর লোকটি ছিল উপরওয়ালাদের শ্রদ্ধা এবং আপন লোকদের ভালবাসার পাত্র। তার বিধবার যত্ন নেওয়া হবে। সে একটা নীতির জন্যে বীরের মত প্রাণ দিয়েছে, কারণ যে-মদ স্পর্শ করে সে তার ঠোঁটকে কলুষিত করতে চায় নি, সেই মদ খেলে সে নিশ্চয় অপারেশন টেবিলে ওঠা পর্যন্ত বেঁচে থাকত।

এই অভিযানের তিনদিন বাদে ফ্রেডি ডাকাত সর্দারের কাছ থেকে এক চিঠি পেল। তাকে সুলতানা লিখেছে যে পুলিস বাহিনীর গুলি-বারুদের

অভাব হওয়াতেই বোধহয় তার ঘাঁটিতে হানা দেবার দরকার হয়েছিল, এ বড় দুঃখের কথা। যাই হ'ক, ভবিষ্যতে ফ্রেডি যদি এরকম কোনো প্রয়োজনের কথা তাকে জানায়, তাহলে সুলতানা সানন্দে তাকে গুলি-বারুদ সরবরাহ করবে।

সুলতানার বন্দুক আর গুলি-গোলা পাওয়াটা ফ্রেডির পক্ষে একটা মাথার ঘায়ের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ-বিষয়ে খুব কড়া হুকুম প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু যে-অঞ্চল সুলতানার কর্মক্ষেত্র, সেখানকার প্রত্যেক লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকানদার আর বন্দুকের মালিকই যে সরকারের বিরাগভাজন হবার ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ছিল, সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা সুলতানার দাবি না মেনে নিলে তার বাড়িতে নিশ্চয় ডাকাত পড়বে এবং সম্ভবত তার গলাটিও কাটা যাবে। কাজেই অস্ত্র আর গোলাগুলি দিতে চাওয়াটা সুলতানার পক্ষে মিথ্যে জাঁক মাত্র নয়। ডাকাত-দলের সর্দারটি পুলিস-বাহিনীর অধিনায়ককে এর চাইতে বেশী আঘাত আর কী হানবে!

সুলতানার গোপন আড্ডাটি গিয়েছে, তরাই আর ভাবরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাকে নাকাল করে তোলা হয়েছে, তার দল কমে চল্লিশ জনে দাঁড়িয়েছে। সকলেই অবশ্য সম্পূর্ণ সশস্ত্র, কেননা তারা অবিলম্বেই তাদের অস্ত্র-শস্ত্রের ক্ষতি পূরণ করে নিয়েছিল।

এমন অবস্থায় ফ্রেডির মনে হল যে সুলতানার ধরা দেবার সময় হয়েছে সে ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে, এই শর্তে সরকারের অনুমতি নিয়ে সে সুলতানাকে বলে পাঠাল যে সুলতানা যেন তার সুবিধেমত যে-কোনো সময়ে আর যে-কোনো জায়গায় ফ্রেডির সঙ্গে দেখা করে। সুলতানা সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সাক্ষাতের স্থান, তারিখ ও সময় জানিয়ে দিল, এবং শর্ত করল যে দু-পক্ষই একা এবং নিরস্ত্র অবস্থায় সাক্ষাৎকারের স্থানে আসবে।

নির্দিষ্ট দিনে যখন ফ্রেডি বনে ঘেরা একটা বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গার মধ্যে পা বাড়িয়ে বেরিয়ে এল, তখনই তার ও-ধার থেকে সুলতানাও বেরিয়ে এল। ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে একটা বড় গাছ ছিল। বন্ধুভাবেই দুজনের সাক্ষাৎ হল। যাঁরা প্রাচ্য দেশে বাস করেছেন তাঁরা সবাই তাই আশা করবেন। একজন হল কর্মদক্ষ, খোশ মেজাজী, পর্বত-প্রমাণ মানুষ, দেশের সরকার তার পেছনে রয়েছে। অপরজন হল একটি ছিমছাম, ছোটখাট মানুষ, তার মাথার জন্যে একটা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

দু-জনে গিয়ে গাছটির ছায়ায় বসতেই সুলতানা একটি তরমুজ বের করে হেসে বলল যে ফ্রেডি স্বচ্ছন্দে সেটার ভাগ নিতে পারে। যাই হ'ক, সাক্ষাৎকারে কোনো ফল হল না, কারণ ফ্রেডির বিনা শর্তে ধরা দেবার প্রস্তাবে সুলতানা রাজী হতে পারল না। এই সাক্ষাৎকারের সময়েই সুলতানা ফ্রেডিকে অনুরোধ করল যে ফ্রেডি যেন অনর্থক ঝুঁকি না নেয়। সে বলল যে সেই ঘাঁটিতে হানার

দিন সে দশ জন সম্পূর্ণ সশস্ত্র লোককে নিয়ে একটা বটগাছে লুকিয়ে ছিল। সেখান থেকে সে লক্ষ করছিল যে ফ্রেডি আর দু-জন সাহেব নালা ধরে-ধরে গাছটার দিকে আসছিল। সুলতানা বলল, 'যে-সাহেবটি পাড়ে উঠবার চেষ্টা করছিল, সে তাতে সফল হলে তোমাদের তিনজনকেই গুলি করে মারবার দরকার হত।'

মোটায় আর রোগায় এই লড়াইয়ের শেষ অঙ্ক এবার মঞ্চস্থ করতে হবে বলে ফ্রেডি সেটা দেখবার এবং তাতে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে উইণ্ডহ্যামকে আর আমাকে ডেকে পাঠাল। সুলতানা আর তার অবশিষ্ট দলবল তখন ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে নাজিবাবাদ অঞ্চলের এক বনের মাঝখানে এক গোশালায় আড্ডা গেড়েছে। ফ্রেডির ফন্দি হল নৌকো করে তার সমস্ত বাহিনী নিয়ে গঙ্গানদী ধরে গিয়ে সুবিধেমত একটা জায়গায় নেমে গোশালাটা ঘেরাও করা। আগেকারটার মত এ অভিযানও রাত্রিতেই হবে। তবে, এবার পূর্ণিমার রাতে হানা দেওয়াই ঠিক হল।

নির্বাচিত দিনে, তিনশো জন লোকের গোটা বাহিনীটা এবং ফ্রেডির এক কি-রকম ভাই, উইণ্ডহ্যাম আর আমি রাত হতে-হতেই এসে দশটি দেশী নৌকোয় উঠে বসলুম।

নৌকোগুলি হরিদ্বারের কয়েক মাইল দক্ষিণে গঙ্গার পশ্চিম কূলে একটি নির্জন জায়গায় জড়ো হয়েছিল। আমি প্রথম নৌকোখানায় ছিলুম। সবই বেশ চলছিল। যেতে যেতে আমরা নদী পার হয়ে পূর্ব তীরে গিয়ে একটি খালে ঢুকলুম। শুকনো ডাঙায় ছাড়া অন্য জায়গায় আমার জীবনে যতসব ভয়ানক অভিজ্ঞতা হয়েছে, এই খালে নৌকো করে যাওয়াটা তার অন্যতম। কয়েকশো গজ পর্যন্ত নৌকোটা চন্দ্রালোকিত এক বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর দিয়ে চলল, তার বুকে এমন একটি ছোট ঢেউও নেই যাতে তীরের গাছের ছায়াকে আঁকা-বাঁকা করে দিতে পারে। ক্রমে খালটা সরু হয়ে আসতে লাগল, নৌকোর গতিবেগও বেড়ে চলল। সঙ্গে-সঙ্গে দূরে জল ছুটে চলবার শব্দও কানে এল।

গঙ্গার পাশের দিকের এ-সব খালে আমি অনেক সময়ই মাছ ধরেছি, কেননা মাছেরা মূল ধারার চাইতে এগুলোকেই বেশী পছন্দ করে। আমরা দ্রুতবেগে কতগুলি নদী-প্রপাতের দিকে এগিয়ে চলেছিলুম। মাঝিরা যে সে-গুলোর মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রাণ এবং নৌকো খোয়াবার ঝুঁকি নিচ্ছে তাতে তাদের সাহসের পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হলুম।

অন্য ন-খানা নৌকোর মত এইখানাও মাল-বওয়া খোলা ভড়, গঙ্গার অবাধ বুকে চলাফেরা করবার পক্ষে খুব উপযুক্ত। কিন্তু এখানে এই সংকীর্ণ খরস্রোতা জল-প্রণালীতে এরকম জবড়জং নৌকোকে চালানো শক্ত। জলেডোবা পাথরের সঙ্গে এর তলাকার তক্তাগুলো অনবরত সজোরে ধাক্কা খেতে লাগল,

আর প্রতিবারই ভয় হতে লাগল যে এইবারই নৌকোর দফা-রফা হবে। নদীর পাথুরে কিনারা থেকে দূরে রেখে নদীর মাঝখান দিয়ে নৌকোটাকে নিয়ে না গেলে নৌকা ডুবে যাবে, এই বলে মাঝিটি দাঁড়ীদের সতর্ক করে দিচ্ছিল বটে, কিন্তু তাতে আমার ভয় মোটেই কমল না। কেননা নৌকোটা তখন আড়-ভাবে ভেসে চলেছিল, আর যতবার সেটা তলায় ঠেকে যাচ্ছিল ততবারই ডুবে যাবার আশঙ্কা হচ্ছিল।

কিন্তু বিভীষিকাও চিরস্থায়ী হতে পারে না। এটা যে দীর্ঘস্থায়ী হল, এর কারণ আমাদের কুড়ি মাইল এইভাবে যেতে হল, বেশীর ভাগই উঁচু-নিচু জলের উপর দিয়ে। বিভীষিকার শেষ হল যখন একজন দাঁড়ী একটা লম্বা দড়ির এক মাথা হাতে নিয়ে খালের বাঁদিককার পাড়ে লাফিয়ে পড়ল আর সেটাকে একটা গাছে বেঁধে ফেলল। একটার পর একটা নৌকো আমাদের ছাড়িয়ে গিয়ে থামতে লাগল। শেষে দশটা নৌকোই বাঁধা হয়ে গেল।

পুলিস-বাহিনী এক বালুবেলায় নেমে পড়ল। নৌকোর কর্কশ কাঠের খোঁচায় ওদের দেহ কেটে আর ছড়ে গিয়েছিল। তার শুশ্রূষা করা হল। তারপর নৌকোওয়ালাদের আরও পাঁচ মাইল ভাঁটিতে নৌকো নিয়ে গিয়ে পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় থাকতে বলা হল।

এরপর আমরা একজনের পিছনে আর একজন, এইভাবে সারি বেঁধে আধ মাইল লম্বা এক হোগলা-বন ঠেলে এগোতে লাগলুম। পায়ে হেঁটে এমন ঘন হোগলা-বন ভেদ করবার চেষ্টা আমি আর কখনও করি নি। হোগলাগুলো দশ থেকে বার ফুট উঁচু। নদীর কুয়াশা আর শিশিরের চাপে সেগুলো নুয়ে পড়েছিল। তার ভিতর দিয়ে শ-খানেক গজ যেতেই আমাদের গা পর্যন্ত ভিজে গেল।

শেষে হোগলা-বনের ওধারে পেঁছে দেখি যে সামনেই এক বিস্তীর্ণ জলরাশি। মনে হল সেটা গঙ্গার কোনও পুরনো খাত হবে। এই বাধা পার হবার সবচেয়ে সহজ উপায় যে কি, তা খুঁজে দেখবার জন্যে ডান-দিকে আর বাঁ-দিকে লোক পাঠানো হল। ডানদিক থেকে লোকরা আগে ফিরে এসে জানাল যে আমাদের ওখান থেকে সিকি মাইল দূরে এই 'হ্রদ'টা সরু হয়ে এসেছে, এবং সেখান থেকে একটি খরস্রোতা নদী বেরিয়ে গিয়ে যে-খাল দিয়ে আমরা এসেছি তাতে গিয়ে পড়েছে। শিগগিরই অন্য দলটিও ফিরে এসে খবর দিল যে হ্রদটির অপর প্রান্তে একটি নদী এসে পড়েছে, সেটি হেঁটে পার হওয়া যাবে না। এখন স্পষ্টই বোঝা গেল, দৈবেই হ'ক. বা ওদের ইচ্ছেতেই হ'ক, মাঝিরা আমাদের একটি দ্বীপে ফেলে রেখে চলে গেছে।

আমাদের নৌকোগুলো চলে গিয়েছে. দিনের আলো হতেও বেশী দেরি নেই। এ-অবস্থায় একটা কিছু করা দরকার। তাই আমরা ঐ বিস্তীর্ণ জলরাশির

শেষ প্রান্তে দেখতে গেলুম যে সেখান থেকে দুই খালের সংযোগস্থলের মধ্যে কোনো জায়গায় পার হওয়া চলবে কি না। যেখানে জলরাশি সংকীর্ণ হয়ে এসে জলস্রোতটা আরম্ভ হয়েছে, সেখানে পার হওয়া সম্ভব বলে মনে হল। সে জায়গাটার উজানে বিশ ফুট গভীর, আর ভাঁটির দিকে উন্মত্ত এক জলপ্রবাহ ছুটে চলেছে।

আমরা যখন সবাই সেই খরস্রোত জলরাশির দিকে চেয়ে জল্পনা-কল্পনা করছি যে কেউ এটা পার হতে পারবে কি না, ততক্ষণে উইণ্ডহ্যাম তাঁর পোশাক খুলে ফেলেছেন। আমি মন্তব্য করলুম যে এটা করার আর দরকার ছিল না, কেননা এমনিতেই তিনি ভিজে সপসপে হয়ে আছেন।' তিনি বললেন যে তিনি ভাবছেন তাঁর প্রাণ বাঁচাবার কথা,—পোশাক বাঁচাবার কথা নয়।

সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে, শার্টটা দিয়ে সবটা পুঁটলি বেঁধে সেটাকে ভাল করে মাথার উপর বসিয়ে তিনি একজন অল্পবয়সী, লম্বা-চওড়া কনস্টেবলকে হাতের কাছে পেয়ে তার হাত ধরে ফেলে বললেন, 'আমার সঙ্গে এস।'

খোদ কমিশনার সাহেবের সঙ্গে ডুবে মরবার সম্মান লাভের জন্যে নির্বাচিত হয়ে ছোকরা হকচকিয়ে গিয়ে আর কিছু বলতে পারল না। দু-জনে হাত-ধরাধরি করে একসঙ্গে জলে নামল।

যতক্ষণ তাদের পার হতে দেখছিলুম, ততক্ষণ আমরা কেউ নিঃশ্বাস ফেলি নি বোধহয়। জল কখনও তাদের কোমর পর্যন্ত, কখনও বা বগল পর্যন্ত উঠছিল। মনে হতে লাগল যে, জলের ধাক্কায় ভেসে যাবে, গিয়ে পড়বেই পড়বে, নিচের মত্ত জলস্রোতের মধ্যে। কোনোমতেই রক্ষে নেই ওদের। আর, নিচে পড়লে কোনো মানুষেরই রক্ষা নেই, তা সে যত বড় সাঁতারুই হ'ক না কেন।

সাহসী লোক দু-জন—একজন হলেন দলের মধ্যে সবচাইতে বয়স্ক, অপর জন বোধহয় সবচাইতে বয়সে ছোট—অটলভাবে যুঝতে-যুঝতে এগিয়ে চললেন। শেষে যখন তাঁরা ধস্তাধস্তি করে ওপারে উঠে পড়লেন, তখন দর্শকদের বুক থেকে স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চুপ করে থাকবার হুকুম ছিল তাই, নয় তো এর জন্যে এমন একটা হর্ষধ্বনি উঠত যা কুড়ি মাইল দূরে হরিদ্বারেও শোনা যেতে পারত। দু-জন যখন পেরেছে, তখন তিনশো জনও যেতে পারবে। কাজেই মানুষের একটা শিকল করা হল। মধ্যে-মধ্যে তার দু-একটা মানুষের পা ফসকে গেলেও গোটা সারিটা মোটের উপর অটুট রইল, এবং সমস্ত দলটা নিরাপদে গিয়ে অপর তীরে উঠল।

এখানে ফ্রেডির বিশ্বস্ততম গোয়েন্দাদের একজন এসে দেখা করল। উদীয়মান সূর্যের দিকে দেখিয়ে সে বলল যে আমরা বড় দেরিতে এসে পৌঁছেছি, কারণ ও অঞ্চলের রাখালদের অগোচরে এত বড় একটা বাহিনীর

পক্ষে বন পর্যন্ত বিস্তৃত ফাঁকা জায়গাটা পার হওয়া এখন অসম্ভব। কাজেই আমাদের আবার দ্বীপটিতে ফিরে না গিয়ে উপায় নেই। তা-ই করা হল। তবে, এ-পার থেকে ও-পারে যাওয়াটা, ও-পার থেকে এ-পারে আসার মত অতটা কষ্টকর হল না।

হোগলা-বনে ফিরে এসে প্রথম কাজ হল পোশাক শুকিয়ে নেওয়া। সেটা শিগগিরই হয়ে গেল, কেননা রোদ ততক্ষণে তেতে উঠেছে। গা আবার যখন শুকনো হল, গরম হল, তখন ফ্রেডি তার পেল্লায় ঝুলি থেকে একটি মুরগি আর একখানা পাঁউরুটি বের করল। গঙ্গার ঠাণ্ডা জলে চুবুনি খাওয়া সত্ত্বেও সে-সবের কিছুমাত্র অনাদর করা হল না। আমি যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়তে পারি, তাই বালির মধ্যে একটি নিচু জায়গায় শুয়ে পড়লুম। প্রবল হাঁচির শব্দে যখন জেগে উঠলুম, তখন দিন প্রায় কেটে গিয়েছে।

সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসে দেখি যে তারা তিনজনই কম-বেশি 'হে-ফিভার' (hay fever) রোগে আক্রান্ত হয়েছে। যে হোগলাবনে আমরা ছিলুম, সে-গুলোর মঞ্জরী হয়। ভোরবেলা আমরা যাবার সময় সে-গুলো জলে ভিজে ছিল, কিন্তু তা গরম রোদ পেয়ে শুকিয়ে গিয়ে ফুলে উঠেছিল। আমার সঙ্গীরা যখন তার মধ্যে ঘুরে-ঘুরে বিশ্রামের জন্যে ঠাণ্ডা জায়গা খুঁজছিলেন, তখন তাঁদের ধাক্কা লেগে পরাগ ঝরে পড়েছিল আর সেই পরাগ নাকে ঢুকে তাঁদের হে-ফিভার হয়েছিল। ভারতীয়দের এ অসুখ হয় না, আমার নিজেরও কখনও হয় নি। এই রোগে কাউকে ভুগতে এই আমি প্রথম দেখলুম। যা দেখলুম তাতে আমি ভয় পেয়ে গেলুম।

ফ্রেডির আত্মীয়টি একজন চা-কর। ছুটিতে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। তাঁর অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। চোখদুটি দিয়ে জল গড়াচ্ছে, আর তা এমন ফুলে উঠেছে যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছেন না, নাক থেকে জল ঝরছে। ফ্রেডি একটু একটু দেখতে পাচ্ছে বটে, কিন্তু তার হাঁচির আর কামাই নেই। আর, ফ্রেডি যখনই হাঁচে, বসুন্ধরা তখনই কম্পমানা হন। শক্ত-সমর্থ অভিজ্ঞ যোদ্ধা উইণ্ডহ্যাম মুখে বলছেন যে তাঁর কিচ্ছু হয় নি, কিন্তু রুমালটা চোখে আর নাকে না দিয়ে পারছেন না।

খোলা নৌকোর মধ্যে ধোপার আছাড় খেতে-খেতে এতখানি আসা, তারপর নির্জন এক দ্বীপে পরিত্যক্ত হয়ে থাকা, তার উপর আবার প্রাণ হাতে নিয়ে বার-বার গর্জমান খরস্রোত পার হওয়া—এতেও যথেষ্ট হয় নি, এতক্ষণে ষোল-কলা পূর্ণ হল। অন্ধ হয়ে যাবার ভয় আছে এমন তিনজন লোক আর তিনশো সিপাইকে নিয়ে হরিদ্বারে ফিরে যেতে হবে এই সম্ভাবনার কথা ভাবতেই আমার গা এমন হিম হয়ে গেল যে গঙ্গার বরফের মত ঠাণ্ডা জল পার হয়ে আসবার সময়ও তেমন হয় নি।

যাই হ'ক, সন্ধে হবার সঙ্গে-সঙ্গেই রোগীদের অবস্থা একটু ভাল দেখে ভারি স্বস্তি পেলুম। তারপর যখন আবার তৃতীয়-বার নদী পার হলুম, তখন ফ্রেডি আর উইন্ডহ্যাম সেরে উঠেছেন, আর অন্য ভদ্রলোকটিও চোখে এতটা দেখতে পাচ্ছেন যে তাঁকে আর বলে দিতে হচ্ছে না যে সামনে পাথর আছে, পা তুলতে হবে।

ফ্রেডির গুপ্তচর একজন গাইডকে নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তারা আমাদের খানিকটা ফাঁকা জায়গার উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা শ-খানেক গজ চওড়া শুকনো জল-প্রণালীর মুখের কাছে হাজির করল।

তখন সবে চাঁদ উঠেছে, প্রায় দিনের আলোয় যেমন, সেইরকম সব দেখা যাচ্ছে। এমন সময় বাঁক ঘুরতেই আমরা একটা হাতির একবারে মুখোমুখি পড়ে গেলুম। এই এলাকায় একটা গুন্ডা হাতি আছে শুনেছিলুম, ইনিই তিনি। গজদন্তদুটি চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে, দুই কান ছড়িয়ে সজোরে চিৎকার করতে-করতে সে আসছে।

পথপ্রদর্শক বলল যে হাতিটা বেজায় বদমেজাজী, অনেক লোককে মেরেছে, আমাদের মধ্যেও কয়েকজনকে নিশ্চয় মারবে—তাতে পরিস্থিতিটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। প্রথমে মনে হল যে গুন্ডাটা আমাদের পথ-প্রদর্শকের ভবিষ্যদ্বাণীকে সফল করে তুলবে, কেননা সে শুঁড় তুলে খানিকটা এগিয়ে এল। তারপব সে ঘুরে গিয়ে তীর ধরে ছুটতে-ছুটতে আর চেঁচাতে-চেঁচাতে জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিল।

নালাটা ধরে আরও মাইল-খানেক এগিয়ে গিয়ে একটা পথের মত পেলুম —পথপ্রদর্শক বললে, জঙ্গলের আগুন লাগার ফলে পথটা সৃষ্ট হয়েছে। এখানে হাঁটতে বেশ আরাম হল, কেননা পায়ের তলায় কচি ছোট-ছোট ঘাস পেলুম। পাতায়-পাতায় চাঁদের আলো ঝিকমিক করছিল, তা আমার মনকে কাজের কথা ভুলিয়ে দিয়ে অরণ্যের সৌন্দর্যে মাতিয়ে দিল। একটা পাতা-ঝরা গাছে খুব উঁচুতে বসে একটা বুড়ো ময়ূর রাতের আকাশে তার সতর্কতাসূচক ধ্বনি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। খানিকটা পোড়া ঘাসের কাছাকাছি আসতেই দেখলুম যে দুটো চিতা পথটার উপর বেরিয়ে এসে আমাদের দেখতে পেয়ে শোভন ভঙ্গীতে লাফ দিয়ে ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যতক্ষণ খাল দিয়ে আসছিলুম, ততক্ষণ আমি যেন ঠিক আমার নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে ছিলুম না। (কিন্তু এখন আমি জানি যে আমাদের ক্ষতি করার মতলব হাতিটার ছিল না, সে শুধু কৌতূহলী হয়েছিল), এবং যে ময়ূরটা বনের প্রাণীদের বিপদের কথা জানিয়ে দিচ্ছিল সেই ময়ূরটাকে আর সবচেয়ে ছায়ায় মিলিয়ে-যাওয়া চিতাদুটোকে দেখে আমি যেন আমার সুপরিচিত পরিবেশের মধ্যে—যে পরিবেশকে আমি ভালবাসি আর বুঝি, সেই পরিবেশে

ফিরে এলুম।

পথটা পূর্ব-পশ্চিমে গিয়েছিল। সেটাকে ছেড়ে আমরা পথপ্রদর্শকের পিছনের খাটো গাছ আর বড় গাছের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মাইলখানেক কি তারও বেশী হেঁটে ছোট জলপ্রবাহটার কাছে এলুম—বিশাল এক বটগাছ তার উপর ঝুঁকে রয়েছে। আমাদের এখানে বসে অপেক্ষা করতে বলে আমাদের পথপ্রদর্শক বলে গেল গোশালাতে তার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে।

সে এক দীর্ঘ, ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। তার উপর আবার খিদেয় মরি, কারণ সেই যে মুরগি আর একখানা পাউরুটির ভাগ পেয়েছিলুম, তার পর এই মাঝ-রাত্রি পর্যন্ত পেটে আর কিচ্ছু পড়ে নি। আরও বিপদ আমার এই হল যে দলের মধ্যে একা আমিই তামাক খাই, অথচ আমার সিগারেটের পুঁজি গিয়েছিল শেষ হয়ে।

পথপ্রদর্শকটি শেষ রাত্রের দিকে ফিরে এসে খবর দিল যে সুলতানা আর তার দলের অবশিষ্ট ন-জন ডাকাত আগের দিন সন্ধেবেলাই গোশালা ছেড়ে চলে গিয়েছে হরিদ্বারের ওদিকে এক গ্রামে ডাকাতি করবার জন্যে। আশা করা যায় যে এই রাত্রেই, কিংবা দিনের বেলায় তারা ফিরে আসবে।

তারপর পথপ্রদর্শক আর গোয়েন্দা আমাদের জন্যে খাবার যোগাড় করতে চলে গেল। খাবারের বড্ড দরকার হয়ে উঠেছিল। যাবার আগে আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেল যে আমরা এখন সুলতানার এলাকার মধ্যে আছি, কেউ যেন বটগাছের আশ্রয় ছেড়ে বাইরে না যায়।

আরও একটা ক্লান্তিকর দিন কেটে গেল। উইন্ডহ্যাম আর থাকতে পারবেন না, এই শেষ দিন। তিনি কুমায়ুনের কমিশনার, তার উপর আবার টিহরি রাজ্যের পোলিটিকাল এজেন্ট। দু-দিন পরেই সেখানকার রাজার সঙ্গে নরেন্দ্রনগরে দেখা করতে হবে তাকে।

রাত হলে, ঘাস-বোঝাই একটা গরুর গাড়ি এল। ঘাসগুলো সরিয়ে দেখা গেল যে বস্তা-কয়েক ছোলাভাজা আর আধমণটাক গুড় রয়েছে। কম হলেও খাদ্যটুকু কম লোভনীয় নয়। সিপাইদের মধ্যে তা ভাগ করে দেওয়া হল। পথ-প্রদর্শকটি সাহেবদের কথাও ভোলে নি। গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাবার আগে সে ফ্রেডির হাতে একটি কাপড়ের পুঁটলিতে বাঁধা খানকতক চাপাটি দিয়ে গেল। কাপড়টুকুর অবস্থা এককালে ভাল ছিল, কিন্তু এখন তার বড় দুর্দশা।

চিত হয়ে পড়ে থেকে, কথার পুঁজি যখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমি সুদূর হরিদ্বারের গরম-গরম খাবার আর নরম বিছানার কথা ভাবছি, তখন আমাদের গাছটি থেকে কয়েকশো গজ দূরে একটা চিতার চিতল হরিণ মারবার একটি শব্দ ভেসে এল। পেট ভরে খেতে পাবার এই তো এক সুযোগ এসেছে! চাপাটির ভাগ খেয়ে আমার খিদে কমা দূরে থাকুক, বরং বেড়েই

গিয়েছিল।

আমি লাফ দিয়ে উঠে ফ্রেডির কাছে তার কুকরিখানা চাইলুম। কেন ওটা চাইছি সে কথা সে জানতে চাইলে আমি বললুম যে চিতাটা যে-হরিণটাকে মেরেছে, তার পেছনের পা-খানা কেটে নিয়ে আসবার জন্যে কুকরিটা চাই।

সে বললে, 'কোন্ চিতা আর কোন্ চিতলের কথা বলছ তুমি?' হ্যাঁ চিতলের ডাক শোনা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এ কথা সে কী করে জানবে যে তারা সুলতানার লোকদের দেখে ভয় পায় নি? হয়তো সুলতানার লোকরা আমাদের খুঁজছে। আর যাই হ'ক, যদি আমার কথাই ঠিক হয় যে চিতাটা কিছু মেরেছে —তাতে অবশ্য তার সন্দেহ আছে—তাহলেই বা আমি কী করে তার মুখ থেকে চিতলটাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব? গোশালার এত কাছে থেকে আমি তো বন্দুক ব্যবহার করতে পারব না নিশ্চয় (কী কাজে লাগতে পারে তা বুঝতে না পেরে আমি আমার রাইফেলটাকে সঙ্গে নিয়ে আসি নি)। না, আমার এই ফন্দিটা অকেজো—এই বলে সে তার বক্তব্য শেষ করল।

কাজেই নিতান্ত দুঃখিত হয়ে আমি খিদে নিয়ে আবার শুয়ে পড়লুম। যারা বনের প্রাণীদের জানে না, তাদের ভাষা বোঝে না, তাদের আমি কেমন করে বোঝাব যে আমি ঠিকই জানি যে হরিণগুলো মানুষ দেখে ভয় পায় নি, এবং তারা দেখেছে যে চিতায় তাদের একজনকে মেরে ফেলেছে, আর সেই হরিণের সবটুকু, কিংবা তার যতটা চাই ততটা, চিতাটার কাছ থেকে নিয়ে আসার মধ্যে কোনো বিপদই নেই?

রাত্রে আর কিছু ঘটল না। ভোর হতেই উইন্ডহ্যাম আর আমি হরিদ্বারের দিকে আমাদের দীর্ঘ পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়লুম। ভীমগোড়া বাঁধে এসে আমরা গঙ্গা পার হয়ে বাঁধের ডাকবাংলোতে তাড়াতাড়ি খানা খেয়ে নিলুম। তারপর সন্ধের দিকে, বাঁধের উজানে যে বিস্তীর্ণ জলরাশি তাতে মজা করে মাছ ধরলুম। সে আনন্দের কথা অনেক দিন মনে থাকবে।

পরদিন সকালবেলা যখন উইন্ডহ্যাম তাঁর নরেন্দ্রনগরের কাজের জন্যে রওনা হচ্ছেন আর আমি আমার ক্ষুধার্ত সঙ্গীদের জন্যে সঙ্গে নিয়ে যাব বলে কিছু রসদের যোগাড় করছি, এমন সময় একজন লোক দৌড়ে এসে খবর দিল যে ফ্রেডি সুলতানাকে বন্দী করেছে।

সুলতানা আগের দিন সন্ধেবেলা গোশালায় ফিরে এসেছিল। ফ্রেডির লোকেরা জায়গাটা ঘিরে ফেলবার পর ফ্রেডি গোয়ালাদের থাকবার মস্ত বড় কুঁড়েঘরটাতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে দেখে যে ঘরে একখানা মাত্র খাটিয়া আছে, আর তার উপর চাদর-ঢাকা এক মূর্তি পড়ে আছে। ফ্রেডি গিয়ে স্রেফ তার উপর বসে পড়ল। সেই সাড়ে তিনমণী বপুখানার তলায় চাপা পড়ে গিয়ে সুলতানা না পারল কোনো লড়াই করতে, না পারল তার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা

করতে, যে সে জীবন্ত অবস্থায় ধরা দেবে না। এই হানা দেবার সময় মোট ছ-জন ডাকাত ওখানে ছিল। সুলতানাকে নিয়ে চারজন ধরা পড়ল, অন্য দু-জন —বাবু আর প্যায়লোয়ান নামে সুলতানার দুই সহচর—গুলি খেয়েও পুলিসের ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে গেল।

সুলতানা কতকগুলো খুনের জন্যে দায়ী ছিল তা জানি না। যখন তার বিচার হল তখন তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল এই যে তার দলের একজন লামাচৌর গ্রামের মোড়লের একজন প্রজাকে হত্যা করেছিল।

ফাঁসির আসামীর কুঠরিতে থাকবার সময় সুলতানা ফ্রেডিকে ডেকে আনিয়ে নাজিবাবাদ কোর্টে বন্দী তার স্ত্রী এবং পুত্রের, এবং তার অতি প্রিয় কুকুরটির ভার ফ্রেডিকে দিয়ে গেল। ফ্রেডি কুকুরটিকে নিজেই নিল। আর ফ্রেডিকে যাঁরা চেনেন, তাঁদের আর এ কথা বলার কোনো দরকার নেই যে, সুলতানার পরিবারকে দেখা-শোনা করবে বলে সে যে কথা দিয়েছিল, তা সে আন্তরিকতার সঙ্গে রক্ষা করেছিল।

ফ্রেডির চাকরিতে পদোন্নতি হল আর ভারত সম্রাট ভারতীয় পুলিস বিভাগের যত লোককে এ যাবৎ সি, আই, ই, উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন, তাদের মধ্যে সে হল সবচাইতে কমবয়সী।

এর কয়েক মাস বাদে সে বার্ষিক পুলিস-সপ্তাহের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে মোরাদাবাদে এল। অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ ছিল একটি ভোজ-উৎসব। তাতে প্রদেশের সব পুলিস-অফিসারই নিমন্ত্রিত হত। যখন খানাপিনা চলছে তখন একজন পরিবেশনকারী ফিসফিস করে ফ্রেডিকে জানাল যে তার আরদালী তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ফ্রেডি যে ক-বছর ধরে সুলতানার পেছনে ছিল, এই আরদালীটি সে সময় ফ্রেডির সঙ্গে ছিল।

এখন হয়েছে কি, সন্ধেবেলা ছুটি থাকায় সে বেড়াতে-বেড়াতে মোরাদাবাদ স্টেশনে গিয়েছিল। সে সেখানে থাকতে থাকতে একখানা ট্রেন এল। সে উদ্দেশ্যহীনভাবে যাত্রীদের নামা-ওঠা দেখতে লাগল। তার কাছাকাছি একটি কামরা থেকে দু-জন যাত্রী নামল। এক জন অন্য জনকে কি বলতেই সে তাড়াতাড়ি একখানা রুমালে তার নিজের মুখ চাপা দিল বটে, কিন্তু আরদালীটি তার আগেই দেখতে পেয়ে গেল যে লোকটির নাকের আগায় একটু তুলো লেগে রয়েছে। আরদালীটি লোক দু-জনের উপর নজর রাখল। তাদের সঙ্গে প্রচুর মালপত্র ছিল। তারা ওয়েটিং রুমে ঢুকে তারা এক কোণে আরাম করে বসবার পর আরদালী একখানা এক্কা ডেকে তাড়াতাড়ি চলে এল ফ্রেডিকে খবর দিতে।

সুলতানার দুই সহকারী, বাবু আর প্যায়লোয়ান যখন গোশালা-ঘেরা পুলিসের ব্যূহ ভেদ করে চলে যায় তখন তাদের দিকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। তার অল্প পরেই একজন লোক নাজিবাবাদের কাছে একটি ডিসপেন্সারিতে

এসে বলে যে তার নাকটা দেখতে হবে. নাকে নাকি একটা কুকুরে কামড়েছে। ব্যাপারটা পুলিসকে জানাবার সময় যে কম্পাউন্ডারটি তার ঘা বেঁধে দিয়েছিল সে বলল যে, ক্ষতটা ছিটে গুলি লেগে হয়েছিল বলেই তার সন্দেহ হয়।

তাই গোটা প্রদেশটার সমস্ত পুলিস-বাহিনী নাকে-জখম-ওলা একজন লোকের সন্ধানে ছিল—আরও বিশেষ করে এইজন্যে যে, সুলতানার দল যে-সব হত্যাকান্ডের জন্যে দায়ী তার অধিকাংশই এই বাবু আর প্যায়লোয়ানই করেছিল বলে লোকে মনে করত।

আরদালীর কথা শুনেই ফ্রেডি তার মোটরগাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে অন্ধ-বেগে স্টেশনের দিকে চলল। অন্ধ-বেগে চলল বলাই ঠিক, কেননা যখন তাড়া পড়ে, তখন ফ্রেডির সামনে শুধু রাস্তাটাই থাকে, যানবাহন বা পথে মোড় ইত্যাদি কিছুই সে দেখে না। স্টেশনে এসে সে ওয়েটিং-রুম থেকে বেরোবার প্রতিটি মুখে পাহারা রেখে তারপর লোক দু-জনের কাছে গিয়ে জিগ্যেস করল যে তারা কে। তারা বলল যে তারা ব্যবসায়ী লোক, বেরিলি থেকে পঞ্জাবে চলেছে।

ফ্রেডি প্রশ্ন করল তারা তাহলে কেন এমন ট্রেন ধরল যার পথ মোরাদাবাদে এসে শেষ হয? তারা বলল যে বেরিলি প্ল্যাটফর্মে দু-খানা ট্রেন ছিল, তার মধ্যে ভুলখানাকেই তাদের দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ফ্রেডি শুনল যে তাদের খাওয়া-দাওয়া হয় নি, এবং ট্রেন ধরবার জন্যে পরের দিন ভোর পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে। তখন ফ্রেডি তাদের তার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করল এবং তার অতিথি হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। লোক দু-জন এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললে, 'সাহেবের যা ইচ্ছে!'

লোক দু-জনকে গাড়ির পিছনে বসিয়ে ফ্রেডি আস্তে-আস্তে গাড়ি চালাতে-চালাতে তাদের খুব খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল, আর সব প্রশ্নেরই সে চটপট জবাব পেতে থাকল।

তারপর লোকদুটি ফ্রেডিকে জিগ্যেস করল যে. রেলওয়ে স্টেশনে রাত্রিবেলা এসে যাত্রীদের ডেকে নিয়ে যাওয়াই আজকাল সাহেব-সুবোদের রেওয়াজ নাকি? মালপত্র এভাবে ফেলে গেলে তা লুট হয়ে যাবে না?

ফ্রেডি জানত যে একটি রীতিমত সই-করা ওয়ারেন্ট না থাকলে এরকম কাজ করাটা যথেচ্ছাচারিতা বলে গণ্য হতে পারে, এবং যদি মোরাদাবাদ জেলে দন্ডভোগ করছে সুলতানার দলের এমন সব ডাকাতরা তাদের এই দুটি প্রাক্তন সাথীকে শনাক্ত না করে তাহলে তখন গুরুতর মুশকিলে পড়তে হবে। যখন এইসব অপ্রিয় ভাবনা তার মনের মধ্যে খেলে যাচ্ছে. ততক্ষণে. পুলিস-সপ্তাহের অনুষ্ঠান উপলক্ষে এসে যে-বাংলোতে উঠেছিল. তার গাড়ি এসে সেখানে পৌঁছে গেল।

সব কুকুরই ফ্রেডিকে ভালবাসে, সুলতানার কুকুরও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এই ক-মাসেই টেরিয়ার কুকুরের একছিটে রক্ত-বিশিষ্ট এই নেড়িকুত্তাটা ফ্রেডিকে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিল। এখন, যেই গাড়িটা এসে থামল আর তা থেকে ফ্রেডিরা তিনজনে নেমে এল, অমনি কুকুরটা বাংলো থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেই অবাক হয়ে থেমে গেল। তারপর, কুকুরের পক্ষে যতভাবে আনন্দ প্রকাশ করা সম্ভব তা করতে-করতে সেই যাত্রী-দুজনের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

ফ্রেডি আর লোক দু-জন নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর প্যায়লোয়ান তার ভাগ্যে কী আছে তা জেনেও নিচু হয়ে কুকুরটার মাথা চাপড়িয়ে বললে, 'ইয়ং সাহেব, আপনি আমাদের যা বলে ভেবেছেন আমরা যে সেই লোকই, এ কথা এমন একজন খাঁটি সাক্ষীর সামনে অস্বীকার করে লাভ নেই!'

অপরাধীর হাত থেকে রক্ষা পেতে চায় আমাদের সমাজ, আর সুলতানা একজন অপরাধী ঠিকই। দেশের আইন অনুসারে তার বিচার হল, সে দোষী বলে সাব্যস্ত হল এবং তার ফাঁসি হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও ছোট্ট মানুষটি সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে সরকারের প্রচণ্ড শক্তিকে উপেক্ষা করে এসেছিল। ফাঁসির আসামীর কক্ষে যারা তাকে পাহারা দিয়েছিল, সাহস-ভরা চালচলনে ও তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। ওকে আমি প্রচুর প্রশংসা না করে থাকতে পারি না।

সুলতানাকে হাতকড়া আর ডাণ্ডা-বেড়ি পরিয়ে লোকের কাছে দেখানো চাই, এবং সে যখন স্বাধীন ছিল তখন তার শুধু নামটি শুনলে যারা কাঁপতে থাকত এমন সব লোকের কাছে তাকে উপহাসের পাত্র করে তোলা চাই, ন্যায়ের বিধান যদি এরকম না হত তাহলে আমি সুখী হতুম। আমি এ কামনাও করেছিলুম যে তাকে যেন আর-একটু কম কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।

তার কারণ আর কিছু নয়, শুধু এই যে, তাকে জন্ম থেকেই দাগী করে দিয়ে তাকে ভাল হবার সুযোগ দেওয়া হয় নি। তার হাতে যখন ক্ষমতা ছিল, তখন সে গরিবদের নির্যাতন করে নি। আমি যখন তার পদচিহ্ন ধরে-ধরে বটগাছটা পর্যন্ত গিয়েছিলুম তখন সে আমার আর আমার দুই বন্ধুকে নাগালের মধ্যে পেয়েও মেরে ফেলে নি। আর, সর্বশেষে, সে যখন ফ্রেডির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তখন সে এসেছিল ছোরা কিংবা রিভলবার নিয়ে নয়— দুই হাতে করে একটি তরমুজ নিয়ে।



৮

আনুগত্য

ডাক-গাড়িটা যত জোরে সম্ভব, ঘণ্টায় তিরিশ মাইল হিসেবে, ছুটছিল। স্থানটি আমার পরিচিত। নতুন-ওঠা সূর্য মাইলের পর মাইল ধরে খেতের উপর ঝক-ঝক করছিল। মাঠে-মাঠে লোকরা সোনালী গমের ফসল কাটছিল।

সেটা এপ্রিল মাস। ট্রেন চলছিল গাঙ্গেয়-উপত্যকার মধ্য দিয়ে। ভারতের উর্বরতম অঞ্চল এটাই। গত বছর ভারতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। আমি দেখেছি যে গ্রামকে-গ্রাম গাছের ছাল খেয়ে জীবন ধারণ করছে। পোড়া মাঠের বুক থেকে অসীম কষ্টে অতি ছোট-ছোট ঘাসের বিচি খুঁটে তুলে, কিংবা ফসল ফলাতে পারে না এমন পোড়া জমিতে বুনো কুল সংগ্রহ করে বাঁচবার চেষ্টা করছে।

তারপর আবহাওয়া দয়া করে বদলে গিয়েছিল। শীতকালে ভাল বৃষ্টি হওয়ায় জমিতে আবার উর্বরতা ফিরে এল। এক বছরের উপবাসী মানুষরা সাগ্রহে প্রচুর ফসল কাটতে লেগে গেল! বেলা তখনও খুবই কম, তবু কর্ম তৎপরতার এক দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। গ্রাম-সমাজের প্রতিটি স্ত্রী-পুরুষের সেই কাজে একটি নির্দিষ্ট অংশ ছিল। মেয়েরাই ফসল কাটছিল। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ভূমিহীন খেত-মজুর। ফসল পাকবার সঙ্গে-সঙ্গে তারা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলে আসে। এদের কাজ শুরু হয় ভোরবেলা, আর শেষ হয় যখন কাজ করবার মত আলো আর থাকে না। এই মেহনতের জন্যে এরা পায় সারা দিনে কাটা ফসলের বার কিংবা ষোল ভাগের এক ভাগ।

খেতে-ঘেরা কোনো বেড়া ছিল না বলে দৃষ্টি বাধা পাচ্ছিল না। গাড়ির জানলা দিয়ে কোনোরকম কোনো যন্ত্রও চোখে পড়ছিল না। চাষ করা হয়েছিল বলদ দিয়ে—হাল-পিছু একজোড়া বলদ। ফসল কাটা হচ্ছিল এক হাত লম্বা আর বাঁকা-ফলাওয়ালা কাস্তে দিয়ে। খড় পাকিয়ে নিয়ে তা দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা ফসলের আঁটিগুলিকে খামারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কাঠের চাকাওয়ালা বলদে টানা

গাড়িতে করে।

খামারের মেঝেটা গোবর দিয়ে লেপা, সেখানে বলদেরা মাড়িয়ে শস্যগুলিকে আলাদা করছে। তারা সবাই লম্বা একটা দড়িতে বাঁধা। মাটিতে শক্ত করে পোঁতা একটা খুঁটিতে সেই দড়ির আর-এক মাথা বাঁধা রয়েছে। এক-একটা খেত থেকে আঁটিগুলো তুলে নিয়ে যাওয়া হলেই ছোট ছেলেরা সেখানে গাছের গোড়াগুলো খাওয়াবার জন্যে গরু-মহিষদের নিয়ে আসছিল। আবার সেই গরুগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে বৃদ্ধ আর অক্ষম স্ত্রীলোকেরা জমি ঝাঁট দিচ্ছিল। ফসল কাটবার সময় শিষ থেকে যে-সব দানা ঝরে পড়েছিল সেগুলো তারা সংগ্রহ করছিল। এরা খেটেখুটে যতটা যোগাড় করবে, তার অর্ধেক নেবে খেতের মালিক। বাকি অর্ধেক তারা রাখতে পাবে। জমি যদি রোদে বেশী ফেটে গিয়ে না থাকে তাহলে তার পরিমাণ হবে আধসের কি সেরখানেক।

আমার পথ ছত্রিশ ঘন্টার পথ। কামরায় আমি একা। সকালের, দুপুরের আর রাত্রির খাওয়ার সময় ট্রেন থামবে। গাড়িটা যেখান দিয়ে যাচ্ছিল, তার প্রতিটি মাইল কৌতূহলোদ্দীপক। তবু আমার মনে সুখ ছিল না। কেননা, আমার বসবার জায়গার নিচে একটা ইস্পাতের তোরঙ্গের মধ্যে একটা সুতোর থলিতে যে দুশো টাকা ছিল, তা আমার নয়।

যে রেল-পথে আমি এখন ভ্রমণ করছিলুম তাতেই আমি আঠার মাস আগে জ্বালানী কাঠের ইনসপেক্টরের চাকরি নিয়েছিলুম। স্কুলের পড়া শেষ করেই আমি সোজা এই কাজে যাই। এই আঠার মাস ধরে আমি বনে বাস করে এঞ্জিনে জ্বালানির জন্যে পাঁচলক্ষ ঘন-ফুট কাঠ কাটিয়েছি।

গাছ কেটে মাটিতে ফেলে তাকে কেটে রলা করা হত, তার প্রতিটি ঠিক ছত্রিশ ইঞ্চি লম্বা—কমও নয়, বেশিও নয়। তারপর সেগুলোকে গরুগাড়ি করে দশমাইল দূরে সবচেয়ে কাছের রেল-স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে সেগুলোকে গোছা করে সাজিয়ে, মাপ নিয়ে, জ্বালানির ট্রেনে তুলে দিয়ে যে-যে স্টেশনে দরকার সেখানে-সেখানে নিয়ে যাওয়া হত।

বনে এই আঠার মাস বেশ খাটুনি গিয়েছিল। কিন্তু আমি ভালই ছিলুম, কাজটাও আমার ভালই লাগত। বনে চিতল হরিণ, চৌশিঙা হরিণ, শুয়োর, ময়ূর ইত্যাদি শিকার ছিল প্রচুর। আর বনের এক সীমানায় যে-নদীটা, তাতে কয়েক রকমের মাছ আর অনেক কুমির এবং ময়াল সাপ ছিল। দিনের বেলা কাজের চাপে শিকার করতে পারতুম না। কাজেই, খাদ্য-সংগ্রহের জন্যে শিকার-করা আর মাছ-ধরা রাত্তিরেই সারতে হত।

চাঁদের আলোয় শিকার আর দিনের আলোয় শিকারে অনেক তফাত। কেননা, রাত্রিবেলা চুপে-চুপে হরিণের, কিংবা দাঁত দিয়ে কন্দ খুঁড়ে তুলছে। এমন শুয়োরের কাছাকাছি যাওয়াটা সোজা হলেও ঠিক করে গুলি চালানো

শক্ত। চাঁদের আলোটা একেবারে বন্দুকের মাছিতে পড়ে চকচক করবে, এমনভাবে বন্দুক না ধরলে হবে না। ময়ূরদের মারতে হত ঘুমন্ত অবস্থাতেই।

বলতে লজ্জা নেই যে আমি কখনও-কখনও এ ধরনের হত্যাও করেছি। কেননা, এই দেড় বছরে আমি চাঁদের আলোয় যা শিকার করতে পেরেছি শুধু সেটুকু মাংসই খেতে পেয়েছি। কৃষ্ণপক্ষে আমাকে বাধ্য হয়ে নিরামিষাশী হতে হয়েছে।

বন কাটার ফলে বনের প্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। অনেকগুলি নিরাশ্রয় আর অনাথের ভার আমার উপর এসে পড়ল। তারা সবাই এসে আমার ছোট তাঁবুটিতে আমার সঙ্গে বাস করতে লাগল।

কয়েকটা করে গৌরীতিত্তির আর কালতিত্তিরের বাচ্চা, চারটি ময়ূরছানা, দু-টি খরগোশের বাচ্চা, আর দুটি চৌশিঙা হরিণশিশু (যারা মোটে তাদের নলীর মত পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখছে)—এতগুলি প্রার্থীর ভিড় যখন জমে উঠেছে, সেই সময় একটি ময়াল সাপ—তার নাম রেক্স—একদিন এসে তাঁবুতে আড্ডা গাড়ল।

সেদিন আমি রাত হবার একঘন্টা পরে তাঁবুতে ফিরে এসে চারপেয়ে পুষ্যিগুলোকে দুধ খাওয়াচ্ছি, এমন সময় দেখি তাঁবুর এক কোনায় লণ্ঠনের আলোয় কি যেন একটা চকচকে করছে। খোঁজ নিয়ে দেখি যে হরিণছানাদের খড়ের বিছানার উপর রেক্স কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি করে গুণে দেখি যে তাঁবু থেকে কোনো পুষ্যিই খোয়া যায় নি। কাজেই রেক্সকে তার নির্বাচিত কোণটি ছেড়ে দিলুম। তারপর দু-মাস ধরে রেক্স রোজ-রোজই রোদ পোয়াবার জন্যে তাঁবুর বাইরে যেত, আর সূর্যাস্ত হলেই ফিরে আসত। এই সময়টার মধ্যে সে তাঁবুতে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে কারও কোনো ক্ষতি করে নি।

নিরাশ্রয় আর অনাথ জীবগুলিকে তাঁবুতে রেখে প্রতিপালন করে ক্রমে তারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিতে শিখলে তাদের বনে ফিরিয়ে দেওয়া হত। তাদের মধ্যে শুধু একটি চৌশিঙা—তার নাম টিড্‌লি-ডি-উইঙ্ক্‌স—আমাকে ছেড়ে যেতে চাইল না।

যখন জ্বালানী কাঠ ট্রেনে তোলা হচ্ছিল তখন আমি সেই কাজটার দেখাশোনা করবার জন্যে তাঁবু তুলে নিয়ে রেল-লাইনের কাছাকাছি চলে গেলুম, সেও আমার সঙ্গে গেল। সেখানে গিয়ে সে তার প্রাণটি হারিয়েছিল আর কি! মানুষের হাতে প্রতিপালিত হওয়ায় তার মনে মানুষের ভয় ছিল না। আমার আসার পরের দিনই সে একজন লোকের কাছে গিয়ে পড়ে। বন্য জীব মনে করে লোকটি তাকে মারতে চেষ্টা করে।

সন্ধেবেলা তাঁবুতে ফিরে দেখি যে সে আমার ক্যাম্পখাটের পাশে পড়ে

রয়েছে। তাকে তুলে দেখি যে তার সামনের দু-খানা পা-ই ভেঙে গিয়েছে, ভাঙা হাড়গুলোর মাথা চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। আমি তার গলায় একটু-একটু দুধ ঢেলে দিচ্ছি এবং যা করতেই হবে বলে জানি তা করবার জন্যে সাহস সঞ্চয় করছি, এমন সময় আমার চাকর একটি লোককে নিয়ে এল।

লোকটি স্বীকার করল যে সে-ই এই বেচারাকে মারতে চেষ্টা করেছিল। শুনলুম যে লোকটি তার খেতে কাজ করছিল, এমন সময় হরিণীটা তার কাছে গিয়ে পড়ে। এটা কাছের বন থেকে ছটকে এসে পড়েছে, এই মনে করে সে তাকে লাঠির এক বাড়ি মেরে তাকে তাড়া করে। তারপর হরিণীটা আমার তাঁবুতে ঢুকে পড়লে সে বুঝতে পারে যে ওটা একটা পোষা প্রাণী।

আমার চাকর তাকে বুদ্ধি দিয়েছিল যে আমি ফিরে আসবার আগেই সে যেন সরে পড়ে, কিন্তু সে তা করতে চায় নি। তার কথাটা বলে সে বলল যে পরদিন ভোরবেলাই সে তার গ্রাম থেকে একজন হাড়-জোড়া-দেবার লোক নিয়ে আসবে। আহত প্রাণীটির জন্যে আমার কিছুই করবার ছিল না। শুধু তাকে একটি নরম বিছানা করে দিলুম, আর ঘন-ঘন তাকে দুধ খাওয়াতে লাগলুম। তারপর, পরদিন ভোর হতেই সেই লোকটি একজন হাড়-জোড়বার লোক নিয়ে এল।

ভারতবর্ষে কাউকে চেহারা দিয়ে বিচার করতে যাওয়াটা বোকামি। এই হাড্ডি-জোড়নেওয়ালাটি ছিল একজন দুর্বল বৃদ্ধ লোক। তার চেহারায় আর ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকে দারিদ্র্যের সব চিহ্ন ফুটে উঠেছে। কিন্তু তা হলেও সে একজন গুণী লোক। লোকটি কথা বলে কম।

সে আমাকে আহত জীবটিকে তুলে ধরতে বলে কয়েক মিনিট ধরে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে ঘুরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলে গেল যে সে দু-ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসবে।

আমি মাসের পর মাস ধরে প্রতিদিন কাজ করে আসছিলুম। তাই ভাবলুম একবেলা ছুটি নিলে অন্যায় হবে না। বুড়ো ফিরে আসবার আগে আমি কাছের জঙ্গল থেকে কয়েকটা খুঁটি কেটে নিয়ে এসে তাঁবুর এক কোণে ছোট খোঁয়াড় তৈরি করলুম। লোকটি যখন ফিরে এল তখন সঙ্গে নিয়ে এল ছাল-ছাড়ানো কয়েকটা পাটের কাঠি, সবুজ রঙের খানিকটা কাই, থালার মত বড়-বড় কয়েকটা রেড়ির পাতা আর এক গুলি সরু পাটের সুতো।

টিড্‌লি-ডি-উইংক্‌স্‌কে আমার হাঁটুর উপর ফেলে আমি আমার ক্যাম্পখাটের কিনারায় বসলুম। তার দেহের ভারের কতকটা তার পিছনের দুই পায়ের উপর, আর কতকটা আমার হাঁটুর উপর রইল। তার সামনে মাটিতে সেই বুড়ো তার সব সরঞ্জাম হাতের কাছে নিয়ে বসল।

সামনের দু-পায়ের হাড়ই হাঁটুর আর ছোট্ট খুরের মাঝামাঝি জায়গায়

কেটে গিয়েছিল, আর দু-পায়েরই আলগা অংশ মুচড়ে পাকিয়ে গিয়েছিল। বুড়ো খুব সন্তর্পণে পাকগুলি খুলে, হাঁটু থেকে খুর পর্যন্ত সবটাতেই সেই সবুজ রঙের ঘন কাইটা লেপে, সেটাকে ধরে রাখবার জন্যে তার উপর ফালি-ফালি রেড়ির পাতা বিছিয়ে, পাটের সুতো দিয়ে সেগুলোকে পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে গেল।

পরদিন সকালবেলা পাটকাঠি বেঁধে তৈরি-করা বন্ধ ফলক নিয়ে সে ফিরে এল। সেগুলো পায়ে লাগানো হয়ে গেলে টিড্‌লি-ডি-উইংকস্ তার হাঁটু মুড়ে খুর মাটিতে ঠেকাতে পারল। বন্ধ ফলক থেকে খুরদুটি ইঞ্চিখানেক বেরিয়ে ছিল।

হাড় জোড়বার জন্যে পারিশ্রমিক হল এক টাকা, আর ওষুধটার মাল-মসলার এবং সুতোর গুলি বাজারে কিনতে গিয়েছিল দু-আনা। যতদিন না বন্ধ-ফলকগুলো খোলা হল এবং হরিণশিশুটি আবার লাফিয়ে বেড়াতে পারল, ততদিন ঐ বৃদ্ধ তার পারিশ্রমিকও নেয় নি, আমি কৃতজ্ঞ হয়ে তাকে যে সামান্য উপহার দিতে চাইলুম তাও নেয় নি।

আমার কাজের প্রতিটি দিন আমার ভাল লাগত। সে কাজ এখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। যে-টাকা আমি খরচ করেছিলুম তার হিসেব দিতে আমি সদর-দপ্তরে যাচ্ছিলুম। নতুন চাকরি খুঁজতে হবে, এই ভয়ও ছিল। কেননা সব ইঞ্জিনগুলিকেই কয়লা-পোড়ানো ইঞ্জিনে পরিণত করা হয়ে গিয়েছিল বলে জ্বালানী কাঠের আর দরকার ছিল না।

আমার খাতাপত্র সব একেবারে ঠিকঠাক ছিল, এবং আমি বুঝতে পারছিলুম যে আমি ভালভাবেই কাজটি করেছি, কেননা যে-কাজে দু-বছর লাগবে বলে ধরা হয়েছিল, তা আমি আঠার মাসে শেষ করেছিলুম। তবু যে স্বস্তি পাচ্ছিলুম না, তার কারণ হল তোরঙ্গের ঐ টাকার থলিটা।

আমার গন্তব্য স্থান সমস্তিপুরে পৌঁছলুম সকাল ন-টার সময়। মালপত্র ওয়েটিং-রুমে রেখে আমি খাতাপত্র আর দুশো টাকার থলিটা নিয়ে আমার ডিপার্টমেন্টের কর্তার অফিসে গেলুম। সেখানে একটি জাঁকালো চেহারার দারোয়ান বললে যে তার মনিব ব্যস্ত আছেন, আমাকে বসতে হবে।

খোলা বারান্ডাটা তখন তেতে উঠেছে। যতই সময় যেতে লাগল, আমার মন ততই চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। রেলের একজন পুরনো লোক আমাকে খাতাগুলি লিখতে সাহায্য করেছিল। সে বলেছিল যে আমি যদি সীল-করা হিসেব দাখিল করেও স্বীকার করি যে আমার হাতে বাড়তি দুশো টাকা আছে (সেটা স্বীকার করবার ইচ্ছে আমার পুরোপুরিই ছিল), তাহলে আমি ভয়ানক মুশকিলে পড়ে যাব।

শেষে দরজাটা খুলে গেল, এবং অত্যন্ত বিব্রত চেহারার একটি লোক

বেরিয়ে এল। দারোয়ান দরজাটা বন্ধ করতে পারার আগেই ঘরের ভিতর থেকে একটা গলা হুঙ্কার করে আমাকে ভিতরে আসতে বলল। বেঙ্গল অ্যান্ড নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের লোকোমোটিভ ডিপার্টমেন্টের কর্তা রাইল্‌স্‌ সাহেবের ওজনখানা ছিল পৌনে তিন মণেরও বেশি, গলার আওয়াজখানা ছিল তাঁর অধীন লোকেদের বুক-কাঁপানো, আর হৃদয়টি ছিল অতি উঁচুদরের।

আমাকে বসতে হুকুম করে, আমার খাতাপত্র টেনে নিয়ে একজন কেরানীকে ডেকে আনিয়ে তিনি যত্ন সহকারে আমার হিসেবের সঙ্গে যে-যে স্টেশনে কাঠ পাঠানো হয়েছিল তাদের হিসেব মিলিয়ে দেখলেন। তারপর তিনি বললেন আমার চাকরি আর থাকবে না বলে তিনি দুঃখিত, আর আজই কিছুক্ষণ বাদে আমাকে ছাঁটাইয়ের হুকুমটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই ভাবেই তিনি জানালেন যে সাক্ষাৎকার শেষ হয়েছে। টুপিটা তুলে নিয়ে আমি চলে আসবার উপক্রম করতেই তিনি আমাকে ডেকে বললেন যে টেবিলে রাখা একটা টাকার থলি সঙ্গে নিয়ে যেতে আমি ভুলে গিয়েছি।

টাকার থলিটা রেখে বেশ বেরিয়ে আসতে পারব, এ কথাটা ভাবা আমার একটা বোকামিই হয়েছিল, কিন্তু রাইল্‌স্‌ যখন আমাকে ডাকলেন তখন আমি ঠিক তাই করবার চেষ্টাই করছিলুম।

আমি টেবিলে ফিরে গিয়ে তাঁকে বললুম যে টাকাটা রেল-কোম্পানিরই টাকা, আর আমার খাতায় ওটাকে কিভাবে দেখাব তা ঠিক করতে না পেরে আমি টাকাটা নিয়ে তাঁর কাছে এসেছি।

রাইল্‌স্‌ বললেন, 'আপনার খাতা-পত্র তো মিল করা আছে। যদি সেগুলো জাল না হয়, তাহলে এর মানে কি, তা আমি জানতে চাই?'

হেডক্লার্ক তেওয়ারি এক ট্রে-ভরতি কাগজপত্র নিয়ে ঘরে এসে পড়েছিলেন। আমি যখন রাইল্‌স্‌কে নিম্নলিখিত কৈফিয়ত দিচ্ছিলুম, তখন তিনি রাইল্‌সের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর সহানুভূতি-ভরা চোখদুটি দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

আমার কাজ যখন শেষ হয়ে আসছিল তখন এক রাত্রিতে পনের জন গাড়োয়ান আমার কাছে এল। তারা বন থেকে কাঠ নিয়ে রেল-লাইনের কাছে পৌঁছে দেবার কাজ করছিল। তারা বলল যে ফসল কাটবার জন্যে এক্ষুনি তাদের গ্রামে ফিরে যেতে হবে বলে জোর তাগাদা এসেছে। তাদের গাড়িতে করে নেওয়া কাঠ নানা জায়গায় ছড়ানো ছিল, সে-সব গাদা করে মাপ নিতে কয়েকটা দিন কেটে যাবে। তাই তারা আমাকে তাদের পাওনার মোটামুটি হিসেব করে দিতে বলল, কেননা সেই রাত্রেই তাদের রওনা হয়ে যাওয়াটা একান্ত দরকার।

রাত ছিল অন্ধকার। আমার পক্ষে কাঠের মাপ হিসেব করা তখন নিতান্তই

অসম্ভব। তাই বললুম যে আমি তাদের দেওয়া হিসাবই মেনে নেব। দু-ঘণ্টার মধ্যে তারা ফিরে এল। টাকা দেবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাত্রির অন্ধকারে তাদের গাড়ি চলে যাবার ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ শুনতে পেলুম। আমার কাছে তারা তাদের ঠিকানা রেখে যায় নি। কয়েক সপ্তাহ বাদে কাঠগুলো গাদা করে সাজিয়ে মেপে দেখা গেল যে তাদের পাওনার হিসেবে দুশো টাকা কম ধরেছিল।

কাহিনীটা বলা হয়ে গেলে রাইল্‌স্‌ আমাকে জানালেন যে রেলের এজেন্ট আইজাট সাহেব পরদিনই সমস্তিপুরে আসবেন বলে আশা আছে। তাঁর উপরেই রাইল্‌স্‌ আমার ব্যাপারটা ছেড়ে দেবেন।

ভারতের সবচেয়ে উন্নতিশীল তিনটি রেলপথের সর্বময় কর্তা আইজাট পরদিন সকালবেলা এসে পৌঁছলেন। দুপুর বেলা রাইল্‌সের অফিসে আমার ডাক পড়ল।

আমি যখন ঘরে ঢুকলুম তখন আইজাট একাই সেখানে বসে ছিলেন। ছোটখাট ফিটফাট মানুষটি, দুই চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। নির্দিষ্ট সময়ের ছ-মাস আগেই কাজ শেষ করেছি বলে প্রথমেই আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি আমাকে বললেন যে রাইল্‌স্‌ তাঁকে আমার খাতা-পত্র দেখিয়ে একটা খবর দিয়েছেন। তিনি শুধু একটি কথা জানতে চান : কেন আমি ঐ দুশো টাকা আত্মসাৎ করে এ কথাটা চেপে যাই নি? তার উত্তরে যা বললুম, তা বোধহয় তাঁর কাছে সন্তোষজনক হয়েছিল।

সেইদিনই সন্ধেবেলা যখন আমি স্টেশনে বসে অনিশ্চয়তার মধ্যে দোল খাচ্ছি, তখন আমি দুখানা চিঠি পেলুম। একখানাতে 'রেলকর্মিগণের বিধবা ও অনাথ শিশুদের ভান্ডার'-এ আমি দুশো টাকা দান করেছি বলে তেওয়ারিজী ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কেননা তিনিই সেই ভান্ডারের অবৈতনিক সম্পাদক। অপর চিঠিখানা লিখেছেন আইজাট। তাতে তিনি জানিয়েছেন যে আমাকে চাকরিতে রাখা হল, আমি যেন কাজের নির্দেশের জন্যে রাইল্‌সের কাছে হাজির হই।

এরপর একটি বছর ধরে ঐ রেলপথের এদিকে-ওদিকে নানা ধরনের কাজে ঘুরে বেড়ালুম। কখনও বা কয়লার খরচ সম্বন্ধে এস্তেলা দেওয়ার জন্যে ইঞ্জিনের পাদানিতে চেপে ঘুরেছি—সে কাজটা আমার পছন্দ ছিল, কেননা তখন আমাকে ইঞ্জিন চালাতে দেওয়া হত। কখনও বা মালগাড়ির গার্ডগিরি করেছি—সেটা একটা বিরক্তিকর কাজ, কেননা তখন কর্মচারীর সংখ্যা কম ছিল বলে এক-একবার আমাকে এক নাগাড় আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতেও হয়েছে। আবার কখনও বা সহকারী স্টোর-কীপার অথবা সহকারী স্টেশন-মাস্টারের কাজও করেছি।

তারপর একদিন হুকুম এল যে আমি যেন মোকামা ঘাটে ফেরি-সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্টরার সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। বেঙ্গল অ্যান্ড নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়েটি গঙ্গা থেকে কম-বেশি দূরে-দূরে গাঙ্গেয়-উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। তার কয়েক জায়গায় মূল রেলপথ থেকে শাখা-রেলপথ বেরিয়ে গঙ্গা-তীর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সেখান থেকে ফেরি-স্টীমার দিয়ে অপর পারের বড় লাইনের রেলপথগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। গঙ্গার ডান পারে মোকামা ঘাট হচ্ছে এই সংযোগগুলির মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

সকালবেলাই আমি সমস্তিপুর থেকে রওনা হয়ে শাখা-লাইনের প্রান্তে সামারিয়া ঘাটে এসে 'গোরখপুর' স্টীমারে চড়লুম। আমার আসার কথা স্টরারকে আগেই জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁকেও আর কিছু বলা হয় নি, আমিও জানতুম না আমাকে কেন মোকামা ঘাটে আসতে বলা হয়েছে। তাই দিনের খানিকটা তার বাড়িতে কাটানো গেল, আর বাকিটা কাটল বিরাট-বিরাট মাল-গুদামগুলি ঘুরে দেখে-দেখে।

দেখলুম যে সেগুলিতে মালের বড্ড গাদাগাদি। দু-দিন বাদে আমাকে গোরখপুরে ডাকা হল। সেটাই ঐ রেলপথের সদর-দপ্তর। সেখানে জানতে পেলুম যে আমাকে মোকামা ঘাটে ট্রেন আর স্টীমার থেকে মাল নামিয়ে, তা স্টীমারে আর ট্রেনে তুলে দেবার কাজ দেখাশোনা করতে হবে। আবার মাইনেও বাড়িয়ে একশো থেকে দেড়শো টাকা করে দেওয়া হল। তাছাড়া, এক সপ্তাহ বাদেই আমাকে মাল চালাচালি করবার ঠিকে নিতে হবে।

কাজেই ফিরে আবার মোকামা ঘাটেই এলুম। এবার এসে পৌঁছলুম রাত্রিবেলা। এমন কাজ নিতে হবে যার আমি কিছুই জানি না, এমন ঠিকাদারি করতে হবে যার জন্যে লোক পাব কি না তাও জানি না। আর, সবচাইতে গুরুতর কথা এই যে, আমার পুঁজি মোটে দেড়শোটি টাকা—যা আমি আড়াই বছর চাকরি করে জমিয়েছিলুম।

স্টরার এবার আমার আসবার আশায় ছিলেন না, কিন্তু তিনি আমাকে খেতে দিলেন। কেন ফিরে এসেছি সে কথা তাঁকে বললুম। নদী থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে বারান্দায় বইছিল। সেখানে চেয়ার নিয়ে গিয়ে আমরা অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলুম

স্টরারের বয়স আমার দ্বিগুণ, আর তিনি মোকামায় ছিলেনও কয়েক বছর। ছোট-লাইন-বিশিষ্ট বেঙ্গল অ্যান্ড নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলপথে যত দূর-পাল্লার যাত্রী ও মাল চলাচল করে, তার শতকরা আশি ভাগই মোকামা ঘাট যায়। প্রতি বৎসর মার্চ থেকে রেল-কোম্পানির গুরুতর ক্ষতি হয়।

মোকামা ঘাটে দুই রেলপথের মাপের তফাতের জন্যে এক রেলপথের মাল

নামিয়ে অন্যটাতে তুলে দিতে হত। যে কোম্পানি এ-কাজটা করত সেই কোম্পানিই বড়-লাইনের আগাগোড়া সমস্ত মাল তোলাইয়ের কাজের ঠিকাদার ছিল।

স্টরারের মতে প্রতি বছর মাল জমে যাবার কারণ হল দুটো : মিটারগেজ রেলপথের স্বার্থ সম্বন্ধে এই কোম্পানির উদাসীনতা, এবং গাঙ্গেয়-উপত্যকায় ফসল কাটবার সময়ে অন্য কাজের জন্যে মজুরের অভাব হওয়া। এই খবরটি আমাকে দিয়ে তিনি অতি সমীচীনভাবেই আমাকে জিগ্যেস করলেন যে, কোম্পানি তাদের প্রচুর সংগতি সত্ত্বেও যে-কাজ করতে পারে নি, আমি এ অঞ্চলে একেবারে নতুন লোক হয়ে এবং বিনা সম্বলে কি করে সে-কাজ করব বলে ঠিক করেছি?

আমার কষ্টার্জিত সঞ্চয়টুকুর কথা তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই নিলেন না। তিনি এও বললেন যে মোকামা ঘাটের মালগুদামগুলো ছাদ পর্যন্ত মালে ঠাসা হয়ে রয়েছে, স্টেশন-ইয়ার্ডে চারশো মালগাড়ি খালাস হবার জন্যে পড়ে রয়েছে, এবং নদীর ওপারে আরও হাজারখানা অপেক্ষা করে রয়েছে কবে তাদের এপারে নিয়ে আসা হবে।

তিনি এই বলে উপসংহার করলেন, 'আপনাকে আমার উপদেশ এই যে, ভোরের স্টীমার ধরে সামারিয়া ঘাট হয়ে সোজা গোরখপুর ফিরে গিয়ে রেল-কর্তৃপক্ষকে বলুন যে এই মাল-চালাচালির কাজের মধ্যে আপনি নেই।'

পরদিন আমি ভোরেই উঠলুম। কিন্তু সামারিয়া ঘাটের স্টীমার না ধরে আমি গুদামগুলি আর স্টেশন-ইয়ার্ডটা দেখতে গেলুম। স্টরার অতিরঞ্জন করেন নি। বলতে গেলে তিনি যা বলেছিলেন, অবস্থা আসলে তার চাইতেও খারাপ। কেননা চারশো মিটার-গেজ (ছোট লাইনের) মালগাড়ি ছাড়া আরও শ-চারেক ব্রড-গেজ (বড় লাইনের) মালগাড়িও খালাস হবার অপেক্ষায় ছিল। আন্দাজ করলুম যে পনের হাজার টন মাল মোকামা ঘাটে পড়ে রয়েছে, আর এই বিপুল বিশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করতে পাঠানো হয়েছে আমাকে।

আমার তখন বয়স পুরো একুশও হয় নি, আর গ্রীষ্মকালও এসে পড়ছিল, যে সময়টা সবাই একটু-আধটু খেপে যায়। যতক্ষণে রামশরণজীর সঙ্গে দেখা হল, ততক্ষণে আমি ঠিক করে ফেলেছি যে, ফল যাই হ'ক, এ কাজ আমি নেব।

রামশরণ ছিলেন মোকামা ঘাটের স্টেশন মাস্টার। সেই পদে তিনি তখন দু-বছর যাবৎ আছেন। তিনি আমার চাইতে কুড়ি বছরের বড় এবং পাঁচটি সন্তানের পিতা। তাঁর প্রকাণ্ড মিশকালো এক দাড়ি ছিল। আমার আসার কথা তাঁকে টেলিগ্রামে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি জানতেন না যে মাল-চালাচালি করবার ঠিকাটা আমি নেব। আমি তাঁকে এই খবরটা দিতে তাঁর মুখখানা হাসিতে ভরে গেল।

তিনি বললেন, 'ভালই হল, স্যর, খুব ভাল হল। আমরা ঠিক চালিয়ে

নেব।' ওই 'আমরা' শব্দটি শুনে আমি তাঁকে ভালবেসে ফেললুম। চৌত্রিশ বছর ধরে, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই ভালবাসা অটুট ছিল।

সেদিন ছোটহাজরি খেতে খেতে আমি স্টরারকে বললুম যে আমি ঠিকাদারিটা নেওয়াই ঠিক করেছি। তিনি বললেন যে মূর্খরা কখনও ভাল কথা নেয় না। কিন্তু তিনি এ-ও বললেন যে তিনি যতদূর সাধ্য আমাকে সাহায্য করবেন। এ প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিলেন। এর পর কয়েক মাস ধরে তিনি আমাকে মালগাড়ি যোগান দেবার জন্যে দিনরাত তাঁর খেয়া (ফেরি) চালু রেখেছিলেন।

গোরখপুর থেকে আসতে দুটো দিন লেগে গিয়েছিল। কাজেই, যখন মোকামা ঘাটে এলুম তখন আমার কাজ বুঝে নিতে আর ঠিকাদারিটা নেবার সব ব্যবস্থা করতে হবে আর পাঁচটি দিনের মধ্যে।

প্রথম দু-দিন কাটল আমার কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচিত হতে। তাদের মধ্যে রামশরণ ছাড়া একজন চমৎকার বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি ছিলেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার। তাঁর নাম চ্যাটার্জি—বয়সে আমার ঠাকুরদা হবার যোগ্য। এ ছাড়া পঁয়ষট্টি জন কেরানী, আর শাণ্টার, পয়েণ্টসম্যান এবং পাহারাওয়ালা মিলিয়ে শ-খানেক।

আমার কার্যক্ষেত্রটি নদীর উপরে সামারিয়া ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখানেও কেরানীতে আর অন্য সবে মিলিয়ে পুরো শ-খানেক লোক থাকত। এই দু-জায়গায় কর্মচারীদের দেখা-শোনা করা ও চলাচলের সময় মালের তদারক করাই এক ভয়ংকর কাজ, তার উপর আবার এসে পড়েছিল আর একটা দায়িত্ব—মোকামা ঘাট দিয়ে প্রতি বছর যে পাঁচ লক্ষ টন মাল-চলাচল করে, তা নির্ঝঞ্ঝাটে যাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে যথেষ্ট-সংখ্যক মজুরের যোগান দেওয়া।

কোম্পানির লোকেরা কাজ হিসেবে মজুরি পেত। মোকামা ঘাটে সব কাজ বন্ধ হয়ে ছিল বলে শ-কয়েক ক্ষুব্ধ লোক গুদামগুলোর এদিক-ওদিকে বসে থাকত। ছোট লাইনের রেলপথের হয়ে আমি মাল-চালাচালির কাজটা করব শুনে তারা অনেকে আমার কাছে কাজ করতে চাইল।

কোম্পানির পুরনো মজুরদের নিযুক্ত করব না বলে কোনো চুক্তি না থাকলেও আমি সেটা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভাবলুম। কিন্তু তাদের আত্মীয়দেব কেন নিযুক্ত করব না তার কোনো কারণ পেলুম না বলে যে তিনটি দিন হাতে ছিল তার প্রথম দিনটিতেই আমি বার জন লোককে ঠিক করে নিয়ে তাদেব সর্দার নিযুক্ত করলুম। এদের মধ্যে এগার জন প্রত্যেকে দশ জন করে মজুর এনে দেবে বলে কথা দিল।

গোড়ার দিকে এরাই মাল-তোলাইয়ের কাজটা করবে। বাকি এক জন কয়লা বইবার জন্যে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে ষাটজন লোক দেবার ভার নিল। যে-সব

মাল নিয়ে কাজ তার মধ্যে নানা ধরনের দ্রব্য থাকত বলে ভিন্ন-ভিন্ন দ্রব্যের জন্যে নানা জাতের লোক নিযুক্ত করতে হল। তাই বারজন সর্দারের মধ্যে আটজন হল হিন্দু, দু-জন মুসলমান এবং বাকি দু-জন অনুন্নত জাতের। বারজনের মধ্যে এক জনেরই মাত্র অক্ষর-পরিচয় ছিল বলে আমি তাদের হিসেব লেখবার জন্যে এক জন হিন্দু আর এক জন মুসলমান কেরানী নিযুক্ত করলুম।

যখন এক কোম্পানিই দুই রেলপথের কাজ করছিল তখন মাল-চালাচালি হত ওয়াগন থেকে ওয়াগনে। এখন থেকে প্রত্যেক রেলপথকেই নিজের মাল খালাস করে গুদামে রাখতে হত, তারপর আবার গুদাম থেকে ওয়াগনে বোঝাই দিতে হত।

ভারি যন্ত্রপাতি আর কয়লা ছাড়া সব শ্রেণীর মালের জন্যেই আমি প্রতি হাজার মণ মাল নামাবার কিংবা ওঠাবার জন্যে এক টাকা সাত আনা হিসেবে পেতুম। ভারি যন্ত্রপাতি আর কয়লা শুধু এক দিকেই যেত। এই দুটি জিনিসকে সরাসরি ওয়াগন থেকে ওয়াগনে নিতে হত বলে শুধু একজন ঠিকাদারকে এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা যেত। আমাকেই এ কাজটা দেওয়া হল। তার জন্যে পেতুম প্রতি হাজার মণ খালাস কিংবা বোঝাইয়ের জন্যে এক টাকা চার আনা হিসেবে। আশি পাউণ্ডে এক মণ হয়, কাজেই হাজার মণে হয় ৩৫ টনেরও বেশি। এই নিরিখ অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু দুই রেল-পথের নথিপত্র দেখে এ কথার সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে।

শেষদিন সন্ধেবেলা নাম ডেকে জানা গেল যে আমার এগার জন সর্দার আছে, যাদের প্রত্যেকের দশ জন করে মজুর আছে। এবং অন্য একটি সর্দারের অধীনে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে আছে যাট জন। এদের, আর দু-জন কেরানীকে নিয়েই আমার বাহিনী সম্পূর্ণ হল। পরদিন ভোর হতেই আমি গোরখপুরে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলুম যে আমি ট্র্যানশিপমেণ্ট-ইন্‌সপেক্টর হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছি এবং মাল-তোলাইয়ের কাজের ঠিকাদারিও নিয়েছি।

বড় লাইনে রামশরণের সমপদস্থ ছিলেন টম কেলি নামে একজন আইরিশ-ম্যান। তাঁর তখন মোকামা ঘাটে কয়েক বছর থাকা হয়ে গিয়েছে। আমি কাজটা পারব বলে তাঁর কিছুমাত্র ভরসা ছিল না, তবু তিনি উদারভাবে আমাকে যথাসাধ্য সবরকমে সাহায্য করতে চাইলেন।

মালে গুদাম সব ঠাসা-বোঝাই, ওদিকে প্রতি রেলওয়ের চারশোখানা করে ওয়াগন খালাস হবার জন্যে বসে আছে—এ অবস্থায় গুদামে জায়গা খালি করে মাল চলাচল ব্যবস্থা করতে হলে গুরুতর কিছু একটা করতেই হয়। তাই কেলির সঙ্গে ব্যবস্থা করলুম যে ঝুঁকি নিয়ে গুদামের বাইরে খোলা জায়গায় এক হাজার মণ গম মাটিতে নামিয়ে রাখব। খালি-করা ওয়াগনগুলোকে সরিয়ে

দিয়ে গুদামে খানিকটা জায়গা করে দিলে কেলি সেখানে হাজার মণ লবণ আর চিনি খালাস করে দেবেন। তখন খালি ওয়াগনগুলো সরিয়ে নিয়ে কেলি আমার জন্যে গুদামে খানিক জায়গা করে দেবেন।

এই বুদ্ধিতে চমৎকার কাজ হল। হাজার মণ গম খোলাভাবে পড়ে থাকার সময় আমার সৌভাগ্যক্রমে বৃষ্টি হল না! দশদিনের মধ্যে আমরা গুদামে জমে-থাকা মাল তো সাফ করে ফেললুমই, ওয়াগনের ভিড়ও পরিষ্কার করে ফেললুম। তারপর কেলি আর আমি পরস্পরের সদর দপ্তরে খবর দিয়ে দিলুম যে মালের বুকিং আবার শুরু করা চলতে পারে। পনেরো দিন যাবৎ মালের বুকিং বন্ধ ছিল।

গ্রীষ্মকালের গোড়ার দিকে আমি ঠিকাদারিটা নিই। ভারতের রেলপথ-গুলিতে মাল-চলাচল এই সময়টাতেই সবচাইতে বেশি হয়। বুকিং খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল অ্যান্ড নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে থেকে এবং বড় লাইন থেকে অবিরাম মাল এসে পড়তে লাগল মোকামা ঘাটে।

যে-হারে আমাকে ঠিকা দেওয়া হয়েছিল, ভারতে সেটা ছিল নিম্নতম হার। আমার মজুরদের ঠিক রাখতে হলে তাদের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কম রাখতে হবে, আর তাদের দিয়ে কঠিন পরিশ্রম করাতে হবে। তাহলেই এরা এ ধরনের কাজে অন্য মজুররা যা পায়, তার সমান কিংবা হয়তো একটু বেশিও পেতে পারে। মোকামা ঘাটে সব মজুরিই দেওয়া হত কাজের পরিমাণ অনুসারে। প্রথম সপ্তাহের শেষে আমার লোকরা আর আমি মহা আনন্দিত হয়ে দেখলুম যে অন্তত কাগজে-পত্রে দেখা যাচ্ছে যে, কোম্পানির লোকরা যা পেত, এরা তার দেড়গুণ করে রোজগার করছে।

আমাকে ঠিকাদারি দেবার সময় কথা হয়েছিল যে আমাকে রেল-কোম্পানি হপ্তায়-হপ্তায় টাকা দেবে, তাই আমিও মজুরদের সেইভাবে টাকা দেব বলে কথা দিয়েছিলুম। কিন্তু কথা দেবার সময় রেল কোম্পানির খেয়াল ছিল না যে ঠিকাদার বদল হবার দরুন তাদের হিসেব-পরীক্ষা বিভাগে যে-সব জটিলতার সৃষ্টি হবে, তা কাটাতে অনেক সময় লাগবে।

রেল-কোম্পানির কাছে এটা তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু আমার পক্ষে মোটেই তা নয়। মোকামা ঘাটে যখন আসি, তখন আমার মোট পুঁজি ছিল দেড়শোটি টাকা। দুনিয়ায় এমন কেউ ছিল না যার কাছে ধার চাইতে পারি। কাজেই, রেল-কোম্পানি আমাকে টাকা না দিলে, আমিও আমার লোকদের টাকা দিতে পারব না।

এই কাহিনীর নাম দিয়েছি 'আনুগত্য'। মোকামা ঘাটে প্রথম তিন মাসে শুধু আমার মজুরদের থেকে নয়, রেল কর্মচারীদের থেকেও যে-পরিমাণ আনুগত্য পেয়েছিলাম, আমার মনে হয় না যে কখনও তার চাইতে বেশি পাওয়া

সম্ভব। মানুষ কখনও এর চাইতে বেশি খেটেছে বলেও আমার মনে হয় না।

সপ্তাহের সাতটা দিনই কাজ শুরু হত ভোর চারটের সময়, আর একটানা চলত রাত আটটা পর্যন্ত। মাল পরীক্ষা করা আর মিলিয়ে দেখার ভার যে কেরানীদের উপরে ছিল তারা বিভিন্ন সময়ে খেতে যেত, যাতে কাজ কখনও থেমে না থাকে। মজুরদের খাবার তাদের বাড়ির স্ত্রীলোকেরা নিয়ে আসত, তারা গুদামে বসেই তা খেয়ে নিত।

সেকালে না ছিল ট্রেড ইউনিয়ন, না ছিল 'দাসত্ব', না ছিল 'দাসদের নির্যাতন'। প্রত্যেকেরই ইচ্ছামত যতটুকু কিংবা যত বেশি কাজ করবার স্বাধীনতা ছিল। প্রত্যেকেই সুখে এবং সানন্দে কাজ করত। কেননা, যে-প্রেরণা না থাকলে লোকে ভাল করে কাজ করতে পারে না, তা তাদের থাকতই—তা সেটা পরিবারের জন্যে একটু ভাল খাওয়া আর কাপড় জোটানোই হ'ক, অথবা অকেজো বলদটার বদলে একটা নতুন বলদ কেনাই হ'ক, কিংবা দেনা-শোধই হ'ক।

লোকজনের কাজ থামলেও রামশরণের আর আমার কাজ শেষ হত না। কেননা চিঠিপত্র দেখতে আর লিখতে হত, এবং পরের দিনের কাজের ছক আর ব্যবস্থা করে রাখতে হত। প্রথম তিন মাসে আমরা কেউই রাত্রে চার ঘণ্টার বেশি ঘুমোতে পাই নি। আমার বয়স ছিল একুশ, আর আমি ছিলাম লোহার মত শক্ত। কিন্তু রামশরণজী ছিলেন আমার চেয়ে কুড়ি বছরের বড়, এবং কমজোরী। তিন মাসে তাঁর সাত সের ওজন কমে গেল, কিন্তু তাঁর স্ফূর্তি কমল না একটুও।

টাকার অভাবের জন্যে সর্বদাই উদ্বেগ ভোগ করতুম। শেষে যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেতে লাগল, সেই উদ্বেগটা তখন একটানা একটা বীভৎস বিভীষিকায় পরিণত হল।

প্রথমে সর্দাররা, তারপর মজুরেরা তাদের সস্তা দামের আর দেখলে-দয়া হয় এমন গয়না একে-একে বাঁধা দিল। তারপর তাদের ধার পাওয়াও বন্ধ হল।

ব্যাপারটাকে আরও খারাপ করে তুলল আগেকার কোম্পানির লোকরা। তাদের চাইতে আমার লোকরা বেশি রোজগার করছে বলে তারা হিংসেয় জ্বলছিল। এখন তারা আমার লোকদের ঠাট্টা করতে লাগল। কয়েকবার খুব অল্পের জন্যেই বিশ্রী ঘটনা হতে-হতে বেঁচে গেল। কেননা, প্রায় না খেয়ে থেকেও আমার লোকরা আনুগত্য হারায় নি। কেউ-কেউ যদি বা এমন একটু সামান্য ইঙ্গিতও করত যে আমি তাদের বোকা বুঝিয়ে আমার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি এবং তারা কখনও তাদের রোজগারের একটি পয়সারও মুখ দেখতে পাবে না, তাহলে তারা তার সঙ্গে মারামারি করতে প্রস্তুত ছিল।

সে বছর বর্ষা আসতে দেরি হচ্ছিল। অদৃশ্য কোনো হাপর থেকে হাওয়া

পেয়েই বোধহয় আকাশের লাল গোলাটা প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সুদীর্ঘ এক ক্লান্তিকর দিনের শেষে সামারিয়া ঘাট থেকে এক টেলিগ্রাম এল যে এক-খানা ইঞ্জিন উলটে গিয়েছে। গঙ্গা পার হয়ে মোকামা ঘাটে ওয়াগন নিয়ে আসে যে-সব বড় নৌকো, সেগুলিতে যোগান আসে যে-লাইন দিয়ে সেই লাইনেই এই কান্ড হয়েছে।

একখানা লঞ্চ আমাকে ও-পারে নিয়ে গেল। তারপর তিন ঘণ্টার মধ্যে দু-বার হ্যান্ড-জ্যাকের সাহায্যে ইঞ্জিনখানাকে লাইনে তোলা হল, দু-বারই সেটা পড়ে গেল। যতক্ষণ না হাওয়া কমল এবং কাঠের স্লীপারগুলোর তলায় গুঁড়ো-গুঁড়ো বালি ঠেসে দেওয়া হল, ততক্ষণ ইঞ্জিনখানাকেও আর একবারও বসানো যায় নি, লাইনটাকেও চালু করা যায় নি।

শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে আর বালি আর হাওয়া লেগে চোখদুটো লাল হয়ে আর ফুলে উঠেছে এমন অবস্থায় আমি ফিরে এসে আমার সেদিনকার প্রথম খাওয়া খেতে বসেছি, অমনি আমার বার জন সর্দার লাইন করে ঘরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু আমার চাকর আমার সামনে একখানা প্লেট রাখছে দেখে তারা ভারতীয়দের সহজাত ভদ্রতা দেখিয়ে আবার লাইন করে বেরিয়ে গেল। তারপর আমি আমার বড়হাজরি খেতে-খেতে শুনতে পেলুম যে বারান্দায় এইরকম একটা কথাবার্তা চলছে :

একজন সর্দার—'সাহেবের সামনে যে প্লেটটা রাখলে, তাতে কী ছিল?'

আমার চাকর—'একখানা চাপাটি আর একটু ডাল।'

একজন সর্দার—'শুধু একখানা চাপাটি আর একটু ডাল কেন?'

আমার চাকর—'আর বেশি কেনবার পয়সা নেই বলে।'

একজন সর্দার—'সাহেব আর কী খেয়েছেন?'

আমার চাকর—'কিচ্ছু না।'

খানিকক্ষণ সব চুপ। তারপর একজন সর্দারের গলা শোনা গেল। সে সকলের চেয়ে বয়সে বড়, জাতে মুসলমান। তার মস্ত দাড়ি হেনায় রঙানো। সে বললে : 'বাড়ি যাও। আমি রইলুম, সাহেবের সঙ্গে কথা বলব।'

চাকর খালি প্লেটখানা সরিয়ে নিয়ে গেলে বুড়ো সর্দারটি ঘরে আসবার অনুমতি চাইল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে বললে : 'আমরা বলতে এসেছিলুম যে আমাদের পেট অনেকদিন ধরে খালি রয়েছে কালকের পর আর কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু এই রাত্রেই দেখলুম যে আপনার দশাও আমাদের মতই খারাপ। আমরা তাহলে যতক্ষণ পড়ে না-যাই ততক্ষণ কাজ করে যাব। সাহেব, আমি তাহলে এখন আপনার অনুমতি হলে বিদায় হচ্ছি। আল্লার দোহাই, আমাদের জন্যে আপনি একটা কিছু করুন!"

কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন আমি গোরখপুরে সদর-দপ্তরে টাকার জন্যে

আবেদন পাঠাচ্ছিলুম। তাতে এইটুকু মাত্র জবাব বের করতে পেরেছিলুম যে আমার বিলগুলির টাকা শিগগিরই দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

দাড়িওলা সর্দারটি চলে যাবার পর আমি হেঁটে টেলিগ্রাফ আপিসে গেলুম। আমার সারাদিনের কাজ সম্বন্ধে প্রতি রাত্রিতে যে রিপোর্ট দিতুম, তার-বাবুটি তখন সেটা তার করছিল। তার টেবিল থেকে একখানা ফরম নিয়ে তাকে বললুম, গোরখপুরে একটি জরুরী খবর দেবার জন্যে লাইন পরিষ্কার করতে হবে।

তখন মাঝরাত্রি পার হয়ে কয়েক মিনিট হয়েছে। এই বলে তার করলুম : 'ভোরের গাড়িতে বার হাজার টাকা পাঠানো হয়েছে, এ-কথা আগে না-জানানো হলে, কাল ঠিক দুপুরবেলা মোকামা ঘাটে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।'

তারটা পড়ে তার-বাবুটি আমার দিকে মুখ তুলে বললে, 'আমার যে-ভাই এখন ওখানে ডিউটিতে আছে, আপনি অনুমতি দিলে আমি তাকে বলতে পারি যে সে যেন সকালবেলা অফিস খোলা পর্যন্ত দেরি না করে এখনই টেলিগ্রামখানা দিয়ে দেয়।'

এর দশ ঘণ্টা বাদে, যখন আমার চরম দাবির মেয়াদের আর দু-ঘণ্টা বাকি, তখন দেখি যে ফিকে হলদে রঙের একখানা খাম নিয়ে একজন তার-পিয়ন আমার দিকে হন-হন করে আসছে। সে মজুরদের যে-দলেরই পাশ দিয়ে আসে, তারাই কাজ ফেলে তার পিছনে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে, কেননা রাত দুপুরে যে তার পাঠিয়েছিলুম তার মর্ম সবাই জানে।

পিয়নটি আমার আপিসের বেয়ারার ছেলে। আমার টেলিগ্রাম পড়া হয়ে গেলে সে জিগ্যেস করল খবর ভাল কি না। খবর ভাল, একথা আমি বলতেই সে তীরবেগে ছুটল। আর গুদামগুলির পাশ দিয়ে তার যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আনন্দের কোলাহল উঠতে লাগল। পরদিন সকালের আগে টাকা এসে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু সুদীর্ঘ মাসের পর মাস যারা অপেক্ষা করেছে, এই কয়েক ঘণ্টায় তাদের কি আর এসে যাবে!

পরদিন এক বখশী আমার আপিসে এসে দেখা দিলেন। তাঁর সঙ্গে আমারই কয়েকজন লোক বাঁশে ঝুলিয়ে আর দু-জন পুলিসের পাহারায় একটি টাকার সিন্দুক নিয়ে এল।

লোকটি হিন্দু, খুব ফুর্তিবাজ। তাঁর দেহটি যতখানি লম্বা ততখানিই চওড়া, আর তা থেকে ঘাম আর মজাদার কথা সমান তালে বেরুচ্ছে। লাল ফিতে দিয়ে তাঁর কপালে একজোড়া চশমা বাঁধা নেই—এমন অবস্থায় আমি তাঁকে কখনও দেখি নি।

আমার আপিসের মেঝেতে ধপ করে বসে পড়ে তিনি গলায় পরানো একটি সুতোয় টান দিয়ে দেহের কোনো গভীর অংশ থেকে একটি চাবি তুলে আনলেন।

তা দিয়ে টাকার সিন্দুকটি খোলা হল। তিনি তার ভিতর থেকে বারোটি থলি তুলে বাইরে আনলেন, তার প্রতিটিতে আনকোরা নতুন এক হাজারটি টাকা।

একখানা টিকিট কেটে তিনি আমার দেওয়া রসিদটিতে সেটা এঁটে দিলেন। তারপর, দুটি খরগোশ আরামে থাকতে পারে এমন একটি পকেটে হাত ডুবিয়ে তিনি একখানা খাম তুলে আনলেন। তাতে আমার তিন মাসের বাকি মাইনে বাবদ সাড়ে চারশো টাকার নোট ছিল।

যখন বারজন সর্দারের প্রত্যেকের হাতে এক হাজার টাকার এক একটি তোড়া দিলুম, তখন যা আনন্দ পেলুম, টাকা দিয়ে এত আনন্দ আর কেউ কখনও পেয়েছে বলে মনে হয় না। আর এও মনে হয় যে টাকা পেয়ে ওদের মত আনন্দও কেউ কখনও পায় নি। যে-উৎকণ্ঠা প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, মোটা লোকটির আবির্ভাবে তা কেটে গেল।

এমন একটা উপলক্ষে কিছু একটা করা উচিত। তাই বাকি দিনটা ছুটি বলে ঘোষণা করা হল। পঁচানব্বুই দিনের মধ্যে আমার লোকরা আর আমি এই প্রথম ছুটি উপভোগ করলুম। অন্যরা যে কি আরামে ছুটির কয়েক ঘণ্টা কাটাল, তা আমি জানি না। আমার বলতে লজ্জা নেই, গভীর আর শান্তিপূর্ণ নিদ্রায় তা কাটিয়ে দিলুম।

একুশ বছর ধরে আমার লোকরা আর আমি মোকামা ঘাটে এই ঠিকাদারি করেছিলুম। এই সারা সময়টার মধ্যে—এমনকি, ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমি যখন এখানে অনুপস্থিত থেকে ফ্রান্সে এবং ওয়াজিরিস্তানে ছিলুম, তখনও—বেঙ্গল অ্যান্ড নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলপথের প্রধান নির্গমস্থল মোকামা ঘাটের মধ্য দিয়ে মালের প্রবাহ অবাধে চলেছিল। যখন আমরা ঠিকাদারিটা নিই তখন মোকামা ঘাট দিয়ে চার থেকে পাঁচ লক্ষ টন যেত, আর যখন আমি কাজটা রামশরণজীকে ছেড়ে দিয়ে আসি তখন মালচলাচল বেড়ে দশ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছিল।



৩১

বুদ্ধু

বুদ্ধু ছিল অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক যত বছর ধরে আমি তাকে দেখেছি, তার মধ্যে কখনও তাকে হাসতে দেখি নি। বড় কষ্টের জীবন ছিল তার। সেই কষ্টের শেল তার একেবারে মর্মে গিয়ে বিঁধেছিল। তার বয়স ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। লম্বা রোগা মানুষটি। তার সঙ্গে ছিল তার স্ত্রী আর দুটি শিশু সন্তান। সে আমার কাছে এসে কাজ চাইল। তারই কথামত আমি তাকে মোকামা ঘাটে বড়-লাইনের খোলা মালগাড়ি থেকে ছোট-লাইনের ঢাকা মালগাড়িতে কয়লা তুলে দেবার কাজে নিযুক্ত করলুম। এই কাজটা স্ত্রী-পুরুষে মিলে করতে পারে, আর বুদ্ধু চেয়েছিল যে তার স্ত্রীও তার সঙ্গেই কাজ করুক।

বড় লাইনের খোলা-মালগাড়ি আর ছোট-লাইনের ঢাকা মালগাড়িগুলি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকত, তাদের মাঝখানে থাকত চার ফুট চওড়া একটি চালু প্ল্যাটফর্ম। সেটার উপরটা ঢাকা ছিল না, তাই কাজটা ছিল প্রাণান্তকর। শীতকালে মেয়েপুরুষরা তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে কাজ করত, প্রায়ই দিনের পর দিন বৃষ্টিতে ভিজতে হত তাদের। গ্রীষ্মকালে ইটের প্ল্যাটফর্মটা আর

মালগাড়িগুলির লোহার মেঝে তেতে আগুন হয়ে থাকত, তাতে তাদের খালি পায়ে ফোস্কা পড়ে যেত। আনাড়ী মানুষ যখন নিজের আর সন্তানদের পেটের দায়ে বেল্চা নিয়ে কাজ করে, তখন সেটা একটা বড় নিষ্ঠুর যন্ত্র হয়ে ওঠে।

প্রথম দিন কাজ করবার পর হাত দুখানা লাল আর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, আর পিঠ এমন টন-টন করতে থাকে যে সেটা বড় যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দিনে হাতময় ফোস্কা পড়ে, পিঠের টনটনানিটাও আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। তৃতীয় দিনে ফোস্কাগুলো ফেটে গিয়ে দূষিত হয়ে ওঠে, খুব কষ্ট করে পিঠটাকে সোজা করতে হয়। তারপর একটি সপ্তাহ বা দশ দিন ধরে শুধু অসীম সহ্য করবার শক্তি থাকলে তবে এই ক্লিষ্ট মানুষগুলো কাজ চালিয়ে যেতে পারে—এটা আমি অভিজ্ঞতা থেকে জানি।

বুদ্ধু আর তার বউও এইসব অবস্থার ভিতর দিয়েই গেল। আমি তাদের থাকবার জায়গা দিয়েছিলুম। ষোল ঘণ্টা কাজ করবার পর যখন তারা দেহটাকে টেনে নিয়ে বাসার দিকে যেত, আমার প্রায়ই মনে হত যে তাদের বলি যে তারা যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছে, এবার এর চাইতে কম কষ্টসাধ্য কোনো একটা কাজ দেখে নিক। কিন্তু তাদের রোজগার বেশ ভাল হচ্ছিল। বুদ্ধু বলেছিল যে আগে সে কখনও এত রোজগার করে নি। কাজেই আমি তাদের কাজ চালিয়ে যেতে দিলুম।

ক্রমে এমন দিন এল যখন তাদের হাতে কড়া পড়ে গেল, পিঠও আর টাটাত না। তখন তারা যেমন চটপটে আর হালকা পায়ে কাজে আসত, ঠিক সেইভাবেই কাজ শেষে ঘরে ফিরে যেত।

গ্রীষ্মকালে সব সময়ে কয়লার চালান খুব বেশি থাকে বলে কয়লা তোলাইয়ের জন্যে তখন শ-দুয়েক মেয়েপুরুষ নিযুক্ত ছিল। তখন ভারত ছিল কয়লা রপ্তানিকারী দেশ। যে সব মালগাড়ি রপ্তানির জন্যে ফসল, আফিম, নীল, কাঁচা-চামড়া আর হাড় নিয়ে কলকাতায় যেত, তারা বাংলার কয়লাখনি-গুলো থেকে কয়লা-বোঝাই হয়ে ফিরে আসত। মোকামা ঘাট দিয়ে পাঁচলক্ষ টন কয়লা যেত।

একদিন বুদ্ধু আর তার বউ কাজে এল না। কয়লার মজুর-দলের সর্দার চামারি আমাকে বললে যে আগের দিন একখানা পোস্টকার্ড এসেছিল, তা পেয়ে সেদিন সকালবেলাই সে সপরিবারে চলে গিয়েছে। বলে গিয়েছে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবে।

দু-মাস বাদে তারা ফিরে এসে বাসা দখল করল। বুদ্ধু আর তার বউ আবার বরাবরকার মত মেহনত করে কাজ করতে লাগল। পরের বছর আবার প্রায় সেই সময়ে বুদ্ধু আর তার বউ কামাই করল। বুদ্ধুর চেহারা তখন

ভরে উঠেছে, বউয়ের চেহারাও আর জীর্ণ শীর্ণ নেই। এবার তারা প্রায় তিন মাস এল না। ফিরল যখন, তখন তাদের ক্লান্ত, শীর্ণ চেহারা।

আমার পরামর্শ না চাইলে, কিংবা নিজে থেকে কেউ কোনো কথা না বললে আমি কখনও আমার লোকদের ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্বন্ধে খোঁজ নিতুম না, কারণ ভারতীয়রা সে বিষয়ে বড় খুঁতখুঁতে। কাজেই, বুদ্ধ কেন একখানা পোস্টকার্ড এলেই থেকে-থেকে কাজ ছেড়ে চলে যায় তা আমি জানতুম না।

মজুরদের চিঠি সর্দারদের কাছে আসত। সর্দারেরা যে-যার লোকদের সেগুলো বিলি করে দিত। তাই আমি চামারিকে বলে রাখলুম যে, এর পরের বার যখন বুদ্ধুর নামে পোস্টকার্ড আসবে তখন যেন সে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। ন-মাস পরে একখানা পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে বুদ্ধু একদিন আমার অাপিসে এসে হাজির হল।

তখন কয়লার চালান অস্বাভাবিকভাবে বেশি, আমার নিযুক্ত স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকে যতদূর সাধ্য পরিশ্রম করে চলেছে। যে-ভাষায় পোস্টকার্ডখানা লেখা তা আমি পড়তে পারি না বলে তাকেই ওটা পড়ে আমাকে শোনাতে বললুম। সে তা পারল না, কেননা কেউ তাকে লিখতে পড়তে শেখায় নি। কিন্তু সে বলল যে চামারি ওটা তার কাছে পড়েছে। ওতে তার মনিব হুকুম করেছে যে, ফসল কাটবার সময় তৈরি হয়েছে, বলেছে সে যেন এখনই চলে আসে। সেদিন বুদ্ধু আমার অফিসে আমাকে যে কাহিনী বলেছিল, তা আমি নিচে লিখছি। ভারতের কোটি-কোটি মানুষেরই কাহিনী এটা :

'আমার ঠাকুরদা ছিলেন একজন খেত-মজুর। তিনি নিজ গ্রামের বেনিয়ার থেকে দুটি টাকা ধার করেছিলেন। বেনিয়া তা থেকে একটি টাকা এক বছরের আগাম সুদ বলে নিজে রেখে দিয়ে তার 'বহিখাতা'-তে একটা লেখার পাশে আমার ঠাকুরদার টিপ-ছাপ নিয়ে নিল। আমার ঠাকুরদা মধ্যে-মধ্যে যখনই পারতেন তখনই সুদ বাবদে বেনিয়াকে কয়েক আনা করে দিতেন। তাঁর মৃত্যু হলে আমার বাবা দেনাটা ঘাড়ে নিলেন। তার পরিমাণ তখন হয়ে দাঁড়িয়েছিল পঞ্চাশ টাকা। আমার বাবা বেঁচে থাকতে-থাকতে দেনাটা বেড়ে বেড়ে একশো পনের টাকায় দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে বুড়ো বেনিয়া মারা গিয়েছে, তার জায়গায় রাজত্ব করছে তার ছেলে। আমার বাবা মারা যাবার পর সে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলল যে পারিবারিক দেনাটা এখন অনেক টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে বলে আমার তাকে একখানা রীতিমতভাবে সই-করা আর স্ট্যাম্প-লাগানো দলিল দিতে হবে। আমি তা-ই করলুম। স্ট্যাম্পকাগজ আর দলিল রেজিস্ট্রির খরচ দেবার সাধ্য আমার ছিল না। তাই বেনিয়া সে টাকাটা আমাকে ধার বাবদ দিয়ে সেটাও আবার দেনার মধ্যে যোগ করে দিল। সুদ সুদ্ধু দেনার পরিমাণ এখন হল একশো

তিরিশ টাকা।

বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়ে বেনিয়া সুদের হার কমিয়ে শতকরা পঁচিশ টাকা করতে রাজী হল। এই অনুগ্রহ দেখিয়ে তার বদলে সে এই শর্ত করিয়ে নিল যে প্রত্যেক বছর তার ফসল কাটার কাজে আমি আর আমার স্ত্রী সাহায্য করব, যতদিন না দেনাটা সম্পূর্ণ শোধ হয়ে যায়। আমার স্ত্রী আর আমি বেনিয়ার জন্যে এই যে বেগার খাটব, সেই চুক্তিটা আর একখানা কাগজে লেখা হল, তাতে আমি টিপসই দিলুম।

দশ বছর ধরে আমি আর আমার স্ত্রী বেনিয়ার ফসল কেটে দিয়ে আসছি। প্রতি বছরই বেনিয়া হিসেব তৈরি করে, স্ট্যাম্প-করা দলিলের পিছনে সেটা লিখে, তাতে আমাকে দিয়ে টিপসই করিয়ে নেয়। আমি ঘাড়ে নেবার পর থেকে দেনাটা বেড়ে কত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা আমি জানি না। আমি অনেক বছর এ বাবদ কিছুই দিতে পারি নি। কিন্তু আপনার কাছে কাজ আরম্ভ করা অবধি আমি পাঁচ, সাত আর তের, এই মোট পঁচিশ টাকা দিয়েছি।'

এই দেনা অস্বীকার করবার কথা বুদ্ধু স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। সেটা একটা অভাবনীয় কথা। তাতে শুধু যে তারই মুখে কালি পড়বে তা নয়, আরও ঢের বেশি অন্যায় করা হবে—তার বাপ-দাদার সুনামেও কালি পড়বে। কাজেই সে নগদে আর মেহনতে যা দিতে পারে তা দিয়ে আসছিল, আর দেনা শোধের কোনো আশা না রেখেই জীবন কাটাচ্ছিল। সে মারা গেলে দেনা তার বড় ছেলেতে অর্সাবে।

বুদ্ধুর কাছ থেকে এই খবরটা বের করা গেল যে বেনিয়াটি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে একজন উকিলও আছেন। তাঁর নাম-ঠিকানা নিয়ে বুদ্ধুকে তার নিজের কাজে যেতে বললুম। তাকে বললুম যে বেনিয়ার ব্যাপারে কি করা যায় সেটা আমি দেখব।

তারপর অনেকদিন ধরে উকিলের সঙ্গে লেখালেখি চলল। ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ, এবং সৎসাহসী। বেনিয়াটি তাঁকে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে অপমান করায় এবং তাঁকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলায় তিনি আমাদের একজন শক্তিশালী মিত্র হয়ে উঠলেন। তাঁর থেকেই জানা গেল যে, যে 'বহিখাতা'-খানা বেনিয়াটি তার বাপের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে তা প্রমাণ হিসেবে আদালতে দাখিল করা চলে না, কারণ তাতে এমন সব লোকের টিপ-ছাপ আছে যারা বহুকাল হল মারা গিয়েছে।

বেনিয়া ফাঁকি দিয়ে বুদ্ধুকে দিয়ে এমন একখানা দলিল করিয়ে নিয়েছে যাতে স্পষ্ট করে লেখা আছে যে বুদ্ধু নিজে শতকরা পঁচিশ টাকা সুদে দেড়শো টাকা ধার নিয়েছে। উকিল আমাকে পরামর্শ দিলেন যে এটা নিয়ে লড়াই করা আর চলবে না, কেননা বুদ্ধুর দেওয়া দলিলটি অসিদ্ধ নয়। তাছাড়া, আংশিক

সুদ হিসেবে তিন কিস্তি টাকা দিয়ে, এবং এই দলিলে এই টাকা দেবার কথার পাশে টিপ-ছাপ দিয়ে সে তার বৈধতা মেনে নিয়েছে।

শতকরা পঁচিশ টাকা সুদ-সহ দেনার টাকাটা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেবার জন্যে উকিলকে এক মনি-অর্ডার পাঠালুম। বেনিয়া বৈধ-দলিলটি ফেরত দিল, কিন্তু বুদ্ধু আর তার স্ত্রীর ফসল কাটবার জন্য বেগার খাটবার যে ব্যক্তিগত চুক্তিপত্রটা, তা সে দিতে চাইল না। তারপর উকিলের পরামর্শে আমি তার নামে জুলুমবাজির জন্যে নালিশ করবো বলে শাসালুম, তখন সে উকিলের হাতে চুক্তিনামাটা ফেরত দিল।

এসব ব্যাপার যখন চলছে, তখন বুদ্ধু বড় অস্বস্তি ভোগ করছিল। এ বিষয়ে সে আমাকে কখনও কিছু বলে নি। কিন্তু কাজ করবার সময় যখনই আমি তার কাছ দিয়ে যেতুম তখনই সে যেভাবে আমার দিকে তাকাত, তাতে বোঝা যায় যে সে এই কথা ভাবছে যে, সর্বশক্তিমান বেনিয়া মশায়ের ব্যবস্থা করবার ভার আমার উপর দিয়ে সে বুদ্ধির কাজ করেছে কি না, এবং তিনি যদি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়ে তার আচরণের জন্যে কৈফিয়ত চেয়ে বসেন তাহলে তার অবস্থাটা কী হবে!

তারপর একদিন আমি রেজিস্ট্রি-ডাকে খুব করে গালা-মোহর-করা একখানা চিঠি পেলুম। তাতে ছিল বহু-টিপসই-দেওয়া একখানা আইন-সংগত দলিল। একখানা চুক্তিনামা—সেটাও টিপসই-দেওয়া উকিলমশায়ের ফী-এর রসিদ, আর একখানা চিঠি—তাতে আমাকে জানানো হয়েছে যে বুদ্ধু এখন মুক্ত। সমস্ত ব্যাপারটাতে আমার দুশো পঁচিশ টাকা খরচ হয়ে গেল।

সেইদিন সন্ধেবেলা বুদ্ধু কাজের শেষে যখন ফিরছিল তখন আমি তার সংগে দেখা করলুম। খাম থেকে কাগজগুলো বের করে বললুম যে সে ওগুলো ধরুক, আর আমি তাতে দেশলাই জেবলে দি। সে বললে, ‘না, সাহেব, এ কাগজগুলো পোড়াবেন না। আমি এখন আপনার গোলাম হলুম। ভগবানের ইচ্ছে হলে একদিন আমি আপনার দেনা শোধ করব।’

বুদ্ধু যে কখনও হাসে নি শুধু তা-ই নয়, সে কথাও বলত খুব কম। যখন আমি তাকে বললুম যে সে যদি আমাকে কাগজ ক-খানা পোড়াতে না দেয় তাহলে সেগুলোকে নিজের কাছে রাখুক, তাতে সে শুধু দুই হাত জোড় করে আমার পা ছুঁল। যখন সে মুখ তুলে চলে যাবার উপক্রম করল, দেখলাম তার কয়লার কালি-মাখা মুখে দাগ কেটে-কেটে চোখের জল গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে।

তিন পুরুষ ধরে যে দেনার পীড়ন চলছিল তা থেকে মুক্তি পেল ভারতের লক্ষ-লক্ষ দেনদারের মধ্যে মোটে একজন। কিন্তু একজন না হয়ে লক্ষ-জন হলেও আমি এর চাইতে বেশি আনন্দ পেতুম না। বেনিয়ার দেনা শোধ হয়েছে,

আর তারা এখন মুক্ত—এ কথা তার স্ত্রীকে বলবার জন্যে বন্ধু চোখের জলে অন্ধ হয়ে হোঁচট খেতে-খেতে চলে গেল। সেই চোখের জল, এবং তার নীরব ভঙ্গীটি আমার মনে যত গভীর রেখাপাত করেছিল, মুখের কোনো কথাই তা পারত না।



১০

লালাজী

সামারিয়া ঘাট থেকে এসে পৌঁছতে যাত্রীবাহী স্টীমারের দেরি হয়েছিল। ঘাটে দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলুম যাত্রীরা নেমে তাড়াতাড়ি ঢালু পাড় বেয়ে বড় লাইনের গাড়িতে উঠেছে। তাদের জন্যে ওটাকে কয়েক মিনিট আটকে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলুম।

স্টীমার থেকে সবশেষে নামল একজন রোগা লোক। তার চোখদুটো গভীর-ভাবে কোটরে বসে গিয়েছে। তার পরনে একপ্রস্থ পোশাক, যা বহুকাল আগে সাদা ছিল, আর হাতে একটি ছোট পুঁটলি,—সেটা রঙিন গামছায় বাঁধা। দেহভার রাখবার জন্যে স্টীমার থেকে নামবার সিঁড়ির রেলিং আঁকড়ে ধরে সে কোনো রকমে ঘাড়ে এসে পড়ল। কিন্তু ঢালু পাড়ের কাছে এসেই সে ফিরে, ধীর দুর্বল পায়ে নদীর ধারে গিয়ে বারবার ভীষণ বমি করতে লাগল।

তারপর, মুখ ধোয়ার জন্যে ঝুঁকে পড়ে সে তার পুঁটলিটা খুলে একখানা চাদর বের করে সেটাকে খুলে বিছিয়ে তার উপর শুয়ে পড়ল। তার পায়ের পাতায় গঙ্গার জল ছলাৎ-ছলাৎ করে লাগতে থাকল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে তার গাড়ি ধরবার মতলব নেই, কেননা হুঁশিয়ারি ঘণ্টা বাজল, ইঞ্জিনও শিস দিল, তবু সে নড়ল না, তেমনি চিত হয়ে শুয়ে রইল। আমি যখন তাকে বললুম যে তার ট্রেন চলে গেল, তখন সে তার বসে-যাওয়া চোখদুটি খুলে

আমার দিকে তুলে বললে, 'সাহেব, আমার আর ট্রেনের দরকার নেই, আমি মরতে বসেছি।'

তখন আমের সময়, বছরের সবচেয়ে গরমের সময় তখন। এই সময়েই কলেরা সবচেয়ে বেশি হয়। নামবার সিঁড়িটার নিচের মাথায় লোকটি যখন আমার পাশ দিয়ে যায়, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে সে কলেরায় ভুগছে। তারপর তাকে সাংঘাতিকভাবে বমি করতে দেখে সে সন্দেহ দৃঢ় হয়েছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বললে যে সে একলাই এসেছে, আর মোকামা ঘাটে তার কেউ নেই।

আমি তাকে দাঁড়াতে-সাহায্য করলুম। তারপর গঙ্গা থেকে দুশো গজ দূরে আমার বাংলোতে ধরে-ধরে নিয়ে গেলুম। সেখানে আমার পাঙখা-কুলির ঘরে তাকে নিয়ে গিয়ে তার আরামের ব্যবস্থা করে দিলুম। ঘরখানা খালি ছিল, চাকরদের থাকবার ঘরগুলো থেকে একটু তফাতেও ছিল।

আমি তখন দশ বছর হল মোকামা ঘাটে আছি, মস্ত একদল কুলি খাটাই। এদের মধ্যে অনেকে আমার তদারকিতে আমারই দেওয়া বাড়িতে থাকত, আর বাকি সবাই আশপাশের গ্রামে বাস করত। আমি আমার নিজের লোকদের এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট কলেরা দেখেছি বলে আমার প্রার্থনা ছিল যে আমার যদি কখনও এই ঘৃণিত ও বিশ্রী রোগ হয়, তাহলে যেন কোনো সৎ পরোপকারী ব্যক্তি আমার মাথায় একটি গুলি করেন কিংবা আমাকে বেশি করে আফিম খাইয়ে দেন।

খুব কম লোকই আমার এ কথা মানবে যে প্রতি বছর যে অসংখ্য লোক কলেরায় মারা যায় বলে খবর পাওয়া যায়, তার অন্তত অর্ধেক মরে কলেরায় নয়—ভয়ে।

যাঁরা দীর্ঘকাল বা অল্পকালের জন্যে ভারতে আসেন তাঁদের কথা বলছি না, কিন্তু আমরা যারা ভারতে বাস করি, আমরা সবাই অদৃষ্টবাদী। আমরা বিশ্বাস করি যে, কপালে-লেখা মেয়াদ না ফুরোলে কেউ মরে না। তার অর্থ কিন্তু এ নয় যে আমরা বহুব্যাপক রোগগুলো সম্বন্ধে উদাসীন। কলেরাকে এ দেশে বেজায় ভয়। যখন এ মহামারী রূপে দেখা দেয় তখন যত লোক সত্যিকার রোগে মরে, তত লোকই দারুণ ভয়েও মরে।

আমার পাঙখা-কুলির ঘরের লোকটি যে খারাপ রকমের কলেরায় ভুগছিল তাতে কোনো সন্দেহই নেই। যদি তাকে বাঁচতে হয়, তাহলে তাকে রক্ষা করতে পারে এক তার মনের জোর, আর দুই, আমার হাতুড়ে চিকিৎসা। কয়েক মাইলের মধ্যে চিকিৎসা-ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যেতে পারত মোটে একটি ডাক্তারের কাছেই।

সে লোকটা হল একটা পশু, যেমন হৃদয়হীন তেমনি আনাড়ী। আমার দৃঢ়

বিশ্বাস এই যে একদিন না একদিন তার মোটা তেল-চকচকে গলাটি কাটবার আনন্দ আমাকেই পেতে হত, যদি না অল্পবয়সী একজন অবেক্ষাধীন কেরানী আমার কাছে কাজ শিখতে এসে সকলের ঘৃণিত এই ডাক্তারটাকে সরিয়ে দেবার একটা কম-নোংরা উপায় বের করত।

আমাদের ভরসাস্থল এই ছোকরা সেই ডাক্তার আর তার স্ত্রীর বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছিল। স্বামী স্ত্রী দু-জনেই ছিল বেজায় দুশ্চরিত্র। তারা কেরানীটিকে বিশ্বাস করে বলেছিল যে মোকামা ঘাটে আসবার আগে তারা কত ফুর্তি করত, সেসব সুখের অভাব এখানে তাদের বড়ই মনে লাগে। খবরটি পেয়ে কেরানীটি ভাবতে লাগল।

কয়েক রাত্রি পরে, যখন প্যাসেঞ্জার স্টীমার সামারিয়া ঘাটে যাবার জন্যে ছাড়বার কথা তার একটু আগে, ডাক্তারকে একখানা চিঠি দেওয়া হল। সেটা পড়ে সে তার স্ত্রীকে বললে যে একটা জরুরী কেস্-এর জন্যে তার সামারিয়া ঘাটে যাবার ডাক এসেছে, সারারাত সে বাড়িতে থাকবে না। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে সে ফিটফাট হয়ে নিল।

বাইরে কেরানীটি তার সঙ্গে দেখা করে খুব গোপনে তাকে একসারি বাড়ির একপ্রান্তে একটা খালি ঘরে নিয়ে গেল। কয়েক রাত্রি আগে আমার একজন পয়েন্ট্স্ম্যান সেই ঘরটাতে গ্যাসের বিষক্রিয়ার ফলে মারা গিয়েছিল।

ডাক্তারটা কিছুক্ষণ ওখানে অপেক্ষা করবার পর দরজা খুলে গেল। ঘরটিতে একটিই নিচের দরজা, আর একটিমাত্র গরাদে-দেওয়া জানলা ছিল। ভাল-করে-ঘোমটা-দেওয়া একটি মূর্তি দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই কে যেন দরজাটা টেনে বন্ধ করে বাইরের দিকে তালা লাগিয়ে দিল।

সেই রাত্রে আমি দেরিতে মাল-গুদামগুলোর ভিতর দিয়ে আসতে আসতে শুনতে পেলুম যে সেই কেরানীটি রাত্রের ডিউটি বদল করতে এসে যার ডিউটি ফুরোল তার সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে।

পরদিন সকালে কাজে যাবার সময় মৃত পয়েন্ট্স্ম্যানের ঘরের সামনে লোকের ভিড় দেখতে পেলুম। একজন নিতান্ত নিরীহ-দর্শন দর্শকের কাছে শুনলুম যে, ঘরের ভিতর লোক আছে বলে মনে হচ্ছে, অথচ দরজাটাতে বাইরে থেকে তালা লাগানো রয়েছে। আমার সংবাদদাতাকে একটা হাতুড়ি নিয়ে এসে তালাটা ভেঙে ফেলতে বলে আমি তাড়াতাড়ি নিজের নিয়মিত কাজ করতে চলে গেলুম। দরজা ভেঙে খোলা হলে ডাক্তার আর তার বউয়ের যে হেনস্তাটা হবে তা হওয়াটা যতই উচিত হ'ক না কেন, আমার সেটা দেখবার ইচ্ছে ছিল না।

আমার সেদিনকার ডায়েরিতে তিনটি কথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল : (১) ডাক্তার আর তার স্ত্রী জরুরী ব্যক্তিগত কারণে চলে গেল ; (২) অবেক্ষাধীন

শিউদেবকে কুড়ি টাকা মাইনেতে 'টালি ক্লার্ক' পদে বাহাল করা হল ; (৩) প্রকাশ যে, পয়েন্ট্স্-এর তালার উপর দিয়ে ইঞ্জিন চলে গিয়েছে—সেটার বদলে নতুন তালা দেওয়া হল। একটি সম্মানিত বৃত্তির কলঙ্ক-স্বরূপ এই লোকটাকে মোকামা ঘাটে আর দেখা যায় নি।

রোগা লোকটির শুশ্রূষার জন্যে আমি বেশি সময় দিতে পারি নি, কারণ আমার হাতে এর মধ্যেই তিনটি কলেরা রোগী এসে গিয়েছিল। চাকরদের থেকে সাহায্য পাবার আশা ছিল না।

কারণ একে তো তারা রোগীটির থেকে ভিন্ন জাতের লোক, তার উপর আবার কলেরার ছোঁয়াচ লাগবার ঝুঁকির মধ্যে তাদের টেনে আনা যুক্তিযুক্ত হত না। যাই হ'ক, তাতে কিছু এসে যাচ্ছিল না। রোগীটির মনে এই বিশ্বাসটা ঢুকিয়ে দিতে পারলেই হত যে আমার চিকিৎসায় সে ভাল হবেই। সেই উদ্দেশ্যে আমি তাকে খুব স্পষ্ট করে বলে দিলুম যে, মরবে বলে আমি তাকে আমার বাড়ির হাতার ভিতরে নিয়ে আসি নি। তাকে নিয়ে এসেছি কষ্ট করে পোড়াবার জন্যে নয়, তাকে সারিয়ে তোলবার জন্যে। আর, সেটা হতে পারে কেবলমাত্র তার সহযোগিতা পাওয়া গেলেই।

প্রথম রাত্রিতে আশঙ্কা হয়েছিল যে আমার এত চেষ্টা সত্ত্বেও সে বুঝি মারা যাবে। কিন্তু সকালের দিকে সে সামলে উঠল, আর তার পর থেকেই তার অবস্থার উন্নতি হতে লাগল। বাকি রইল তার দেহে একটু জোর ফিরে আসা। কলেরা রোগটা অন্য সব রোগের চাইতে তাড়াতাড়ি মানুষের দেহ থেকে শক্তি শুষে নেয়। এক সপ্তাহ বাদে সে আমাকে তার কাহিনী বলতে পারল।

সে একজন লালা। ব্যবসা করত। এক সময়ে তার বেশ জমজমাট একটি শস্যের কারবার ছিল। তারপর সে ভুল করে সম্পূর্ণ অজানা একজন লোককে অংশীদার করে নেয়।

কয়েক বছর ব্যবসায় উন্নতি হতে লাগল, সবই ভাল চলল কিন্তু একবার সে অনেক ঘুরে-টুরে ফিরে এসে দেখল দোকান খালি, তার অংশীদারও পালিয়েছে। সামান্য যে টাকা তার সঙ্গে ছিল তাতে তার ব্যক্তিগত দেনাই শুধু মিটল।

সুনাম নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাকে চাকরি খুঁজতে হল। তার সঙ্গে কারবার ছিল এমন একজন ব্যবসায়ীর কাছে সে চাকরি পেল। তার কাছে সে দশ বছর ধরে সাত টাকা মাইনেতে কাজ করে আসছে। তাতে তার আর তার ছেলের কোনো রকম চলে যায়,—অংশীদারের প্রবঞ্চনার অল্পদিন পরেই তার স্ত্রী মারা গিয়েছিল। মনিবের কাজে সে মজফ্ফরপুর থেকে গয়া যাচ্ছিল, পথে ট্রেনেই তার অসুখ হয়ে পড়ে। ফেরি-স্টীমারে উঠে তার অবস্থা আরও

খারাপ হয়ে পড়ে। তাই সে পবিত্র গঙ্গাতীরে মরবে বলে কোনোরকমে ডাঙায় নেমে এসেছিল।

লালাজী ছাড়া তার আর কোনো নাম আমি জানতুম না। লালাজী আমার কাছে প্রায় এক মাস রইল। তারপর একদিন সে গয়া চলে যাবে বলে আমার অনুমতি চাইল। তখন আমরা গুদামগুলির মধ্য দিয়ে হাঁটছিলুম। লালাজী যতদিনে যতটা শক্তি পেয়েছিল তাতে আমি কাজে রওনা হলে সে রোজ সকালবেলা আমার সঙ্গে-সঙ্গে খানিকটা হেঁটে যেত।

আমি জিগ্যেস করলুম যে গয়া পৌঁছে যদি সে দেখে যে তার মনিব তার জায়গায় অন্য লোককে নিয়েছে, তখন সে কি করবে। সে বলল যে অন্য চাকরি খুঁজবে।

আমি বললুম, 'তোমাকে আবার ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য করবে, এমন কাউকে দেখ না!'

সে বললে, 'সাহেব, আবার ব্যবসায়ী হব, আমার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারব, এ ভাবনা আমার মাথায় দিনরাত জ্বলছে। কিন্তু যে সাত টাকা মাইনের একজন চাকর, আর যার জামিন রাখবার কিছু নেই, এমন লোককে নতুন ব্যবসা শুরু করবার জন্যে যে পাঁচশো টাকা দরকার তা ধার দেবে, দুনিয়ায় এমন কেউ নেই।'

গয়ার গাড়ি ছাড়ত রাত আটটায়। সেদিন সন্ধেবেলা আটটার কিছু আগেই আমি বাংলোয় ফিরে এলুম। দেখি যে লালাজী সদ্য-ধোয়া কাপড়-চোপড় পরে, আর যত বড় পুঁটলি নিয়ে সে এসেছিল তার চাইতে একটু বড় একটি পুঁটলি হাতে করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে আমার থেকে বিদায় নিয়ে যাবে বলে।

আমি তার হাতে গয়ার একখানা টিকিট আর পাঁচখানা একশো টাকার নোট দিলুম। সেই কয়লার গুঁড়োয় ভরা মুখখানার মত এরও মুখে আর রা সরল না। অতি কষ্টে সে একবার তার হাতের নোটগুলোর দিকে, আর একবার আমার মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা সংবরণ করতে লাগল। শেষে যে-ঘন্টা বাজিয়ে জানানো হয় যে ট্রেন পাঁচ মিনিট বাদেই ছাড়বে, সেই ঘন্টা বেজে উঠল। তখন সে আমার পায়ে তার মাথাটি রেখে বলল, 'এক বছরের মধ্যে আপনার এই দাস এই টাকা ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।'

এইভাবে লালাজী আমার সঞ্চয়ের বেশির ভাগ সঙ্গে নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। তাকে যে আবার দেখতে পাব এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না, কারণ ভারতের গরিবরা দয়া পেলে তা কখনও ভোলে না। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা হল যে, লালাজী যে-প্রতিজ্ঞা করে গেল সেটা রক্ষা করা তার সাধ্যাতীত। কিন্তু এখানে আমার ভুল হয়েছিল।

একদিন সন্ধেবেলা দেরি করে বাড়ি ফিরে এসে দেখি যে ধবধবে সাদা জামাকাপড় পরা একজন লোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের আলো তার পিছন থেকে এসে আমার চোখে পড়ছিল বলে সে কথা না বলা পর্যন্ত তাকে আমি চিনতে পারি নি।

সে হল লালাজী—নিজে যে মেয়াদ নির্দিষ্ট করে গিয়েছিল তার কয়েকদিন আগেই সে এসেছে। সেই রাত্রে আমার চেয়ারের কাছে মেঝেয় বসে সে তার ব্যবসার বেচা-কেনার কথা আর তার ফলে সাফল্যলাভের কথা আমাকে বলল। কয়েক বস্তা শস্য নিয়ে এবং বস্তা-পিছু চার আনা লাভে সন্তুষ্ট থেকে সে কারবার শুরু করে আস্তে-আস্তে, কিন্তু ব্যবসা গড়ে তুলতে থাকে। শেষে সে টন-পিছু তিন টাকা লাভে এক-এক বারে ত্রিশ টন পর্যন্ত মালের চালান দিতে থাকে।

তার ছেলে এখন ভাল একটি স্কুলে পড়ছে। এখন তার একটা বউ পুষবার ক্ষমতা হয়েছে বলে সে পাটনার এক ধনী ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করেছে। এত সব কাণ্ড করতে তার লেগেছে বার মাসের চাইতেও কম সময়। তার ট্রেনের সময় যখন হয়ে এল তখন সে পাঁচখানা একশো টাকার নোট আমার হাঁটুর উপর রাখল। তারপর পকেট থেকে একটি থলি বের করে সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে সে বললে, 'আপনি আমাকে যে টাকা ধার দিয়েছিলেন, এটা হল শতকরা পঁচিশ টাকা হিসেবে তার সুদ।' এই সাক্ষাৎ থেকে সে যতটা আনন্দ পাবে বলে এসেছিল, আমরা বন্ধুদের থেকে সুদ নিই না শুনে সে সেই আনন্দের অর্ধেকটা থেকে বঞ্চিত হল বলেই আমি বিশ্বাস করি।

চলে যাবার আগে লালাজী বললে, 'যে এক মাস আমি আপনার এখানে ছিলুম, তখন আমি আপনার চাকর-বাকরের আর আপনার কুলিমজুরদের সঙ্গে কথাবার্তায় জেনেছিলুম যে এমন সময় একটা এসেছিল যখন আপনার খাওয়া এসে ঠেকেছিল একখানা চাপাটি আর একটুখানি ডালেতে। পরমেশ্বর না করুন, এমন যদি আবার আসে তাহলে আপনার এই কেনা চাকরের যা কিছু আছে তা সে আপনার পায়ে এনে রাখবে।'

এর একুশ বছর বাদে আমি মোকামা ঘাট ছেড়ে চলে আসি। ততদিন ধরে প্রত্যেক বছর আমি লালাজীর বাগান থেকে মস্ত এক ঝুড়ি বাছাই-করা আম পেতুম। ব্যবসায়ী হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার পূর্ণ হয়েছিল তার অংশীদার যখন তাকে ঠকিয়ে যায় তখন সে তার যে-বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল, আবার তাতে ফিরে গিয়েছিল।



১১

চামারি

নামটা শুনেই বোঝা যায় সে চামারি ছিল ভারতের ছয় কোটি অস্পৃশ্য মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিচু স্তরের একজন লোক। তার স্ত্রীকে সংগে নিয়ে এসে একদিন সে আমার কাছে কাজ চাইল। তার স্ত্রীর শরীরটিতে মাংস ছিল না, তার ছেঁড়া ঘাগরা ধরে দুটি শিশু দাঁড়িয়ে রইল। চামারির দেহটি ছোট এবং জীর্ণ-শীর্ণ, মাল গুদামে কাজ করবার মত জোর তাতে ছিল না। তাই আমি তাকে আর তার বউকে কয়লা সরাবার কাজে লাগিয়ে দিলুম। পরদিন সকাল বেলা তাদের দু-জনকে বেল্‌চা আর ঝুড়ি দিলুম। তারাও সাহস এবং অধ্যবসায় নিয়ে তাদের সাধ্যাতীত এই কাজে লেগে গেল। সন্ধের দিকে তাদের কাজটা শেষ করে দেবার জন্যে আমায় অন্য লোক লাগাতে হল, কেননা পঞ্চাশখানা মালগাড়ির মধ্যে একখানার মাল খালাস করতে দেরি হওয়ার মানে হচ্ছে দুশো জনের কাজ আটকে থাকা।

দু-দিন ধরে চামারি আর তার বউ বিপুল বিক্রমে কাজ করল বটে, কিন্তু তাতেও কাজ হল না। তৃতীয় দিন সকালবেলা যখন তারা ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে তাদের ফোস্‌কা-পড়া হাত বেঁধে কাজ পাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল, তখন আমি চামারিকে জিগ্যেস করলুম যে সে পড়তে লিখতে জানে কি না। সে

বললে যে সে সামান্য একটু হিন্দী জানে। আমি তাকে ঝুড়ি আর বেল্চা ফেরত দিয়ে হুকুম নেবার জন্যে আমার আপিসে আসতে বললুম।

কয়েকদিন আগেই আমি মাতলামির জন্যে আমার কয়লা-কুলির দলের সর্দারকে বরখাস্ত করেছিলুম—জীবনে আমি এই একটি লোককেই বরখাস্ত করেছি। এদিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে চামারি আর তার বউ কেউই, যে কাজ তারা করছে তা থেকে জীবিকা অর্জন করতে পারবে না। কাজেই আমি চামারিকে সর্দারের পদ দিয়ে পরীক্ষা করব বলে ঠিক করলুম।

চামারি ভেবেছিল যে তাকে বরখাস্ত করব বলেই আপিসে ডেকে এনেছি। যখন আমি তাকে নতুন একখানা হিসেবের খাতা আর একটি পেনসিল দিয়ে বললুম যে সে যেন বড় লাইনের যে সব ওয়াগন থেকে কয়লা নামানো হচ্ছে সেগুলোর নম্বর, এবং প্রত্যেক ওয়াগনে যে সব মেয়ে-পুরুষ কাজ করছে তাদের সকলের নাম লিখে নিয়ে আসে, তখন সে স্বস্তি পেল এবং গর্ব বোধ করতে লাগল।

আমি যে যে সংবাদ চাইলুম আধঘন্টা বাদে সে তা নিয়ে ফিরে এল, সব কথা পরিচ্ছন্নভাবে তার খাতায় লেখা রয়েছে। লেখাগুলো নির্ভুল কি না তা যাচাই করে আমি খাতাখানা তাকে ফেরত দিয়ে বললুম যে তাকে কয়লা-কুলিদের সর্দারিতে বাহাল করলুম। তার কাজ তাকে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিলুম। তখন কয়লার কাজ করছিল দুশো কুলি। মাত্র একটা ঘন্টা আগে যে নগণ্য লোকটি তার হীনজন্মের সব অযোগ্যতার বোঝা নিয়ে নিচু হয়ে ছিল, সে এখন বগলে একটি খাতা আর কানে একটি পেনসিল গুঁজে, জীবনে এই প্রথম তার মাথাটি উঁচু করে আমার আপিস থেকে বাইরে পা বাড়াল।

জীবনে আমি যত লোককে কাজে লাগিয়েছি তাদের মধ্যে চামারির মত বিবেক-সম্পন্ন এবং পরিশ্রমী লোক খুব কমই দেখেছি। তার অধীন কুলির দলে সব জাতের মেয়ে-পুরুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ছত্রী আর ঠাকুরও ছিল। কিন্তু তাদের যার যা জন্মগত অধিকার তার চাইতে কম মর্যাদা দেখিয়ে সে একবারও এইসব মেয়েদের আর পুরুষদের বিরাগ উৎপাদন করে নি।

অথচ তার কর্তৃত্বও কেউ কখনও অমান্য করে নি। তার অধীনে যারা কাজ করত তাদের প্রত্যেকের আলাদা হিসেব রাখবার দায়িত্ব তার উপরে ছিল। এবং যে কুড়ি বছর সে আমার কাছে কাজ করেছিল, তার হিসেবের নির্ভুলতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন কোনোদিন ওঠে নি।

প্রতি রবিবার সন্ধেবেলা চামারি একখানা মাদুরে আর আমি একটি টুলের উপর বসতুম। আমাদের মাঝখানে থাকত তামার পয়সার মস্ত একটি স্তূপ। আর, আমাদের ঘিরে থাকত তাদের সপ্তাহের পাওনার জন্যে ব্যগ্রভাবে

অপেক্ষমান কয়লার গুঁড়ো মাখা অনেকগুলি স্ত্রীলোক আর পুরুষ।

আমার চারপাশের এই সরল পরিশ্রমী মানুষগুলোর সঙ্গে আমিও সমানভাবেই এই সন্ধেগুলো উপভোগ করতুম। কেননা, তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে রোজগার করত তা পেতে যত আনন্দ, তা দিতে আমারও তেমনি আনন্দ হত। সারা সপ্তাহ ধরে তারা আধমাইল লম্বা একটা প্ল্যাটফর্মে কাজ করত, আর তাদের মধ্যে কেউ বা থাকত আমার দেওয়া বাড়িতে, কেউ বা থাকত আশপাশের গ্রামগুলিতে। তাই তাদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ ছিল অতি অল্প।

রবিবারের সন্ধেগুলিতে তারা সেই সুযোগ পেত, আর পূর্ণভাবে তার সদ্‌ব্যবহার করত। কাঠোর-পরিশ্রমী লোকরা সর্বদাই হাসিখুশি হয়। কেননা, কাল্পনিক কষ্ট বানিয়ে নেবার মত সময় তারা পায় না, আর সত্যিকার দুঃখের চাইতে মনগড়া দুঃখ তো সব সময়েই বেশি কষ্টকর হয়। এ কথা মানতেই হবে যে আমার লোকরা দীন-দরিদ্র, এবং ঝঞ্ঝাট-অশান্তি তাদের যথেষ্টই থাকত। তা সত্ত্বেও তারা বেশ আমুদে ছিল। আমিও তাদের মত ভাল করেই তাদের ভাষা বুঝতে আর বলতে পারতুম বলে তাদের মন-খোলা কথাবার্তায় এবং তাদের সব ঠাট্টা-তামাশায় যোগ দিতে পারতুম।

রেল-কোম্পানি আমাকে টাকা দিত ওজন-দরে, আর আমি আমার লোকদের দিতুম ওয়াগন হিসেবে—তা সেটা গুদামের কাজেই হ'ক আর কয়লার প্ল্যাটফর্মের কাজেই হ'ক।

মাল-গুদামের কাজের বাবদ আমি টাকাটা সর্দারদের হাতে দিতুম, তারা যে-যার লোককে তা থেকে তাদের পাওনা বেঁটে দিত। কিন্তু কয়লার মজুর আর মজুরনীদের প্রত্যেককে আমি নিজেই মজুরিটা দিতুম। চামারিকে নোট দিতুম, সে মোকামা বাজারে গিয়ে সেগুলোকে ভাঙিয়ে সব পয়সা করে নিয়ে আসত।

তারপর রবিবার সন্ধেবেলা আমাদের মাঝখানে সেই পয়সার কাঁড়ি নিয়ে আমরা দু-জনে বসতুম। সাতদিনের মধ্যে যত ওয়াগন খালাস করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে যে-যে পুরুষ আর মেয়ে কাজ করেছে চামারি তাদের নাম পড়ে যেত আর আমি তাড়াতাড়ি মনে মনে হিসেব করে নিয়ে প্রত্যেক কর্মীর যার যা পাওনা তা তাকে দিতুম।

প্রতি ওয়াগন খালাসের জন্যে আমি চল্লিশ পয়সা (দশ আনা) করে দিতুম। কোনো একটা ওয়াগন খালাস করতে যত জন করেছে যদি পাওনাটা তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা না যেত, তাহলে আমি বাড়তি পয়সা তাদের একজনের হাতে দিয়ে দিতুম সে পরে তা দিয়ে নুন কিনে এনে সকলের মধ্যে তা ভাগ করে দিত। টাকা দেবার এই নিয়মটা সকলেরই সন্তোষজনক হত।

কাজটা খুব কষ্টকর, আর খাটতেও হত অনেকক্ষণ, একথা ঠিক। কিন্তু এতে খেত মজুরির চাইতে তিনগুণ বেশি আয় হত। তা ছাড়া আমার কাজ ছিল স্থায়ী, আর খেত মজুরি ছিল মরশুমী, অস্থায়ী কাজ।

চামারিকে মাসে পনের টাকা মাইনেতে নিযুক্ত করেছিলুম, তা ক্রমে-ক্রমে বাড়িয়ে চল্লিশ টাকা করা হয়েছিল। রেলের বেশির ভাগ কেরানী যা পেত, এটা তার চাইতে বেশি। এ ছাড়া চামারিকে মাল-গুদামে দশজন লোককে লাগাতেও দিয়েছিলুম। ভারতবর্ষে মানুষের সম্মান অনেকটাই স্থির হয় তার রোজগার আর তার টাকার ব্যবহার দেখে। ভাল মাইনে পাচ্ছিল বলে চামারি সব রকমের লোকের শ্রদ্ধা পাচ্ছিল বটে, কিন্তু সে যে-রকম বিনা আড়ম্বরে টাকাটা খরচ করত, তার জন্যে সে আরও বেশি শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিল।

খিদে যে কি, তা সে জেনেছিল। তাই সে এটা তার কর্তব্য বলে গ্রহণ করল যে, সে যেমন কষ্ট পেয়েছে তেমন কষ্ট যাতে আর কেউ না পায় তা সে যথাশক্তি দেখবে। তার নিজের নিচু জাতের কেউ তার দরজায় এলে সে তার সংগে তার নিজের খাবার সানন্দে ভাগ করে খেত, এবং যে-সব অতিথি জাতের বাধার জন্যে চামারির বউয়ের রান্না খেতে পারত না, তারা নিজেরা রান্না করে নেবার জন্যে সিধে পেত।

এ-রকম করে সদাব্রত খুলে রাখার জন্যে তার বউয়ের কথায় আমি চামারিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে সব সময়েই বলত যে আমি যে-পনের টাকায় তাকে প্রথম কাজে নিযুক্ত করি, সেই টাকাতেই তো তার পরিবারের বেশ কুলিয়ে যাচ্ছিল—এখন তার বউকে তার চাইতে বেশি দিলে তাকে অপব্যয় করতে উৎসাহ দেওয়া হবে।

আমি জিগ্যেস করলুম যে তার অপব্যয়টা কোন্ দিকে হতে পারে। সে জবাব দিল যে তার বউ তাকে কেবলই জামাকাপড় সম্বন্ধে অনুযোগ করে, আর বলে যে তার অধীনের লোকদের চাইতে পোশাক ভাল হওয়া উচিত। অথচ সে নিজে মনে করে যে পোশাকের টাকাটা দিয়ে গরিবদের খাওয়ানোই অনেক ভাল।

তারপর, তার যুক্তিটাকে একেবারে পাকা করবার জন্যে সে বলল : 'এই নিজেকেই দেখুন না মহারাজ!'—সে প্রথম দিন আমাকে এই বলেই সম্বোধন করেছিল, তার শেষ দিন পর্যন্ত তা-ই বলে এসেছে—'আপনি তো কত বছর ধরে এই পোশাকটাই পরছেন। আপনি যা পারেন, আমি তা পারব না কেন?' আসলে কিন্তু আমার পোশাক সম্বন্ধে তার একটু ভুল হয়েছিল। একই কাপড়ে তৈরি দু-প্রস্থ সুট ছিল আমার। একটির কয়লার গুঁড়ো যখন সাফ করা হত, তখন অন্যটি ব্যবহৃত হত।

আমি মোকামা ঘাটে ষোল বছর আছি, এমন সময় কাইজার উইল্‌হেল্‌ম্‌

তাঁর যুদ্ধটি বাধিয়ে বসলেন। আমার যুদ্ধে যাওয়ার কথায় রেল-কোম্পানি প্রথমে আপত্তি করেছিল, কিন্তু শেষে যখন আমি ঠিকাদারিটা চালিয়ে যাব' বললুম, তখন তারা রাজী হল। আমার লোকদের নিয়ে এক আলোচনা-সভা করলুম। এ যুদ্ধের তাৎপর্য যে কি সে-কথা তাদের বোঝানো অসম্ভব হল, কিন্তু আমি না থাকলেও তাদের প্রত্যেকে কাজটা চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক আছে দেখা গেল।

আমি যে ক-বছর ধরে প্রথমে ফ্রান্সে, পরে ওয়াজিরিস্তানে সেনাদলে কাজ করছিলুম, তখন যে মোকামা ঘাট দিয়ে অবাধে এবং একটি গোলমালও না হয়ে মাল-চলাচল হয়েছিল, সেটা সম্পূর্ণই তাদের আনুগত্য এবং অনুরাগের জন্যে সম্ভব হয়েছিল।

আমার অবর্তমানে রামশরণ ট্র্যানশিপ্‌মেন্ট ইন্‌সপেক্‌টর হন। চার বছর বাদে যখন ফিরে এলুম, তখন আমার লোকদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ হবার সময় এই সুখের অনুভূতিটি হল যে আমি মোটে একটি দিন এখানে ছিলুম না। তারা বলল যে তারা মন্দিরে, মসজিদে আর বাড়ির ঠাকুর-ঘরে প্রার্থনা জানিয়েছিল বলে আমি নিরাপদে ফিরে এসেছি।

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবার পরের গ্রীষ্মকালে সারা বাংলাদেশ জুড়ে বেজায় কলেরা দেখা দিল। কয়লা-কুলিদের মধ্যে দু-জন মেয়ে আর একটি পুরুষ একসঙ্গে এই রোগের খপ্পরে পড়ল। চামারি আর আমি পালা করে তাদের সেবা করতে লাগলুম, তাদের মনে সাহস সঞ্চার করতে লাগলুম। শেষে শুধুমাত্র মনের জোরে তারা রক্ষা পেয়ে গেল।

এর কিছুদিন বাদে এক রাত্রে আমি শুনতে পেলুম যে বাংলোর বারান্দায় কে যেন ঘোরাফেরা করছে। স্টরারের পদোন্নতি হওয়াতে তিনি চলে গিয়েছিলেন, বাংলোয় আমি একাই ছিলুম। কে, তা জিগ্যেস করায় অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা জবাব এল, 'আমি চামারির বউ। আপনাকে বলতে এসেছি যে তার কলেরা হয়েছে।' তাকে দাঁড়াতে বলে আমি তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে, একটি লন্ঠন জেলে আর লাঠি নিয়ে তার সঙ্গে রওনা হলুম। মোকামা ঘাটে বড় বিষাক্ত সাপের ভয়।

সেদিন চামারি সারাদিন কাজ করবার পর বিকেলবেলা আমার সঙ্গে কাছেই একটি গ্রামে গিয়েছিল। পার্বতী বলে তার কয়লা কুলির দলের একটি স্ত্রীলোক সেখানে গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়েছে বলে খবর এসেছিল। পার্বতী বিধবা, তার তিনটি সন্তান। মোকামা ঘাটে আসার পর সে-ই প্রথম স্ত্রীলোক যে আমার কাছে কাজ করতে এসেছিল, আর এই কুড়ি বছর ধরে সে অক্লান্তভাবে কাজ করেছিল।

সব সময়ে হাসিখুশি আর আনন্দময়ী এই মেয়েটি সর্বদাই যার দরকার

তাকেই সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। রবিবারের সান্ধ্য আসরের সে-ই ছিল প্রাণ। কারণ সে বিধবা বলে সকলের সঙ্গেই ঠাট্টাকৌতুক করতে পারত। তাতে ভারতীয় সমাজের শালীনতার কঠোর নিয়ম লঙ্ঘন করা হত না। যে ছেলেটি তার অসুখের খবর আমার কাছে নিয়ে এসেছিল সে জানত না যে তার কি হয়েছে। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস যে পার্বতী মরতে বসেছে।

সুতরাং আমি সামান্য কয়েকটি ওষুধ সঙ্গে নিয়ে, আর যাওয়ার পথে চামারিকে ডাক দিয়ে তাডাতাড়ি সেই গ্রামে গেলুম। গিয়ে দেখি যে পার্বতী তার বৃদ্ধা মায়ের কোলে মাথা রেখে কুড়েঘরের মেঝেতে শুয়ে রয়েছে। ধনুষ্টঙ্কার এই আমি প্রথম দেখলুম, এবং আশা করি এটাই শেষ দেখা হবে। পার্বতীর মত দাঁত থাকলে যে কোনো চিত্রতারকার ভাগ্য ফিরে যেত। তাকে জল খাওয়াবার জন্যে চাড় দিয়ে খুলতে গিয়ে সেই দাঁতের পাটি ভেঙে গিয়েছিল।

তার জ্ঞান ছিল, কিন্তু সে কথা বলতে পারছিল না। যে যন্ত্রণা সে ভোগ করছিল, তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। তাকে আরাম দেবার জন্যে আমার কিছুই করবার ছিল না, শুধু তার শ্বাসপ্রশ্বাস একটু সহজ হতে পারে ভেবে তার গলার খিঁচে-থাকা পেশীগুলো একটু মালিশ করে দিতে লাগলুম। যখন এই করছি তখন যেন একটা ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে তার শরীরটা থর-থর করে উঠল। তার হৃৎস্পন্দন যেন দয়া করে থেমে গেল, তার সব যন্ত্রণার অবসান হল।

দরিদ্রের কুটিরটি থেকে ফিরে আসবার সময় আমাতে আর চামারিতে একটি কথাও হল না। মৃতদেহ সৎকারের আয়োজন ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সেই উঁচু জাতের মেয়েটির আর আমাদের মাঝখানে সংস্কারগত বাধা ছিল প্রচুর। তবু তার জন্যে আমাদের ভালবাসার কিছু কমতি হয় নি। আর এই আনন্দময়ী, কঠোর পরিশ্রমী ছোটখাটো মেয়েটির অভাব আমরা মুখে স্বীকার না করলেও খুবই অনুভব করব, এ কথা আমরা দু-জনেই জানতুম। সে রাত্রে আমি সামারিয়া ঘাটে চলে যাওয়াতে চামারির সঙ্গে আমার আব দেখা হয় নি। আর এখন তার বউ বলতে এসেছে যে তার কলেরা হয়েছে।

ভারতে আমরা কলেরাকে ঘৃণা আর ভয় দুই করি বটে, কিন্তু বোধহয় আমরা অদৃষ্টবাদী বলেই ছোঁয়াচ লাগবাব ভয় আমাদের নেই। তাই আমি দেখে অবাক হলুম না যে চামারিব দড়ির খাটিয়া ঘিরে বহু লোক মেঝেতে বসে আছে।

ঘরটা অন্ধকার, কিন্তু আমার হাতের লণ্ঠনের আলোয় চামারি আমাকে চিনতে পেরে বললে, 'এই অসময়ে আপনাকে ডেকে এনেছে বলে আমার বউকে মাপ করবেন।' রাত তখন দুটো। 'ভোর হবার আগে আপনাকে বিরক্ত করতে

বারণ করেছিলুম ওকে। ও আমার কথা শুনল না।'

ঘণ্টাদশেক আগে চামারিতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, তখন সে তো বেশ সুস্থই ছিল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার চেহারা কিরকম বদলে গিয়েছে তা দেখে আমি চমকে উঠলুম। সে চিরকালই রোগা পাতলা মানুষ, এখন দেখে মনে হল যে সে কুঁকড়ে তারও অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। চোখদুটি গভীরভাবে কোটরে ঢুকে গিয়েছে, স্বর অতি দুর্বল, ফিসফিসানির চেয়ে বেশি কিছু নয়।

ঘরের ভিতর সাংঘাতিক গরম। তাই আমি তার প্রায়-উলঙ্গ দেহ একখানা চাদর দিয়ে ঢেকে লোকদের দিয়ে তাকে বাইরে উঠোনে আনিয়ে নিলুম। কলেরা রোগীর পক্ষে জায়গাটা বড়ই প্রকাশ্য স্থান, তা ঠিক। কিন্তু তার মত অবস্থার মানুষের নিঃশ্বাস নেবার মত হাওয়াও সেখানে ছিল না। অমন উত্তপ্ত একটা ঘরের চাইতে প্রকাশ্য স্থানও অনেক ভাল।

চামারিতে আর আমাতে মিলে অনেক কলেরার কেস-এর সঙ্গে লড়াই করেছি। ঘাবড়ে যাওয়ার যে কি বিপদ আর আমার নাগালের মধ্যে যেসব সামান্য ওষুধপত্র ছিল তার উপর বিশ্বাস রাখাটা যে কত দরকার, সে কথা তার চেয়ে ভাল করে কেউ জানত না। এই বিশ্রী রোগের সঙ্গে সে বীরের মত যুঝতে লাগল। একবারও হতাশ না হয়ে আমি তার রোগ ঠেকাবার এবং শরীরে জোর বজায় রাখবার জন্যে যত কিছু দিলুম, তা-ই সে খেতে লাগল।

দিনটা গরম হলেও তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তাকে গরম রাখবার জন্যে তার বিছানার তলায় জ্বলন্ত কয়লা-ভরা একটা আগুনের পাত্র রাখা হল, আর তার হাতের পাতায় আর পায়ের তেলোয় শুঠের গুঁড়ো ঘষা হতে লাগল।

আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে এই লড়াই চলল, তার প্রতিটি মুহূর্তে মরণের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া হল। তারপর সেই সাহসী ছোট্ট মানুষটির আচ্ছন্ন ভাব দেখা দিল, নাড়ী ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল, শ্বাসক্রিয়া বুঝতে পারা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। রাত বারটা থেকে চারটের একটু পর পর্যন্ত তার এই অবস্থা চলল। বুঝলাম যে আমার বন্ধু আর সামলাতে পারবে না। এই দীর্ঘকাল ধরে আমার সঙ্গে যেসব নির্বাক মানুষ তার উপর লক্ষ রাখছিল, তারা হয় মাটিতে বসে নয় চামারিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল।

এমন সময় চামারি হঠাৎ উঠে বসে, ব্যগ্রভাবে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বরে বলে উঠল, 'মহারাজ! মহারাজ! আপনি কোথায়?'

আমি শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমি ঝুঁকে পড়ে আমার হাতখানা তার কাঁধে রাখতে সে তার দুই হাত দিয়ে তা ধরে বলল, 'মহারাজ! পরমেশ্বর আমাকে ডাকছেন, আমাকে যেতে হবে।'

তারপর দুই হাত জোড় করে, মাথা নুইয়ে সে বলল, 'পরমেশ্বর! আমি আসছি!'

আমি যখন তাকে আবার বিছানায় শুইয়ে দিলুম তখন তার প্রাণ আর নেই।

বোধহয় সব জাতের শ-খানেক লোক উপস্থিত ছিল। সবাই চামারির শেষ কথাগুলো শুনেছিল। তাদের মধ্যে একজন অজানা লোক ছিল, তার কপালে চন্দনের তিলক, তাতে তার জাত বোঝা যায়। আমি যখন শীর্ণ দেহটিকে খাটিয়ায় নামিয়ে রাখলুম, সেই আগন্তুকটি তখন জানতে চাইল যে মৃত ব্যক্তি কে?

যখন বলা হল যে সে হচ্ছে চামারি, তখন লোকটি বলল, 'অনেক কাল ধরে যা খুঁজছিলুম, এতক্ষণে তা পেলুম। কাশীর প্রধান বিষ্ণুমন্দিরের একজন পুরোহিত আমি। আমাদের প্রভু, সেখানকার প্রধান পুরোহিত ঠাকুর, ওই লোকটির সৎকার্যের কথা শুনে একে খুঁজে বের করে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এর একটু দর্শন পেতে পারেন। আমি এখন আমার প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে বলব যে চামারি মারা গিয়েছে। চামারিকে যে কথা বলতে শুনলুম, তাও তাঁকে বলব।'

তারপর হাতের পুঁটলিটা মাটিতে রেখে, পায়ের চপ্পল খুলে ফেলে, সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত খাটিয়ার পায়ের দিকে গিয়ে সেই মৃত অস্পৃশ্য ব্যক্তিকে প্রণাম জানাল।

চামারির মত করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মোকামা ঘাটে আর কখনও কারও হবে না। সকল সমাজের সব সম্প্রদায়েরই লোক, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান, অস্পৃশ্য-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে তাতে যোগদান করেছিল। একদিন যে বন্ধুহীন অবস্থায় নানা অযোগ্যতার বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তারপর সকলের শ্রদ্ধাভাজন এবং অনেকের ভালবাসার পাত্র হয়ে বিদায় নিল, তাকে শেষ সম্মান দেখাতে এসেছিল সবাই।

আমাদের খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাস অনুসারে চামারি ধর্মশূন্য বর্বর লোক মাত্র। ভারতের অস্পৃশ্যদের মধ্যেও তার স্থান ছিল সকলের নিচে। কিন্তু সে যেখানে গিয়েছে, আমার যদি সেখানে যাবার সৌভাগ্য হয় তাহলে আমি আর কিছু চাইব না।



১২

মোকামা ঘাটে জীবন-যাত্রা

আমার লোকরা আর আমি যে মোকামা ঘাটে শুধু কাজ করে আর ঘুমিয়েই সময় কাটিয়েছিলুম, তা নয়। গোড়ার দিকে কাজের চাপ আমাদের সকলের পক্ষেই অবশ্য সাংঘাতিক ছিল, আর সাংঘাতিক থেকেও গেল। কিন্তু সময় কেটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যখন হাতে কড়া পড়ে গেল আর পিঠের পেশী গড়ে উঠল, তখন আমরা আমাদের জোয়ালের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেলুম।

আমাদের উপর যারা নির্ভর করত তাদের মঙ্গলই আমাদের প্রত্যেকের সাধারণ লক্ষ্য ছিল বলে সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা সকলে একই দিকে জোয়াল টানতুম।

তাই কাজ অবাধে চলতে লাগল, আর আনন্দ করবার এক-আধটুকু ফুরসত পাওয়া যেতে লাগল। মোকামা ঘাটে যে বিপুল পরিমাণ মাল জমে উঠেছিল তা পরিষ্কার করে এবং তারপর মালের চলাচল ঠিক রেখে আমরা যে-সুনাম অর্জন করেছিলুম তাতে আমাদের প্রত্যেকেরই কৃতিত্ব ছিল। তাই আমরা প্রত্যেকে তার জন্যে গর্ব বোধ করতুম, এবং সুনাম রক্ষার জন্যে কৃত-সংকল্প ছিলুম। তাই, কেউ একজন ব্যক্তিগত কাজের জন্যে কামাই করলে তার সঙ্গীরা সানন্দে তার কাজটা করে দিত।

যখন একটুখানি সময় পেলুম আর হাতে দু-চারটে টাকা এল, তখন প্রথম যে-সব কাজে হাত দিলুম তা হচ্ছে আমার লোকদের এবং কম-মাইনের রেলে-কর্মচারীদের ছেলেদের জন্যে একটা স্কুল খোলা। বুদ্ধিটা প্রথম এল রাম-শরণজীর মাথায়। তিনি শিক্ষা-ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন—বোধহয় এইজন্যে যে, তিনি নিজে লেখাপড়া করবার বিশেষ সুযোগ পান নি।

আমরা দু'জনে মিলে একটি কুটির ভাড়া করে, তাতে একজন মাস্টারকে বসিয়ে, কুড়িটি ছাত্র নিয়ে স্কুল আরম্ভ করে দিলুম। এরপর এর নাম বরাবরই ছিল 'রামশরণের স্কুল'। প্রথম যাতে এসে ঠোক্কর খেলুম তা হচ্ছে জাত-বিচার। কিন্তু আমাদের শিক্ষক মশায় কুড়েঘরখানার চারপাশটা খুলে ফেলে এই সমস্যার পাশ কাটিয়ে গেলেন। কেননা, উঁচুজাতের ছেলেরা আর নিচু জাতের ছেলেরা এক ঘরে বসতে পারে না বটে, কিন্তু একই চালার তলায় বসলে কোনো আপত্তির কারণ থাকে না।

গোড়া থেকেই স্কুলটি খুব ভাল চলতে লাগল, সেটা সম্পূর্ণভাবেই রাম-শরণজীর অদম্য উৎসাহের ফলে। যখন উপযুক্ত বাড়ি-টারি তৈরি হল, আরও সাতজন মাস্টারকে নিযুক্ত করা হল, ছাত্রসংখ্যাও বেড়ে দুশোতে দাড়াল, গভর্নমেণ্ট তখন আমাদের টাকাকড়ি-সংক্রান্ত সব দায়িত্ব নিজে নিয়ে স্কুলটিকে একটি মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয়ের পর্যায়ে তুলে দিল, এবং 'রায়সাহেব' উপাধি দিয়ে রামশরণজীকে পুরস্কৃত করল। তাতে তাঁর বন্ধুরা সকলেই আনন্দিত হল।

বড় লাইনে রামশরণের সমপদস্থ ব্যক্তি টম কেলি ছিলেন একজন উৎসাহী ক্রীড়ামোদী মানুষ। তাঁতে আর আমাতে মিলে একটি রিক্রিয়েশন ক্লাব (অবসর বিনোদন সঙ্ঘ) প্রতিষ্ঠা করলুম। খানিকটা জায়গা সাফ করে নিয়ে, একটি ফুটবলের আর একটা হকি খেলার গ্রাউন্ড চিহ্নিত করে, গোল-পোস্ট পুঁতে, ফুটবল আর হকি-স্টিক কিনে আমরা যে যার ফুটবল আর হকির দলকে তালিম দিতে লাগলুম।

ফুটবল খেলায় তালিম দেওয়াটা তবু সোজা হয়েছিল, কিন্তু হকির বেলা তা হল না। নিয়মানুমোদিত হকি-স্টিক কেনা আমাদের সংগতিতে কুলোল না বলে যা কিনলুম তাকে সেকালে বলা হত 'খালসা স্টিক'। এগুলো একরকম ব্ল্যাক্‌থর্ন কিংবা ছোট ওক্‌জাতীয় গাছ থেকে পঞ্জাবে তৈরি হত। তার শিকড়কে দরকার-মত বাঁকা করে নিয়ে স্টিকের বাঁকটা বানানো হত।

প্রথমদিকে অনেকে আহত হতে লাগল, কেননা শতকরা আটানব্বই জনই খালি পায়ে খেলত, স্টিকগুলিও ছিল ভারি, তাতে কিছু জড়ানোও থাকত না, আর খেলা হত কাঠের বল দিয়ে। যখন আমাদের দু-জনের দলই খেলার দুটো অ-আ-ক-খ আয়ত্ত করে ফেলল—অর্থাৎ, বলটাকে কোন্‌দিকে ঠেলে নিতে হবে তা শিখে নিল (তার বেশি নয়)—তখন আন্তঃরেলওয়ে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিলুম। আমরা, খেলোয়াড়রা তাতে যত না আমোদ পেতুম, দর্শকরা পেত তার চাইতে বেশি।

কেলি নিজেকে যতটা মোটা বলে মানতেন তিনি তার চেয়ে মোটা ছিলেন বলে সব সময় নিজের দলের গোলে খেলতেন। আর বাইরের দলের বিরুদ্ধে

আমরা সংযুক্ত দল হয়ে খেললেও তিনি আমাদের গোলকীপার হতেন। আমি রোগা পাতলা মানুষ, সেণ্টার ফরওআর্ড খেলতুম। কারও পায়ে কিংবা হকি-স্টিকে বেধে দৈবাৎ কখনও পড়ে গেলে আমাকে ভারি বিব্রত হতে হত। কারণ, এরকম কিছু ঘটলে কেলি ছাড়া আর বাদবাকি সব খেলোয়াড়ই খেলা ছেড়ে এসে আমাকে তুলে দাঁড় করাতে আর পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়তে লেগে যেত।

একবার আমার যখন এই ধরনের যত্ন-আত্তি চলছিল, তখন বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড় বল ড্রিব্‌ল করতে-করতে মাঠ ধরে ছুটছে দেখে দর্শকেরা মাঝখানে পড়ে তাকে গোল দিতে তো দিলই না, উলটে তার বলটা বাজেয়াপ্ত করে তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলল।

আমরা রিক্রিয়েশন ক্লাবটি পত্তন করবার অল্প পরেই বেঙ্গল অ্যান্ড নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে একটি ক্লাব-ঘর তৈরি করে। তাতে তাদের ইউরোপীয় কর্মচারীদের জন্যে একটি টেনিস-কোর্টও হয়। এরকম কর্মচারীর সংখ্যা আমাকে নিয়ে ছিল চার। কেলিকে সেই ক্লাবের একজন চাঁদা-না দেওয়া সভ্য করে নেওয়া হল। দেখা গেল যে তাকে সভ্য করে নিয়ে বেশ কাজ হয়েছে, কেননা তিনি বিলিয়ার্ড্‌স ও টেনিস দুই খেলাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি আর আমি মাসে দু-তিনবারের বেশি টেনিস খেলা উপভোগ করতে পারতুম না বটে, কিন্তু দিনের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর অনেকদিনই সন্ধেবেলা আমরা মনের আনন্দে বিলিয়ার্ড্‌স খেলেছি।

মোকামা ঘাটের মাল-গুদামগুলো আর সাইডিংগুলো দেড় মাইলেরও বেশি লম্বা ছিল। মিছিমিছি হাঁটার হাত থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্যে কেলির রেল-কোম্পানি তাঁকে একখানা ট্রলি আর সেটা ঠেলবার জন্যে চারজন লোক দিয়েছিল। ট্রলিটা কেলির আর অপর পক্ষের বড়ই আনন্দের জিনিস হয়েছিল, কেননা শীত-কালে যখন কড় হাঁস আর বালি হাঁসেরা দেখা দিত আর পূর্ণিমা বা তার কাছাকাছি তিথি এসে পড়ত, তখন আমরা ট্রলি করে বড় লাইন ধরে ন-মাইল গিয়ে কতকগুলি ছোট-ছোট পুকুরের কাছে নামতুম।

পুকুরগুলোর কোনোটা কয়েক গজ মাত্র চওড়া, কোনো-কোনোটা বা আয়তনে তিন চার বিঘে পর্যন্ত। তাদের চারপাশে অড়হরের খেত থাকায় লুকিয়ে থাকবার বেশ সুবিধে ছিল। সূর্য যখন ডুবছে এমন সময় আমরা সেখানে এসে পৌঁছতম, তারপর একটা পুকুরের পাশে কেলি, আর অন্য একটার ধারে আমি জায়গা নিতুম।

একটু বাদেই হাঁসগুলোকে আসতে দেখা যেত। সত্যিই তাদের সংখ্যা অযুত-অযুত। দিনের বেলা তারা গঙ্গার চড়ায় থাকত, আর সন্ধে হলে চড়া থেকে চলে এসে এই পুকুরগুলির পানা কিংবা তার ওধারে পাকা গম বা অন্য

ফসল খেত। আমাদের আর গঙ্গার মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে রেল-লাইন গিয়েছে। সেটা পার হয়েই হাঁসগুলো নামতে শুরু করত। তারপর আমাদের মাথার উপর সহজ পাল্লার মধ্যে এসে যেত।

চাঁদের আলোয় শিকার করতে হলে একটু অভ্যেস থাকা চাই, কেননা মাথার-উপর-দিয়ে-উড়ে-যাওয়া পাখি আসলে যতটা দূরে থাকে তার চাইতে বেশি দূরে বলে মনে হয়। তাই শিকারী একটু বেশি সামনের দিকে গুলি ছুড়ে বসে। এরকম হলে পাখিগুলো বন্দুকের আগুনের ঝলক দেখে আর শব্দ শুনে খাড়া হয়ে আকাশে উঠে যায়। যখন তারা আবার উপুড় হয়, ততক্ষণে তারা বন্দুকের দ্বিতীয় নলটির পাল্লার বাইরে চলে গিয়েছে।

পূর্ণিমার চাঁদ যখন গঙ্গার ধারের তালগাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে, মাথার উপর দিয়ে দশ থেকে একশোটা হাঁসের ঝাঁকের পর ঝাঁক চলে যাচ্ছে এবং তাদের কলধ্বনি আর পাখা নাড়ার সাঁই-সাঁই শব্দে শুকনো ঠান্ডা হাওয়া স্পন্দিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে, তখনকার সেই শীতের সন্ধেগুলির স্মৃতি আমার মোকামা ঘাটের দিনগুলির সবচেয়ে সুখের স্মৃতির মধ্যে অন্যতম।

আমার কাজ কখনও নীরস লাগত না সময়ও কখনও কাটছে না বলে মনে হত না। কারণ, গঙ্গা-পারাপারের ব্যবস্থা এবং মোকামা ঘাটে দশলক্ষ টন মাল চলাচলের বন্দোবস্ত করার উপরে আবার যে কয়েক লক্ষ লোক প্রতি বছর গঙ্গার দুই কূলের মধ্যে যাতায়াত করত, তাদের জন্য ফেরি-স্টীমার চালাবার ব্যবস্থা আমার উপরেই ছিল।

হিমালয়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের পর নদীটা এখানে চার-পাঁচ মাইল চওড়া হয়ে উঠত। নদী পার হওয়াটা আমার আনন্দের ব্যাপার ছিল। তাতে যে শুধু আমার পা দু-খানা বিশ্রাম পেত আর একটু শান্তিতে ধূমপান করবার সুবিধে হত তা-ই নয়—এতে আমি আমার একটা শখের কাজ করবারও সুযোগ পেতুম তা হচ্ছে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করা। ফেরি-স্টীমারটা ছিল মস্ত দুটো রেলপথের যোগসূত্র। তার মধ্যে একটা উত্তর দিকে, অপরটা দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি খেপে যে সাতশো লোক নদী পার হত, তাদের মধ্যে ভারতের সব জায়গা থেকে, এমনকি ভারতের সীমান্তপারের দেশগুলি থেকেও এসেছে এমন লোক থাকত।

একদিন সকালবেলা আমি স্টীমারের উপরের ডেক থেকে ঝুঁকে পড়ে নিচের ডেকে থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের দেখছিলুম। আমার সঙ্গে একটি যুবক ছিল, সে সম্প্রতি ইংল্যান্ড থেকে এসে রেলের কাজে যোগ দিয়েছিল। মোকামা ঘাটে আমার কাজের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে তাকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আমার কাছে সে একপক্ষ কাল কাটিয়েছিল।

তখন আমি তার সঙ্গে নদী পার হয়ে সামারিয়া ঘাটে চলেছিলুম। সেখান থেকে তাকে গোরখপুর যেতে হবে, সেই দীর্ঘ যাত্রায় তাকে রওনা করে দিয়ে আসব। আমার পাশের বেঞ্চেই পা মুড়ে বসে একজন ভারতীয়ও নিচের ডেকের দিকে দেখছিল। আমার যুবক সংগী ক্রস্থওয়েট এদেশে কাজ করতে এসে এদেশের সবকিছু সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। যখন আমরা লোকগুলোকে বকবক করতে-করতে খোলা ডেকে জায়গা করে নিতে দেখছিলুম, তখন সে বললে এই সব লোকেরা কারা, আর এরা ভারতের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছেই বা কেন এ বিষয়ে তার প্রচুর কৌতূহল।

জনতা ততক্ষণে মুড়ি-ঠাসা হয়ে বসে পড়েছে। তাকে বললুম যে তার কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করব। বললুম, 'ডান দিক থেকে আরম্ভ করা যাক। একেবারে বাইরের সারির লোক যারা রেলিং-এ পিঠ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু তাদের ধরে-ধরে সারা ডেকটা ঘুরে আসা যাবে। আমাদের সবচাইতে কাছের লোক তিনজন হচ্ছে ব্রাহ্মণ। কাদামাটি দিয়ে আঁটা যে বড়-বড় তামার হাঁড়িগুলিকে ওরা সাবধানে পাহারা দিচ্ছে, তাতে আছে গঙ্গাজল। গঙ্গার বাঁ পারের চাইতে ডান পারের কাছের জলই বেশি পবিত্র বলে গণ্য। তাই একজন বিখ্যাত মহারাজার কর্মচারী এই তিনজন ব্রাহ্মণ ওই পাত্রগুলিকে এপারে এসে ভরে নিয়ে আশি মাইল দূরে চলেছে স্টীমারে আর রেলপথে—মহারাজার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে। এমনকি ভ্রমণের সময়ও সেই মহারাজা ঘরোয়া কাজে ওই গঙ্গাজল ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করেন না।

ব্রাহ্মণদের পরেই যে লোকটি, সে একজন মুসলমান ধনুকর। তার পাশে ডেকের উপরে ধনুকের মত যে যন্ত্রটি পড়ে রয়েছে, তা দিয়ে সে পুরনো তোশক-গদির ডেলা-বাঁধা তুলোগুলিকে ধুনে দেবার কাজ করে, জায়গায়-জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এই যন্ত্রটি দিয়ে পুরনো তুলো ধুনতে ধুনতে ও সেগুলোকে ফুঁপিয়ে রেশমের মতন করে তোলে।

তার পরেই রয়েছে দু-জন তিব্বতী লামা। তারা গয়ার পবিত্র বৌদ্ধ মন্দিরে তীর্থ করে ফিরে চলেছে। তাদের কপালে ঘামের ফোঁটা দেখেই বুঝতে পারছ শীতের এই ভোরেও তাদের গরম লাগছে।

লামাদের ওপাশে চারজন লোকের একটি দল। এরা তীর্থ করতে কাশী গিয়েছিল, এখন নেপালের পাদ-শৈলে তাদের ঘরে ফিরে চলেছে। দেখতেই পাচ্ছ যে তাদের চারজনের প্রত্যেকেরই দুটো করে ফুঁকো কাঠের কুঁজো সঙ্গে আছে। সেগুলো বেতের বোনা দিয়ে সুরক্ষিত, আর খাটো বাঁশের বাঁকে ঝোলানো রয়েছে। কাশীর গঙ্গায় তোলা জল আছে ওতে। ওদের নিজেদের আর আশপাশের গ্রামগুলিতে পূজাপার্বণ উপলক্ষে এই জল ওরা ফোঁটা-ফোঁটা করে বিক্রি করবে।'

এইভাবে সারাটা ডেক ঘুরে আমি বাঁ-দিকের শেষ লোকটির প্রসঙ্গে এলুম। ক্রস্থওয়েটকে বললুম, 'এই লোকটি আমার পুরনো পরিচিত লোক। সে আমার লোকদের একজনের বাবা। নদীর বাঁ-কূলে তার খেত চাষ করবার জন্যে এখন গঙ্গা পার হচ্ছে।

নিচের ডেকের যাত্রীদের সম্বন্ধে যা যা বললুম, ক্রস্থওয়েট সে সব কথাই গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনল। তারপর সে জিগ্যেস করল যে আমাদের পাশের বেঞ্চে যে লোকটি বসে আছে সে কে?

আমি বললুম, 'ও! উনি একজন মুসলমান ভদ্রলোক, চামড়ার ব্যবসা করেন। গয়া থেকে মজফ্ফরপুর চলেছেন।'

আমার কথা শেষ হতেই ভদ্রলোক পা দুখানা সোজা করে ডেকের মেঝেতে নামালেন, তারপর হাসতে শুরু করলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে নিখুঁত ইংরেজিতে বললেন, 'আমাদের নিচের ডেকের লোকদের যে বর্ণনা এতক্ষণ আপনি আপনার বন্ধুকে দিচ্ছিলেন, তা শুনে আমার খুব মজা লাগছিল। আমার বর্ণনা শুনে তো আরও আমোদ হল।'

আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলুম, কেননা আমি ধরে নিয়েছিলুম যে ইনি ইংরেজি জানেন না। অবশ্য আমার রোদে-পোড়া রঙে সেই লাল রঙটা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'আমার মনে হয় যে এক আমার ক্ষেত্রে ছাড়া আর সকলের ক্ষেত্রেই আপনার বর্ণনা ঠিক হয়েছে। আপনি যা বললেন আমি তা-ই—মুসলমান। গয়া থেকে মজফ্ফরপুর চলেছি, সে কথাও ঠিক—যদিও আপনি তা কী করে জানলেন তা জানি না, কেননা গয়াতে টিকিট কেনবার পর এ-পর্যন্ত আমি সেটা কাউকে দেখাই নি। কিন্তু আমাকে চামড়া-ব্যবসায়ী বলে মনে করে ভুল করেছেন। চামড়া নয়, তামাকের কারবার করি আমি।'

কখনও কখনও বিশিষ্ট-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে স্পেশ্যাল ট্রেন চালানো হত, আর সেই উপলক্ষে বিশেষ খেয়া-স্টীমারও দেওয়া হত। এদের সময় ঠিক করে দেবার দায়িত্ব ছিল আমার। একদিন বিকেলবেলা আমি এইরকম একটি স্পেশ্যাল ট্রেন দেখতে গিয়েছিলুম। তাতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর পরিবারের কুড়িজন মহিলা, তাঁর একজন সেক্রেটারী আর মস্ত একদল চাকর-বাকর নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে কলকাতা যাচ্ছিলেন।

ট্রেন থামতেই নেপালের জাতীয় পোশাক পরা গৌরবর্ণ দৈত্যাকৃতি একটি লোক ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে, যে গাড়িতে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার কাছে এল। এখানে এসে সে একটি প্রকাণ্ড ছাতা খুলে, কামরার দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাতখানা তুলে কোমরে রাখল।

শিগগিরই তার পিছনের দরজাটা খুলে প্রধানমন্ত্রী দেখা দিলেন, তাঁর হাতে একটি বেত, সেটার মাথাটা সোনা বাঁধানো। তিনি অভ্যস্তভাবে এবং সহজেই লোকটির বাহুর উপর চড়ে বসলেন। তিনি আরাম করে বসবার পর লোকটি তাঁর মাথার উপর ছাতাটা তুলে ধরে রওনা হল। যেমন করে মানুষ মোমের পুতুল নিয়ে যায়, সে তেমনই অবলীলাক্রমে এই বোঝা নিয়ে আলগা বালির উপর দিয়ে তিনশো গজ হেঁটে স্টীমারে গিয়ে পেঁছিল।

সেক্রেটারী মশায়কে আমি চিনতুম। তাঁকে বললুম যে এমন একটা গায়ের জোরের কাজ আমি কখনও দেখি নি। তিনি আমাকে জানালেন যে, যেখানে অন্য কোনো যানবাহন পাওয়া যায় না সেখানে সর্বদাই প্রধানমন্ত্রী এই ফরসা দৈত্যটিকে এই কাজে লাগান। তিনি বললেন বটে যে লোকটি নেপালী কিন্তু আমার অনুমান এই যে, সে উত্তর ইউরোপের কোনো জাতের লোক। কি কারণে সে ভারতের সীমান্তে একটি স্বাধীন রাজ্যে এসে চাকরি নিয়েছিল, সে-কথা সে কিংবা তার মনিবরাই ভাল বলতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রীকে যখন বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ততক্ষণে চারজন অনুচর বারফুট লম্বা আর আটফুট চওড়া একটি চারকোনা কালো সিল্ক বের করে নিয়ে এসে, সব দরজা-জানলা বন্ধ-করা একটি কামরার পাশে বালির উপর বিছিয়ে দিল। কাপড়খানার চার কোনায় দড়ির ফাঁস পরানো ছিল। মাথায় হুক লাগানো চারটে আটফুট উঁচু রুপোর খুঁটির হুকগুলো ওই চারটে ফাঁসের মধ্যে গলিয়ে খুঁটিগুলো খাড়া করে ধরতে সেই চৌকোনা জিনিসটা তালাশূন্য বাকসের মত আকার ধারণ করল।

এবার এটার এক মাথা ওই কামরাটার দরজার সমান উঁচু করে তুলে ধরা হল, আর প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের কুড়িজন মহিলা সেই কামরা থেকে বেরিয়ে সেই সিল্কের ঘেরাটোপের ভিতরে ঢুকলেন। দণ্ডবাহকেরা ঘেরাটোপটার বাইরে হাঁটতে লাগল, মহিলাদের শুধু ঝকঝকে পেটেন্ট লেদারের জুতো-পরা পা ক-খানা দেখা যেতে লাগল—এইভাবে শোভাযাত্রা স্টীমারের দিকে রওনা হল।

স্টীমারের নিচের ডেকে এসে ঘেরাটোপটার এক মাথা তুলে ধরতেই মহিলারা সিঁড়ি বেয়ে হালকা পায়ে ছুটে উপরের ডেকে যেখানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি কথা বলছিলুম, সেখানে চলে এলেন।

তাঁদের সকলেরই বয়স ষোল থেকে আঠার বছর বলে মনে হল। এর আগে একবার যখন মহিলারা এভাবে এসে পড়েছিলেন, তখন আমি উপরকার ডেক ছেড়ে সরে যাবার প্রস্তাব করেছিলুম। তখন আমাকে বলা হয়েছিল যে তা করবার দরকার নেই—শুধু বাজে লোক যাতে রাজপরিবারের মহিলাদের দেখতে না পায়, এইজন্যেই ওই সিল্কের বাক্স।

মহিলাদের পোশাকের বিশদ বর্ণনা দেবার সাধ্য আমার নেই। এইটুকুমাত্র বলতে পারি যে তাঁরা তাঁদের রঙচঙা, আঁট-সাঁট কাঁচুলি আর চল্লিশ গজ মিহি সিল্কের তৈরি বিরাট ফাঁদালো সালোয়ার পরে যা কিছু দেখবার আছে তা দেখবার জন্যে যখন স্টীমারের এ-ধার থেকে ও-ধার পর্যন্ত সঞ্চরণ করছিলেন, তখন তাঁদের দেখাচ্ছিল কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য আর জাঁকালো প্রজাপতির মত।

মোকামা ঘাটে এসে প্রধানমন্ত্রীকে এবং মহিলাদের আবার একই ভাবে স্টীমার থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে নিয়ে যাওয়া হল। সমস্ত দলটা আর তার পর্বত-প্রমাণ মালপত্র গাড়িতে উঠতে তখন ট্রেন কলকাতার দিকে রওনা হয়ে গেল। পরে দলটা ফিরে এল। সামারিয়া ঘাটে গিয়ে আমি তাদের কাঠমান্ডুর পথে রওনা করে দিয়ে এলুম।

কয়েকদিন বাদে আমি একটা রিপোর্ট লিখছিলুম, সেটা সে রাত্রেই পাঠানো দরকার ছিল। এমন সময় সেই সেক্রেটারীটি আমার আপিসে এসে ঢুকলেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা আর কোঁচকানো, দেখে মনে হচ্ছিল যে ওটা পরে কয়েক রাত শোয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিমছাম খোশ-পোশাকী যে কর্মচারীটিকে গতবার দেখেছি, তাঁর আর এঁর চেহারায় একেবারে আকাশ-পাতাল তফাত। তাঁকে যে চেয়ারখানা এগিয়ে দিলুম, তাতে বসে পড়েই তিনি কোনো ভূমিকা না করে বললেন যে তিনি ভয়ানক বিপদে পড়েছেন। যে-কাহিনীটি তিনি আমাকে বললেন, তা এই :

'আমাদের কলকাতায় থাকার শেষ দিনে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাড়ির মহিলাদের নিয়ে কলকাতার প্রধান গহনা-বিক্রেতা হ্যামিলটন অ্যান্ড কোম্পানির দোকানে গিয়ে তাঁদের পছন্দমত গহনা নিতে বললেন। গহনাগুলোর দাম রুপোর টাকায় হল। আপনি জানেন যে, আমাদের সব খরচ আর সব কেনাকাটার জন্যে নেপালের কাঁচা টাকা সর্বদা যথেষ্টই সঙ্গে থাকে। গয়না পছন্দ করতে, টাকা গুনে দিতে, আমি যে সুটকেসটি নিয়ে গিয়েছিলুম তার মধ্যে গয়নাগুলো সাজিয়ে ভরে রাখতে, এবং দোকানদারের সেই সুটকেসটি গালামোহর করে বন্ধ করতে যা ভেবেছিলুম তার চাইতে বেশি সময় লেগে গেল। তার ফলে আমাদের হুড়োহুড়ি করে হোটেলে ফিরে গিয়ে মালপত্র আর লোকজন গুছিয়ে নিয়ে স্পেশ্যাল ট্রেন যেখানে অপেক্ষা করছিল সেখানে ঊর্ধ্বশ্বাসে যেতে হল।

'সন্ধের শেষদিকে আমরা কাঠমান্ডু পৌঁছলুম। পরদিন সকালবেলা প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি গহনার বাক্সটা আমার কাছে চাইলেন। তখন প্রাসাদের প্রতিটি ঘর খুঁজে দেখা হল, যত লোক কলকাতা গিয়েছিল তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল, কিন্তু সুটকেসটার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না, এবং কেউ যে কখনও ওটাকে দেখেছে এমন কথা স্বীকার

করল না।

'আমার মনে আছে যে, যে-মোটরকার করে দোকান থেকে হোটেলে এসেছিলুম, সেই গাড়ি থেকে সুটকেসটা আমিই নামিয়ে নিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর ফেরবার পথে আর কোনো সময়ে ওটাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সুটকেসটা আর তার ভিতরকার জিনিসগুলোর জন্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। ওটা যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমার হয়তো চাকরির চাইতেও বেশি কিছু খোয়াতে হবে। কারণ দেশের আইন অনুসারে আমি ভয়ানক অপরাধ করেছি।

'নেপালে একজন সন্ন্যাসী আছেন, তাঁর নাকি দিব্য দৃষ্টি আছে। বন্ধুদের পরামর্শে আমি তাঁর কাছে গেলুম। তাঁকে খুঁজে বের করে দেখি যে তিনি ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় পরা এক বৃদ্ধ। প্রকাণ্ড এক পাহাড়ের গায়ে একটি গুহাতে তিনি থাকেন। তাঁকে আমার বিপদের কথা জানালুম। তিনি চুপ করে আমার কথা শুনলেন, কোনো প্রশ্ন করলেন না। পরদিন সকালবেলা আমাকে আসতে বললেন।

'আবার যখন তাঁর কাছে গেলুম তখন তিনি বললেন যে গত রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে তিনি এক স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নে তিনি সুটকেসটিকে দেখেছেন। তার গালামোহরগুলি সব ঠিকই আছে। সেটা একটা ঘরের কোণে অনেক বাক্স আর বস্তার তলায় লুকোনো রয়েছে। ঘরটা একটা বড় নদীর থেকে বেশি দূরে নয়। তাতে একটা মোটে দরজা আছে, দরজাটা পূর্বমুখী। সন্ন্যাসী আমাকে এইটুকু বলতে পারলেন।'

বলতে-বলতে কখন সেক্রেটারীটির চোখে জল এল, গলা ধরে এল।

তারপর তিনি বললেন, 'তাই আমি এক সপ্তাহের জন্যে নেপাল ছেড়ে আসবার অনুমতি নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, যদি আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। কেননা এটা সম্ভব যে, সন্ন্যাসী স্বপ্নে যে-নদীটি দেখেছেন, সেটা গঙ্গা নদী।'

লোকে যাকে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন বলে মনে করে এমন মানুষেরা যে হারানো বা খোয়ানো জিনিস উদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারে, এ কথা হিমালয় অঞ্চলে কেউ অবিশ্বাস করে না। সেক্রেটারীটিও যে সন্ন্যাসীর কথা বিশ্বাস করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। তাঁর তখন উদ্বেগ ছিল এই যে, অন্য কেউ সুটকেসটা পেয়ে সেটা লুট করে নেবার আগে সেটা কি করে ফিরে পাবেন। তাতে দেড় লক্ষ টাকার গহনা ছিল।

নানারকম মালপত্র রাখা আছে এমন অনেকগুলো ঘরই মোকামা ঘাটে ছিল। কিন্তু তার মধ্যে কোনোটাই সন্ন্যাসীর বর্ণনার সঙ্গে খাপ খায় না। তার সঙ্গে মেলে এমন একটা ঘরের কথা আমি জানতুম। সেটা হচ্ছে মোকামা ঘাট থেকে দু-মাইল দূরে মোকামা জংশন স্টেশনের পার্সেল আপিস। কেলির

ট্রলিখানা চেয়ে নিয়ে সেক্রেটারীটিকে রামশরণজীর সঙ্গে মোকামা জংশনে পাঠিয়ে দিলুম। সেখানে পার্সেল আপিসের ভারপ্রাপ্ত কেরানী সুটকেসের কথা কিছুই জানে না বলল। তবে, আপিসের মালপত্রের স্তূপ সরিয়ে প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসবার কথায় সে আপত্তি করল না। তা করা হলে সুটকেসটা বেরিয়ে পড়ল,—তার গালামোহর সব ঠিক ছিল।

তখন প্রশ্ন উঠল যে, কেরানীটির অজান্তে সুটকেসটা ওখানে এল কী করে? এতক্ষণে স্টেশনমাস্টার মশায় দেখা দিলেন। তাঁর অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হল যে সুটকেসটাকে আপিসে এনে রেখেছিল একজন গাড়ি-ঝাড়ুদার, রেলের লোকদের মধ্যে তার মাইনেই সবচাইতে কম। প্রধানমন্ত্রী যে গাড়িতে করে কলকাতা থেকে মোকামা ঘাটে আসেন, এই ঝাড়ুদারটিকে সেটা ঝাঁট দিতে বলা হয়েছিল তারই একটা কামরায় সীটের তলায় গোঁজা এই সুটকেসটা সে দেখতে পায়

কাজ শেষ হয়ে গেলে সে সুটকেসটা বয়ে নিয়ে সিকি মাইল দূরে প্ল্যাটফর্মে এল। সেখানে সে সময়ে এমন কেউ ছিল না যার হাতে সে সুটকেসটা দিতে পারে। তাই সে ওটাকে পার্সেল আপিসের এক কোণে রেখে দিয়েছিল। তার কাজের জন্যে সে দুঃখ প্রকাশ করল এবং সে যদি কোনো অন্যায় করে থাকে, তার জন্যে মাপও চাইল।

সাধারণত এটাই নিয়ম যে, অবিবাহিত লোক আর তার চাকর-বাকর কতকগুলো কম-বেশি বাঁধাধরা অভ্যেস মেনে চলে। আমার চাকরেরা আর আমি তার ব্যতিক্রম ছিলুম না। কাজ যখন খুব বেশি থাকত তখন ছাড়া আর সব সময়েই আমি রাত আটটার সময় বাড়ি ফিরে আসতুম। আমার গৃহভৃত্য তখন বারান্দায় অপেক্ষা করত। আমাকে আসতে দেখলেই সে পানিপাঁড়েকে ডেকে আমার স্নানের জল ঠিক করতে বলত। কেননা শীত হ'ক গ্রীষ্ম হ'ক, আমি সব সময়েই গরম জলে স্নান করতুম।

বাড়িটার সামনের বারান্দার উপর পাশাপাশি তিনখানা ঘর ছিল—একখানা খাবার, একখানা বসবার, আর একখানা শোবার ঘর। শোবার ঘরের লাগোয়া ছিল ছোট একটি বাথরুম, দশ-ফুট লম্বা আর ছ-ফুট চওড়া। বাথরুমের দুটো দরজা—একটা বারান্দার উপর, অপরটা শোবার ঘরের দিকে। আর একটা ছোট জানলা ছিল, সেটা এই শোবার ঘরের দিকের দরজার উলটো দিকে, বাড়ির এক প্রান্তের দেওয়ালে অনেকটা উঁচুতে বসানো।

বাথরুমে আসবাব ছিল ডিম্বাকৃতি একটা কাঠের স্নানের টব, সেটায় বসা যায় এমন লম্বা সেটা। একটা কাঠের বাথ-ম্যাট বা ফুটোওলা পাপোশ আর ঠাণ্ডা-জলভরা দুটি মাটির পাত্র। পানিপাঁড়ে স্নানের জল দিয়ে গেলে আমার

চাকর বাথরুমের দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় আমার খুলে-রাখা জুতো-জোড়া তুলে নিয়ে তা পরিষ্কার করে রাখবার জন্যে রান্নাঘরে চলে যেত। আমি বড়-হাজরি আনতে না বলা পর্যন্ত সে সেখানেই থাকত।

একদিন রাত্রে আমার চাকর রান্নাঘরে চলে যাবার পর আমি ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে ছোট একটা হাত-লণ্ঠন তুলে নিয়ে বাথরুমের মধ্যে গিয়ে, ঘরের চওড়ার দিক বরাবর আধাআধি পর্যন্ত গিয়েছে এমন একটা দু-ইঞ্চি উঁচু আর ন-ইঞ্চি চওড়া দেওয়ালের উপর সেটাকে রাখলুম। তারপর আমি দরজাটায় খিল লাগালুম। ভারতের অধিকাংশ দরজার মত এ দরজাটাও কব্জাগুলো থেকে ঝুলে পড়েছিল। তাই খিল না দিলে দরজা বন্ধ থাকত না।

দিনের বেশির ভাগই আমি কয়লার প্ল্যাটফর্মে কাটিয়েছিলুম, তাই খুব কষে সাবান মাখলুম। মাথায় এমন ফেনা হল যে সাবানওয়ালাদের তার জন্যে বাহাদুরি দেওয়া যায়। তারপর বাথ-ম্যাটটার উপর সাবানখানা রাখব বলে যেই চোখ খুলেছি, অমনি ভয়ে চমকে উঠলুম।

স্নানের টবের শেষ মাথার ও-পাশে, আমার পায়ের আঙুলগুলি থেকে কয়েক ইঞ্চি মাত্র দূরে একটা সাপের মাথা জেগে রয়েছে। মাথায় সাবান দেবার সময় আমার হাত নাড়া আর জল ঘাঁটা দেখে মস্ত গোখরো সাপটা স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছিল, কারণ সেটা ফণা চিতিয়ে তার সেই কুটিলদর্শন মুখ থেকে লম্বা চেরা জিভটা অনবরত বের করছিল আর মুখের মধ্যে টেনে নিচ্ছিল। তখন আমার যা করা উচিত ছিল তা হচ্ছে হাত-দু-খানা নাড়তে থাকা, পা দু-খানা সাপের কাছ থেকে গুটিয়ে নেওয়া, এবং সাপটার দিকে সারাক্ষণ চোখ রেখে খুব আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে পা বাড়িয়ে দরজার দিকে যাওয়া।

কিন্তু আমি অত্যন্ত বোকার মতন স্নানের টবটার দু-পাশ ধরে দাঁড়িয়ে উঠে পিছনে পা ফেললুম। তিনটে কাজই একসঙ্গে করা হল। আমি গিয়ে পড়লুম সেই সিমেন্ট-করা নিচু দেওয়ালটার উপর। তাতে আমার পা পিছলে গেল। টাল সামলাবার চেষ্টা করতে যেতেই আমার কনুই বেয়ে খানিকটা জল গিয়ে বাতিটার সলতের উপর পড়ল, সেটাও নিবে গেল। ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল।

এইভাবে আমি ছোট একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে, ভারতের সবচাইতে মারাত্মক একটা সাপের সঙ্গে বন্ধ হয়ে রইলুম। পিছন-দিকেই হ'ক, আর বাঁ-দিকেই হ'ক, একটা পা ফেললেই আমি দুটো দরজার একটার কাছে যেতে পারতুম, কিন্তু সাপটা কোথায় ছিল তা না জানায় আমি ভয়ে নড়তে পারলুম

না, পাছে—আমার খালি পা তার উপর পড়ে যায়।

তাছাড়া, দুটো দরজারই ছিটকিনি নিচের দিকে ছিল। যদিও বা সাপের গায়ে পা না পড়ে, তাহলেও তো আমাকে ছিটকিনি হাতড়ে দেখতে হবে, আর পালিয়ে যাবার চেষ্টায় সাপটারও সেখানে থাকার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।

চাকরদের ঘরগুলি ছিল বাড়ির হাতার এক কোণে। বাড়ির যে দিকটাতে খাবার ঘর, সেখান থেকে তা পঞ্চাশ গজ দূরে। কাজেই চেঁচিয়ে তাদের ডাকলে কাজ হবে না। তাই আমার একমাত্র আশা এই যে হয়ত আমার চাকর খাবার নিয়ে আসবার হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করে-করে বিরক্ত হয়ে এসে পড়বে, কিংবা কোনো বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আমি ভক্তিভরে প্রার্থনা করতে লাগলুম যেন সাপটা আমাকে কামড়াবার আগেই এই দুটোর একটা ঘটে যায়।

সাপটাও আমারই মত ফাঁদে পড়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু সে কথা ভেবে কিছুমাত্র শান্তি হল না। মোটে কয়েকদিন আগেই আমার একজন লোকের এই ধরনের বিপদ হয়েছিল। আমি তাকে তার মজুরি দিয়েছিলুম। তা রাখতে সে বিকেলের দিকে তার বাড়িতে গিয়ে যেই বাকসটা খুলতে গিয়েছে, অমনি পিছনে একটা ফোঁস-ফোঁস শব্দ শুনে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে কি যে, খোলা দরজার দিক থেকে একটা গোখরো সাপ তার দিকে আসছে।

সে পিছনের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল, কেননা ঘরের দরজা ঐ একটিই ছিল। বেচারা খালি হাত দিয়ে গোখরোটাকে ঠেকাবার চেষ্টাও করেছিল। তা করতে গিয়ে সে তার হাতে আর পায়ে বারবার সাপের ছোবল খায়। পড়শীরা তার চিৎকার শুনে তাকে বাঁচাতে এসেছিল, কিন্তু সে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যায়।

সেই রাত্রিতে আমি জানলুম যে ছোট-ছোট জিনিসও বড়-বড় ব্যাপারের চাইতে মর্মান্তিক আর ভয়ঙ্কর হতে পারে। জলের এক-একটি ফোঁটা আমার পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, আর আমার মনে হয় যে সাপটা আমার পায়ের মাংসের মধ্যে তার বিষদাঁত বসাবার উপক্রমণিকা স্বরূপ তার লম্বা চেরা জিভটি দিয়ে খোলা চামড়াটা চাটছে।

গোখরোটার সঙ্গে আমি ঘরটায় কতক্ষণ ছিলুম, তা বলতে পারি না। পরে আমার চাকর বলে, যে তা মোটে আধঘন্টা। সে খাবার টেবিল সাজাতে এসেছিল। সেই শব্দটা শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। তাকে ডেকে বাথরুমের দরজায় আসতে বললুম। সে এলে তাকে আমার বিপজ্জনক অবস্থার কথা জানিয়ে, একটা লণ্ঠন আর একটা মই নিয়ে আসতে বললুম।

আবার দীর্ঘকাল অপেক্ষা করবার পর আমি অনেকগুলো গলার হট্টগোল শুনতে পেলুম। তারপর বাড়ির বাইরের দিককার দেওয়ালের গায়ে মই

রাখবার খচ-খচ শব্দ আমার কানে এল। লণ্ঠনটা জানলায় তুলে ধরা হল,—জানলাটা ছিল মাটি থেকে দশ ফুট উঁচুতে। কিন্তু লণ্ঠনে ঘরে আলো হল না। লণ্ঠনটা যে ধরে ছিল, তাকে বললুম জানলার একখানা কাঁচ ভেঙে সেই ফাঁক দিয়ে লণ্ঠনটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে।

যা ফাঁক হল তার ভিতর দিয়ে লণ্ঠনটাকে খাড়াভাবে ঢোকানো গেল না, ফাঁকটা এত ছোট। যাই হ'ক, তিন-তিনবার জ্বালাবার পর শেষে সেটাকে ঘরে ঢোকানো গেল। আমার মনে হতে লাগল যে গোখরোটা আমার পিছনেই রয়েছে।

মাথা ঘুরিয়ে দেখি যে আমার থেকে দু-ফুট দূরে, শোবার ঘরের দরজার নিচে সেটা শুয়ে রয়েছে। খুব আস্তে-আস্তে সামনে ঝুঁকে পড়ে আমি বাথ-ম্যাটটা তুলে নিয়ে সেটাকে উঁচু করে ধরে, যেই গোখরোটা মেঝের উপর দিয়ে সুড়ুৎ করে আমার দিকে এল, অমনি সেটাকে ফেলে দিলুম। ভাগ্যক্রমে আমার তাক ঠিকই হয়েছিল। বাথ-ম্যাটটা গোখরোটার মাথার ছ-ইঞ্চি পিছনে ঠিক ঘাড়ের উপর দুড়ুম করে গিয়ে পড়ল। সেটা কাঠে ছোবল মারছে আর লেজ আছড়াচ্ছে, এই ফাঁকে চট করে বারান্দার দরজার দিকে গিয়ে পড়লুম এক ভিড়ের মাঝখানে। লোকেরা লাঠি নিয়ে সশস্ত্র হয়ে এসেছে, সকলেরই হাতে লণ্ঠন। রেল-কোয়ার্টারে রটে গিয়েছিল যে আমি একটা তালাবন্ধ ঘরে মস্ত একটা সাপের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রাম করছি।

চাপা-পড়া সাপটাকে শিগগিরই মেরে ফেলা হল। আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে শেষ লোকটি বিদায় হবার পর খেয়াল হল যে আমার পরনে একেবারে কিছু নেই, আর সাবানে আমার চোখ ভরতি হয়ে রয়েছে। সাপটা যে কি করে বাথরুমে এসেছিল, তা কোনদিনই জানা গেল না। সেটা দুই দরজার কোনোটা দিয়েও ঢুকে থাকতে পারে, অথবা ঘরের চাল থেকেও পড়ে থাকতে পারে। চালটা ছিল খড়ের। সেটা ছিল ইঁদুর আর কাঠবিড়ালিতে ভরতি, আর চড়ুই পাখির বাসা। সে যাই হ'ক, যে চাকরেরা আমার স্নানের যোগাড় করেছিল তাদের আর আমার কৃতজ্ঞ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল, কেননা সেই রাত্রিতে আমরা যমরাজার দক্ষিণ দরজার বড়ই কাছে গিয়ে পড়েছিলুম।

মোকামা ঘাটে আমরা কোনো হিন্দু বা মুসলমান পরব পালন করতুম না। কেননা দিনটা যা-ই হ'ক না কেন, কাজ তো চালাতেই হত। কিন্তু বছরে একটি দিন ছিল যে-দিনটির জন্যে আমরা আশা আর গভীর আনন্দ নিয়ে উন্মুখ হয়ে থাকতুম—তা হচ্ছে বড়দিন।

প্রথা অনুসারে এইদিন বেলা দশটা পর্যন্ত আমাকে বাড়িতে থাকতে হত। ঠিক দশটার সময় আমাকে আমার আপিসে নিয়ে যাবার জন্যে রামশরণজী

আসতেন। তাঁর পরনে থাকত তাঁর সবচেয়ে ভাল পোশাকটি, এবং এই উপলক্ষে বিশেষ করে তুলে-রাখা প্রকান্ড একটি গোলাপী রেশমী পাগড়ি তাঁর মাথায় শোভা পেত।

নিশান কেনবার পয়সা আমাদের ছিল না বটে, কিন্তু আপিসে লাল আর সবুজ রঙের সিগন্যাল-এর ফ্ল্যাগ ছিল প্রচুর। আর গাঁদা আর জুঁইফুলের মালা দিয়ে রামশরণজী আর তাঁর উৎসাহী সহায়কের দল ভোর থেকে পরিশ্রম করে আপিসটাকে আর তার আশপাশটাকে উজ্জ্বল ও উৎসবোচিত করে তুলতেন।

আপিসের দরজার কাছে একটি টেবিল আর একখানা চেয়ার রাখা হত। টেবিলের উপর একটি কাঁসার ঘটিতে আমার বাগানের সবচেয়ে ভাল গোলাপের একটি তোড়া থাকত, সেটি টোন সুতো দিয়ে যতদূর সম্ভব আঁট করে বাঁধা। টেবিলের সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত রেলের কর্মীরা, আমার সর্দারেরা, আর আমার সব কর্মীরা। আর সকলেই পরিষ্কার কাপড়-জামা পরে আসত। সারাটা বছর আমরা যতই নোংরা হয়ে কাটাই না কেন, বড়দিনে আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতেই হত।

আমি চেয়ারে বসলে রামশরণজী আমার গলায় একটি জুঁইফুলের মালা পরিয়ে দিতেন। তারপর কাজ শুরু হত। প্রথমে রামশরণজী এক লম্বা বক্তৃতা দিতেন, তারপর আমার একটি ছোট বক্তৃতা হত। বক্তৃতা-শেষে শিশুদের মিঠাই বিলানো হত। সংশিলষ্ট সকলের পরিতোষ হবার পর এই ঝামেলাটা মিটে গেলে তবে সেদিনকার আসল কাজ শুরু হত—তা হচ্ছে রামশরণজীকে, কর্মচারীদের আর মজুরদের নগদ বোনাস দেওয়া।

আমি মাল-চালাচালির ঠিকাদারিতে যে নিরিখে টাকা পেতুম তা শোচনীয়ভাবে কম ছিল বটে, কিন্তু তা হলেও, সংশিলষ্ট সকলের সাগ্রহ সহযোগিতার ফলে আমার কিছু লাভ হত। এই লাভের শতকরা আশি ভাগই এই বড়দিনের দিন বিতরণ করে দেওয়া হত। বোনাসের টাকাটা সামান্যই হত—দু-বছরেও এক মাসের মাইনে কিংবা এক মাসের রোজগারের চাইতে বেশি হত না সেটা। তবুও লোকে একে যথেষ্ট মূল্য দিত। আর এর ফলে আমি তাদের যে শুভেচ্ছা এবং সাগ্রহ সহযোগিতা পেতুম, তাতেই আমি একুশ বছর ধরে প্রতি বছর দশলক্ষ টন মাল তোলাই করতে পেরেছিলুম। তার মধ্যে এক দিনও একটি অপ্রিয় ঘটনা ঘটে নি, একদিনের জন্যে কাজ বন্ধ থাকে নি।

জাঙ্গল লোর



১

আট থেকে আঠার বছর বয়সের চোদ্দ জন ছেলেমেয়ে আমরা কালাধুঙ্গির বোর নদীর পুরনো কাঠের পুলের এক কোণে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ড্যান্সির ভূতের গল্প শুনছি। আশেপাশের ঝোপ-জঙ্গল থেকে কাঠকুটো এনে আমরা রাস্তার মাঝে আগুন জেবলেছিলাম। আগুন নিভে গেছে। লালচে আঁচ তখনো গনগন করছে। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ড্যান্সি যে তার গল্প বলার উপযুক্ত পরিবেশ বেছে নিয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। কেননা জনৈকা সন্ত্রস্ত শ্রোত্রী তার সঙ্গিনীকে সমানে ধমকাচ্ছে, 'অমন করে বার-বার পেছন দিকে তাকিয়ো না, বড় অস্বস্তি বোধ হয়।'

ড্যান্সি হল আয়র্ল্যাণ্ডের মানুষ। হাজার রকম অন্ধবিশ্বাসে তার আপাদমস্তক আচ্ছন্ন। আর এ সমস্ত সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত বলেই ভূতের গল্প তার মুখে অত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠত। তার সে-রাত্রের গল্পের বিষয়-বস্তু হল যত সব আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়া মূর্তি, হাড়ের ঠকঠকানি, রহস্য-জনক উপায়ে দরজা খুলে যাওয়া আর বন্ধ হওয়া, আর পূর্বপুরুষদের বাড়ির প্রাচীন কাঠের সিঁড়িতে মচ্‌মচ্ শব্দ। কিন্তু পূর্ব-পুরুষদের ভূতে-পাওয়া-বাড়িঘর দেখবার সম্ভাবনা তো আমার নেই ড্যান্সির ভুতুড়ে গল্প শুনে তাই আমার কোনো ভয় হত না। এইমাত্র সে তার সবচেয়ে রক্ত-জমাট-করা গল্প শেষ করেছে আর মেয়েটি আবার তার নার্ভাস সঙ্গিনীকে পেছন ফিরে তাকাবার জন্যে ধমক দিয়েছে, এমন সময় একটা বুড়ো শিঙাল পেঁচা একটা বাজ-খাওয়া হলদু গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল থেকে গলা ছেড়ে ডেকে

উঠল, তারপর বোর নদীতে মাছ আর ব্যাঙ ধরার নৈশ অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। যে মরা গাছটাকে নিশানা করে আমরা গুলতি আর প্রজাপতির জাল নিয়ে অভিযানে বেরোতাম, সেই লতায় ছাওয়া মরা গাছটার ডালে বসে সারাটা দিন সে ঝিমোয়। কাক বা অন্য যেসব পাখি পেঁচাদের খেলিয়ে মজা পায়, লতার আড়ালে সে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। পেঁচার এই ডাককে অজ্ঞ লোকে বাঘের ডাক বলে ভুল করে থাকে। এই ডাকে সাড়া দেয় তার সঙ্গিনী, সে থাকে (মিলনের সময় ছাড়া অন্য সময়ে) খালের ধারের একটা পিপল গাছের উপরে। এই ডাককে অজুহাত করে ড্যান্সি তার ভূতের গল্প শেষ করে বন্শীর গল্প শুরু করে, কারণ তার মতে বন্শীরা হল ভূতের চেয়েও বেশি বাস্তব এবং বেশি ভয়াবহ। ড্যান্সি বলে বন্শী হল এক ধরনের পেত্নী, গভীর বনে তার বাস ; আর সে এমন সাংঘাতিক যে তার নাম উচ্চারণ করলেই শ্রোতার ও তার আত্মীয়দের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা এবং তাকে চোখে দেখলেই নির্ঘাত মৃত্যু। ড্যান্সি বলে বন্শীর ডাক একটা একটানা দীর্ঘ তীক্ষ্ন চিৎকার ; সাধারণত অন্ধকার রাত্রে ঝঞ্ঝার সময়েই তার সেই চিৎকার শোনা যায়। বন্শীর ভয়াবহ গল্পগুলোর একটা আকর্ষণ আমার কাছে ছিল, কারণ যেসব জঙ্গলে আমি পাখি, পাখির ডিম আর প্রজাপতির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতাম এইসব গল্প সেইসব জঙ্গল নিয়েই।

আয়ার্ল্যান্ডে থাকতে ড্যান্সি যে বন্শী শুনেছিল, তার কী চেহারা সে দেখেছিল আমার জানা নেই : তবে, কালাধুঙ্গির জঙ্গলে তার শোনা দুটো বন্শীর চেহারা আমি দেখেছি। এই দুটোর একটার কথা আমি পরে বলব, আর অন্যটার কথা তো হিমালয়ের পাদদেশের বাসিন্দাদের সকলেরই জানা আছে, ভারতের অন্যত্রও নেহাত অজানা নয় : সে হল চুরাইল। সমস্ত অপদেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ এই চুরাইল দেখা দেয় নারী রূপে। সাপ যেমন করে পাখিকে সম্মোহিত করে, কোনো মানুষের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সেও ঠিক তেমনিভাবেই তাকে সম্পূর্ণ সম্মোহিত করে ফেলে। তার পায়ের পাতা আবার উল্টো দিকে ফেরানো। পেছন দিকে হাঁটতে-হাঁটতে সে তাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই, এই স্ত্রীলোকের দেখা পাবার আশঙ্কা হলে তা এড়াবার একমাত্র উপায় হল—হাত দিয়ে হ'ক, এক টুকরো কাপড় দিয়ে হ'ক কিংবা যদি ঘরের ভিতরে হয় তাহলে কম্বল-মুড়ি দিয়ে হ'ক চোখদুটোকে ঢেকে ফেলা।

গুহা-মানবের যুগের মানুষ যেমনই হয়ে থাকুক/হ'ক, আজকের আমরা সবাই সূর্যের/রৌদ্রের সন্তান। দিনের বেলা আমরা দিব্যি থাকি। আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভিতু, সেও প্রয়োজনে যে-কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সাহস পায় বুকে। কয়েক ঘণ্টা আগেও যে-কথা ভাবলে ভয়ে শরীর

শিউরে উঠত, আমরা ঠাট্টা করে, হেসে তা উড়িয়ে দিতে পারি।

যখন রোদ পড়ে যায়, আমাদের ঘিরে নেমে আসে রাত। চোখের ভরসায় এতক্ষণ চলেছে, এখন আর তা চলে না। মোহিনী-কল্পনা এখন আমাদের ভয়ে বিবশ করে ফেলে। অতি সুসময়েও সে জাদুকরী ভেলকিবাজি দেখাতে পারে। কল্পনা-প্রবণতা আর অলৌকিকে দৃঢ়বিশ্বাস দুয়ে যখন মিলেমিশে যায়, তখন —ঘন জঙ্গলের বুকে যাদের বাস ; পা যাদের পথচলার একমাত্র বাহন ; রাতে পথ চলতে পাইনকাঠের মশাল, অথবা তেল মিললে হ্যারিকেন-লণ্ঠনের এতটুকু আলো যাদের একমাত্র ভরসা : তারা যে রাতের আঁধারকে ভয় পাবে তাতে তো অবাক হবার কিছু নেই।

মাসের পর মাস ওই সব মানুষের সঙ্গে বাস করার আর কেবল তাদেরই ভাষায় কথা বলার ফলে, ওদের অন্ধবিশ্বাস ড্যান্সির অন্ধবিশ্বাসকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। আমাদের পাহাড়ীদের সাহসের অভাব ছিল না। আর ড্যান্সিও প্রচুর সাহসী ; কিন্তু এইসব অন্ধবিশ্বাসের ফলে পাহাড়ীরা বা ড্যান্সি কেউই কখনো খোঁজ করে দেখে নি কোন্‌টা পাহাড়ীদের মতে চুরাইল আর কোন্‌টা ড্যান্সির মতে বন্‌শী।

কুমায়ুনে অত বছর বাস করে আর শত-শত রাত জঙ্গলে কাটিয়ে মাত্র তিন বার আমি চুরাইলের ডাক শুনেছি, তিনবারই রাত্রে, আর দেখেছি মাত্র একবার।

তখন মার্চ মাস। সবেমাত্র সরষের ফসল কাটা হয়েছে, চমৎকার ফলেছে এবার। যে গ্রামে আমাদের কুটির, পুরো গ্রামটাই আনন্দের উচ্ছ্বাসে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। স্ত্রী-পুরুষ সবাই গান ধরেছে, ছেলেমেয়েরা এ-ওকে ডাকছে। পূর্ণিমার আর দু-এক দিন মাত্র বাকি, চাঁদের আলো প্রায় দিনের মত ফুটফুটে। ম্যাগি আর আমি ভাবছি ডিনারের ব্যবস্থা করতে বলব, আটটা বাজে—এমন সময় তীক্ষ্ণ আওয়াজে রাতের বাতাস খান-খান করে চুরাইলের ডাক শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল গ্রামের সমস্ত শব্দ। আমাদের কুটির থেকে পঞ্চাশ গজ মত তফাতে, প্রাচীরের ডান কোণে আছে বহু প্রাচীন এক হলদু গাছ। যুগ যুগ ধরে কত শকুন, ঈগল, বাজপাখি, চিল আর চকচকে কাস্তে-চরা তার মগডালের ছাল জীর্ণ করে ডালগুলোকে মেরে ফেলেছে। উত্তুরে হাওয়ার ভয়ে সামনের দরজাটা বন্ধ ছিল, আমি আর ম্যাগি বেরিয়ে গেলাম সেটা খুলে বারান্দায়, আর অমনি চুরাইলটা আবার ডেকে উঠল। শব্দটা এল হলদু গাছটা থেকে। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল চুরাইলটা গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে বসে রয়েছে।

কোনো-কোনো শব্দকে কিছু অক্ষর বা কথা সাজিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব,—যেমন, মানুষের ডাকা 'কুঈ' আর কাঠঠোকরার-'ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাপ'

শব্দ। কিন্তু চুরাইলের ডাক সেভাবে শব্দে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যদি বলি এর সংগে সাদৃশ্য আছে কোনো নিপীড়িত আত্মার, বা কোনো যন্ত্রণার্ত মানুষের, তাতে পাঠকের কিছুই বোধগম্য হবে না, কারণ তা শোনবার অভিজ্ঞতা পাঠকের বা আমার হয় নি। জংগলের কোনো শব্দের সংগেও এর কোনো তুলনা সম্ভব নয়। কারণ এ শব্দ একেবারে অন্যজাতের। পার্থিব জগতের সংগে যেন এর কোনো সম্বন্ধ নেই। এ শব্দ শুনলে রক্ত জমাট হয়ে যায়, হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে আসে। আগে যতবার এ ডাক শুনেছি, বুঝেছি এ কোনো পাখির ডাক—হয় পেঁচার, কিংবা কোনো যাযাবর পাখির ; কারণ কুমায়ুনের সমস্ত পাখি আর তাদের ডাক আমার জানা ছিল ; আমি জানতাম আমাদের বনের কোনো প্রাণীর ডাক এ নয়। ঘরে গিয়ে দূরবীন নিয়ে ফিরে এলাম। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীর অবস্থিতি নির্ণয়ের জন্যে এর ব্যবহার হত, সুতরাং বলা বাহুল্য জিনিসটা ভাল। এটা চোখে লাগিয়ে খুব ভাল করে লক্ষ্য করলাম। যা দেখলাম তার একটা বর্ণনা দিচ্ছি—এই আশায় যে, আমার চেয়ে ওয়াকিবহাল কোনো মানুষ হয়তো তা থেকে একে চিনতে পারবে।

(ক) সোনালী ঈগলের থেকে এর আকৃতি একটু ছোট।

(খ) লম্বা লম্বা পায়ে এ সোজা দাঁড়িয়ে থাকে।

(গ) এর ল্যাজ ছোট, কিন্তু পেঁচার ল্যাজের মত অত ছোট নয়।

(ঘ) এর মাথা পেঁচার মাথার মত অত গোল বা অত বড় নয়, ঘাড়ও তেমন ছোট নয়।

(ঙ) এর মাথায় কোনো ঝুঁটি বা শিং নেই।

(চ) যখন ডাকে (ঠিক আধ মিনিট অন্তর এ ডাকে), মাথাটা আকাশের দিকে ফিরিয়ে, হাঁ করে ডাকে।

(ছ) এর রঙ একেবারে কালো, কিংবা হয়তো ঘোর বাদামী—চাঁদের আলোয় অমন কালো দেখায়।

আমার বন্দুকের তাকে ছিল একটা ২৮ বোর বন্দুক আর একটা হালকা রাইফেল। বন্দুকটা এখন কাজে আসবে না, কারণ পাখিটা তার নাগালের বাইরে : আর রাইফেলটা ব্যবহার করতে আমার সাহস হচ্ছিল না, কারণ চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় তো নির্ভুল তাগ করার সম্ভাবনা অল্প। তাই, যদি আমি ব্যর্থ হই, তাহলে যারা গুলির শব্দ শুনবে তারা আরও নিশ্চিত হবে যে এ ডাক যে ডেকেছে নিশ্চয় সে কোনো অপদেবতা, রাইফেলের গুলি পর্যন্ত যার কিছু করতে পারে না। বার-কুড়ি অমনি ডাকার পর পাখিটা ডানা মেলে গাছ ছেড়ে উপরে উঠে রাত্রির আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে-রাতে আর গ্রাম থেকে কোনো সাড়া মিলল না। পরের দিন কেউ

চুরাইলের নাম উচ্চারণ করল না। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার বন্ধু, চোরাই শিকারী কুঁয়ার সিং আমায় সাবধান করে দিয়েছিল, 'বাঘকে কখনো বাঘ বলে ডেকো না, ডাকলেই সে এসে হাজির হবে।' সেই একই কারণে এই তরাইয়ের মানুষরা কখনো চুরাইলের নাম নেয় না।

শীতের ক-টা মাস কালাধুঙ্গিতে কাটাতে আসা আমাদের দুটো বড় পরিবারের অল্পবয়সীদের সংখ্যা চোদ্দ,—অবশ্য আমার ছোট ভাইকে বাদ দিয়ে, কারণ রাত্রে বনে আগুন জ্বালিয়ে বসে মজা করা বা নদীতে স্নান করার বয়স তার হয় নি। এই চোদ্দ জনের মধ্যে সাত জন মেয়ে—তাদের বয়স নয় থেকে আঠার, আর সাত জন ছেলে, তাদের বয়স আট থেকে আঠার— আমি হলাম বয়সে সবার ছোট। এবং ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হওয়ার ফলে এমন কতগুলো কাজ আমার ঘাড়ে পড়ত যা আমার অত্যন্ত বিশ্রী লাগত। আমাদের জীবনযাত্রার ধরনটা ছিল এক যুগ পুরনো : আমাদের চৌহদ্দির একটা সীমানা ধরে যে খাল, সে খালে মেয়েরা যখন রবিবার ছাড়া প্রত্যেক দিন স্নান করতে যেত (কেন যে মেয়েদের রবিবার স্নান করা বারণ, আমি জানি না), তখন এমন এক পুরুষমানুষকে তাদের সঙ্গে যেতে হত যার বয়স এতই কম যে গোঁড়া পিসিমারও আপত্তি করার কারণ থাকত না। এক্ষেত্রে আমিই ছিলাম সেই হতভাগ্য। আমার কাজ ছিল মেয়েদের তোয়ালে আর রাতের পোশাক বয়ে নিয়ে যাওয়া (তখনকার দিনে সাঁতারের পোশাক ছিল না), আর কোনো পুরুষ ওদিকে এলে মেয়েদের সাবধান করে দেওয়া। জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে বা দরকার হলে খালটা মেরামত বা পরিষ্কার করার কাজে মানুষ এপারে ওপারে যাওয়া আসা করত, ফলে সেখানে একটা পায়ে-চলা পথ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। খালটা ছিল বাঁধানো, দশ ফুট চওড়া আর তিন ফুট গভীর, বাগানে জল-সেচ ব্যবস্থার জন্যে খালের কয়েক গজ পর্যন্ত ছ-ফুট গভীর করা হয়েছিল। এটা করিয়েছিলেন কুমায়ুনের রাজা জেনেরাল স্যর হেনরি র‍্যাম্‌জে। প্রতিদিন মেয়েদের নিয়ে যাবার সময় আমাকে সাবধান করে দেওয়া হত, যেন আমি লক্ষ্য রাখি যাতে ওরা কেউ গভীর জলে গিয়ে ডুবে না যায়। পাতলা সুতোর রাত্রিবাস পরে স্রোতের জলে আব্রু বজায় রেখে স্নান করা সহজ কাজ নয়, কারণ যখনই কেউ অসাবধানে তিন ফুট জলে নেমে বসে পড়ে (জলে নামামাত্র সব মেয়েরাই যা করে থাকে), সঙ্গে-সঙ্গে রাত্রিবাস ফুলে মাথার উপর উঠে পড়ে, আর তা দেখে দর্শকেরা স্বভাবতই বিচলিত হয়ে ওঠেন। হামেশাই এমন ঘটত। আমার উপর কড়া হুকুম ছিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে তাকাতে হবে।

যখন আমি মেয়েদের পাহারা দিচ্ছি আর দরকার-মত থেকে থেকে অন্য দিকে তাকাচ্ছি, অন্য সব ছেলেরা সেই সময়ে গুলতি আর ছিপ নিয়ে খালের

যেদিকটা গভীর সেদিকে এগিয়ে চলেছে আর সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতা হচ্ছে পথের ধারের শিমুল গাছটার সবচেয়ে উঁচু ফুলগুলো কে গুলতি মেরে নামিয়ে আনতে পারে, বা খালধারের বট গাছে কে সবার আগে গুলতি ছুঁড়তে পারে এই নিয়ে। গুলতি লেগে দুধের মত আঠা গাছের গুঁড়ি বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়তে থাকলেই ধরা হত, লক্ষ্যভেদ হয়েছে। পাখি ধরার আঠা হিসেবে এই আঠাই হল সবচেয়ে ভাল। তা ছাড়া গুলি করার মত কত পাখিই না আছে—কাঞ্চন, দামা, দোয়েল, হলদে পাখি ইত্যাদি, যারা শিমুল ফুলের মধু খায়। তা ছাড়া সাধারণ, স্লেট রঙের, বা লাল-ঝুঁটি মদনা, যারা ওই ফুল ঠুকরে ঠুকরে সামান্য একটু খেয়ে বাকিটা ফেলে দেয় হরিণ বা শুয়োরের খাদ্য হিসেবে, ঝুঁটিওলা রঙবাহার মাছরাঙারা, যারা তাড়া খেয়ে খালের জলে আলতো করে ভেসে চলে, আর শিঙাল পেঁচটা তো আছেই—বোর সেতুর অপর পারে পেঁচাটার জোড়। এই পেঁচাটা থাকত খালের-জলে-ঝুঁকে-পড়া পিপল গাছটার একটা ডালে। এই প্রাণীটাকে কক্ষনো কেউ তার গুলতির পাল্লার মধ্যে পায় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে লক্ষ করে ছেলেরা গুলতি ছুড়েই চলেছে। বড় জলায় পৌঁছেই প্রবল প্রতিযোগিতা লেগে যেত ছিপ ফেলে কে কত বেশি মাছ ধরতে পারে। তাদের ছিপ বাড়িতে মা বা বোনের সুতোর বাকস থেকে ধার করা সুতো দিয়ে তৈরি, চেয়ে নিয়ে. আর যাদের বঁড়শি কেনার পয়সা জোটে নি তারা আলপিন বেঁকিয়ে বঁড়শি তৈরি করে নিয়েছে। আর ছিপ হত কঞ্চি কেটে। এই মাছ ধরা চলত যতক্ষণ না সমস্ত টোপ ফুরিয়ে যেত বা অসাবধানে জলে পড়ে নষ্ট হয়ে যেত। সামান্য কয়েকটা ছোট মহাশোল মাছ ধরার পর (কারণ খালে মাছের কোনো অভাব ছিল না) তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে সবাই গিয়ে উঠত খালের-জলে-ঝুঁকে-পড়া মস্ত পাথরটার উপর. আর তারপর সংকেত পাওয়ামাত্রই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত, কে আগে খাল পার হতে পারে। সবাই যখন এইসব মজাদার খেলায় ব্যস্ত আমি সেই সময় খালের ধারে এক মাইল দূরে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকার হুকুম তামিল করছি নয়তো মাথায়-কাঠের বোঝা কোনো বৃদ্ধ গ্রামবাসীর আগমনের সংকেত না করার জন্যে ধমক খাচ্ছি। এই জবরদস্তি কর্তব্য পালনের মধ্যে একটাই মজা ছিল, দুই বাড়ির ছেলেদের, বিশেষ করে ড্যান্সি আর নীল ফ্লেমিংকে জব্দ করবার জন্যে মেয়েদের গোপন মতলবগুলো সব আমি আগে থেকেই জেনে যেতাম।

ড্যান্সি আর নীল দু-জনেই আইরিশ, দু-জনেই পাগলাটে। কিন্তু ওদের মধ্যে মিল ওই পর্যন্তই। ড্যান্সি হল বেঁটে, রোমশ, উত্তর আমেরিকার হিংস্র ভাল্লুকের মত প্রচণ্ড বলিষ্ঠ, আর নীল লম্বা, রোগা, লিলি ফুলের মত কোমল সুন্দর। পার্থক্য শুধু এইটুকুই নয়। ড্যান্সি কাঁধে গাদা

রাইফেল নিয়ে পায়ে হেঁটে বাঘের পিছু ধাওয়া করে বাঘ মারতে পিছপা হয় না। নীল জঙ্গলকে ভয় করে, কেউ শোনে নি সে কোনোদিন বন্দুক ছুঁড়েছে। তাদের মধ্যে মিল ছিল একটাই, দুজনে দুজনকে ঘৃণা করত, কারণ দুজনেই সমস্ত মেয়েদের প্রেমে পাগল। ড্যান্সির বাবা ছিলেন জেনেরাল, সৈন্যদলে যোগ দিতে রাজী না হওয়ায় তিনি ড্যান্সিকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। আমার দাদাদের সঙ্গে সে পাবলিক স্কুলে পড়াশুনো করেছিল। বন-বিভাগের চাকরি খুইয়ে সে তখন রাজনৈতিক দপ্তরে কোনোদিন চাকরি পাবার প্রতীক্ষায় অবসর যাপন করছে। নীল চাকুরে লোক, ডাকঘরে আমার দাদা টমের সহকারী। বিয়ে করবার মত সংগতি স্বপ্নের অতীত এ কথা জানা সত্ত্বেও মেয়েদের প্রতি তাদের টান বা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা একটুও কমে নি।

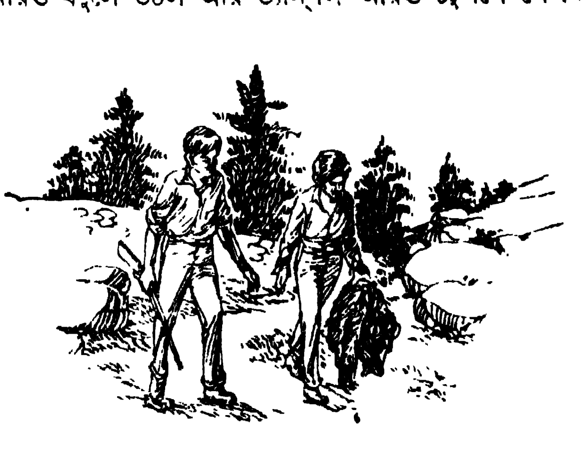
খালের ধারের কথাবার্তা যা কানে আসত তা থেকে আমি বুঝেছিলাম যে গতবার কালাধুঙ্গিতে এসে নীল বড় কেউকেটা ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, নিজেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছে। আর ড্যান্সি খুব দমে ছিল, নিজেকে সহজে জাহির করে নি। এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটাবার জন্যে তখন ঠিক করা হল যে নীলকে বেশ খানিকটা নামিয়ে আনতে হবে, আর সেইসঙ্গে ড্যান্সিকে একটুখানি তুলে ধরতে হবে। তাই বলে বেশি নয় : নয়তো, সেও আবার নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে। এই 'নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা' বলতে যে কি বোঝায়, আমি ঠিক বুঝতাম না, কিন্তু আমার মনে হত এ নিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা না করাই ভাল। এই দুই উদ্দেশ্য একসঙ্গে সার্থক করতে হলে দরকার একই কৌশলে অতি উৎসাহী নীল আর অতি মন্থর ড্যান্সি, দু-জনকে জব্দ করা। অনেক পরামর্শের পর যে কৌশল সাব্যস্ত হল তা সার্থক করতে আমার দাদা টমের সাহায্য দরকার। শীতের ক-মাস নৈনিতালে কাজের তেমন চাপ থাকে না, টম তাই নীলকে এক সপ্তাহ অন্তর শনিবার থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত ছুটি দিত। এই ছোট্ট ছুটিটা নীল কাটাত দুই পরিবারের কোনো একটির সঙ্গে, কারণ তার সহৃদয় ব্যবহার আর চমৎকার কন্ঠস্বরের জন্যে দুই পরিবারেই সে ছিল সুস্বাগত। মতলবমত টমকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া হল যেন সে কোনো অছিলায় আগামী শনিবার নীলকে একটু আটকে রাখে, আর এমন সময় ছেড়ে দেয় যাতে এই পনের মাইল পথ হেঁটে কালাধুঙ্গিতে পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। টম নীলকে এমনি একটা আভাস দেবে দেরি দেখে মেয়েরা ভয় পেয়ে তার খোঁজে এগিয়ে আসবে। বিরাট মতলবটা হল, একটা ভাল্লুকের চামড়ায় ড্যান্সিকে মুড়ে সেলাই করে দিয়ে মেয়েরা নিয়ে যাবে নৈনিতালের পথে দু-মাইল দূরে যেখানে রাস্তাটা হঠাৎ অনেকখানি বেঁকে গেছে। এখানে একটা পাথরের আড়ালে ড্যান্সি লুকিয়ে থাকবে, আর নীল এলেই ভাল্লুকের মত গর্জন করে উঠবে।

হঠাৎ ভাল্লুক দেখেই নীল সোজা রাস্তা ধরে দৌড় দেবে, শেষ পর্যন্ত অপেক্ষমানা মেয়েদের মধ্যে গিয়ে পড়বে, তার কাহিনী শুনে তারা কাপুরুষতার জন্যে ধিক্কার দেবে এবং মিনিটখানেক পরে যখন ড্যান্সিও এসে পড়বে তখন প্রচণ্ড হাসিতে সবাই ফেটে পড়বে। ড্যান্সি প্রথমটা আপত্তি করেছিল কিন্তু রাজী হল যখন সে শুনল যে দিন-পনের আগে এক চড়ুইভাতিতে হ্যামের স্যান্ডউইচের মধ্যে যে লাল ফ্ল্যানেলের টুকরো দিয়ে তাকে বিব্রত করা হয়েছিল সেটা নীলের মতলবেই হয়েছিল।

কালাধুঙ্গি-নৈনিতাল রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। নির্দিষ্ট দিন সন্ধ্যায় নিজের পোশাকের উপর ভাল্লুকের চামড়ায় মোড়া ড্যান্সিকে নিয়ে মেয়েরা নির্দিষ্ট জায়গায় গেল। কখনো চার হাতে পায়ে, কখনো বা দু পায়ে হেঁটে ড্যান্সি চলল ওদের সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলা বেশ গরম ছিল, ড্যান্সি যখন এসে পৌঁছল ঘামে তার সারা শরীর ভিজে গেছে। আর এদিকে একটার পর একটা কাজ এসে পড়ায় নীল খুব বিরক্ত হচ্ছিল। এইভাবে কখন তার বেরোবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যখন তার ছুটি হল, টম তার শটগানটায় দুটো গুলি পুরে নীলের হাতে দিল। সাবধান করে দিল, যেন নিতান্ত দরকার না হলে গুলি খরচ না করে। নৈনিতাল থেকে কালাধুঙ্গির রাস্তা প্রায় সমস্তটাই ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। তার প্রথম আট মাইলের মাঝে-মাঝে শস্য-খেত আর পরের রাস্তাটা মোটামুটি ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ হল ড্যান্সি আর মেয়েরা তাদের জায়গায় এসে পৌঁছেছে। আলো কমে আসছে ক্রমেই। এমন সময় শোনা গেল নীল মনে জোর আনবার জন্যে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে আসছে। গানের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। মেয়েরা পরে বলেছিল নীল নাকি এত ভাল গান আর কখনো গায় নি। তারপর মোড় ফিরে ড্যান্সি যেখানে লুকিয়ে ছিল তার কাছে এসে পৌঁছতেই ড্যান্সি পেছনের পায়ে ভর করে ভাল্লুকের মত গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নীল বন্দুক বাগিয়ে দুটো গুলিই ছেড়ে দিল একসঙ্গে। ধোঁয়ার একটা ঝলক উঠে নীলের চোখ অন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নীল দৌড়তে শুরু করল এবং দৌড়তে দৌড়তে শুনতে পেল ভাল্লুকটার পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যাবার শব্দ। সেই মুহূর্তে মেয়েরা দৌড়ে এলে তাদের দেখে নীল বন্দুক আস্ফালন করে বললে এইমাত্র সে একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুককে গুলি করে মেরেছে— ভাল্লুকটা তাকে ভীষণভাবে তাড়া করে এসেছিল। সন্ত্রস্ত মেয়েরা যখন জিজ্ঞাসা করল ভাল্লুকটার কী হয়েছে, পাহাড়ের নিচের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে নীল তাদের আমন্ত্রণ জানাল তার সঙ্গে গিয়ে তার শিকার দেখতে। বললে কোনো ভয় নেই, ভাল্লুকটা মরে গেছে। মেয়েরা রাজী হল না, নীলকে বললে

একাই গিয়ে দেখে আসতে। নীলের তখন কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই—মেয়েদের চোখের জল দেখে সে মনে করেছে যে সে ভাল্লুকের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ায় তারা আনন্দাশ্রু মোচন করছে। গেল সে একাই। ড্যান্সির আর নীলের মধ্যে সেখানে কী কথাবার্তা হয়েছিল আমরা জানি না, তবে অনেকক্ষণ পরে যখন দেখা গেল ওরা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে যেখানে মেয়েরা উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিল, তখন ড্যান্সির হাতে বন্দুক আর নীলের হাতে ভাল্লুকের চামড়াটা। গায়ে ভাল্লুকের চামড়া থাকায় খাড়াই পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়েও ড্যান্সি আহত হয় নি। ড্যান্সি বললে নীল বুকে গুলি করে তাকে ফেলে দিয়েছে। যে বন্দুকের গুলিতে আর একটু হলেই এক মহা বিপদ ঘটত, কিভাবে সেটা নীলের হাতে আসে, তা শুনে সবাই মজা মাটি করার সমস্ত দোষটা চাপাল অনুপস্থিত টমের উপরে।

সোমবার ছিল সরকারী ছুটি, তাই যখন টম রবিবার রাত্রে ছুটিটা কাটাবার জন্যে বাড়ি এসে পৌঁছল, ক্রুদ্ধ মেয়ের দল তাকে চেপে ধরল কেন সে নীলের মত মানুষের হাতে গুলি-ভরা বন্দুক দিয়ে এভাবে ড্যান্সির জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। টম চুপ করে শুনল যতক্ষণ না মেয়েরা শান্ত হল, তারপর যখন সে শুনল ড্যান্সি বুকে গুলি লেগে পড়ে যেতে কিভাবে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তার অকাল মৃত্যুতে কান্নাকাটি করেছে, হোহো করে হেসে উঠে টম সকলকে হকচকিয়ে দিল. আর তারপর যখন সে সকলকে বুঝিয়ে দিল কিভাবে চিঠিটা পাওয়া অবধি দুষ্টুমির গন্ধ পেয়ে সে কার্তুজ থেকে গুলি বার করে তা ময়দা দিয়ে ভরে রাখে, তখন কেবলমাত্র ড্যান্সি ছাড়া সকলেই তার সঙ্গে সে হাসিতে যোগ দিল। বিরাট মতলবটার মোট ফলাফল যা আন্দাজ করা গিয়েছিল দেখা গেল তা হল না, কারণ এর ফলে নীল বরং আরও ফুলে উঠল আর ড্যান্সি আরও চুপসে গেল।





২

ভাল্লুকের ঘটনায় ড্যান্‌সিই শেষ পর্যন্ত বেকায়দায় পড়েছিল। মেয়েদের সংগে আমি থাকতাম বলে ড্যান্‌সি ভেবেছিল বুঝি আমিও এই ভাল্লুকের ব্যাপারের মধ্যে ছিলাম। এ ধারণা কিন্তু তার ঠিক নয়। কারণ আমি শুধু বলেছিলাম সাধারণ সুতোয় না করে টোয়াইন সুতোয় ভাল্লুকের চামড়াটা সেলাই করতে, এবং এ ব্যাপারের সংগে আমার সম্বন্ধ এই পর্যন্তই। এমনি একটা সন্দেহ তার মাথায় ছিল ; তা না হলে কেন সে একদিন সকালে আমায় তার সংগে শিকারে যেতে বলবে। আমি তখন সংগীদের দেখাচ্ছিলাম কিভাবে গাছের একটা ডাল থেকে দুলতে দুলতে আরেকটা ডালে চলে যাওয়া যায়। এত বড় সম্মান পেয়ে আমি তখন একেবারে খুশির সপ্তম স্বর্গে ; বেরিয়ে পড়লাম তার সংগে। বেরোবার পর সে বললে আমায় দেখাবে কিভাবে মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারতে হয়। ধুনিগারের বেত-ঝোপের কাছে গিয়ে দেখলাম সেখানে অনেক বাঘের থাবার ছাপ রয়েছে (পরে শুনেছিলাম এ জায়গাটা বাঘদের একটা আড্ডা), কিন্তু কোনো বাঘের দেখা মিলল না। ড্যান্‌সি ছিল আমাদের পরিবারের বন্ধু, ফেরার পথে সে ঠিক করল আমায় বন্দুক ছুড়তে শেখাবে। এ কথা যখন সে বললে আমরা তখন ফাঁকা জায়গাটার এ প্রান্তে, এর অপর পারে কয়েকটা সাদা-মাথা দামা পাখি (এই পাখিগুলো হাসে) শুকনো পাতা সরিয়ে সরিয়ে উইপোকা খুঁজে ফিরছে। শিকারে বেরোবার সময় ড্যান্‌সি গাদা রাইফেলটা হাতে, আর শটগানটা (সেটাও গাদা) কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছিল। এখন সে শটগানটা কাঁধ থেকে নামিয়ে আমার হাতে দিয়ে পাখিগুলোকে দেখিয়ে দিল। বাঁ পা-টা ডান পায়ের একটু সামনে রাখতে

বললে, তারপর বললে বন্দুকটা কাঁধে তুলে স্থিরভাবে ধরে ঘোড়া টিপে দিতে। তাই করলাম। এই ব্যাপারের পর এত বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি জানি না বন্দুকটা ড্যান্সি বিশেষ করে আমার জন্যেই খুব বেশী করে গেদেছিল, না কি ভাল্লুকের মত প্রচণ্ড শক্তিশালী ড্যান্সির অভ্যাসই ছিল বেশি করে বন্দুক গাদা। যাই হ'ক, বন্দুকের ধাক্কা সামলে উঠে যখন চারদিকে তাকাবার মত অবস্থা আমার হল, দেখলাম ড্যান্সি বন্দুকটার নলদুটোর উপর হাত বুলিয়ে দেখছে সেদুটো জখম হয়েছে কি না। গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি যখন ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাই তখন বন্দুকটা আমার হাত থেকে ছিটকে পাথরের উপর পড়েছিল, দামাগুলো সব উড়ে পালিয়েছিল, কিন্তু যেখানে তারা চরছিল, দেখলাম একটা সাদা-কপালে মক্ষিভুক্ পাখি সেখানে পড়ে আছে—দোয়েল পাখির মত তার আকৃতি। পাখিটার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন না থাকায় ড্যান্সি সিদ্ধান্ত করল নিশ্চয় সে শব্দেই ভয় পেয়ে মারা গেছে। আমিও ড্যান্সির সঙ্গে একমত হলাম, কারণ আমার নিজেরও প্রায় সেই অবস্থাই হতে বসেছিল।

এই অভিজ্ঞতার কিছুদিন পরে আমার বড় ভাই টম একদিন বললে আমায় নিয়ে ভাল্লুক-শিকারে যাবে। আমার যখন চার বছর বয়স তখন বাবা মারা যান, সেই থেকে টমের উপর আমাদের সংসারের দায়িত্ব। শুনে মা তো দিশেহারা হয়ে পড়লেন। জোন অব্ আর্ক আর নার্স ক্যাভেল-এর সাহস একসঙ্গে করলে যা হতে পারে মা-র সাহস তার চেয়ে কম নয়। কিন্তু তাহলেও তিনি ঘুঘু পাখির মত কোমল ও শান্ত। পরম উৎসাহে আমি টমের কথা শুনছিলাম। টম ছিল আমার কিশোর হৃদয়ের উপাস্য বীর। মাকে সে বুঝিয়ে বললে যে এর মধ্যে বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই, সে আমাকে সামলাবে যাতে আমার কোনো অনিষ্ট না হয়। শেষ পর্যন্ত মায়ের অনুমতি পেয়ে আমি ঠিক করলাম আমি আঠার মত টমের পায়ে পায়ে চলব, তাহলেই আর কোনো ভয় থাকবে না।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম,—টম তার রাইফেল ছাড়াও আমার জন্যে একটা বন্দুক নিয়েছে। জীবজন্তুদের একটা চলা-পথ ধরে আমরা চলেছি—পথটা গেছে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর দিয়ে। পাহাড়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়ে আমরা একটা গভীর, অন্ধকার, ভয়াল দরিপথের সামনে এলাম। সেটার ধারে এসে দাঁড়িয়ে টম আমায় ফিসফিস করে বললে এ জায়গাটা ভাল্লুকদের খুব প্রিয়, তারা দরিপথ দিয়ে কিংবা যে পথে আমরা এলাম এই পথে চলা-ফেরা করে। তারপর সেই পথের ধারের একটা পাথর দেখিয়ে আমায় সেখানে বসতে বলে বন্দুকটা আর দুটো গুলি আমার হাতে দিল। এই বলে আমায় সাবধান করে দিল যে কোনো ভাল্লুক পেলে সেটাকে যেন একেবারে

মেরে ফেলি, কেবলমাত্র আহত করে ছেড়ে না দিই। তারপর সেখান থেকে প্রায় আটশো গজ তফাতে পর্বতের উঁচুতে যেখানে একটা ওক গাছ নিরালা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা দেখিয়ে দিয়ে বললে সে ওখানে থাকবে ; যদি আমি কোনো ভাল্লুককে তার কাছে দেখতে পাই যাকে দেখতে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে যেন আমি গিয়ে তাকে খবরটা দিই। এই বলে সে আমার কাছ থেকে চলে গেল।

বাতাস বইছে, সেই বাতাসে শুকনো ঘাস আর ঝরা পাতার সরসর শব্দ হচ্ছে। চারদিকের জঙ্গল আমার কল্পনায় ক্ষুধার্ত ভাল্লুকে ভাল্লুকে ভরে উঠল—সেই শীতকালে এই পাহাড়ে ন-টা ভাল্লুক মারা হয়েছিল। এক্ষুনি যে আমায় ভাল্লুকে খেয়ে ফেলবে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইল না এবং তার সে ভোজ যে আমার পক্ষে অত্যন্ত কণ্টকর হবে তাতেও সন্দেহ নেই। সময় যেন আর কাটতেই চায় না, প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক বেড়ে চলেছে। অস্তসূর্যের লাল আভায় সমস্ত পাহাড়টা যখন ঝলসে উঠেছে তখন দেখি একটা ভাল্লুক টমের গাছের থেকে কয়েকশো গজ উপর দিয়ে আকাশ রেখা ধরে ধীরে ধীরে চলেছে। টম তা দেখেছে কি না সে দুর্ভাবনা আমার একটুও ছিল না, এই ভয়ংকর জায়গা থেকে পালাবার এই হল সেই সুযোগ যার প্রতীক্ষায় আমি ছিলাম, এবং এখনও সময় আছে। তাই বন্দুকটা কাঁধে করে আমি টমকে ভাল্লুকটার খবর দিতে গেলাম। টমের কাছে একবার পোঁছে গেলে আমার আর ভয় নেই। ড্যান্সির ব্যাপারের পর আর আমি বন্দুকটা ভরে নিতে সাহস করলাম না।

আমাদের এদিককার হিমালয়ের কালো ভাল্লুক সারা শীতকাল ওক গাছের ফল খেয়ে কাটায়। ভাল্লুক অত্যন্ত ভারি, আর এই ফল ফলে ওক ডালের সবচেয়ে উঁচুতে ; তাই ফল খেতে হলে ভাল্লুককে এই ডাল নিচু করে গাছের গুঁড়ির দিকে নিয়ে যেতে হয়। ফলে এইসব ডালের কোনোটা কেবল ফেটে যায় এবং তার পরও অনেকদিন কাঁচা থাকে, কোনোটা একেবারে ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়, কোনোটা বা ভেঙে গিয়ে কেবলমাত্র ছালে আটকে ঝুলতে থাকে। দরিপথ অতিক্রম করে একটা ঘন ঝোপের কাছে এসে পোঁছতে হঠাৎ একটা খসখস শব্দ আমার কানে এল। ভয়ে জমে গিয়ে আমি একেবারে নিস্পন্দ হয়ে রইলাম। শব্দটা ক্রমেই জোর হয়ে উঠতে লাগল, আর পরক্ষণেই একটা প্রকাণ্ড পদার্থ সশব্দে আমার সামনে পড়ল। দেখলাম একটা গাছের ডাল, কোনো ভাল্লুক এটা আগে থেকেই ভেঙে রেখেছিল, এখন হাওয়ার বেগে পড়ে গেল। কিন্তু এ যদি এশিয়ার সবচেয়ে বড় ভাল্লুকেও হত তাহলেও আমি এত ভয় পেতাম না। যে সাহসে ভর করে আমি টমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম তা আর বিন্দুমাত্র রইল না, ফলে আবার আমি গুঁড়ি মেরে পাথরটার

কাছে ফিরে গেলাম। সুস্থ মানুষের পক্ষে যদি কেবল আতঙ্কে মারা যাওয়া সম্ভব হত তবে সে রাত্রে (এবং তার পরেও আরও অনেকবার) আমি নির্ঘাত মারা পড়তাম।

অস্ত-সূর্যের রক্তিম আভা পাহাড় থেকে মিলিয়ে গেল, শেষ আলোও আকাশ থেকে চলে গেল। এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একটা মূর্তি দেখা দিল, একটা প্রফুল্ল স্বর আমায় ডেকে বললে, 'কিরে, ভয় পাস নি তো?' কথাটা বলে টম আমার বন্দুকটা নিজের হাতে নিল। উত্তরে যখন আমি বললাম এখন আর আমার ভয় করছে না, টম আর এ নিয়ে কথা বাড়ালো না, কারণ বুদ্ধি-সুদ্ধি তার যথেষ্ট ছিল, ব্যাপার-স্যাপার সব বুঝত ভাল।

টম শিকারে যাবার সময় সর্বদাই তাড়াতাড়ি বেরোবার পক্ষপাতী ছিল। যেদিন সে আমায় ময়ূর শিকারে নিয়ে যায়, ভোর চারটেয় বিছানা থেকে তুলে বললে নিঃশব্দে হাত-মুখ ধুয়ে আর জামাকাপড় পরতে যাতে কারুর না ঘুম ভেঙে যায়। আধঘণ্টার মধ্যেই এক এক কাপ গরম চা আর ঘরে তৈরি কিছু বিস্কুট খেয়ে আমরা অন্ধকারের মধ্যে সাত মাইল হাঁটা-পথ ধরে গারুপ্পুর দিকে রওনা হলাম।

আমার জীবনে আমি তরাই আর ভাবর-এর জঙ্গলে অনেক পরিবর্তন দেখেছি। এর কিছু হয়েছে মানুষের হাতে, কিছু হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কোনো-কোনো ঘন বনে, আগে যেখানে মানুষের পা পড়ে নি, এখন সেখানে কেবল ঝোপ-ঝাড়, আর যে সব জায়গায় ছিল প্রশস্ত ঘাস জমি আর প্লামের ঝোপ সেখানে এখন বন। গারুপ্পুর দক্ষিণ-পূর্বে যেখানে আগে (অর্থাৎ যখনকার কথা লিখছি) ছিল কোমর-সমান ঘাস আর প্লামের ঝোপ, এখন সেখানে বড়-বড় গাছের জঙ্গল। ডিসেম্বরের সেই সকালে টম এই অঞ্চলের দিকেই চলেছিল; কারণ এই সময় প্লাম পাকে, সে লোভ সামলানো কেবলমাত্র হরিণ আর শুয়োরের পক্ষেই নয়, ময়ূরের পক্ষেও একরকম অসম্ভব।

গারুপ্পুতে যখন পৌঁছলাম তখনও অন্ধকার থাকায় আমরা কুয়োটার কাছে বসে পূব আকাশে ধীরে ধীরে আলোর আভাস লক্ষ করলাম, বনের জেগে ওঠার সাড়া পেলাম। চারদিক থেকে লাল বনমোরগের ডাক শোনা গেল। সেই ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গেল অসংখ্য ছোট-ছোট পাখির, আর তারাও পালক থেকে শিশির আর চোখ থেকে ঘুম ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে নতুন দিনের আবাহনে মোরগদের সঙ্গে গলা মেলাল। যেসব ময়ূর বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর ছড়ানো বিরাট বিরাট শিমুল গাছের ডালে ডালে বিশ্রাম করছিল এবার তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গলের শব্দের সমারোহে তাদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যুক্ত করল। ভোরের প্রথম আলো যখন সামনের শিমুল গাছের মগডাল স্পর্শ করল, কুড়ি-পঁচিশটা ময়ূর ছড়ানো ডালপালা ছেড়ে প্লাম-ঝোপের কাছে

নেমে এল।

টম উঠে দাঁড়িয়ে তার পাইপের ছাইটা ঝেড়ে ফেলে বললে এবার বনে ঢোকার সময় হয়েছে। এই নিচু এলাকায় শিশির প্রায় ত্রিশ ফুট পর্যন্ত ছেয়ে থাকে, তাই ভোরবেলা বড়-বড় গাছগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে গাছের পাতা থেকে যে জল ঝরে, শব্দ শুনে বা চোখে দেখে তাকে বৃষ্টি বলেই মনে হয়। রাস্তা থেকে নেমে যে ঘাসের ভিতর দিয়ে আমরা চললাম তা টমের কোমর পর্যন্ত আর আমার থুতনি পর্যন্ত উঁচু। সেই শিশির-ভেজা ঘাসের ভিতর দিয়ে যেতে গিয়ে আমার ভিজে পোশাক গায়ে লেপটে গিয়ে সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আরো অস্বস্তির সৃষ্টি করল। যেখানে আমি থেমেছিলাম সেখান থেকে ময়ূরটা পাল্লার বাইরে। এ কথার উত্তরে যখন বললাম আমি গুলি করতে যাই নি কেবল ঘোড়াটা তুলে নিচ্ছিলাম, টম বললে কক্ষনো তা করা উচিত নয়, ঘোড়া তোলা উচিত ঠিক গুলি করবার সময়টাতে,—এভাবে ঘোড়া তুলে এগোনো বিপজ্জনক, বিশেষ করে যখন যেখান দিয়ে চলেছি সেখানে অদৃশ্য গর্তে পা পড়ে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা। 'এবার যাও', বললে টম, 'আরেকবার চেষ্টা করে দেখ।' এবার আমি ময়ূরটাকে সহজেই পাল্লার মধ্যে পেলাম, একটা বড় প্লামের ঝোপ মাঝখানে পড়ায় আর কোনো অসুবিধে হয় নি। শিমুল গাছটায় পাতা না থাকলেও লাল রঙের বড় বড় ফুল ফুটে ছিল। গাছটার আমার দিকের একটা ডালের উপর বসে ছিল ময়ূরটা—সূর্যের টেরচা রোদ তার উপর পড়তে মনে হল, এমন সুন্দর ময়ূর আমি আর দেখি নি কখনো। এবার ঘোড়াটা তোলার সময় এসেছে ; কিন্তু উত্তেজনার বশেই হ'ক কিংবা আমার অসাড় আঙুলগুলোর জন্যেই হ'ক, কিছুতেই আমি সেটা তুলতে পারলাম না। কী করা যায় ভাবতে ভাবতেই ময়ূরটা উড়ে গেল। আমার কাছে এসে টম বললে, 'যাক গে, পরের বার তুই নিশ্চয় পারবি।' কিন্তু সেদিন সকালে আর কোনো পাখি গাছে বসে আমায় কৃতার্থ করল না। টম একটা লাল বন-মোরগ আর তিনটে ময়ূর মারবার পর আমরা ঘাস আর প্লামের ঝোপ ছেড়ে রাস্তায় উঠলাম। তারপর বাড়ি ফিরে যখন প্রাতরাশে বসলাম তখন বেলা হয়ে গেছে।





৩

ওই তিন পর্বেই আমার জঙ্গল বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হল। বড়রা অন্তত আমায় আর কিছু শেখান নি। বন্দুকের ব্যবহার আমাকে শেখানো হয়েছে, বাঘ ভাল্লুক আছে এমন বনে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে জন্তু আহত নয় তাকে ভয় করবার কিছু নেই। ছেলেবেলায় যা ভাল করে শেখা যায় সারা জীবন তা মনে থাকে। আমি যা শিখেছিলাম ভাল করেই শিখেছিলাম। এই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে শিকারে নামব কিনা, সে-সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হয়েছিল। আমার ইচ্ছার তোয়াক্কা না করে আমার বয়সের ছেলেদের কি করা উচিত তাই বিবেচনা করে বড়রাই যদি নির্দেশ দিতেন, আমি কী করব না করব, আমার তা মোটেই ভাল লাগত না।

ছেলেরা যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। কোন্ ধরনের শিকারে তারা নামবে, নিজেদের পছন্দ ও শরীরের সামর্থ্য অনুসারে তা তাদের নিজেদেরই বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলেই শিকারে অঢেল সুযোগ রয়েছে। কিন্তু কারো যদি শিকারে উৎসাহ না থাকে, প্রাণনাশে অনীহা থাকে, তার শিকারে না নামাই ভাল। যত প্রচ্ছন্নই হ'ক না কেন, যে-কোনো জবরদস্তিই খেলাধুলোর মজাটাই মাটি করে দেয়। যেদিকে কারো স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, সেদিকেও জোর করে তাকে ঠেলে দিলে আর কোনো মজাই থাকে না।

আমি যখন নিউমোনিয়ায় মৃত্যুর মুখোমুখি, তখন টমেরই সাহায্যে আমার

মা আর বোন আমার সেবাশুশ্রূষা করে আমায় সারিয়ে তুলেছে। যে জীবন আমি হারাতে বসেছিলাম, সেই জীবনে যাতে আমি আবার উৎসাহ ফিরে পাই সেজন্যে টম আমাকে একটা গুলতি এনে দিলে। আমার বিছানার পাশে বসে টম পকেট থেকে গুলতিটা বার করে আমার হাতে দিয়ে খাটের পাশ থেকে গোমাংসের জুসের কাপটা তুলে নিয়ে বলত, এটা খেলে তবে আমার গায়ে গুলতি ছোড়ার মত জোর হবে। সেই শুনে আমাকে যা দেওয়া হত বিনা প্রতিবাদে আমি তাই খেয়ে নিতাম। আমি ক্রমে শক্তি ফিরে পেতে লাগলাম। বাড়ির সকলেই তখন আমায় প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করছে। টমও তাদের সঙ্গে যোগ দিল, জঙ্গলের গল্প বলে, গুলতি ছোড়ার কৌশল শিখিয়ে সে আমার উৎসাহ জাগিয়ে রাখত।

টমের কাছেই আমি শিখি যে শিকারীদের পক্ষে বছরটা দুই ঋতুতে বিভক্ত—বন্ধ ঋতু আর খোলা ঋতু। বন্ধ ঋতুতে আমায় গুলতি তুলে রাখতে হত, কারণ পাখিরা তখন বাসা বাঁধে। যখন ডিমে তা দিচ্ছে বা বাচ্চাদের যত্ন করছে সে সময়ে তাদের হত্যা করা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ। খোলা ঋতুতে আমার যেমন ইচ্ছে গুলতি ব্যবহারে বাধা ছিল না, কিন্তু এই শর্ত ছিল যে, যে পাখি মারব সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। হরিয়াল বা নীল পাহাড়ী পায়রা আমাদের পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রচুর মিলত, সেগুলো মারতে বাধা ছিল না, কারণ সেগুলো ছিল খাদ্য। কিন্তু আর যে সব পাখি মারব তাদের ছাল ছাড়িয়ে ঠিক করে রাখতে হবে। তাই যখন সময় হল টম আমায় একটা ছাল ছাড়ানোর ছুরি আর আর্সেনিক সাবান দিল। পশু সংরক্ষণ বিদ্যায় টমের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল না বটে, তবে, একটা পুরুষ কালিজ নিয়ে সে আমায় পাখির ছাল ছাড়ানো সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে দিয়েছিল। আমাদেরই এক আত্মীয় স্টীভেন ডীজ তখন কুমায়ুনের পাখিদের বিষয়ে এক বই লিখেছিল। তার বইয়ের চারশো আশিটি রঙিন ছবির মধ্যে অধিকাংশই আমারই সংগ্রহের পাখির ছবি, নয়তো আমি তার জন্যে বিশেষভাবে যা সংগ্রহ করেছিলাম, তারই থেকে।

টমের দুটো কুকুর ছিল। পপি ছিল লাল রঙের কুকুর। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় সেটা কাবুলের পথে না খেতে পেয়ে মারা যেতে বসেছিল, সেটাকে সে ভারতে নিয়ে আসে। ম্যাগগ ছিল মেটে-সাদা রঙের স্প্যানিয়েল। ম্যাগগের ল্যাজ ছিল পেখমের মত। পপি ছোট ছেলেদের পাত্তা দিত না, কিন্তু ম্যাগগ অত বাছবিচার করত না ; আমায় পিঠে নিয়ে খানিকটা দূর পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনার ক্ষমতা তার ছিল। আমাকে সামলে রাখার দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার সমস্ত স্নেহ আমার উপর ঢেলে দিয়েছিল। ম্যাগগই আমায় শিখিয়েছিল এমন কোনো ঘন ঝোপের খুব কাছ দিয়ে না যেতে যেখানে জীবজন্তুরা ঘুমিয়ে থাকে, পাছে ঘুম ভেঙে গেলে তারা বিরক্ত হয়ে ওঠে।

সে-ই আমায় দেখায় যে কুকুরও চেষ্টা করলে বেড়ালের মত নিঃশব্দে জঙ্গলের মধ্যে চলা-ফেরা করতে পারে। ম্যাগগ সঙ্গে থাকলে আমি এমন গহন জঙ্গলেও গিয়েছি যেখানে যেতে আগে আমার সাহস হত না। আমার যখন গুলতির যুগ চলছিল সেই সময় একবার আমাদের এমন এক সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হয় যার ফলে ম্যাগগ প্রায় মারা পড়তে বসেছিল।

আমার সংগ্রহের জন্যে একটা টকটকে লাল সানবার্ডের সন্ধানে সেদিন সকালে আমরা বেরিয়ে পড়েছি, এমন সময় ড্যান্সির সঙ্গে দেখা। তার স্কটিশ টেরিয়ার থিস্‌লকে নিয়ে সে বেড়াতে বেরিয়েছিল। তারাও আমাদের দলে যোগ দিল। কুকুরদুটোর মধ্যে সদ্ভাব না থাকলেও তারা মারামারি না করেই চলছিল।

কিছুদূর যাবার পর থিস্‌ল্ একটা শজারুকে দেখে তাড়া করল। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগগও, আমার বারণ সত্ত্বেও। ড্যান্সি তার গাদা বন্দুক নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পাছে কুকুরগুলোর গায়ে লাগে এই ভয়ে সে গুলি করতে সাহস করল না, কারণ কুকুরদুটো শজারুটার দুদিক থেকে পাশে পাশে ছুটছিল আর তাকে কামড়ে চলেছিল। ড্যান্সি তেমন দৌড়তে পারে না, তার উপর হাতে আবার বন্দুক। ফলে শজারুটা, কুকুরদুটো আর আমি তাকে অনেকটা পেছনে ফেলে গেলাম। শজারুর সঙ্গে কারবার বড় সহজ নয়। তারা তাদের কাঁটা ছুড়ে মারতে পারে না বটে, কিন্তু তাহলেও তারা যেমন কষ্টসহিষ্ণু তেমনি দ্রুতগতি। আক্রমণের বা আক্রমণ প্রতিরোধের সময় তারা তাদের গায়ের কাঁটাগুলো খাড়া করে তোলে, আর ছোটে পেছন দিকে।

শজারুটাকে তাড়া করবার আগে আমি গুলতিটা পকেটে পুরে একটা মোটা লাঠি হাতে নিয়েছি, কিন্তু কুকুরদের কোনোরকম সাহায্য করাই আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যখনই আমি শজারুটার কাছাকাছি এসেছি সে আমায় তেড়ে এসেছে, এবং বহুবার আমি কুকুরদুটোর দৌলতে তার কাঁটার আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছি। আধমাইলটাক তাড়া করবার পর আমরা একটা গভীর দরিপথের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম যেখানে শজারুদের গর্ত আছে। এবার কুকুরদুটো শজারুটাকে ধরে ফেলল। ম্যাগগ তার নাক কামড়ে ধরল, আর থিস্‌ল্ তার গলাটা। ড্যান্সি যখন এসে পৌঁছল তখন লড়াই প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তবুও সে নিশ্চিত হবার জন্যে শজারুটাকে একটা গুলি করল। দুটো কুকুরেরই গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। যতগুলো কাঁটা পারলাম তাদের গা থেকে ছাড়িয়ে নিলাম, তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ির পথ ধরলাম, যাতে যে সব কাঁটা ভেঙে ভিতরে থেকে যাওয়ার ফলে অনেক চেষ্টাতেও খালি হাতে বার করতে পারি নি চিম্‌টে দিয়ে সেগুলো বার করতে পারি, কারণ শজারুর কাঁটায় খোঁচা খোঁচা কাঁটা-মত থাকে, ফলে তা টেনে বার করা কঠিন হয়ে ওঠে। ড্যান্সি

চলল শজারুটাকে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে।

সারা দিন সারা রাত ম্যাগগের অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটল। খুব ঘন-ঘন সে হাঁচতে থাকল, আর যতবার হাঁচল প্রতিবারেই তার খড়ের বিছানায় চাপ চাপ রক্ত পড়তে লাগল। সৌভাগ্যবশে পরদিন ছিল রবিবার। ছুটি কাটাতে নৈনিতাল থেকে এসে টম দেখল একটা শজারু-কাঁটা ম্যাগগের নাকের ভিতর ভেঙে রয়ে গেছে। অনেক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত যখন সে চিমটে দিয়ে ভাঙা কাঁটাটা বার করল, দেখা গেল সেটা লম্বায় ছ-ইঞ্চি, আর কলমের মত মোটা। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল এবং সে রক্ত যখন কিছুতেই বন্ধ করা গেল না, আমাদের ভয় হল, বুঝি ম্যাগগকে বাঁচাতে পারা যাবে না। যাই হ'ক সযত্ন সেবাশুশ্রূষায় আর ভাল খাওয়া-দাওয়ার ফলে ম্যাগগ সেরে উঠল। থিস্‌ল্‌ ততটা আহত হয় নি, সেও অবিলম্বে ভাল হল।

গাদা বন্দুকটা পাবার পর—সে কথা পরে বলব—ম্যাগগকে আর আমাকে দু-বার উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। একবার হয় কালা-ধুঙ্গিতে, আর একবার নৈনিতালে। নয়া গাঁও গ্রামের কথা পাঠককে আগে বলেছি। নয়া গাঁওয়ের সবটা জুড়ে তখন চাষ চলছে। খেত আর ধুনিগার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে একফালি জঙ্গল, তার মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা। জঙ্গলটা হল সিকি মাইল থেকে আধ মাইল চওড়া : এই জঙ্গলের ভিতরে আছে অসংখ্য লাল বন-মোরগ, ময়ূর, হরিণ আর শুয়োর। এরা প্রচুর শস্য নষ্ট করত। খেত থেকে যেতে আসতে তারা জন্তুদের পায়ে-চলা পথের উপর দিয়ে চলত। এই পায়ে-চলা পথেই ম্যাগগ আর আমি আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করি।

নয়া গাঁও আমাদের কালাধুঙ্গির বাড়ি থেকে তিন মাইল। একদিন আমি ম্যাগগকে নিয়ে খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লাম। ময়ূরের সন্ধানে। চওড়া রাস্তাটার মাঝখান দিয়ে আমরা চলেছি, কারণ তখনও আলো ভাল করে ফোটে নি, এবং এ জঙ্গল হল চিতা আর বাঘের আস্তানা। রাস্তাটা যেখানে সেই জন্তুদের পায়ে-চলা পথে গিয়ে মিশেছে সেখানে পৌঁছে দেখলাম, সূর্য উঠেছে। এবার বারুদ ভরবার পালা। বারুদ ভরতে সময় লাগে ; প্রথমে বারুদটা মেপে নল দিয়ে ঢেলে দেওয়া, তারপর একটা পুরু বনাত দিয়ে শক্ত করে গেদে দেওয়া। এরপর গুলিটা মেপে নিয়ে সেই বনাতের উপর ঢেলে দিতে হবে আর পাতলা পীচবোর্ড গুলির উপর চেপে দিতে হবে। যখন দেখা যাবে গাদনকাঠিটা নল থেকে ছিটকে আসছে তখন বুঝতে হবে যে ঠিকমত গাদা হয়েছে। ভারী মস্ত ঘোড়াটা তখন অর্ধেকটা তুলে শক্ত করে আটকাতে হবে। এতগুলো ব্যাপার আমার মনের মত করে সমাধা করে গাদবার যন্ত্রপাতি পিঠঝুলিতে ভরে নিয়ে ম্যাগগ আর আমি জন্তুদের চলা-পথ ধরে এগিয়ে চললাম। কতকগুলো বন-

মোরগ আর ময়ূর আমাদের পথের উপর দিয়ে চলে গেল, কিন্তু একবারও কেউ দাঁড়িয়ে গুলি করার সুযোগ দিল না। আধ-মাইলটাক যাবার পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় পৌছলাম। সেখানে পা ফেলতে দেখি সাতটা ময়ূর একটার পেছনে একটা সারি বেঁধে ফাঁকা জায়গাটার ওপার দিয়ে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আমরা গুড়ি মেরে গেলাম যেখান দিয়ে ময়ূরগুলি গিয়েছিল, তারপর ম্যাগগকে ওদের খোঁজে পাঠিয়ে দিলাম।

দেখা গেছে, ঘন জঙ্গলে কুকুরের তাড়া খেলে ময়ূর সর্বদাই কোনো গাছের উপর উঠে বসে। শিকারী হিসেবে তখন গাছে-বসা পাখি মারা পর্যন্ত আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ; তাই ম্যাগগ আর আমি দু-জনে মিলে অনেক চেষ্টায় একটা ময়ূর শিকার করলাম। শিকারের মধ্যে ময়ূর হল ম্যাগগের সবচেয়ে প্রিয়, তাই ময়ূরকে তাড়া করে গাছে তুলে দিয়ে ম্যাগগ গাছের নিচে ঘেউ-ঘেউ করতে করতে ছুটে বেড়াত আর আমি সেই সুযোগে গুড়ি মেরে এগিয়ে আমার কাজ সারতাম।

ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে গিয়ে ময়ূর সাতটা নিশ্চয় দৌড়ে থাকবে ; কারণ ম্যাগগ ঘন ঝোপের মধ্যে অন্তত শ-খানেক গজ যাবার পর আমি ডানার ঝাপটানি আর ময়ূরের চিৎকার শুনতে পেলাম, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাগগের ভয়ার্ত চিৎকার আর বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন কানে এল। বোঝা গেল ময়ূরটা ম্যাগগকে একটা ঘুমন্ত বাঘের কাছে পৌঁছে দিয়েছে ; এখন পাখি আর কুকুর আর বাঘ সকলেই যে যার মত করে বিস্ময়, আতঙ্ক ও বিরক্তি প্রকাশ করেছে। ভয়ের ভাব [illegible]টিয়ে উঠে এখন ম্যাগগ ভীষণ চিৎকার করে ছুটছে আর বাঘটা গর্জনের পর গর্জন করে তাকে তাড়া করছে। দু-জনেই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এই হৈ-হল্লার মধ্যে একটা ময়ূর কোথা থেকে ভেসে এসে ভয়ের সংকেতধ্বনি করে বসল ঠিক আমার মাথার উপরের একটা গাছের ডালে। অবশ্য সেই মুহূর্তে আর আমার পাখির উপর কোনো আকর্ষণ ছিল না—আমার তখন একমাত্র সাধ, বহু দূরে এমন কোথাও পালাতে হবে যেখানে বাঘ নেই। ম্যাগগের তো চারটে পা আছে, কিন্তু আমার মোটে দুটো ; তাই নিঃসংকোচে বিশ্বস্ত বন্ধুকে ফেলে রেখেই আমি প্রচণ্ড দৌড় লাগালাম। জীবনে আর কখনো আমি অমন দৌড় দৌড়েছি কি না সন্দেহ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাগগ আমাকে ধরে ফেলল, এবং বাঘের গর্জন আর পেছন থেকে শোনা গেল না।

এখন আমি কল্পনা করতে পারি (এ কল্পনা করা সেই মুহূর্তে সম্ভব ছিল না) যে বাঘটা ফাঁকা জায়গাটায় এসে তার থাবার উপর ভর করে বসে বাঘের হাসি হাসছে ; এই ভেবে যে, একটা মস্ত কুকুর আর একটা ছোট ছেলে যাকে দেখে প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল, আসলে সে ঘুমের ব্যাঘাত

হয়েছে বলে তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছিল মাত্র।

কালাধুঙ্গি ছেড়ে আমাদের গ্রীষ্মাবাস নৈনিতাল যাবার আগে সেই শীত-কালে আমাকে আর একটা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। এবার আমি একা, কারণ ম্যাগগ তার আর এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে আমাদের না বলে কয়ে গ্রামে গেছে। ঘন জঙ্গল এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত ফাঁকার উপর দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি। নয়া গাঁওয়ের নিচে গারুপ্পুর রাস্তায় আমি বন-মোরগের সন্ধানে চলেছি। রাস্তার উপর অনেক পাখি দেখা গেল খুঁটে খুঁটে খাবার খাচ্ছে, কিন্তু তাদের কোনোটাই গুলির পাল্লার মধ্যে এল না। বাধ্য হয়ে তখন আমি জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। এ জঙ্গলে কিছু বড় বড় গাছ, আর ইতস্তত ছড়ানো কিছু ঝোপ ও ছোট ছোট ঘাস। জঙ্গলে ঢোকবার আগে আমি জুতো-মোজা খুলে ফেললাম। সামান্য একটু এগোতেই দেখলাম, একটা লাল বনমোরগ পা দিয়ে দিয়ে একটা গাছের নিচে শুকনো পাতা আঁচড়াচ্ছে।

বনমোরগ কিংবা পোষা মোরগছানা যখন শুকনো পাতা বা আবর্জনার গাদা আঁচড়ায়, প্রথমটা সে মাথা তুলে দেখে নেয় কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না। তারপর মাথা নামিয়ে কোনো লুকোনো-পোকা-মাকড় বা শস্য খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে। এই মোরগটা যে গাছটার নিচে খেতে ব্যস্ত ছিল সে জায়গাটা আমার বন্দুকের পাল্লার বাইরে। তাই আমি খালি পায়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হলাম। যখনই পাখিটা মাথা নামাচ্ছে সেই সুযোগে কয়েক গজ অগ্রসর হচ্ছি, আর নিশ্চল হয়ে থাকছি যখনই সে মাথা তুলছে—এইভাবে অগ্রসর হতে হতে আমি একটা নিচু জায়গায় এসে তাকে প্রায় পাল্লার মধ্যে এনে ফেললাম। নিচু জায়গাটার দু-দিকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা লম্বা ঘাস, নিচু জায়গাটায় নেমে দু পা ধারের দিকে সরে গেলেই আমি তাকে নাগালের মধ্যে পাব, আর সেইসঙ্গে একটা ছোট গাছও পাব যার উপর ভারি বন্দুকটা রেখে ভাল করে তাক করতে পারব। মোরগটা আবার মাথা নামাতেই নিচু জায়গাটায় এগিয়ে গেলাম। কিন্তু পা ফেলতেই আমার পা পড়ল একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপের কুণ্ডলীর মধ্যে। ক-দিন আগে আমি যে দৌড় দৌড়েছিলাম কোনো বালক কখনো তেমন দৌড়েছে কি না সন্দেহ, আর এই মুহূর্তে যে লাফ আমি লাফালাম কোনো বালক কখনো তেমন লাফিয়েছে কি না তাও সন্দেহ। একেবারে গিয়ে পড়লাম নিচু জায়গাটার অপর পারে, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে সেই কুণ্ডলীতে গুলি করেই ছুটতে শুরু করলাম—থামলাম না যতক্ষণ না রাস্তায় পৌঁছে নিরাপদ বোধ করলাম।

উত্তর ভারতের বন-জঙ্গলে অনেক বছর কাটিয়েছি, কিন্তু কখনো শুনি নি কোনো ময়াল সাপ মানুষ মেরেছে। কিন্তু তাহলেও বলব যে নিতান্ত ভাগ্যবলে আমি সেই সকালে বেঁচে গেছি, কারণ যদি ময়ালটা আমার পা

জড়িয়ে ধরত—ঘুমিয়ে না থাকলে নিশ্চয় ধরত—তাহলে আর ওকে কষ্ট করে আমায় মারতে হত না, কারণ ভয়েই আমি মারা পড়তাম, কদিন আগে যেমন একটা পূর্ণবয়স্ক চিতল হরিণের ল্যাজ ময়ালে টেনে ধরতেই সে ভয়ে মারা পড়েছিল। ময়ালটা কত বড়, বা আমার গুলিতে সে মরেছে কি না তা আমি জানি না, কারণ তা দেখতে আমি ফিরে যাই নি। তবে ওই অঞ্চলে আমি আঠার ফুট লম্বা ময়াল পর্যন্ত দেখেছি, আর দুটো ময়াল দেখেছি যাদের একটা একটা চিতল হরিণকে, আর অন্যটা একটা গরুকে আস্ত গিলে ফেলেছিল।

কালাধুঙ্গি থেকে নৈনিতালে ফেরার অল্প পরেই ম্যাগগের আর আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হয়। নৈনিতালের চারদিকের জঙ্গলে তখন প্রচুর কালিজ ও অন্যান্য পাখি ছিল, এবং বেশী শিকারী না থাকায় এবং তাদের মারার ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ না থাকায় স্কুলের ছুটির পর ম্যাগগকে নিয়ে বেরিয়ে বাড়িতে রান্নার জন্যে গোটা-দুই করে কালিজ বা পাহাড়ী তিতির শিকার করে আনতে বাধা ছিল না।

এক সন্ধেয় ম্যাগগকে নিয়ে আমি কালাধুঙ্গি রোড দিয়ে চলেছি। অনেক-গুলো কালিজকে ম্যাগগ তাড়া করে গাছে তুলল, কিন্তু কোনোটাই গাছে বসে থেকে আমাকে ভাল করে টিপ করে গুলি ছুঁড়বার সুযোগ দিল না। উপত্যকার নিচে সরিয়া তাল বলে যে ছোট হ্রদটা ছিল সেখানে পেঁছে আমরা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম—আমাদের উদ্দেশ্য হল উপত্যকার উপরদিকের শেষ প্রান্তের গিরিখাত পর্যন্ত হেঁটে ফিরে যাব। হ্রদটার কাছে আমি একটা কালিজকে গুলি করলাম। তারপর ঘন ঝোপ আর বিরাট পাথরের স্তূপের উপর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে যখন আবার রাস্তাটার দুশো গজের মধ্যে এসে পেঁছেছি, ঘন ঝোপ থেকে বেরিয়ে একটা ঘাসে ভরা জায়গায় এসে পেঁছেছি দেখলাম দোপাটি-ঝোপের তলা থেকে অনেকগুলো কালিজ লাফিয়ে উঠে একটা নিচু কুল-ঝোপ থেকে কুল খেতে শুরু করল। পাখিগুলি উড়লেই দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু সচল লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়বার মত হাত তখনও আমার তৈরি হয় নি, তাই আমি মাটিতে বসে অপেক্ষা করে রইলাম কখন কোন পাখি ফাঁকা জায়গাটায় এসে বসে, তারই জন্যে। ম্যাগগ আমার পাশে শুয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ আমরা এইভাবে রয়েছি আর পাখিগুলো কুল খাবার জন্যে তখনো লাফালাফি করে চলেছে, এমন সময় পাহাড়ের উপর দিকে যে রাস্তাটা কোনাকুনিভাবে চলে গেছে সেই রাস্তা থেকে অনেক মানুষের চলার আর কথার আওয়াজ শোনা গেল। তাদের টিনের পাত্রের শব্দ থেকে বুঝলাম যে তারা গোয়ালা; সরিয়া তালের নিচে তাদের বাড়ি থেকে নৈনিতালে দুধ বিক্রি করে এখন ফিরছে। চারশো গজ দূরের মোড়টায় বাঁক নেবার সময় প্রথম

তাদের সাড়া পেলাম। তারপর তারা আমার উপরের দিকে আর-একটু বাঁ দিকে একটা জায়গায় পেঁছে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, যেন কোনো প্রাণীকে রাস্তা থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। পরমুহূর্তেই আমাদের ঠিক উপরের জঙ্গল থেকে একটা বড় জন্তুর এগিয়ে আসার শব্দ আমাদের কানে এল—জন্তুটা আসছে আমাদের দিকে। ঘন ঝোপের ফাঁক দিয়ে প্রথমে দেখা যাচ্ছিল না, দোপাটি গাছগুলোর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কালিজগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড চিতা ফাঁকা জায়গাটার উপর লাফিয়ে পড়ল। মাটিতে পড়ার আগেই চিতাটা আমাদের দেখতে পেয়েছিল ; মাটিতে লেপটে পড়ে সে সেইভাবেই রয়ে গেল নিস্পন্দ। ফাঁকা জায়গাটা ত্রিশ ডিগ্রি কোণ করে একটু একটু করে উঠে গেছে ; আমাদের থেকে উপরে, মাত্র দশ গজ দূরে, তার সমস্ত শরীরটা দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। তাকে দেখেই আমি আমার বাঁ হাতটা বন্দুক থেকে সরিয়ে ম্যাগগের কাঁধের উপর রাখলাম,—টের পেলাম, আমার নিজের শরীরের মত ওর শরীরও থরথর করে কাঁপছে।

এই প্রথম ম্যাগগ আর আমি চিতা দেখলাম। বাতাস বইছিল নিচের থেকে পাহাড়ের উপর দিকে : আমাদের প্রতিক্রিয়া হল মোটামুটি একই রকম—তীব্র উত্তেজনা, কিন্তু ভয় নয়। ভয় না পাবার কারণ আমি আজ সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার পরে বুঝতে পারি—চিতাটার আমাদের উপর কোনো জিঘাংসা ছিল না। রাস্তা থেকে মানুষের তাড়া খেয়ে হয়তো সে ওই পাথরগুলোর দিকে চলে যাচ্ছিল যার উপর দিয়ে ম্যাগগ আর আমি একটু আগে এসেছি ; তাই ঝোপটা পেরিয়েই তার পালাবার পথের উপর হঠাৎ একটা ছোট ছেলে আর একটা কুকুরের সম্মুখীন হয়ে সে অবস্থাটা বোঝবার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ছিল। আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই সে বুঝতে পেরেছিল তার সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নেই। আমাদের জঙ্গলের অন্য যে-কোনো প্রাণীর চেয়ে চিতাদের উপস্থিত বুদ্ধি বেশি। তাই আমাদের থেকে ভয়ের কিছু নেই বুঝতে পেরে এবং আশে-পাশে আর কোনো মানুষের সাড়া না পেয়ে সে গুড়িমারা ভঙ্গি ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, কমনীয় ভঙ্গিতে কয়েকটি লাফ দিয়ে পেছনের জঙ্গলে অন্তর্হিত হল। বাতাসে চিতাটার গন্ধ আসতেই ম্যাগগ খাড়া হয়ে উঠে প্রচণ্ড গর্জন করতে লাগল, তার ঘাড়ের আর পিঠের সমস্ত লোম সিধে হয়ে উঠল। এতক্ষণে সে বুঝেছে, যে সুদর্শন প্রকাণ্ড জন্তুটাকে চোখে দেখে সে একটুও ভয় পায় নি এবং যে খুব সহজেই তাকে মেরে ফেলতে পারত সে হল চিতা জঙ্গলের সকল জন্তুর মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক শত্রু তার।



৪

গুলতি আর গাদা-রাইফেল--আমার শিকারী জীবনের এই দুই অধ্যায়ের মাঝে ছিল এক তীর-ধনুকের অধ্যায়। সে সময়ের কথা মনে করে আজও আমার মন খুশিতে ভরে ওঠে কারণ তীর-ধনুকে কখনো কোনো পাখি বা পশু বিদ্ধ করতে না পারলেও, প্রকৃতির ব্যাঙ্কে সেই সময়েই প্রথম আমার যৎসামান্য সঞ্চয় হয়েছিল এবং তখন ও পরবর্তী জীবনে জঙ্গলের যে জ্ঞান আমি আত্মস্থ করেছি আজও তা আমার কাছে অশেষ আনন্দের উৎস হয়ে রয়েছে।

'শিখেছি' কথাটার চেয়ে 'আত্মস্থ করেছি' কথাটা আমার বেশি পছন্দ। কারণ জঙ্গলের জ্ঞান তো কোনো বিজ্ঞান নয় যে পাঠ্য কেতাব পড়ে শেখা যাবে, এ কেবল একটু একটু করে আত্মস্থ করার জিনিস : এই প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল চলতে পারে, কারণ প্রকৃতি-গ্রন্থের না আছে শুরু, না আছে শেষ। সে বই যেখানে খুশি এবং যে-কোনো বয়সে খুলে পাঠ করা সম্ভব, এবং জ্ঞান লাভের বাসনা থাকলে এ বই অসীম কৌতূহলের খোরাক যোগাবে এবং যত নিবিড়ভাবেই যত দিন ধরে পড়ে যাওয়া যায়, এর আকর্ষণ কোনোদিন হ্রাস পাবে না। কারণ প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের শেষ নেই।

এখন বসন্তকাল। সামনের গাছটা উজ্জ্বল ফুলের অলংকারে ভূষিত। রঙ-বেরঙের পাখি এই ফুলের আকর্ষণে এসে কেউ ডালে ডালে নাচছে, কেউ ফুল থেকে মধু খাচ্ছে, কেউ বা খাচ্ছে ফুলের পাপড়ি : কেউ বা আবার যেসব মৌমাছি মধু সংগ্রহে ব্যস্ত তাদের খেয়ে চলেছে। কাল এই ফুল ফলে পরিণত হবে। তখন আবার অন্য পাখিরা এসে গাছটা দখল করবে। এই বিভিন্ন ধরনের

পাখির আবার প্রকৃতির ব্যবস্থায় ভিন্ন কাজ ; কারুর কাজ হল প্রকৃতির উদ্যান-শোভা বৃদ্ধি করা, কারুর বা প্রকৃতিকে সুরে ভরে তোলা, কারুর বা আবার তাকে গাছে-পালায় পুনরুজ্জীবিত করা।

বছরের পর বছর হয় ঋতুর পর ঋতুর পরিবর্তন, সেইসঙ্গে দৃশ্যপটও বদলাতে থাকে। নানা প্রজাতির পাখিদের নতুন ঝাঁক নানা সংখ্যায় এসে গাছের শোভা বৃদ্ধি করে। গাছের একটা বড় ডাল ভেঙে পড়ে ঝড়ের বেগে। মরে যায় গাছটা। তখন আর-একটা গাছ এসে তার স্থান গ্রহণ করে। এইভাবে চলে আবর্তন-চক্র।

আপনার পায়ের কাছে যে পথটা, তাতে একটা সাপের চলা-পথের ছাপ। সূর্য ওঠার ঘন্টাখানেক আগে সাপটা এই পথে চলে গেছে। সাপটা গিয়েছিল পথের ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, তার শরীরের বেড় তিন ইঞ্চি : এবং সে যে বিষাক্ত সাপ তা একরকম নিশ্চয় করেই বলা চলে। অথচ কালই হয়তো এখানে অথবা অন্য কোনো পথে লক্ষ করলে দেখবেন আর একটা ছাপ, পাঁচ মিনিট আগে যে সাপটা এ রাস্তা পার হয়ে গেছে সে গিয়েছিল বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ; তার শরীরের বেড় পাঁচ ইঞ্চি ; এবং সে নির্বিষ।•

আজ আপনি বনের রহস্য যেটুকু আত্মস্থ করলেন, আগামী কাল আপনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন তা তার সঙ্গে যুক্ত হবে এবং আপনার আত্মস্থ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে কতটা আপনি শিখলেন। এই শেখার সময়টা মোটামুটি কেটে যাবার পর—সে এক বছর পরে বা পঞ্চাশ বছর পরে যখনই হ'ক—তখনও দেখবেন যে আপনার শিক্ষাগ্রহণ সবেমাত্র শুরু হয়েছে, প্রকৃতির সমস্ত রহস্য আপনার সামনে পড়ে রয়েছে। একটা কথা নিশ্চয় করে জানবেন যে, শেখবার যদি ইচ্ছে না থাকে তাহলে আপনি প্রকৃতি থেকে কিছুতেই কিছু শিখতে পারবেন না।

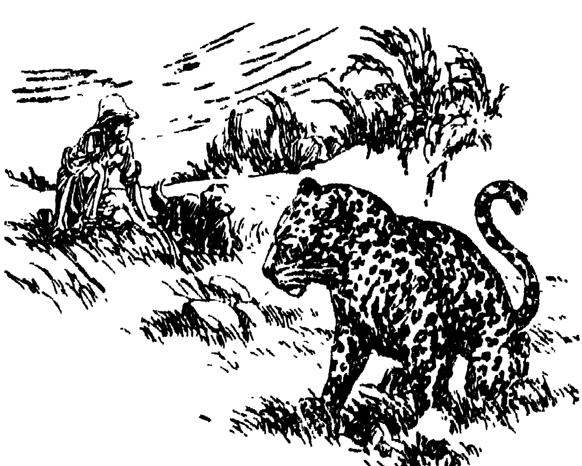
একটা তাঁবু থেকে আর একটা তাঁবু পর্যন্ত বার মাইল পথ আমি এক অপূর্ব জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম, এক সঙ্গী নিয়ে। তখন এপ্রিল মাস, প্রকৃতি সৌন্দর্যের শীর্ষে। সমস্ত গাছ সমস্ত ঝোপ সমস্ত লতা ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। রঙবাহার প্রজাপতির দল ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসও ফুলের গন্ধে ভরে উঠে পাখির গানে রোমাঞ্চিত। দিনের শেষে আমার সঙ্গীকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম এ পথ-চলা তার ভাল লেগেছে কি না, সে বললে, 'উঁহু, রাস্তাটা বেজায় এবড়ো-খেবড়ো!'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে একবার আমি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া জাহাজ 'কারাগোলা'য় করে বোম্বাই থেকে মোম্বাসায় চলেছি। উপরের ডেকে ছিলাম আমরা পাঁচজন। আমি যাচ্ছি টাঙ্গানিয়াকায় একটা বাড়ি তৈরি করতে, আর বাকি চারজন চলেছে কিনিয়ায়—তিনজন যাচ্ছে শিকার করতে, আর একজন,

সেখানে গোলাবাড়িটা কিনেছে, সেটা দেখতে যাচ্ছে। সমুদ্র ছিল অশান্ত, আর সমুদ্রযাত্রায় আমি এমনিতেই বড় অস্বস্তি বোধ করি। আমার বেশির ভাগ সময়ই তাই কেটেছে ধূমপানের কক্ষে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। আর ওরা কাছেই একটা টেবিলে বসে তাস খেলতে খেলতে ধূমপান করেছে আর গল্প-গুজব করেছে,—সে গল্প বেশির ভাগই শিকারের গল্প।

একদিন পায়ে টান ধরায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। ওদের কথাবার্তা আমার কানে এল। শুনলাম সবচেয়ে যে অল্পবয়স্ক সে বলছে, 'ওঃ, বাঘ সম্বন্ধে আমার আর জানতে কিছু বাকি নেই। গত বছর আমি মধ্যপ্রদেশে এক ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে পনের দিন ছিলাম।'

দুটোই দুই তরফের চূড়ান্ত উদাহরণ সন্দেহ নেই, কিন্তু তা হলেও এ থেকে আমার যা বক্তব্য তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমি এই বলতে চাই যে যদি আপনার কৌতূহল না থাকে তাহলে যেমন যে পথ ধরে চলেছেন তা ছাড়া আর কিছুই আপনার চোখে পড়বে না, তেমনি যদি আপনার শেখবার কোনো আগ্রহ না থাকে আর মনে করে থাকেন যে যা আসলে সারা জীবন ধরেও শেখা যায় না আপনি তা পনের দিনে শিখতে পেরেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহলে আপনি যে অজ্ঞ সেই অজ্ঞই থেকে যাবেন।





৫

আমার ছেলেবেলায়, স্কুল-জীবনের দশটি বছরে, তার পর যখন আমি বাংলা দেশে কাজ করছিলাম তখন আবার দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে আমার সমস্ত ছুটি কাটত কালাধুংগি আর তার আশেপাশের জঙ্গলে। যদি আমি সেই সুযোগে জঙ্গলের জ্ঞান যথাসম্ভব আত্মস্থ করতে না পেরে থাকি, তবে সে দোষ আমার নিজের, কারণ প্রচুর সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। এমন সুযোগ ভবিষ্যতে আর কারুর মিলবে না, কারণ লোকসংখ্যার চাপে এমন অনেক অঞ্চলে এখন চাষবাস শুরু হয়েছে যেখানে আমার সময়ে বন্য প্রাণীরা ইচ্ছেমত ঘোরাফেরা করত। জঙ্গলকে নিয়ন্ত্রণে আনার ফলে যে-সব অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী তার মধ্যে একটা হল সেইসব গাছ কেটে ফেলা যার ফল আর ফুল পশুপাখিদের খাদ্য। গাছগুলো কাটার ফলে লক্ষ-লক্ষ বানর বন ছেড়ে চাষের খেতে গিয়ে পড়ল এবং এর ফলে যে সমস্যা দেখা দিল, ভারতীয়দের ধর্মীয় সংস্কারের জন্যে তার প্রতিকার করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। কারণ জনসাধারণ বানরদের পবিত্র প্রাণী বলে বিশ্বাস করে। আমাদের মতে এই গাছ কাটারই কোনো দরকার ছিল না। এমন দিন আসবে যখন এই সমস্যা আরো গুরুতর হয়ে উঠবে। যাদের উপর এই সমস্যা নেমে আসবে তাদের অদৃষ্ট কেউ মাথা পেতে নিতে চাইবে না। শুধু উত্তরপ্রদেশেই আমার মতে বানরের সংখ্যা এক কোটির কম নয়। এক কোটি বানর খেতের শস্য আর বাগানের ফল খেয়ে জীবনধারণ করতে লাগলে সমস্যা ভয়ংকর হয়ে উঠবে।

সেই সুদূর অতীতে যদি আমি ধারণা করতে পারতাম যে একদিন আমাকে

এই বইটা লিখতে হবে, তাহলে চেষ্টা করতাম যা শিখেছি তা তার চেয়ে ভাল করে শিখতে, কারণ যে অবিমিশ্র আনন্দ আমি জঙ্গলের মধ্যে পেয়েছি আনন্দের সঙ্গেই আমি তা পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিতাম। আমার এ আনন্দের কারণ হয়তো এই যে, যে-কোনো বন্য প্রাণীই তার স্বাভাবিক পরিবেশে সুখী। প্রকৃতির বুকে কোনো দুঃখ, কোনো অনুশোচনা নেই। যখন কোনো ঝাঁক থেকে কোনো পাখি বা পাল থেকে কোনো জন্তু বাজপাখি বা কোনো মাংসাশী জন্তুর কবলিত হয়, বাকিরা তখন আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে তাদের সময় তখনও আসে নি, এবং ভবিষ্যতের চিন্তা তাদের বিশেষ ব্যাকুল করে না। যখন আমার জ্ঞান-বুদ্ধি কম ছিল, আমি পাখিদের আর ছোট ছোট জন্তুদের বাজপাখির বা ঈগলের বা মাংসাশী জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে একটি প্রাণীকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমি আসলে দুটি প্রাণীর জীবন নাশের কারণ হয়ে পড়েছি। এর কারণ, বাজপাখি বা ঈগলের নখে আর মাংসাশী প্রাণীর থাবায় পচা মাংস বা রক্ত লেগে যে বিষের সৃষ্টি হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ চিকিৎসা না পেলে (এবং জঙ্গলে তা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়) তাদের কবল থেকে উদ্ধার-করা জীব শতকরা একটির বেশি বাঁচতে পারে না, এবং হন্তা তার শিকারকে হারিয়ে ক্ষুধার তাড়নে বা শাবকের প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি প্রাণীকে বধ করতে বাধ্য হয়।

কয়েক জাতের পাখির কাজ হল প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখা। এই কাজ করতে আর সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করবার জন্যে তাদের পক্ষে হত্যা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই হত্যাকাণ্ডও প্রচুর নৈপুণ্যের সঙ্গে এবং যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। হন্তার তরফ থেকে হত্যাকাণ্ড তাড়াতাড়ি করা দরকার, নতুবা শত্রুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। জীবের যন্ত্রণার যাতে তাড়াতাড়ি অবসান হয় প্রকৃতির বিধান তাই হওয়াই তো স্বাভাবিক।

প্রত্যেক প্রাণীর নিজস্ব হত্যা-পদ্ধতি আছে এবং বহুলাংশেই তা নির্ভর করে শিকারী ও তার শিকারের আকৃতির তারতম্যের উপর। যেমন ধরুন, যে যাযাবর বাজপাখি সাধারণত মাটিতে শিকার করে, সে দরকার পড়লে কোনো উড়ন্ত ছোট পাখিকে উড়তে উড়তেই ধরে খেয়ে ফেলে। তেমনি, কোনো বাঘ যদি কোনো বিশেষ অবস্থায় শিকারকে কাবু করবার আগে তার পায়ের শিরা কেটে ফেলা দরকার মনে করে, অবস্থান্তরে হয়তো আবার তাকে এক আঘাতে হত্যা করবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় বনের প্রাণী বিনা কারণে হত্যা করে না। খেলাচ্ছলে হত্যা যে একেবারে হয় না তা অবশ্য নয়, এবং কোনো কোনো প্রাণী, বিশেষ করে

পাইল-মার্টেল, গন্ধগোকুল বা নেউল যে কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হত্যা করে না তাও নয়। শিকার কথাটার অর্থ ব্যাপক, এর ব্যাপক অর্থই করতে হবে।

পারসি উইন্ডহ্যাম যখন কুমায়ুনের কমিশনার ছিলেন তদানীন্তন যুক্তপ্রদেশের রাজ্যপাল স্যার হারকোর্ট বাটলার তাঁকে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ চিড়িয়াখানার জন্যে একটা ময়াল সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ যখন আসে উইন্ডহ্যাম তখন তাঁর শীতকালীন ট্যুরে ছিলেন। কালাধুঙ্গিতে তিনি এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কমিশনারের তরফ থেকে রাজ্যপালকে উপহার দেওয়া যেতে পারে এমন কোনো ময়ালের সন্ধান আমার জানা আছে কি না। এখন, এমনই একটা ময়ালের খবর আমার জানা ছিল ; পরদিন তাই উইন্ডহ্যাম, তাঁর দুই শিকারী আর আমি হাতির পিঠে চড়ে সেই ময়ালের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। এই ময়াল আমার বহু বছরের চেনা, তাই পথ চিনে হাতিকে নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হল না।

গিয়ে দেখি ময়ালটা সটান হয়ে একটা ছোট ঝরনার উপর শুয়ে রয়েছে। টলটলে জল এক কি দু-ইঞ্চি তার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মনে হয় ঠিক যেন কোনো চিড়িয়াখানার কাচের ঘরে তাকে দেখছি। উইন্ডহ্যাম দেখে বললেন ঠিক এমনটিই তিনি চাইছিলেন ; মাহুতকে তিনি হুকুম করলেন হাতির হাওদা থেকে একটা লম্বা দড়ি খুলে নিতে। দড়ি যোগাড় হলে উইন্ডহ্যাম তার এক দিকে একটা ফাঁস লাগালেন। তারপর সেটা শিকারীদের হাতে দিয়ে তাদের হুকুম করলেন সেই ফাঁসে আটকে সাপটাকে ধরে আনতে। আতঙ্কে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওরা বললে এ কাজ একেবারেই অসম্ভব। শুনে উইন্ডহ্যাম বললেন ভয় নেই, যদি সাপটা আক্রমণের কোনোরকম উদ্যোগ করে তখন তিনি গুলি করবেন—একটা ভারি রাইফেল তিনি সঙ্গে এনেছেন। কিন্তু এতেও যখন ওরা আশ্বস্ত হল না তখন তিনি আমার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যথেষ্ট জোরের সঙ্গে আমি আপত্তি জানাতে তিনি রাইফেলটা আমার হাতে দিলেন, তারপর নিজে নেমে গিয়ে শিকারীদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

আমার খুব আফসোস হয় যে এর পরের কয়েক মিনিটে যে ব্যাপার ঘটল তা তুলে নেবার জন্যে রাইফেল না এনে মুভি ক্যামেরা আনি নি, কারণ অমন মজার ব্যাপার আমি আর কখনও দেখি নি। উইন্ডহ্যামের মতলব ছিল পাইথনটার ল্যাজে ফাঁসটা আটকে শুকনো ডাঙায় তুলে নেওয়া এবং তারপর সেটাকে এমনভাবে বেঁধে ফেলা যাতে হাতিতে করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। শিকারী দু-জনকে মতলবটা বুঝিয়ে দিতে তারা তখন ফাঁসটা উইন্ডহ্যামের হাতে দিয়ে বললে যে, ফাঁসটা যদি তিনি সাপটার ল্যাজে আটকে দেন তাহলে তারা তাকে টেনে তুলবে। কিন্তু উইন্ডহ্যামের দৃঢ় ধারণা এই যে, এ কাজটা

তাঁর চেয়ে শিকারীরাই পারবে ভাল। পাইথনটা যাতে টের না পায়, তাই অনেকবার এগোনো পিছোনো হল, নীরবে ইঙ্গিত বিনিময় হল ; তারপর তিনজনেই জলে নেমে পড়ল। প্রত্যেকেরই চেষ্টা, ফাঁসটা থেকে যতটা দূরে সম্ভব দড়ি ধরে কোনোরকমে কাজটা সারা। এইভাবে খুব সাবধানে তারা নদীর উজান বেয়ে এগোল। যখন তারা নাগালের মধ্যে এসে পেঁছেছে আর প্রত্যেকেই চাইছে অন্য কেউ ফাঁসটা ল্যাজে লাগাক, এমন সময় পাইথনটা তার মাথাটা জল থেকে এক ফুট কি দু-ফুট উপরে তুলে তাদের দিকে এগোবার উপক্রম করল। সঙ্গে সঙ্গে জল ছিটোতে ছিটোতে দৌড়ে পালাতে লাগল শিকারী দু-জন আর চেঁচাতে লাগল,— 'ভাগো সাহেব!' উইন্ডহ্যামও তাদের পিছু-পিছু ছুটতে শুরু করলেন। ছুটতে ছুটতে তিন জনে তীরের ঘন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে সবেগে ঢুকে পড়ল, আর পাইথনটা একটা বড় জাম গাছের শেকড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। মাহুতের আর আমার হাসতে হাসতে প্রায় হাতির পিঠ থেকে পড়ে যাবার অবস্থা!

এর এক মাস পরে একদিন আমি উইন্ডহ্যামের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন পরদিন তিনি কালাধুঙ্গিতে আসবেন, আর-একবার চেষ্টা করবেন পাইথনটাকে ধরতে। জেফ্ হপকিন্স আর তাঁর এক বন্ধু সদ্য বিলেত থেকে এসেছেন : চিঠিটা যখন আসে তাঁরা তখন আমার সঙ্গে ছিলেন। তিন জনে দেখতে বেরিয়ে পড়লাম পাইথনটাকে যেখানে দেখেছিলাম সেখানে সে আছে কি না। যে গাছটার শেকড়ের নিচে পাইথনটা থাকত, তার কাছে ছিল সম্বরদের একটা আড্ডা। যুগ যুগ ধরে সম্বরের পায়ের খুরে খুরে এখানকার মাটি সূক্ষ্ম ধুলোয় পরিণত হয়েছিল। দেখলাম পাইথনটা সেখানে মরে পড়ে আছে, কয়েক মিনিট আগে একজোড়া উদ্‌বিড়াল তাকে হত্যা করেছে।

উদ্‌বিড়ালরা নিছক শিকারের আনন্দেই পাইথন আর কুমির মেরে থাকে, কারণ কখনো আমি তাদের পাইথন বা কুমির খেতে দেখি নি। পাইথন আর কুমির ওরা মেরে থাকে এইভাবে। পাইথন বা কুমির যখন ডানদিকের উদ্‌বিড়ালটার আক্রমণ এড়াবার জন্যে মাথা ফেরায়, বাঁ দিকের উদ্‌বিড়ালটা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে (উদ্‌বিড়ালরা অত্যন্ত চটপটে) তাদের শিকারের কাঁধে কামড় বসায়,—তার মাথার যতটা কাছে সম্ভব। তারপর যখন সে বাঁয়ের আততায়ীর কাছ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত, ডান দিকেরটা তখন লাফিয়ে এসে একটা কামড় বসায়। এইভাবে এ একবার ও একবার একটু একটু করে মাংস খুবলে নিতে নিতে শেষ পর্যন্ত যখন হাড় পর্যন্ত সমস্ত মাংসটা উঠে যায় তখনই তারা মরে ; কারণ পাইথন বা কুমিরের জীবনীশক্তি অত্যন্ত বেশি।

করল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তানাকপুরের প্রত্যেকটি বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। লড়াইটা কতক্ষণ চলেছিল এ নিয়ে সবাই একমত নয়। কারুর কারুর মতে এ লড়াই সারা রাত চলেছিল, আবার অন্যদের মতে মাঝরাতে লড়াই শেষ হয়। অবসরপ্রাপ্ত এক ভদ্রলোক মিঃ ম্যাথিসনের বাংলো ছিল লড়াইটা যেখানে হচ্ছিল তার ঠিক উপরে ; তিনি বলেন, লড়াই বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলেছিল এবং এমন ভয়ঙ্কর শব্দ তিনি জীবনে আর কখনো শোনেন নি। বন্দুকের আওয়াজ অবশ্য রাত্রে শোনা গিয়েছিল, কিন্তু তা মিঃ ম্যাথিসনের, না পুলিসের বন্দুকের আওয়াজ তা বোঝা যায় নি। যাই হ'ক তাতে কোনো কাজ হয় নি— যুদ্ধও বন্ধ হয় নি, আর যুধ্যমানেরাও ওখান থেকে চলে যায় নি।

সকালবেলা আবার তানাকপুরের মানুষরা সেই উঁচু জায়গাটায় গিয়ে পেঁছল। দেখল, একশো ফুট উঁচু পাথরের নুড়ি-ছাওয়া জায়গাটার পাদদেশে হাতিটা মরে পড়ে রয়েছে। আঘাতের চিহ্ন সম্বন্ধে নায়েব-তহসিলদারের বর্ণনা শুনে বুঝলাম, অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে তার মৃত্যু হয়েছে। হাতিটার শরীরের কোনো অংশ বাঘে খায় নি, আর কোনো আহত বা হত বাঘেরও কোনো চিহ্ন তখন বা পরবর্তীকালে তানাকপুর অঞ্চলে দেখা যায় নি।

আমার মনে হয় বাঘদুটোর ইচ্ছে ছিল না হাতিটাকে হত্যা করে। পুরনো কোনো ক্ষতির প্রতিশোধ, বা বাচ্চা মারার জন্যে আক্রোশ, বা খাদ্যের জন্যে হত্যা করা,—কোনো যুক্তিই যথেষ্ট জোরাল নয়। ব্যাপারটা কিন্তু যা দাঁড়াল তা হচ্ছে এই : একটা বড় পুরুষ-হাতি, তার দুটো দাঁতের ওজন নব্বই পাউন্ড, তানাকপুরের কাছাকাছি অঞ্চলে একজোড়া বাঘের হাতে মারা পড়ে। আমার মনে হয় ব্যাপারটা ঘটনাচক্রেই ঘটে গেছে। একটা বাঘ ও বাঘিনীর মিলনের সময় একটা হাতি তার পথ থেকে তাদের সরিয়ে দেবার চেষ্টা করায় লড়াই বেধে যায়। মনে হয় দ্বিতীয় বাঘটা হাতিটার মাথায় লাফিয়ে পড়ে তার চোখদুটো থাবা মেরে উপড়ে ফেলেছিল, আর হাতিটা দৃষ্টি হারিয়ে এলোপাথাড়িভাবে বাঘদের আক্রমণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত উঁচু তীর অবধি গিয়ে পেঁছেছিল। এখানে আলগা পাথরগুলোর মধ্যে তাল সামলাতে না পেরে সে বাঘদুটোর সম্পূর্ণ আওতার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। লড়াইয়ের সময় বাঘদুটো তার হাতে কিছু চোট খেয়েছিল, ফলে তারা অত্যন্ত নির্মম হয়ে উঠেছিল।

মাংসাশী প্রাণী মাত্রেই দাঁতের কামড়ে হত্যা করে থাকে, আর যে-সব প্রাণী তাদের শিকারের পিছু নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করে শিকার করে, শুধু শিকারকে ধরে রাখবার জন্যেই নয়, কখনো-কখনো দাঁত বসাবার আগে থাবা মেরে তাকে কাবু করেও থাকে। যে-সব প্রাণী শিকারকে আক্রমণ করে হত্যা করে তাদের কথা বাদ দিলে, হত্যা করার ব্যাপারটা জঙ্গলে এত কম প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে এবং প্রত্যক্ষ হলেও গোড়ার দিকের ব্যাপারগুলো তাড়াতাড়ি ঘটে

যায় আর তা অনুসরণ করা এত কঠিন হয়ে ওঠে যে, বাঘ আর চিতার প্রায় গোটা-কুড়ি হনন-কার্য লক্ষ করার পরও ঠিক যে সময়ে আততায়ী শিকারের উপর গিয়ে পড়ে সে সময়কার ব্যাপারগুলোর নিখুঁত বর্ণনা করতে পারব না। যে-সব ঘটনা আমি লক্ষ করেছি তার মধ্যে মাত্র একবার আমি মুখোমুখি আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছি—আক্রমণটা হয়েছিল একটা চিতল হরিণীর উপর। যেদিকে হাওয়া বইছিল সেইদিক ধরেই হরিণীটা চরছিল। এর কারণ অবশ্য সহজেই অনুমান করা যায়। কেননা, বাঘ বা চিতা যেসব প্রাণীকে আক্রমণ করে থাকে, তাদের পক্ষে তাকে শিং দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করা সম্ভব ; এ ছাড়া আর যে-সব আক্রমণ আমি প্রত্যক্ষ করেছি প্রতিবারই তা হয় পেছন থেকে, নয় তো এক পাশ থেকে এসেছে ; হয় এক লাফে, কিংবা একটুখানি ছুটে এসে শিকারী পশু শিকারকে থাবা দিয়ে ধরেই বিদ্যুৎ-গতিতে তাকে গলা ধরে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে।

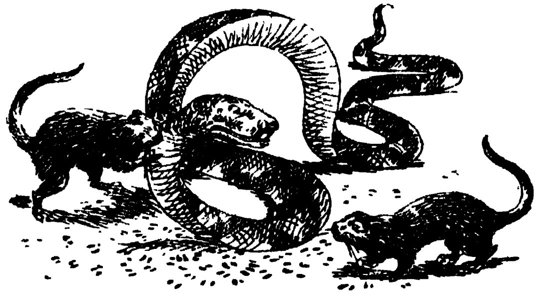
কোনো প্রাণীকে ধরাশায়ী করার সময় প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, কারণ পূর্ণাবয়ব সম্বর বা চিতলের এক পদাঘাতে বাঘ বা চিতার পেট ফেঁসে যেতে পারে। তাই আঘাত এড়াবার জন্যে, আর শিকার যাতে পায়ের উপর দাঁড়াতে না পারে সেজন্যে তার মাথাটা মাটিতে পেড়ে ফেলবার সময় মুচড়িয়ে ফেলা হয়, যেভাবে ছবিতে দেখানো হয়েছে। এ অবস্থায় আর শিকার লাথি ছুড়েও শিকারী পশুর কিছুই করতে পারে না এবং উঠে দাঁড়ানো বা পাক খাওয়াও আর তখন তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তাহলেই তার ঘাড় ভেঙে যাবে। এমন দেখা যায় যে কোনো ভারি জন্তু ভূপতিত হতেই তার ঘাড় ভেঙে গেছে। আবার এমনটিও দেখা যায় যে আততায়ীর কুকুর-দাঁতের কামড়ে তার ঘাড় ভেঙে গেছে। এই দুই ভাবেও ঘাড় না ভাঙলে গলা টিপে দম বন্ধ করে তাকে হত্যা করা হয়।

বাঘ তার শিকারকে পেছনের পায়ের হ্যামস্ট্রিং নামক শিরা ছিন্ন করে হত্যা করেছে এ-হেন ঘটনা আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু চিতাকে কখনো তা করতে দেখি নি। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এভাবে শিরা কেটে হত্যা করা হয়েছে —দাঁত, নয় থাবার সাহায্যে। কিন্তু চিতাকে কখনো তা করতে দেখি নি। এক বন্ধু একবার আমার কাছে তাঁর একটা গরুর মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে আসেন। জায়গাটা হল সেমধর শৈলশিরা,—নৈনিতাল থেকে ছ-মাইল দূরে। তাঁর অনেক গরু। বাঘের আর চিতার হনন-কার্য তিনি অনেক প্রত্যক্ষ করেছেন,— কিন্তু এই গরুটার ঘাড়ে কোনো আঘাতের চিহ্ন না দেখে, আর যে-ভাবে তার মাংস ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তা দেখে তাঁর ধারণা যে কোনো অজানা জন্তু তাকে মেরে খানিকটা খেয়ে রেখে গেছে। তখনো বেলা বেশি হয় নি, ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই আমরা অকুস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গরুটা

পূর্ণবয়স্ক, পঞ্চাশ ফুট চওড়া একটা দাবানল-পথে তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং সেখান থেকে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টা হয় নি। নিহত পশুর বর্ণনা শুনে আমার মনে হয়েছিল কোনো কালো হিমালয়-ভাল্লুকের কান্ড এটা। ভাল্লুকরা স্বভাবত মাংসাশী নয়, তবে, মাঝে মাঝে তারা হত্যা করে থাকে। আর বাঘ বা চিতার মত হত্যায় পারদর্শিতা না থাকায় অত্যন্ত বেয়াড়াভাবে তারা হত্যা করে থাকে। অবশ্য এ গরুটা ভাল্লুকের হাতে নয়, বাঘের হাতে মারা পড়েছে, এবং অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে মারা পড়েছে। প্রথমে হ্যামস্ট্রিং শিরা কেটেছে, তারপর পেট ফাটিয়ে হত্যা করেছে। হত্যা করার পর বাঘটা থাবা মেরে চামড়া ছিঁড়ে পেছনের দিক থেকে খানিকটা খাবলে খেয়ে ফেলেছে। শক্ত মাটিতে তার চিহ্ন ধরে এগোনো সম্ভব হল না। তাই বাকি দিনটা আমার কাটল আশে-পাশের জঙ্গলে বাঘটার সন্ধানে, যদি গুলি করার একটা সুযোগ জুটে যায়। সূর্যাস্ত নাগাদ আমি ফিরে এলাম, তারপর মড়ির কাছেই একটা গাছের ডালে বসে কাটিয়ে দিলাম বাকি রাতটা। অর্থাৎ বাঘটা মড়িতে ফিরে এল না। এইরকম আরও নটা মড়িতেও সে ফিরে আসে নি এমন নজির পাওয়া গেল। ছটা গরু আর তিনটে অল্পবয়স্ক মোষকে ঠিক এইভাবেই সে মেরেছে।

মানুষের চোখে দেখলে এভাবে হত্যা করাটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে হবে, কিন্তু বাঘের দিক থেকে দেখলে তা বলা যায় না। খাদ্যের জন্যে তার হত্যা করা দরকার, এবং হত্যার পদ্ধতিটা নির্ভর করে তার শরীরের অবস্থার উপর। বাঘটার কুকুর-দাঁত ছিল না যার সাহায্যে হত্যা করবে, শিকার টেনে নিয়ে যাবারও সামর্থ্য তার ছিল না। আর শিকারের দেহ থেকে দাঁতের সাহায্য না নিয়ে থাবার সাহায্যে মাংস ছিঁড়ে নেওয়া থেকে এই প্রমাণ হচ্ছে যে, তার শরীরে কোনো বিকার আছে এবং আমার স্থির ধারণা এই যে, কোনো অসাবধানী শিকারীর লক্ষ্যভ্রষ্ট দ্রুত গুলি তার নিচের চোয়ালের খানিকটা উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এই সিদ্ধান্তে আমি আসি বাঘটার প্রথম শিকার লক্ষ করে,—সে যে আহত হয়েছিল, এবং সে আঘাত এখনও তাকে ক্লেশ দিচ্ছে, এ ধারণা আমার আরও বলবৎ হয় হত্যাকান্ডগুলির মধ্যে লম্বা সময়ের ব্যবধান লক্ষ করে, ও ক্রমেই যেভাবে তার খাওয়া কমে আসছিল তা প্রত্যক্ষ করে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আঘাতটা এসেছিল তার কোনো মড়ি থেকেই, এবং এই কারণেই সে দ্বিতীয়বার কোনো মড়িতে ফিরে আসে নি। দশটা হত্যাকাণ্ডের পর তার প্রাণীহত্যা বন্ধ হয় ; এবং ও অঞ্চলে যখন কোনো বাঘ মারা হয় নি বা মৃত বাঘ পাওয়া যায় নি তখন আমার বিশ্বাস যে, কাছের পাহাড়ে যে সব অসংখ্য গুহা আছে গুড়ি মেরে তারই একটার মধ্যে গিয়ে সে আঘাত-জনিত ক্ষতে মারা পড়ে।

দৃষ্টান্তটা ব্যতিক্রম। কিন্তু পায়ের শিরা কেটে হত্যা করার আরও নজির আমার আছে। খুব বড় বড় দুটো মোষকে আমি বাঘের কবলে ওভাবে মারা পড়তে দেখেছি। প্রথমে শিরা কেটে তারপর তাকে পেড়ে ফেলে দাঁতের কামড়ে মেরে ফেলা হয়েছে।





৬

টমের দেওয়া গুলতির রবারটা নষ্ট হয়ে যেতে আমি একটা গুলি-ধনুক তৈরি করে নিলাম। তীর-ছোড়া ধনুক আর গুলি-ছোড়া ধনুকের মধ্যে তফাত হল এই যে গুলি-ছোড়া ধনুক লম্বায় ছোট, দুটো ছিলার মাঝখানে একটা চৌকো জাল বোনা থাকে যেখানে গুলিটা রেখে ছোড়া হয়। গুলি-ধনুক ছুড়তে বিশেষ অভ্যাস দরকার হয়, কারণ যে হাতে ধনুকটা ধরা থাকে সে হাতের কব্জিটা যদি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নেওয়া না হয় তাহলে সে হাতের বুড়ো আঙুল জখম হবার খুব সম্ভাবনা থাকে। গুলতির দ্বিগুণ বেগে ধনুকের গুলি ছোটে। তবে, গুলতির মত অতটা নিখুঁত নয়। নৈনিতালের কোষাগার ছিল আমাদের গ্রীষ্মকালীন আবাসের ঠিক মুখোমুখি, গুর্খা সেনা-বাহিনীর পাহারায়। গুর্খারা ছিল এই ধনুক ছোড়ায় অত্যন্ত নিপুণ, আর তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রায়ই আমার ডাক পড়ত কোষাগারের মাঠে। একটা ছোট কাঠের খুঁটি মাটিতে পোঁতা ছিল, একটা প্রকাণ্ড গোলাকার কাঁসি তাতে বাঁধা ছিল যেটা বাজিয়ে সময় জানানো হত। এই খুঁটির উপর একটা দেশলাইয়ের বাক্স রাখা হত, আর সেখান থেকে, কুড়ি গজ দূর থেকে আমার প্রতিযোগী আর আমি পালা করে একটা করে গুলি ছুড়তাম। ওদের হাবিলদার ছিল ছোটখাট মানুষটি, ষাঁড়ের মত গায়ের জোর তার : ওদের মধ্যে তারই হাত ছিল সবচেয়ে ভাল। কিন্তু কখনও সে আমায় হারাতে পারে নি. এবং এতে দর্শকরা প্রচুর আনন্দ পেত।

বাধ্য হয়েই আমায় গুলি-ধনুক ব্যবহার করতে হয়েছিল. এবং পাখি সংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট নৈপুণ্য লাভ করা সত্ত্বেও গুলতির মত অতটা ভাল

লাগে নি কখনও ; আর ফেনিমোর কুপারের পরম উত্তেজক বইগুলো পড়ার পর আমি গুলি-ধনুকের সঙ্গে একটা তীর-ছোড়া ধনুকও তৈরি করে নিলাম। কারণ, কুপারের বইয়ের রেড-ইণ্ডিয়ানরা যদি তা দিয়ে জীবজন্তু মারতে পারে, আমিই বা কেন পারব না। আমাদের অঞ্চলের লোকেরা তীর-ধনুক ব্যবহার করে না, তাই তা তৈরি করার কোনো নমুনা আমি পাই নি ; যাই হ'ক কয়েকবার চেষ্টার পর মনের মত একটা ধনুক তৈরি করা গেল ; তারপর এই ধনুক আর দুটো তীর নিয়ে (তীরদুটোয় ছুঁচলো লোহা লাগিয়ে নিয়েছিলাম) আমি এক রেড ইণ্ডিয়ানের মত বেরিয়ে পড়লাম। আমার তীরের মারণ-ক্ষমতা বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার কোনো অহেতুক উচ্চ ধারণা ছিল না। তাই আমি সন্তর্পণে এগোতে লাগলাম ; কারণ বন-মোরগ বা ময়ূর ছাড়াও আমাদের জঙ্গলে এমন অনেক প্রাণী ছিল যাদের আমি অত্যন্ত ভয় করতাম। যা শিকার করব তার কাছে অগ্রসর হবার সুবিধে হবে বলে, আর বিপদের সম্ভাবনা দেখলে গাছে আশ্রয় নিতে পারব বলে আমি জুতো ছেড়ে ফেললাম। তখনকার দিনে এখনকার মত তলায় পাতলা রবার দেওয়া জুতো পাওয়া যেত না। তাই হয় খালি পা, নয় তো শক্ত চামড়ার জুতো—এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। ওই জুতো পরে শিকারের পিছু নেওয়া বা গাছে ওঠা—কোনোটাতেই সুবিধা হল না।

দুটো জলের ধারা পাহাড়ের ধার বেয়ে এসে আমাদের চৌহদ্দির নিচের দিকটায় মিশেছে। প্রবল বৃষ্টির সময় ছাড়া অন্য সময়ে ধারাদুটি থাকত শুকনো। দুটোরই গর্ত ছিল বালিতে ভরা। এই দুই ধারার মাঝখানে নিচের দিকে প্রায় সিকি মাইল চওড়া আর উপরের দিকে প্রায় এক মাইল চওড়া যে জঙ্গল, সেখানে ছিল সমস্ত রকম শিকারের প্রাণী। যেখানে মেয়েরা স্নান করত সেটা আমাদের এলাকা আর জঙ্গলের মাঝখানে সীমারেখার সৃষ্টি করেছিল, তাই শিকারের সান্নিধ্যে আসতে হলে বা যেসব পাখি মারতে চাইতাম তাদের পেতে হলে শুধু এই খালের উপর পাতা একটা গাছ ডিঙিয়ে গেলেই হল। পরবর্তী জীবনে যখন আমার সিনেমা তোলার ক্যামেরা হয়েছিল, এই খালের আমাদের এলাকার দিকের একটা গাছে উঠে কতদিন কাটিয়েছি খালে জল খেতে আসা বাঘের ছবি তুলব বলে। এই জঙ্গলেই আমি আমার শেষ বাঘ শিকার করেছি হিটলারের যুদ্ধের অবসানে ফৌজ থেকে ছাড়া পেয়ে এসে। এই বাঘটা বিভিন্ন সময়ে একটা ঘোড়া, একটা বাছুর আর দুটো বলদ মেরেছিল এবং তাকে তাড়াবার সমস্ত চেষ্টা বিফল হতে আমি তাকে মেরেছি। আমার বোন ম্যাগির সন্দেহ ছিল আমি স্থির হাতে রাইফেল ধরতে পারব কি না। তার ভয় ছিল, নানা জঙ্গলে সংক্রমিত নানা রকম ম্যালেরিয়া জ্বরে আমার হাত বুঝি দুর্বল হয়ে পড়েছে। যাই হ'ক, সম্পূর্ণ যাতে নিশ্চিন্ত

হতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আমি বাঘটাকে বিচারে আহবান করলাম, তাকে দোষী সাব্যস্ত করে মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে তার চোখে গুলি করলাম। সে তখন আমার দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। এ যে হত্যাকাণ্ড তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ হত্যাকাণ্ডের সপক্ষে যুক্তি আছে। গ্রাম থেকে দুশো গজ দূরে যে ল্যান্টানার ঘন ঝোপটা সে নিজের আবাস বলে বেছে নিয়েছে বাঘটাকে সেখানে বাস করতে দিতে আমার আপত্তি ছিল না। যত প্রাণী সে বধ করেছে আমিই তাদের জন্যে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু যুদ্ধের ফলে সারা দেশে এইসব গৃহপালিত পশুর সংখ্যাল্পতার কথা চিন্তা করে আমায় এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, বিশেষ করে যখন দেখা গেল যে তাকে তাড়াবার সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হচ্ছে।

দুই জলধারার মধ্যবর্তী জঙ্গলটা আমি আর ম্যাগগ খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোঁজ করে দেখেছি ; আমি তাই জানতাম কোন্-কোন্ অঞ্চল এড়িয়ে চলতে হবে। এমনকি পড়ে-থাকা গাছটা ধরে খাল পার হয়ে বন-মোরগ আর ময়ূর শিকারে যাওয়াও নিরাপদ মনে করি নি যতক্ষণ না আমি নিশ্চিত হয়েছি যে কোনো বাঘ এ এলাকায় নেই। নিশ্চিত হতে পেরেছি জলধারার বাঁ-দিকের জঙ্গলটা পরীক্ষা করে। যে-সব বাঘ এখানে আসত, সবাই আসত সূর্যাস্তের সময়টায় কেবলমাত্র পশ্চিম দিক থেকে। আর, শিকার না পেলে যে গহন জঙ্গল থেকে এসেছিল সূর্যোদয়ের আগেই সেখানে ফিরে যেত। এই জলধারার শুকনো বালি খাত পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যেত এই খাত পেরিয়ে কোনো বাঘ জঙ্গলে ঢুকেছে কিনা (ওই জঙ্গলটাকে আমি মনে করতাম একান্তই আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি), এবং ঢুকে থাকলে সেখানেই রয়ে গেছে না চলে গেছে। পায়ের দাগ দেখে যখন কেবল যাওয়ারই প্রমাণ পেতাম, ফেরার চিহ্ন দেখতাম না, তখন জঙ্গল পরিহার করে অন্যত্র পাখির খোঁজে যেতাম।

এই জলধারার প্রতি আমার আকর্ষণের অন্ত ছিল না। কারণ শুধু তো বাঘ নয়, দু-দিকের বহু মাইলব্যাপী জঙ্গলে যত জন্তু যত সরীসৃপ এর উপর দিয়ে যেত, যে চিহ্ন তারা রেখে যেত ফোটোগ্রাফের মতই তা ছিল আমার কাছে স্পষ্ট। এইখানেই আমি প্রথমে গুলতি, তার পরে ধনুক, তার পরে গাদা-বন্দুক আর সব-শেষে আধুনিক রাইফেল নিয়ে একটু একটু করে জঙ্গলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকি। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি, খালি পায়ে এগোতে থাকি নিঃশব্দে। যত জীবজন্তু যত সরীসৃপ এই জলধারা পার হত, তাদের সকলকেই কোনো না কোনো দিন দেখেছি। শেষে আমি পায়ের চিহ্ন দেখেই কোন্ প্রাণী গেছে তা বলে দিতে পারতাম। এইভাবেই শুরু হয়েছিল, কারণ জীবজন্তুর অভ্যাস, তাদের ভাষা, প্রকৃতির পরিকল্পনায় তাদের কার কী অংশ—এ সবই তখনও আমার শেখা বাকি। এইসব চিত্তাকর্ষক ব্যাপারে জ্ঞান

সঞ্চয় করতে করতে আমি পাখিদের ভাষাও শিখতে শুরু করলাম। বিশ্ব প্রকৃতির উদ্যানে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধেও আমার ধারণা হতে লাগল।

প্রথমে আমি পাখি এবং জন্তু ও সরীসৃপদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ফেললাম। শুরু করলাম পাখিদের দিয়ে। ছ-টা ভাগে ভাগ করলাম তাদের :

(ক) যে-সব পাখি প্রকৃতির উদ্যানকে সুন্দর করে তোলে। এই ভাগে হল : সাতসতী, ওরিওল সানবার্ড প্রভৃতি।

(খ) যে-সব পাখি তাদের গানে এই উদ্যান মুখর করে তোলে : দামা, দোয়েল, শ্যামা।

(গ) যে-সব পাখি এই উদ্যানকে নতুন করে গড়ে তোলে : বসন্তবাউরি, ধনেশ, বুলবুল।

(ঘ) যে-সব পাখি বিপদের সংকেত জানায় : ফিঙে, লাল বন-মোরগ, ছাতারে।

(ঙ) যে-সব পাখি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে : ঈগল, বাজপাখি, পেঁচা।

(চ) যে-সব পাখি মুর্দাফরাসের কর্তব্য করে : শকুনি, চিল, কাক।

জন্তুদের ভাগ করলাম পাঁচ ভাগে :

(ছ) যে-সব জন্তু প্রকৃতির উদ্যানকে সুন্দর করে তোলে : হরিণ, কৃষ্ণসার, বানর।

(জ) যে-সব জন্তু মাটি খুঁড়ে তাকে বাতান্বিত করে এই উদ্যানকে নতুন করে গড়ে তোলে : ভাল্লুক, শুয়োর, শজারু।

(ঝ) যে-সব জন্তু বিপদের সংকেত করে : হরিণ, বানর, কাঠবিড়ালি।

(ঞ) যে-সব জন্তু প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে : বাঘ, চিতা, বন-কুত্তা।

(ট) যে-সব জন্তু মুর্দাফরাসের কাজ করে : হায়েনা, শেয়াল, শুয়োর।

সরীসৃপদের আমি দুই ভাগে ভাগ করলাম :

(ঠ) যে-সব সাপ বিষাক্ত তাদের এই দলে ফেললাম : কেউটে, চন্দ্রবোড়া, কিরাইত ইত্যাদি।

(ড) যে-সব সাপ বিষাক্ত নয় : ময়াল, ঢ্যামনা ইত্যাদি।

প্রধান প্রাণীদের কাজের প্রকৃতি অনুসারে এভাবে ভাগ করবার পর জঙ্গলের অন্য যেসব প্রাণী একই ধরনের কাজ করত, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারাও ক্রমশ যথোপযুক্ত তালিকাভুক্ত হল। এর পরের কাজ হল এইসব জঙ্গলের বাসিন্দাদের ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়া আর যে সব পাখির বা জন্তুর ডাক অনুকরণ করা মানুষের ঠোঁটে আর গলায় সম্ভব তা শেখা। প্রতিটি পাখির ও জন্তুর নিজস্ব ভাষা আছে, এবং—সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম

বাদ দিলে—এক জাতের প্রাণী অন্য জাতের ভাষায় কথা কইতে না পারলেও জঙ্গলের সমস্ত প্রাণীই পরস্পরের ভাষা বোঝে। ব্যতিক্রমের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তিনটি : ভিমরাজ, লালচে পিঠ শ্রাইক (শিকারী পাখি-বিশেষ) আর হরবোলা। পাখি-প্রেমিকদের কাছে ভিমরাজ হল প্রচুর আনন্দ ও কৌতূহলের উৎস। ভিমরাজ যে কেবল আমাদের জঙ্গলের সবচেয়ে দুঃসাহসী পাখি তাই নয়, অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সে সমস্ত পাখির, এবং জন্তুর মধ্যে চিতল হরিণের ডাক অনুকরণ করতে পারে। তা ছাড়া রসিকতায়ও তার জুড়ি নেই। বন-মোরগ বা ছাতারে বা দামা, যারা মাটিতে ঠুকরে খায় তাদের সঙ্গে মিশে কোনো মরা ডালের উপর বসে সে নিজের আর অন্য পাখিদের গানে বন মাতিয়ে তোলে আর সেইসঙ্গে বহু দূর পর্যন্ত বাজপাখি, বেড়াল, সাপ কিংবা গুলতি-হাতে ছোট ছোট ছেলে, এইসব শত্রুদের উপর লক্ষ রাখে, এবং তার বিপদ-সংকেত কোনো পাখি অবহেলা করে না। এর পুরস্কার-স্বরূপ, যাদের সে পাহারা দেয় তাদের কাছে সে খাবারের যোগান আশা করে থাকে। কিছুই তার তীক্ষ্ন চোখ এড়াতে পারে না। যে-মুহূর্তে সে দেখে কোনো পাখি তার নিচে শুকনো পাতার রাশি সরাতে সরাতে কোনো পুরুষ্টু শতপদী বা সরস বিছে আবিষ্কার করেছে, চিৎকার করতে করতে সে বাজপাখির মত তীরবেগে নেমে আসে কিংবা যে পাখির কবল থেকে সে সেটা ছিনিয়ে নিতে চায়, বাজপাখি ধরলে সে যেমন করে চেঁচিয়ে ওঠে তেমনি করে চেঁচিয়ে ওঠে। এবং দশ বারের মধ্যে ন-বার সে তা ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে তাকে মেরে ফেলে অবসর-মত খেয়ে ফেলে। খাওয়া সেরে আবার তার গান শুরু করে।

ভিমরাজের আবার চিতল হরিণের সান্নিধ্যেও দেখা মেলে। উচ্চিংড়ে বা অন্য যে-সব পোকা হরিণের উপস্থিতিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে তাদের খেতে থাকে সে। হয়তো একটা চিতল কোনো বাঘ বা চিতা দেখে সতর্কধ্বনি করে উঠল, ভিমরাজ সেই ডাক শিখে নিয়ে নিখুঁতভাবে অনুকরণ করে। একবার আমার উপস্থিতিতেই একটা চিতা একটা এক-বছর-বয়স্ক চিতলকে মারে। চিতাটাকে কয়েকশো গজ দূরে তাড়িয়ে দিয়ে আমি সেই মড়িটার কাছে গেলাম। তারপর একটা ছোট ঝোপ থেকে খানিকটা লতা নিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখলাম সেটাকে। কাছে-পিঠে উপযুক্ত কোনো গাছ না থাকায় একটা ঝোপের দিকে পেছন করে বসলাম সিনেমা তোলার ক্যামেরাটা কোলের কাছে নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এল একটা ভিমরাজ আর তার সঙ্গে একঝাঁক সাদা-গলা পেঙা। মড়িটা চোখে পড়তে ভিমরাজটা সেটাকে ভাল করে দেখবে বলে কাছে এগিয়ে আসতে আমায় দেখতে পেল। মড়ি দেখতে সে অভ্যস্ত কিন্তু আমার উপস্থিতিতে ঘাবড়ে গেল সে। যাই হ'ক যখন সে বুঝল যে

আমি কোনো বিপজ্জনক প্রাণী নই, সে তার সংগীদের কাছে উড়ে গেল—তারা মাটিতে বসে কিচির-মিচির করে চলেছিল। পাখিগুলো ছিল আমার বাঁ-দিকে। আমি আশা করছিলাম যে চিতাটা আমার ডান দিক থেকে আসবে, এমন সময় ভিমরাজটা চিতল হরিণের সতর্কধ্বনি ডেকে উঠল, আর সে ডাক শুনেই সাদা-গলা পাখিগুলো—সংখ্যায় তারা পঞ্চাশটার কম নয়—একসংগে উড়ে চিৎকার করতে করতে উপরের গাছগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ল আর সেখান থেকে সতর্কধ্বনি ডাকতে শুরু করল। ভিমরাজটাকে লক্ষ করে আমি অদৃশ্য চিতাটার সমস্ত গতিবিধিই আন্দাজ করতে পারছিলাম। পাখিগুলোর চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে চিতাটা ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এসে পেঁছিল ঠিক আমার পেছনে। যে ঝোপটার সামনে আমি বসে ছিলাম তাতে প্রায় পাতা ছিল না বললেই হয়, তাই আমায় দেখতে পেয়েই চিতাটা নিচু গলায় একটা গর্জন তুলে জংগলের মধ্যে চলে গেল। আর ভিমরাজটা চলল তার পিছু-পিছু। ভিমরাজটা তখন ব্যাপারটায় খুব মজা পাচ্ছে। যেভাবে সে চিতল হরিণের ডাক ডাকতে ডাকতে চলেছিল তা যুগপৎ আমার বিস্ময় ও ঈর্ষা জাগ্রত করল, কারণ একটা বিশেষ ডাকে যদি বা আমি তার সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতাম, চিতলের বিভিন্ন বয়সের ডাকের যে পার্থক্য সে এত দ্রুত ও এত স্বচ্ছন্দে অনুকরণ করে চলেছিল আমার পক্ষে তা ছিল অসম্ভব।

ক্যামেরা নিয়ে জায়গা ঠিক করে দাঁড়াচ্ছি, আর ভাবছি, চিতাটা মড়িতে ফিরে আসার মুহূর্তেই আমায় দেখতে পাবে। আমি আশা করছিলাম মড়িটা যখন সে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে আমি তখনই ছবি তুলব। ভিমরাজটার লক্ষ এড়িয়ে চিতাটা দ্বিতীয়বার ফিরে এল। আমার উপস্থিতিতে এবং ক্যামেরার শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করে প্রচণ্ড গর্জন করলেও আমি কুড়ি গজ দূরে থেকে তার ছবি তুললাম। যে লতা দিয়ে মড়িটা বেঁধে রেখেছিলাম সেটা ছিঁড়ে শিকারকে নিয়ে যাবার জন্যে সে যে টানাটানি করেছিল পঞ্চাশ ফুট ধরে তার ছবি তুললাম।

ভিমরাজদের কথা কইতে শেখানো যায় কি না আমি জানি না, তবে, তারা যে শিস দিয়ে সুর ভাঁজতে পারে সে পরিচয় আমি পেয়েছি। কয়েক বছর আগে বেংগল অ্যান্ড নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের (এখন যার নাম আউধ-ত্রিহুত রেলওয়ে) মান্‌কাপুর স্টেশনের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্টেশন-মাস্টার ভিমরাজ আর শ্যামা পাখিদের গানের সুরে শিস দিতে শিখিয়ে দিব্যি আয় বাড়াতেন। জংশন স্টেশনটায় গাড়ি প্রাতরাশের জন্যে থামলে প্রায়ই দেখা যেত যাত্রীরা স্টেশন-মাস্টারের বাংলোর দিকে ছুটছে পাখির গান শুনতে আর ফিরছে খাঁচায় করে একটা পাখি নিয়ে, যে পাখি তাদের সবচেয়ে প্রিয় গান শিস দিয়ে গাইতে পারে। এই পাখি, আর একটা রঙবাহার খাঁচার জন্যে স্টেশন-মাস্টার নিতেন ত্রিশ টাকা করে।



৭

প্রকৃতির শিক্ষার শুরুও নেই শেষও নেই এ কথা বলে আমি কখনই এ দাবি করতে পারি না যে এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যা কিছু শেখবার সব আমি শিখেছি কিংবা এ বই কোনো বিশেষজ্ঞের লেখা। তবে জীবনের এতগুলো দিন প্রকৃতির সঙ্গে কাটিয়ে আর জঙ্গলের জ্ঞান আহরণ অবসরের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করে যে সামান্য জ্ঞান আমি অর্জন করেছি তাই আমি নিঃশেষে তুলে ধরছি। এ অহঙ্কারও আমার নেই যে পাঠক আমার সিদ্ধান্ত আর বক্তব্য মেনে নেবেন। কিন্তু তা-বলে সেজন্যে যে কোনো কলহের সম্ভাবনা আছে তা নয়, কারণ কোনো দু-জন মানুষ কখনো কোনো বিষয়কে ঠিক এক চোখে দেখে না। মনে করুন তিনজন লোক একটা গোলাপ ফুল দেখছে। একজন দেখবে তার রঙটা শুধু, একজন হয়তো শুধু আকৃতিটা, আর একজন হয়তো দেখবে তার রঙ আর আকৃতি দুই-ই। তিনজনেই যা দেখতে চেয়েছিল তাই দেখেছে, এবং তিনজনের কারুরই দেখায় ভুল হয় নি। যুক্ত-প্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোনো আলোচ্য বিষয়ে আমার মতান্তর হওয়ায় তিনি বলেছিলেন, 'এ বিষয়ে আমরা আমাদের মতান্তর মেনে নিয়েও বন্ধুভাবে থাকতে পারি।' তাই বলছি, কোনো পাঠক যদি কোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত না হন, তবুও মুখ্যমন্ত্রী মশায়ের উপদেশ শিরোধার্য করে বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন রাখা যাক।

যে-সব জন্তু বালিখাতে প্রায় একই রকম পায়ের দাগ রেখে যেত, প্রথমটা আমার তাদের পার্থক্য বুঝতে বেশ অসুবিধে হত। যে-সব অল্পবয়সী সম্বর

ও অল্পবয়সী নীলগাইয়ের খুরের ছাপের সঙ্গে বড় শুয়োরের খুরের ছাপের মিল প্রচুর, জলপথ পার হবার সময় তাদের লক্ষ করে আর তাদের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে একবার তাকিয়েই আমি শুয়োরের খুরের ছাপের সঙ্গে অন্য যে-কোনো দ্বিধা-বিভক্ত-খুর-বিশিষ্ট জন্তুর পায়ের ছাপের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারছি। হরিণদের মত শুয়োরদেরও প্রধান খুরের পেছনে অবর্ধিত খুর থাকে, কিন্তু এই অবর্ধিত খুর হরিণের চেয়ে শুয়োরের বেশি লম্বা হয়ে থাকে এবং শক্ত মাটির উপর চলার সময় ছাড়া অন্য সময়ে এই অবর্ধিত খুরের ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু হরিণের বেলায় এই অবর্ধিত খুরের ছাপ তখনই মাত্র দেখা যায় যখন প্রধান খুরগুলো নরম মাটিতে বসে গেছে। অনভিজ্ঞের চোখে বাঘের বাচ্চার থাবার ছাপ আর চিতার থাবার ছাপের পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে না যখন ওরা এক রকম মাটিতে চলাফেরা করে। এই পার্থক্য ধরা পড়ে পায়ের আঙুলের ছাপ দেখে। কারণ বাঘের বাচ্চার পায়ের আঙুল চিতার চেয়ে অনেক, অনেক বড়।

হায়েনার আর বন-কুত্তার থাবার ছাপের সঙ্গে চিতার থাবার ছাপ প্রায়ই গুলিয়ে যায়। এক্ষেত্রে সন্দেহ জাগলে দুটো মৌলিক নিয়ম প্রয়োগ করা যেতে পারে :

(ক) যে-সব জন্তু তাড়া করে শিকার ধরে তাদের পায়ের পাতার তুলনায় পায়ের আঙুল বড়। আর যারা গুঁড়ি মেরে শিকার করে তাদের পায়ের পাতার তুলনায় আঙুল ছোট।

(খ) যে-সব জন্তু তাড়া করে শিকার ধরে তাদের পায়ের নখের ছাপ দেখা যায়। এবং (ভয়-পাওয়া অবস্থায় অথবা লাফাতে যাবে এমন অবস্থায় ছাড়া) আর যে-সব জন্তু গুঁড়ি মেরে শিকার করে তাদের নখের ছাপ দেখা যায় না।

বাড়ির কুকুর আর বেড়ালের থাবার ছাপ পরীক্ষা করলে বুঝবেন, প্রথমটির বেলায় বড় আঙুল আর ছোট পায়ের পাতা, আর পরেরটির বেলায় ছোট আঙুল আর বড় পায়ের পাতা বলতে আমি কী বুঝি।

যেখানে সাপ প্রচুর সে অঞ্চলে বাস করতে হলে সাপের চলার চিহ্ন দেখে জানতে হয় সাপটা কোন্ দিকে গেছে,—অন্তত মোটামুটি নির্ভুলভাবে বুঝতে পারা চাই সাপটা বিষাক্ত কি না। সাপটা কত মোটা তাও তার চলার পথ দেখে আন্দাজ করা সম্ভব। এই তিনটি বিষয় একে-একে আলোচনা করছি।

(ক) কোন্ দিকে গেছে। ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এমন একটা জমি কল্পনা করুন যেখানে ছ-ইঞ্চি উঁচু লুসের্ন গাছ ঘনসন্নিবদ্ধ রয়েছে। এই জমির উপর ডান দিক থেকে বাঁ দিকে রোলার চালিয়ে গেলে লক্ষ করবেন, রোলারটা যেদিকে গেছে গাছগুলো সেদিকেই হেলে

মাটিতে শুয়ে পড়েছে ; সুতরাং রোলার চালানোর সময় উপস্থিত না থাকলেও আপনি সহজেই বুঝবেন যে রোলারটা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চালানো হয়েছে। আপনার চোখের দৃষ্টি যদি খুব ভাল না হয় তাহলে আতস কাঁচ নিয়ে খানিকটা বালি বা ধুলো ভাল করে লক্ষ করলে দেখবেন যে, এই বালি আর ধুলোর কণাই অন্যান্য বস্তুর কণার উপরে উঠে রয়েছে। এই উঁচু কণাগুলোকে বলা যাক 'পাইল'। কোনো সাপ যখন বালি বা ধুলোর উপর দিয়ে চলে যায় এই পাইল তখন সাপটা যেদিকে চলে গেছে সেদিকে কাত হয়ে পড়ে, রোলারের চাপে লুসের্নের মতই। বালি বা ধুলো বা ছাই, যার উপর দিয়ে সাপ চলে যায় সে সমস্তর উপরেই এই পাইল থাকে। সুতরাং এ কথা মনে রাখলে, সাপটা কোন্ দিকে গেছে তা হিসেব করতে আর ভুল হবে না, পাইলের চেপটে পড়া অবস্থা দেখেই তা বুঝতে পারা যাবে।

(খ) বিষাক্ত কি না। লক্ষ করে থাকবেন, আমি বলেছি কোনো সাপের চলার চিহ্ন দেখে সে সাপ বিষাক্ত কি বিষাক্ত না এ-কথা একরকম নির্ভুলভাবেই বলা যায়। সাপটা কোন্ দিকে গেছে তা নির্ণয় করার জন্য যেমন ধরাবাঁধা নিয়ম আছে, চলার পথ দেখে সাপটা কোন্ জাতের তা নির্ণয় করার তেমন কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম কিছু নেই। ভারতে তিনশোরও বেশি বিভিন্ন জাতের সাপ আছে। যদিও আমি তাদের কয়েকটির মাত্র চলার দাগ লক্ষ করেছি, তা থেকেও সাপের জাত বুঝতে যে সাধারণ নিয়ম আমি আবিষ্কার করেছি তার দুটো ব্যতিক্রম আমার চোখে পড়েছে। এই দুটো হল—বিষাক্ত সাপের মধ্যে শঙ্খচূড়, আর নির্বিষ সাপের মধ্যে পাইথন।

এই দুই ব্যতিক্রম বাদ দিলে, বিষাক্ত সাপেরা হয় শিকারের প্রতীক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকে, আর নয় তো শিকারের দিকে অলক্ষ্যে অগ্রসর হয়। তাই তাদের গতিবেগ বিশেষ দ্রুত হবার দরকার হয় না, অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতেই তারা মাটির উপর চলাফেরা করে। আস্তে চলতে গেলে সাপকে অত্যন্ত আঁকাবাঁকা গতিতে চলতে হয়। যেমন ধরুন, ভারতের সবচেয়ে মারাত্মক সাপ, চন্দ্রবোড়া বা করাইত সাপ এ-হেন একটা সাপকে যদি বালি বা ধুলোর উপর দিয়ে চলতে দেখেন, লক্ষ করবেন ছোট ছোট প্রচুর আঁকাবাঁকা রেখা রচনা করে সে চলেছে। সাপের চলা পথ লক্ষ করলও দেখা যাবে তাই। তাই, যদি আপনি দেখেন কোনো সাপ খুব আঁকাবাঁকা চিহ্ন রেখে গেছে, তাহলে একরকম নিশ্চিত হতে পারেন যে এ কোনো বিষাক্ত সাপের চিহ্ন। শঙ্খচূড়রা বলতে গেলে কেবলমাত্র অন্য জাতের সাপ খেয়েই বেঁচে থাকে : তাই তাদের ভক্ষ্যদের অনেকে দ্রুতগতি হওয়ার ফলে তাদের যে গতিবেগ হয়েছে তা নাকি ঘোড়ার গতিবেগের সমান। অবশ্য এ বিষয়ে আমি সঠিক কিছু বলতে পারব না, কারণ ঘোড়ায় চড়ে আমি কখনো এই সর্পরাজকে তাড়া করি নি, তার তাড়াও খাই

নি। এরা লম্বায় সতেরো ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। যাই হ'ক, চোদ্দ ফুট লম্বা কয়েকটা সাপ মারার পর আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে তারা দ্রুতগতি, এবং আমার ধারণা, এই গতিবেগের কারণ হল তাদের ভক্ষ্য অন্যান্য সাপের দ্রুত গতি। আমি যে ব্যতিক্রমের কথা বলেছি তা বাদ দিলে নির্বিষ সাপেরা হয় চিক্কণ-দেহ, চটপটে ও ক্ষিপ্রগতি, এবং এদের কয়েকটি—যথা, ঢ্যামনা বা কালো পাহাড়ী সাপ, অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটতে পারে। নির্বিষ সাপের ক্ষিপ্র গতির প্রয়োজন শিকার ধরার বা শত্রুকে পেছনে ফেলে পালানোর—কারণ শত্রু তাদের অসংখ্য। খুব দ্রুত বেগে চলার সময় সাপ যে চিহ্ন রেখে যায় তা প্রায় সিধে; আর যেখানে মাটি ঈষৎ অসমান সে-সব জায়গায় সাপের পেট কেবলমাত্র উঁচু জায়গাগুলোই স্পর্শ করে, নিচু জায়গায় চলার কোনো দাগ পড়ে না। তাই সাপের দাগ মোটামুটি সিধে হলে একরকম ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে দাগ নির্বিষ সাপের দাগ। একমাত্র শঙ্খচূড় সাপের দাগের সঙ্গেই নির্বিষ সাপের দাগ গুলিয়ে ফেলা সম্ভব, তবে সে সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প কারণ শঙ্খচূড় সাপ অতি বিরল, এবং কেবলমাত্র বিশেষ-বিশেষ এলাকাতেই তার দেখা মেলে।

(গ) বেড়। চলার দাগ দেখে সাপের বেড় হিসেব করতে হলে, দাগের মাপ কয়েকটা জায়গায় নিতে হবে, তারপর গড়ে যে মাপ পাওয়া যাবে তাকে চার দিয়ে গুণ করলে সাপের বেড়ের হিসেব মিলবে। এ হিসেব অবশ্য একেবারে নিখুঁত হবে না, তবে এ থেকে মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। নিখুঁত হবে না এইজন্যে যে, দাগের বেড় নির্ভর করে, অনেকাংশে যে জমির উপর দিয়ে সাপটা চলে গেছে তার উপর। যেমন ধরুন, যদি হালকা ধুলোর উপর এই দাগ পড়ে তাহলে সেই দাগ পুরু ধুলোর উপরের দাগের চেয়ে সরু হবে।

ভারতে প্রতি বছর কুড়ি হাজার মানুষ সর্পাঘাতে প্রাণ দেয়। আমার বিশ্বাস, এই কুড়ি হাজারের মাত্র অর্ধেক-সংখ্যক মানুষ সাপের বিষে মারা যায়, বাকি অর্ধেক মারা যায় নির্বিষ সাপের কামড়ে—মানসিক আঘাতে, কিংবা আতঙ্কে, অথবা এই দুটি কারণ মিলিয়ে। হাজার হাজার বছর সাপের সঙ্গে বাস করেও ভারতীয়দের সাপ সম্বন্ধে জ্ঞান আশ্চর্য সীমিত : মাত্র কয়েকটা সাপ বাদে প্রায় সমস্ত সাপকেই তারা বিষাক্ত বলে মনে করে। কোনো বড় সাপের কামড় খেলে মানুষ স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, তাই তার উপর যখন আবার তার এই ধারণা হয় যে সে সাপ বিষাক্ত সাপ এবং তার আর জীবনের কোনো আশা নেই, তখন আর এত লোকের নির্বিষ সাপের কামড়ে মারা পড়ার ব্যাপারে (অর্থাৎ আমার যা বিশ্বাস) আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ভারতের অধিকাংশ গ্রামেই কিছু লোক আছে যাদের সাপের বিষ সারাবার

ক্ষমতা আছে শোনা যায়। ভারতের মাত্র শতকরা দশ ভাগ সাপ বিষাক্ত হওয়ায় তাদের এই সুনামটা সহজেই গড়ে উঠেছে। এ-জন্যে তারা কোনো পয়সা নেয় না এবং গরিব মানুষদের মধ্যে প্রচুর ভাল কাজ করে থাকে ; এবং যদিও কোনো বিষাক্ত সাপের কামড়ে ওষুধ বা মন্ত্র কোনো কাজে লাগে না, কিন্তু নির্বিষ সাপের কামড় থেকে তারা বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে থাকে তাদের মধ্যে সাহস আর আত্মপ্রত্যয় সঞ্চার করে।

ভারতের প্রায় সমস্ত হাসপাতালে সর্পাঘাতের চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু যেহেতু গরিব মানুষের পক্ষে পায়ে হেঁটে কিংবা বন্ধুবান্ধবের কাঁধে উঠে ছাড়া যাবার উপায় নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই তারা এত দেরি করে হাসপাতালে পৌঁছয় যে তখন আর বিশেষজ্ঞের চিকিৎসায় কোনো কাজ হবার সময় থাকে না। সমস্ত হাসপাতালেই বিষাক্ত সাপের চার্ট টাঙানো থাকে। যেখানে যেখানে বিষাক্ত সাপ মারলে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় সে-সব জায়গা ছাড়া অন্যত্র এ চার্টের কোনো মূল্যই নেই, কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খালি-পা মানুষ রাত্রিকালে সাপের কামড় খেয়ে থাকে, ফলে যে সাপ কামড়াল তাকে দেখবার সুযোগ পায় না। তা ছাড়া একটা অদ্ভুত ধারণা মানুষের মধ্যে বহুল পরিমাণে রয়ে গেছে যে, যে সাপ কামড়েছে তাকে যদি সে মানুষ মেরে ফেলে তাহলে সেই সাপও তাকে মেরে ফেলে। এর ফলে সর্পাহত ব্যক্তি প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই, যে সাপ তাকে কামড়েছে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে না, আর ফলে ডাক্তাররাও বুঝতে পারে না সে সাপ বিষাক্ত না নির্বিষ।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ জাগলে আমি প্রথমে সাপটাকে মেরে ফেলি, তারপর তার মুখটা পরীক্ষা করে দেখি। যদি দেখি তার দু-সারি দাঁত আছে তাহলে বুঝতে পারি যে সে নির্বিষ। আর যদি দেখি উপরের চোয়ালে দুটো দাঁত (এ দুটো থাকে চন্দ্রবোড়া গোষ্ঠীর মত ভাঁজ করা বা গোক্ষুর গোষ্ঠীর মত শক্ত করে বসানো), তখন বুঝি যে সে সাপ বিষাক্ত। প্রথমোক্ত সাপে কামড়ালে অনেকগুলো দাঁতের দাগ দেখা যায়, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর সাপের কামড়ে মাত্র দুটো, এবং কখনো কখনো একটা কামড়ের দাগ দেখা যায় —এটা ঘটে, যখন সাপটা যাকে কামড়ায় তার সঙ্গে সমকোণে না থাকে কিংবা যে জায়গায় কামড়েছে, একটা হাতের আঙুলে বা পায়ের আঙুলে, তা বেজায় ছোট হওয়ায় দুটো দাঁত একসঙ্গে বসানোর জায়গা পায় নি।



৮

জঙ্গলের প্রাণীদের ডাকের ভাষা শেখা যেমন আমার পক্ষে কঠিন হয় নি তেমনি কোনো-কোনো পাখির বা জন্তুর ডাক অনুসরণ করাও আমার পক্ষে কঠিন হয় নি, কারণ আমার শ্রবণ-শক্তি ভাল ছিল, আর বয়স কম থাকায় গলার স্বর-নিঃসরক অংশগুলি নমনীয় ছিল। শুধু ডাক শেখা বা প্রতিটি প্রাণীর ডাক শুনে তা ঠিকমত চিনতে পারাই যথেষ্ট নয়, কারণ যে-সব পাখির কাজ হল সুরঝঙ্কারে প্রকৃতির কানন পূর্ণ করা তারা ছাড়া আর কোনো প্রাণীই বিনা কারণে ডাকে না, এবং সে ডাক প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

একদিন আমি একটা গাছে বসে খোলা জায়গায় একপাল চিতল হরিণকে লক্ষ করছিলাম। পালে ছিল পনেরটা হরিণ হরিণী, আর প্রায় এক বয়সের পাঁচটা হরিণ-শিশু। একটা বাচ্চা রোদে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, সেটা দাঁড়িয়ে উঠল ; তারপর শরীরটা লম্বা করে, চার পা তুলে দৌড়তে-দৌড়তে গেল একটা পড়ে-থাকা গাছের কাছে। বাকি হরিণ শিশুগুলি বুঝে নিয়েছে, যে সে তার সঙ্গীদের ইঙ্গিত করছে দৌড়োদৌড়ি খেলায় তার সঙ্গে যোগ দিতে। পাঁচটা বাচ্চাই লাফাতে লাফাতে বেমালুম গাছটা ডিঙিয়ে চলে গেল, তারপর খানিকটা পাক খেয়ে, খানিকটা দৌড়ে আবার এসে গাছটা ডিঙিয়ে পার হল। এই দ্বিতীয় লাফের পর দলের সর্দার জঙ্গলের দিকে চলল, আর বাকি সকলে চলল তার পিছু-পিছু। একটা হরিণী শুয়ে ছিল, সে এবার উঠে দাঁড়াল। তারপর বাচ্চাগুলো যেদিকে গেছে সেদিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ম চিৎকার করে উঠল। চিৎকার শুনে পলাতক বাচ্চারা আবার ফিরে এল ছুটতে ছুটতে। দলের বড়-বড় প্রাণীদের সেই চিৎকারে এতটুকু বিচলিত করল না, তারা তেমনি শুয়ে রইল নয় তো ঘাস চিবিয়ে চলল। এই ফাঁকা জায়গাটার কাছ দিয়েই

কাঠুরেদের একটা পায়ে-চলা পথ চলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল একজন লোক কুড়ুল কাঁধে সেই পথ ধরে আসছে। আমার উঁচু জায়গা থেকে আমি অনেক দূর থেকেই তাকে দেখতে পেয়েছিলাম, কারণ যেদিক থেকে সে আসছিল সেদিকে জঙ্গল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। খোলা জায়গাটার শ-খানেক গজের মধ্যে এসে পড়তেই একটা হরিণী তাকে দেখতে পেল। অমনি একটা তীক্ষ্ন চিৎকার উঠল এবং একটুও ইতস্তত না করে সমস্ত দলটা সবেগে ঘন ঝোপের আড়ালে ছুটে গেল।

উদ্বিগ্ন মায়ের বাচ্চাকে ফিরিয়ে আনার ডাক আর হরিণটা সাবধানী ডাক আমার অনভিজ্ঞ কানে অবিকল একই রকম মনে হয়েছিল। অনেক অভিজ্ঞতা লাভের পর পরবর্তীকালে আমি বুঝেছিলাম যে বিভিন্ন জন্তু বা পাখি যখন বিভিন্ন তাগিদে ভিন্নভাবে ডাকে, সেই ভিন্নতা কেবল ডাক থেকে বোঝা যায় না, ডাকে স্বরের উত্থান পতন লক্ষ করতে হয়। কুকুরের ডাক শুনে আমরা বুঝতে পারি, কখন সে তার মনিবকে স্বাগত জানাচ্ছে, কখনো দৌড়তে নিয়ে যাওয়ায় প্রবল উত্তেজনায়, কখনো কোনো তাড়া-খাওয়া বেড়াল গাছে উঠে পড়লে ব্যর্থ আক্রোশে, কখনো অজানা মানুষ দেখে রাগে, কখনো বা স্রেফ বেঁধে রাখা হয়েছে বলে। প্রতি ক্ষেত্রেই তার ডাকে স্বরভঙ্গি থেকেই আমরা বুঝি কখন কী কারণে সে ডাকছে।

যখন আমার অভিজ্ঞতা এমন স্তরে এসে পৌঁছল যে জঙ্গলের সমস্ত প্রাণীকে তাদের ডাক শুনে চিনতে পারি, সে ডাকের কারণ বুঝতে পারি এবং তাদের অনেকের ডাকই এমন নিখুঁতভাবে অনুকরণ করতে পারি যে তা শুনে কিছু পাখি বা কিছু পশু আমার কাছে চলে আসে বা আমার পিছু পিছু চলে, জঙ্গলের প্রতি তখন এক নতুন আকর্ষণ আমার মধ্যে জাগল, কারণ তখন আর কেবলমাত্র বনের যেটুকু চোখে দেখছি সেটুকুই নয়, আমার শ্রবণ-শক্তির সীমা পর্যন্ত আমি জঙ্গলকে উপলব্ধি করতে পারি। প্রথমেই কিন্তু দরকার, শব্দ কোথা থেকে আসছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা। যে-সব প্রাণীর আতঙ্কের মধ্যে দিন রাত কাটে, শব্দের উৎস নির্ণয়ে তাদের এক চুল ভুল হয় না এবং ভয়ের মধ্যে মানুষও তা শিখে ফেলে। যে সব আওয়াজ বনের প্রাণী বার-বার করে—এই যেমন কোনো হনুমানের চিতা দেখে কিংবা কোনো চিতলের সন্দেহজনক কোনো নড়াচড়ার আভাস পেয়ে অথবা কোনো ময়ূরের বাঘের সাড়া পেয়ে ডেকে ওঠা—এই শব্দগুলো কোথা থেকে আসছে তা আন্দাজ করা শক্ত নয়,—তা ছাড়া এমন কোনো বিপদের সংকেত সেগুলো নয় যে-জন্যে তক্ষুনি ব্যবস্থা করতে হবে। যে শব্দ মাত্র একবার শোনা যায়—যথা, কোনো ডালপালা ভাঙার শব্দ, কোনো চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন, অথবা কোনো পশু বা পাখির একটি-মাত্র সাবধানী ডাক যেটা ঠিক কোথা থেকে আসছে আন্দাজ করা কঠিন, সেটাই

সাক্ষাৎ বিপদের পূর্বাভাস,—তখন সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতার প্রয়োজন। অনেকটা প্রাণের দায়েই আমাকে শব্দের উৎস নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা শিখতে হয়েছিল, অর্থাৎ ঠিক কোন্ দিক থেকে আর কতটা দূর থেকে শব্দ আসছে তা আন্দাজ করতে শিখেছিলাম। আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারতাম বাঘ বা চিতা কোথায় অলক্ষ্যে কি-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দিনের বেলা জঙ্গলের মধ্যে আর রাতে বিছানায় শুয়েই হ'ক,—কারণ আমাদের বাড়িটার এমন জায়গায় অবস্থিতি যেখান থেকে জঙ্গলের সমস্ত শব্দ কানে আসে।

স্টীভেন ডীজকে আমি যে-সব পাখি সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম তার প্রতিদান হিসেবে তিনি পূর্বোল্লিখিত বন্দুকটা আমায় দিয়েছিলেন। এটা একটা দোনলা গাদা বন্দুক। নতুন অবস্থায় বন্দুকটা নিশ্চয় ভালই ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত বারুদ গাদা হয়ে পরবর্তীকালে ওটার একটা নল ফেটে, উপযোগিতা অর্ধেক হয়ে গেছে। বিস্ফোরণের ফলে স্টকটাও গেছে ভেঙে। স্টীভেনের কাছ থেকে যখন এটা পাই নলদুটো তখন স্টক-এর সঙ্গে তামার তার দিয়ে কোনো রকমে বাঁধা ছিল। যাই হ'ক, আমার বন্ধু চোরা-শিকারী কুঁয়ার সিং বললে যে বাঁ নলটা ভালই আছে আর তাতেই দিব্যি কাজ চলবে। তার এই ভবিষ্যদ্-বাণী পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, কারণ দু-দুটো শীতকাল আমি ওই বন্দুকটার সাহায্যেই সুবৃহৎ সংসারের সকলের মত বন-মোরগ আর ময়ূর শিকার করেছিলাম এবং এক স্মরণীয় উপলক্ষে একটা চিতল হরিণের এতটা কাছে গিয়ে পড়েছিলাম যে সেখান থেকে চার নম্বর গুলিতেই তাকে শিকার করেছিলাম।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এই গাদাবন্দুক দিয়ে যত পাখি আমি শিকার করেছি সবই বসা অবস্থায়। গুলি-বারুদ ছিল দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং লক্ষ রাখতে হত একটা গুলিও যাতে বিফল না হয়। কোনোদিন সকালে বা বিকেলে দুটো কি তিনটে গুলি ব্যবহার করে থাকলে দুটো কি তিনটে পাখিই নিয়ে ফিরেছি, এবং অন্য কোনো ভঙ্গিতে পাখি মেরেই আমি এতটা তৃপ্তি পেতাম না।

দুই জলধারার মধ্যবর্তী জঙ্গলের উত্তর প্রান্তে যে পাদশৈলের কথা আগে বলেছি, একদিন সন্ধ্যায় আমি সেখান থেকে ফিরছি। কয়েক সপ্তাহ ধরেই আবহাওয়া খুব শুকনো ছিল, ফলে গুঁড়ি মেরে এগোনো কষ্টকর হয়ে উঠেছিল এবং যখন আমি গুলি-বারুদের থলেয় করে একটা কালিজ আর একটা বন-মোরগ নিয়ে ফেরার পথ ধরেছি তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দরিপথে কালিজটাকে গুলি করেছিলাম সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে নীলচে কালো রঙের একটা মেঘ পশ্চিমের পাহাড়ের উপর দেখা দিল। মেঘটা ছিল ভয়াল, বিশেষ করে কিছুদিন থেকেই যে শুকনো আবহাওয়া চলেছে আর তার উপর আজ সারাটা দিন যে-রকম একটুও বাতাস নেই, তাতে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। পাদ-

শৈল অঞ্চলের মানুষ আর পশু উভয়েই শিলাবৃষ্টিকে ভয় করে, কারণ মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সিকি মাইল থেকে দশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত যে-কোনো আকারের চাষের এলাকা একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং তখন ফাঁকা জায়গায় পড়লে ছেলে-মেয়ে গরু-ভেড়া প্রাণে মারা পড়তে পারে। শিলাবৃষ্টিতে কোনো বন্য জন্তু মরতে দেখি নি বটে, কিন্তু অসংখ্য পাখির মৃতদেহ ইতস্তত ছড়ানো দেখেছি,—তাদের মধ্যে শকুন ও ময়ূরও দেখেছি। আমাকে তখনও আরও তিন মাইল যেতে হবে, কিন্তু সোজা পথ ধরে, জীবজন্তুর পায়ে চলা ঘোরানো পথগুলো কোনাকুনি পার হয়ে সে দূরত্ব আধমাইলটাক কমিয়ে আনা সম্ভব ছিল। আমার সামনে সেই নীলচে-কালো মেঘ তখন ক্রমশ এগিয়ে আসছে, বিদ্যুতের ঝলক সামনে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে। সমস্ত জন্তু, সমস্ত পাখি এখন নীরব নিস্তব্ধ,—একমাত্র শব্দ যা শুনতে পাচ্ছি সে হল দূর থেকে বাজের গুরু-গুরু আওয়াজ। মোটা মোটা গাছের এক ঘন সারির মধ্যে ঢুকতে সেই শব্দ আমার কানে এল। ঘন পাতার সামিয়ানার নিচে তখন আলো কমে এসেছে। সাবধানে পা ফেলে ফেলে ছুটছি খালি পায়ে, আর কানে শুনছি শিলাবৃষ্টি শুরু হবার আগে যে হাওয়া ওঠে তার শব্দ। বড় বড় গাছগুলোর মাঝামাঝি যেতে-না-যেতেই ঝড়টা এসে গেল, খটখটে শুকনো সমস্ত পাতা পাক খেতে খেতে উড়তে লাগল,—শব্দ হতে লাগল কোনো জলের প্রবল স্রোত হঠাৎ ছাড়া পেলে যেমন শব্দ হয় তেমনি। আর সেই মুহূর্তে আমার কানে এল ড্যান্‌সির বন্‌শীর এক চিৎকার। এ যে ড্যান্‌সির বন্‌শীর তাতে সন্দেহ নেই। আস্তে শুরু হয়ে তা ক্রমে অত্যন্ত ভয়াল হয়ে উঠল, তারপর ক্রমশ কমে আসতে আসতে অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মত শোনাতে লাগল। এক একটা শব্দ আছে যা শুনে মানুষ নিথর হয়ে যায়; আরেক জাতের শব্দ আছে যা মানুষকে তৎক্ষণাৎ তৎপর করে তোলে। এই চিৎকারে তাই হল। শব্দটার উৎস আন্দাজ করলাম আমার একটু উপরে, পেছন দিকে। কয়েক সপ্তাহ আগে আমি আর ম্যাগগ একটা বাঘের ভয়ে প্রাণপণ দৌড় লাগিয়েছিলাম বটে, কিন্তু অজানা আতঙ্কের ফলে যে মানুষ বাতাসের বেগে ছুটতে পারে এ আমার জানা ছিল না। তবু আমার সপক্ষে বলব যে এত ভয়েও আমি বন্দুক আর ভারি দড়ির ঝোলাটা ফেলে দৌড়ই নি। কাঁটা-কুটো আগ্রাহ্য করে আঙুলে বেকায়দায় আঘাত লাগতে পারে জেনেও ছুটতে লাগলাম যতক্ষণ না বাড়ি পেঁৗছলাম। মাথার উপর বাজের ভয়াল গর্জন ফেটে পড়ছে। শিরশির করে শিল পড়ছে। তারই মধ্যে আমি বাড়ির বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। সবাই তখন দরজা-জানলা বন্ধ করে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় ব্যস্ত, তাই আমার রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা কারুর চোখে পড়ল না।

ড্যান্‌সি বলেছিল বন্‌শী শুনলে পরিবারে বিপদ ঘটে থাকে: তাই পাছে

তেমন কোনো বিপদ ঘটলে দোষটা আমার উপর পড়ে সেই ভয়ে আমি ঘটনাটা প্রকাশ করলাম না। বিপদ যে-ধরনেরই হ'ক তার প্রতি একটা আকর্ষণ মানুষ-মাত্রেরই থাকে, ছোট-ছেলেদেরও থাকে। এবং যদিও এরপর বহুদিন আমি যেখানে বন্‌শী শুনেছিলাম সে জায়গাটা এড়িয়ে চলেছি, একদিন ভরসা করে গেলাম সেই মোটা গুঁড়ির জঙ্গলের ধারে। সেদিনও হাওয়ার জোর ছিল। একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। এমন সময় আবার সেই চিৎকার আমার কানে এল। পালাবার প্রবল তাগিদ অতি কষ্টে দমন করে আমি গাছটার পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে শুরু করলাম, আর চিৎকারটা পর-পর কয়েকবার শোনবার পর আমি ঠিক করলাম গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে দেখব বন্‌শীর চেহারটা। তার ডাক শুনে যখন কোনো বিপদ হয় নি, তখন আমার মনে হল যে যদি সে আমায় দৈবাৎ দেখতে পায় তাহলেও নিশ্চয় খুব ছোট ছেলে বলে আমায় মেরে ফেলবে না। এই ভেবে আমি গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগলাম, ভয়ে আমার প্রাণ কণ্ঠাগত। ছায়ার মত নিঃশব্দে এগোতে এগোতে শেষ পর্যন্ত ড্যান্‌সির বন্‌শী আমার চোখে পড়ল।

বহুকাল আগে কোনো এক ভয়ঙ্কর ঝড়ে একটা প্রকাণ্ড গাছ খানিকটা উপড়ে গিয়েছিল ; গাছটা পড়েই যেত যদি তার চেয়ে একটু ছোট আরেকটা গাছের উপর কোনাকুনিভাবে না পড়ত। বড় গাছটার চাপে তার চেয়ে ছোট গাছটা চিরদিনের মত হেলে পড়েছিল। ঝড়ের বেগে গাছটা উপরে উঠেই আবার ছোট গাছটার উপরে হেলে পড়ত। ফলে ঘষা লেগে লেগে দুটো গাছেরই ছাল শুকিয়ে কাঁচের মত মসৃণ হয়ে গিয়েছিল, আর এই ভয়ঙ্কর চিৎকারটা উঠেছিল এই দুটো শুকনো মসৃণ কাঠের ঘর্ষণের ফলেই। বন্দুক মাটিতে রেখে ঝুঁকে-পড়া গাছটা বেয়ে উঠলাম। সেখানে বসে নিচে থেকে শব্দটা আসছে শুনে তবে আমি নিশ্চিত হলাম যে, জঙ্গলে ঢুকলে যে ভয় সব সময়ে আমার মনের আড়ালে থাকত তার কারণ ঠিক নির্ণয় করতে পেরেছি। জঙ্গলের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখলে বা শুনলেই তার রহস্যের অন্তস্তলে প্রবেশ করার তাগিদ সেই দিন থেকেই আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। এজন্যে ড্যান্‌সির কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ সে আমায় বন্‌শীর ভয় দেখিয়েছিল বলেই পরবর্তী-কালে জঙ্গলের বহুতর রোমাঞ্চকর ব্যাপারের রহস্য-উদ্‌ঘাটন করে আমি জঙ্গলের গোয়েন্দা কাহিনী লিখেছি।

গোয়েন্দা-কাহিনী সাধারণত শুরু হয় কোনো ভয়াবহ অপরাধ বা অপরাধের প্রচেষ্টা থেকে। মোহাচ্ছন্ন পাঠক তখনকার মত ভুলে যায়, সে গল্প পড়ছে, উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে সে অভিভূতের মত এগোয়, যতক্ষণ না অপরাধী ধরা পড়ে শাস্তি পায়। জঙ্গলের গোয়েন্দা-কাহিনী ঠিক সেভাবে হয় না, এবং প্রতি ক্ষেত্রেই যে অপরাধীর শাস্তি-বিধানেই তার

পরিসমাপ্তি হয় তাও নয়। এমনি দুটি ঘটনা আমি আমার স্মৃতির মণিকোঠা থেকে উদ্ধার করে শোনাচ্ছি।

এক

আমি তখন কালাধুঙ্গি থেকে দশ মাইল দূরে বন-বিভাগের এক বাংলোয় রয়েছি। একদিন ভোরে আমি রান্নার জন্যে বন-মোরগ কিংবা ময়ূর যা হ'ক শিকার করতে বেরিয়েছি। রাস্তার বাঁ দিকে ঘন গাছে ছাওয়া একটা নিচু পাহাড়, সব রকম শিকার মেলে সেখানে ; আর ডান দিকে খেত। এই চাষের জমি আর রাস্তা—এর মাঝখানে ঝোপে ভরা সরু একফালি জমি। যে-সব পাখি সকালবেলা খেতের ফসল খেতে আসে, গ্রামবাসীরা খেতের মধ্যে চলাফেরা শুরু করলেই তারা উড়তে উড়তে রাস্তার উপর এসে পড়ে আর গুলি করার চমৎকার সুযোগ মেলে। কিন্তু সেদিন ভাগ্য আমার প্রতি অপ্রসন্ন, কারণ যে-সব পাখি রাস্তার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল আমার অল্প বোরের বন্দুকের নাগালের বাইরে ছিল তারা, ফলে চাষের খেত পার হয়ে গিয়েও আমি একবারও বন্দুক ছোড়ার সুযোগ পেলাম না।

পাখির দিকে নজর রাখতে রাখতে আমায় রাস্তার দিকেও নজর রাখতে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত যখন এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখান থেকে আর আমার পাখি মারার সম্ভাবনা নেই। সেখান থেকে একশো গজ এগিয়ে লক্ষ করলাম, একটা বড় পুরুষ-চিতা আমার বাঁ দিকের পাহাড় থেকে নেমে রাস্তা পর্যন্ত এসেছে। কয়েক গজ সে রাস্তার বাঁ দিক ধরেই গিয়েছিল, তারপর রাস্তা পার হয়ে ডান দিকে এসে একটা ঝোপের কাছে শুয়ে ছিল। এখান থেকে সে আরও কুড়ি গজ পর্যন্ত গিয়ে তারপর আবার একটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে ছিল। চিতাটার চলাফেরা দেখে বোঝা গেল যে সে কোনো কিছু দেখে কৌতূহলী হয়েছে, এবং সেটা যাই হ'ক, সেটা যে রাস্তার উপরে ছিল না তা স্পষ্ট, কারণ তাহলে সে রাস্তা ধরে না গিয়ে ঝোপ ধরে ধরে যেত। সে যেখানে প্রথমে শুয়ে ছিল সেই পর্যন্ত ফিরে গিয়ে আমি হাঁটু পেতে বসে দেখবার চেষ্টা করলাম কী সে দেখছিল। চাষের খেত আর ঝোপের সরু ফালিটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আছে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, গ্রামের গরু মোষ সেখানকার ঘাস খেয়ে-খেয়ে ছোট করে ফেলেছে। চিতাটা প্রথমে যে জায়গা থেকে লক্ষ করছিল সেখান থেকে এ জায়গাটা দেখা যায় স্পষ্ট। আর দেখলাম, দ্বিতীয়বার চিতাটা যেখান থেকে দেখেছিল সেখান থেকেও এ জায়গাটা দৃশ্যমান। সুতরাং বোঝা গেল, ফাঁকা জায়গাটার উপরেই সে কোনো কিছু একটা দেখে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে চিতাটা আরও পঞ্চাশ গজ এগিয়ে ঝোপের অপর প্রান্তে চলে গিয়েছিল, খানিকটা জমি নিচু হয়ে রাস্তার ধার থেকে এসে এই ফাঁকা জায়গাটার ভিতর দিয়ে চলে গেছে। ঝোপ যেখানে শেষ হয়েছে সে-পর্যন্ত এসে চিতাটা শুয়ে ছিল কিছুক্ষণ, নড়া-চড়া করেছে অনেকবার। তারপর সে এই নিচু জায়গাটা ধরে এগিয়ে গেছে, চলতে চলতে অনেকবার থেমেছে আর শুয়ে বিশ্রাম করেছে। ত্রিশ গজ এগোতে যেখানে পৌঁছলাম রাস্তা-থেকে-ধুয়ে-আসা বালি আর ধুলোর আস্তরণ শেষ হয়ে সেখানে শুরু হয়েছে ছোট ছোট ঘাস। চিতাটা যেখানে যেখানে পা ফেলেছিল সে সব জায়গায় ঘাসের সঙ্গে বালি আর ধুলো লেগে ছিল, তা থেকেই ধারণা করা যুক্তিসংগত যে আগের দিন শিশির পড়া শুরু হবার আগেই সে এখান দিয়ে চলে যায়,—অর্থাৎ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। ঘাস-জমিটা মাত্র কয়েক গজ পর্যন্ত বিস্তৃত ; তার পর আবার যে হালকা বালি আর ধুলো তাতে যখন কোনো থাবার ছাপ দেখা যায় নি তখন বোঝা যাচ্ছে যে এই পর্যন্ত এসে চিতাটা নিচু জায়গাটা ছেড়ে চলে গেছে। ফাঁকা জায়গাটায় চিহ্ন ধরে এগোনো সম্ভব নয়, তবে যেখানে এসে চিতাটা নিচু জায়গাটা ছেড়ে চলে গেছে, লক্ষ করে দেখলাম সেখান থেকে সে যেদিকে গেছে সেখানে এক থেকে দু-ফুট উঁচু রুক্ষ ঘাসের গুচ্ছ। সেখানে গিয়ে দেখলাম প্রায় দশ ফুট তফাত দিয়ে একটা সম্বরের খুরের গভীর গর্ত। এখান থেকে প্রায় ত্রিশ গজ নিয়মিত দূরত্বের ব্যবধানে সম্বরটার চারটে পায়ের খুরই মাটিতে গভীরভাবে বসে গেছে,—সম্বরটি যদি তার পিঠের উপর থেকে হঠাৎ ঝটকা মেরে কোনো কিছু ফেলে দেবার চেষ্টা করে থাকে তবেই এমন চিহ্ন হতে পারে। এই ত্রিশ গজ পার হয়ে সম্বরটা বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে সোজা ধেয়ে গেছে নিচু জায়গাটার ওপারের নিরালা একটা গাছ লক্ষ করে। এই গাছের গুঁড়িতে মাটি থেকে প্রায় ফুট-চারেক উপরে দেখলাম, সম্বরের লোম আর সামান্য রক্ত লেগে রয়েছে।

আর আমার কোনো সন্দেহ রইল না ; বুঝলাম, সম্বরটা যে ফাঁকা জায়গাটার উপর চরে বেড়াচ্ছিল, পাহাড়ের উপর থেকে চিতাটা দেখতে পেয়েছিল ; ভাল করে দেখে নিয়ে সে চুপি-চুপি তার পিছু নিয়েছিল। তারপর সে ঘাসের গুচ্ছের আড়াল থেকে তার পিঠে লাফিয়ে পড়ে এবং তার পিঠেই রয়ে যায় যতক্ষণ না সম্বরটা তাকে এমন কোনো আড়ালে নিয়ে যায় যেখানে সে তাকে মারতে পারে এবং বিনা উপদ্রবে নিজেই সমস্ত মাংসটা খেতে পারে। যেখানে সম্বরটাকে ধরেছিল ইচ্ছে করলেই সে তাকে সেখানে মারতে পারত, কিন্তু একটা পূর্ণ-বয়স্ক সম্বরকে সেখান থেকে টেনে আড়ালে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত না (পায়ের ছাপ থেকেই বুঝেছিলাম সেটা পূর্ণবয়স্ক), ফলে দিনের আলো ফুটলে তাকে শিকারটা হারাতে হত। বুদ্ধিমানের মতই তাই সে ঠিক

করেছিল যে সম্বরটার পিঠে চড়েই যাবে। প্রথম যে গাছটা পেয়েছিল সেটাতে ধাক্কা মেরে চিতাটাকে ফেলতে না পেয়ে এই অবাঞ্ছিত সওয়ারকে পৃষ্ঠচ্যুত করতে সম্বরটা আরও তিনবার বিফল চেষ্টা করেছিল। তারপর সে দুশো গজ গিয়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে, এই আশায় যে, বড় বড় গাছগুলো যা করতে পারে নি ঝোপ-জঙ্গল হয়তো তা করতে সমর্থ হবে। ঝোপের কুড়ি গজ ভিতরে মানুষ আর শকুনের সন্ধানী দৃষ্টির আড়ালে এসে তখন চিতাটা পূর্ণবয়স্কা স্ত্রী-সম্বরটার গলায় দাঁত বসায়, তার দাঁত আর সামনের দুই পায়ের থাবা দিয়ে গলাটা ধরে রেখে নিজের শরীরটা এক ঝটকায় সম্বরটার উপর দিয়ে চালিয়ে দিতেই সে মাটিতে পড়ে যায় ; তারপর তাকে মেরে ফেলে মাংস খেতে শুরু করে। আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন সে তার শিকারের কাছে শুয়ে ছিল। আমাকে দেখে সে সরে গেল, যদিও আমাকে তার ভয় পাবার কিছু ছিল না, কারণ আমি বেরিয়েছিলাম পাখি শিকারে, আমার সঙ্গে ছিল কেবল একটা ২৮ বোর বন্দুক, আর আট নম্বর কার্তুজ।

শিকারকে মারবার আগে তার পিঠে চড়েছে--চিতার এমন অনেক ঘটনা আমি জানি, সে শিকার সম্বর, বা চিতল, এবং এক ক্ষেত্রে একটা ঘোড়াও হতে দেখা গেছে। কিন্তু কোনো বাঘের এরকম ব্যবহারের মাত্র একটি নজিরই আমার আছে।

আমি তখন কালাধুঙ্গি থেকে বার মাইল দূরে খাট্টা ম্যাঙ্গোলিয়া নামে একটা গোশালা অঞ্চলে তাঁবু ফেলে আছি। একদিন একটু বেলা করে প্রাতরাশ খাচ্ছি, দূর থেকে মোষের ঘণ্টার অত্যন্ত জোর শব্দ শোনা গেল। সেদিন সকালে একটা চিতার ছবি সিনে ক্যামেরায় তুলে আমি প্রায় দেড়শো মোষের একটা পালের ভিতর দিয়ে আসছিলাম,—বিস্তীর্ণ তরাই এলাকায় তারা ঘাস খেয়ে চলেছিল। এই তরাইয়ের ভিতর দিয়ে বালি-ভরা একটা নালা চলে গেছে, সামান্য জল তাতে ঝকমক করছে। এই নালায় একটা বাঘ আর একটা বাঘিনীর টাটকা থাবার ছাপ আমার চোখে পড়ল। ঘণ্টা যে-রকম জোরে জোরে বাজছে তাতে বুঝলাম যে মোষের পালটা ঊর্ধ্বশ্বাসে গোশালার দিকে ছুটেছে। ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে একটা বিচ্ছিন্ন মোষের ডাকও মিশে ছিল। গোশালায় মানুষ ছিল জন-দশেক, এই ব্যাপারে ভয় পেয়ে তারা চিৎকার করতে লাগল, ক্যানেস্তারা বাজাতে শুরু করল। এর ফলে মোষের পালটা চিৎকার বন্ধ করল বটে, কিন্তু ঘরে না পৌঁছনো পর্যন্ত তাদের দৌড় থামল না।

কিছুক্ষণ পরে সমস্ত হট্টগোল থেমে যেতে দুটো গুলির শব্দ আমার কানে এল। গোশালায় খোঁজ করতে গিয়ে দেখলাম একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, আর কয়েকজন ভারতীয় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে : তাদের মাঝখানে একটা মোষ মাটিতে পড়ে রয়েছে। ইউরোপীয়টির

কাছে শুনলাম ব্যাপারটা। তিনি ইজ্জতনগরের ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস্‌ কর্তৃক নিযুক্ত। তিনি যখন রাখালদের সঙ্গে কথা বলছিলেন এমন সময় দূর থেকে মোষগুলোর ঘণ্টার শব্দ তাঁদের কানে আসে। দলটা কাছে আসতে তাঁরা শুনতে পেলেন একটা মোষ চিৎকার করছে, আর সেইসঙ্গে একটা বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জনও তাঁদের কানে এল। আমি ছিলাম আরও খানিকটা দূরে, বাঘের গর্জনটা আমার কানে আসে নি। বাঘটা গোশালার দিকে আসছে মনে করে রাখালটা খুব চেঁচামেচি শুরু করে আর ক্যানেস্তারা বাজাতে থাকে। মোষের পালটা যখন ফিরল, দেখা গেল একটা মোষের সারা গায়ে রক্ত মাখা আর রাখালরা যখন বলল যে তার আর বাঁচার কোনো আশা নেই, তাদের অনুমতি নিয়ে তখন তিনি তাকে গুলি করেন। মাথায় দুটো গুলি খেয়ে তার যন্ত্রণার অবসান হয়।

মোষটা ছিল অল্পবয়স্ক, ভারি চমৎকার তার স্বাস্থ্য ; রাখালরা যে বলেছিল সে হল পালের সেরা মোষ, কথাটা বিশ্বাস করবার মত। এহেন অবস্থায় কোনো জন্তু আমি কখনো দেখি নি, তাই আমি তাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করলাম।

মোষটার ঘাড়ে আর গলায় কোনো দাঁতের বা থাবার চিহ্ন নেই, কিন্তু তার পিঠে পঞ্চাশটা বা তারও বেশি গভীর ক্ষত,--বাঘের থাবায় এ ক্ষত হয়েছে। কয়েকটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে বাঘটা যখন মোষটার মাথার দিকে মুখ করে ছিল, আর কয়েকটার সৃষ্টি হয়েছে বাঘটা যখন মোষটার ল্যাজের দিকে মুখ করে ছিল। ক্ষিপ্ত পশুটির পিঠে সওয়ারি হয়েই বাঘ তার কাঁধ থেকে খুবলে প্রায় পাঁচ পাউণ্ড মাংস খেয়ে নিয়েছে, তাব পিঠের শেষপ্রান্ত থেকে কামড়ে তুলে নিয়েছে আরো দশ-পনের পাউণ্ড।

তাঁবুতে ফিরে আমি একটা ভারি রাইফেল নিয়ে মোষগুলোর পায়ের চিহ্ন লক্ষ করে অগ্রসর হলাম। দেখলাম মোষগুলো দৌড়তে শুরু করেছিল, নালার ওপারে যেখানে আমি বাঘটার থাবার ছাপ লক্ষ করেছিলাম সেখান থেকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানকার ঘাস মানুষের কাঁধ পর্যন্ত উঁচু। কী ঘটেছিল সঠিক আন্দাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না, এবং এমন কোনো সূত্রও মিলল না যা থেকে আন্দাজ করতে পারি কী করে বাঘটা এই মোষটার পিঠে এসে পড়েছিল যাকে সে মারতে চায় নি। মারতে যে চায় নি সেটা বোঝা যায়, কারণ মোষটার ঘাড়ে ও গলায় কামড়ের চিহ্ন নেই। কী ঘটেছিল সঠিক আন্দাজ করতে না পারার জন্যে অত্যন্ত আফসোস হল ; কারণ শুধু যে এই একটা ব্যাপারেই আমার ভুল হয়েছিল তাই নয়, বাঘের পক্ষে কোনো জানোয়ারের পিঠে সওয়ার হওয়ার আর সেইসঙ্গে সেই সওয়ারের মাংস খাওয়ার এ ছাড়া আর কোনো নজির শোনা যায় নি।

নালার থাবার-ছাপগুলো থেকে বোঝা যায় যে দুটো বাঘই ছিল পূর্ণদেহ ; সুতরাং অল্পবয়স্ক বাঘের অনভিজ্ঞতার যুক্তিও এখানে খাটে না। তা ছাড়া

অল্পবয়স্ক কোনো বাঘ বেলা দশটার সময়—বলতে কি, কোনো সময়েই একপাল মোষের সম্মুখীন হতে সাহস করবে না।

দুই

আমার পুরনো বন্ধু হ্যারি গিল-এর ছেলে এভেলিন গিল-এর মত প্রজাপতি-সংগ্রাহক আমি অতি অল্পই দেখেছি। ক-দিনের ছুটি নিয়ে যখন সে নৈনিতালে এসেছিল তখন একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম পাওয়ালগড় রোডে একটা প্রজাপতি আমি দেখেছি, তার উপরের ডানাগুলোয় লাল লাল চমৎকার ফোঁটা কাটা। এভেলিন বললে এ ধরনের প্রজাপতি সে কখনো দেখে নি, তাই সে আমায় অনুরোধ করল তাকে একটা নমুনা যোগাড় করে দিতে।

এর কয়েক মাস পরে একদিন আমি পাওয়ালগড় থেকে তিন মাইল দূরবর্তী সাঁদনি গাগায় তাঁবু গেড়েছি, উদ্দেশ্য—চিতল হরিণদের লড়াইয়ের চলচ্চিত্র তুলে নেওয়া। কারণ এই সময়টার সাঁদনি গাগা সমভূমির উপর প্রায়ই একসঙ্গে এমন অনেকগুলি দ্বন্দ্বযুদ্ধের দৃশ্য দেখা যায়। একদিন সকালে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে আমি প্রতিশ্রুত প্রজাপতি ধরবার জন্যে প্রজাপতি-ধরা জালটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার তাঁবু থেকে একশো গজ দূরে একটা বনপথ আছে, কালাধুঙ্গি আর পাওয়ালগড়ের মধ্যে সেটা যোগসূত্রের কাজ করে। এই রাস্তার মাইল-খানেক দূরে একটা গর্তে ছিল সম্বরদের আড্ডা ; আশা ছিল এখানেই আমার সেই প্রজাপতি মিলবে।

এই বনপথে মানুষের চলাচল বিশেষ ছিল না, এবং যে বনের ভিতর দিয়ে এই পথ চলে গেছে সেখানে শিকার পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় ভোরবেলা এ পথে যেতে-যেতে আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি। শক্ত মাটির এই পথের ধুলোর হালকা প্রলেপের উপব যত প্রাণী আগের রাতে চলাফেরা করেছে তাদের সকলেরই চিহ্ন এখনো রয়েছে। একবার চোখ তৈরি হয়ে গেলে জঙ্গলের পথে বা রাস্তায় যে কোনো প্রাণীর পায়ের ছাপ দেখলে আর থেমে দাঁড়িয়ে তার জাত, আয়তন, গতিবিধি নির্ণয় করতে হয় না। মনের অবচেতনে আপনা থেকেই সব ধরা পড়ে যায়। তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেখানে রাস্তায় এসে পড়লাম, সেখান থেকে একটু এগিয়ে যে শজারুটা রাস্তায় উঠে এসেছিল, ডানদিকের জঙ্গলে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়ে সেটা আবার দ্রুত ফিরে গেছে। পায়ের চিহ্ন দেখেই এসব বুঝতে পারি। তার এই আতঙ্কের কারণও বোঝা গেল কয়েক গজ এগিয়ে যেতেই—একটা ভাল্লুক সেখানে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে

রাস্তা অতিক্রম করে গেছে। বাঁ দিকের জঙ্গলে প্রবেশ করে ভাল্লুকটা একপাল শুয়োর আর চিতলের একটা ছোটখাট দলকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে,—সবেগে তারা রাস্তা পার হয়ে ডানদিকের জঙ্গলে প্রবেশ করে। আর একটু আগে একটা সম্বর হরিণ ডান দিক থেকে বেরিয়ে এসে একটা ঝোপের মধ্যে খানিকক্ষণ খাওয়ার পর পঞ্চাশ গজের মত রাস্তা ধরে এগিয়ে গেছে, তারপর তার শিংগুলো একটা ছোট চারা গাছে খানিকক্ষণ ঘষে আবার জঙ্গলে ফিরে গেছে। এরই কাছাকাছি একটা জায়গায় একটা চৌশিঙা কৃষ্ণসার একটা বাচ্চা নিয়ে রাস্তায় এসেছিল। হরিণ-শিশুটার পায়ের ছাপ কোনো শিশুর হাতের নখের চেয়ে বড় হবে না। বাচ্চাটা রাস্তার উপর লাফিয়ে বেড়িয়েছে, কিন্তু তার পরেই তার মা ভয় পেয়ে যায়, রাস্তা ধরে কয়েক গজ সবেগে ছুটে গিয়ে মা আর সন্তান জঙ্গলে প্রবেশ করে। এখানে রাস্তা বাঁক নিয়েছে, এই বাঁকের উপর ছিল একটা হায়েনার পায়ের ছাপ। হায়েনাটা এসেছিল এই পর্যন্ত, তারপর যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেদিকে ফিরে যায়।

পথের চিহ্ন লক্ষ করে করে আর পাখির গান শুনে-শুনে (সাঁদনি গাগা শুধু যে এখানে একশো মাইলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা তাই নয়, তার পক্ষীকুলের জন্যেও সে বিখ্যাত) আধ-মাইলটাক অগ্রসর হবার পর পাহাড় কেটে তৈরি একটা রাস্তার উপর এসে পেঁাছলাম। এখানকার মাটি এত শক্ত যে তাতে পায়ের চিহ্ন পড়ে না। আরও খানিকটা সেই পথ ধরে যাবার পর একটা অস্বাভাবিক চিহ্ন লক্ষ করে থমকে দাঁড়ালাম। শুরুতে চিহ্নটা তিন ইঞ্চি লম্বা আর দু'ইঞ্চি গভীর একটা হলরেখার মত,—সমকোণে রাস্তাটা কেটে চলে গেছে। লোহার ফলা দিয়ে এমন খাত হয়তো কাটা যায়। কিন্তু গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোনো মানুষ এ পথে যায় নি। অথচ এই খাতের সৃষ্টি হয়েছে গত বার ঘন্টার মধ্যে। তা ছাড়া, এ যদি মানুষের কাজ হত তাহলে এ দাগ চলত রাস্তার সমান্তরালে, সমকোণে নয়। রাস্তাটা এখানে চোদ্দ ফুট চওড়া আর তার ডানদিকটা যেমন প্রায় খাড়াই আর দশ ফুট উঁচু, বাঁ দিকটা তেমনি সিধে গভীর হয়ে নেমে গেছে। সেখান থেকে বোঝা যায়, যে বস্তু দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে সেটা গেছে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে।

এটা মানুষের তৈরি নয় এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার পরে আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলাম যে একমাত্র কোনো পশুর শিঙের সুঁচলো আগা দিয়েই এ তৈরি হওয়া সম্ভব,—কোনো চিতল হরিণের বা কৃষ্ণসারের বাচ্চারই হবে। এমনি কোনো হরিণ যদি উঁচু পাড় থেকে লাফিয়ে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে থাকে, শক্ত মাটিতেও তার খুরের আঘাতে চিড় খেত, তার পায়ের চিহ্ন থেকে যেত। কিন্তু এ খাতের কাছে কোনো হরিণের পায়ের চিহ্ন নেই। এই রেখাটাকেই আমার একমাত্র সূত্র ধরে আমি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পেঁাছলাম যে এ হল

কোনো মরা হরিণের শিঙের কীর্তি,—কোনো বাঘ হরিণ মুখে করে পাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে এই চিহ্ন রেখে গেছে। রাস্তার উপর যে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই সে একটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার নয়, কারণ বাঘ বা চিতা কোনো শিকার নিয়ে রাস্তা পার হবার সময় যখনই সম্ভব হয় সেটাকে শূন্যে ধরে রাখে ; এর কারণ, আমার ধারণা, যাতে ভাল্লুক বা হায়েনা বা শেয়াল গন্ধ অনুসরণ করে পিছু না ধরতে পারে।

এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য যাচাই করবার জন্যে আমি রাস্তা পার হয়ে রাস্তার বাঁ দিকের পাহাড়টা থেকে নিচের দিকে তাকালাম। কোনো জন্তুকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখা গেল না। তবে, পাহাড়ের কুড়ি ফুট ঢালুতে, প্রায় চার ফুট উঁচুতে একটা ঝোপে গাছের পাতায় প্রাতঃসূর্যের আলোয় কি একটা ঝলমল করছে দেখা গেল। ভাল করে দেখব বলে সেখানে নেমে গিয়ে দেখলাম, রক্তের একটা বিন্দু, এখনও একেবারে শুকিয়ে যায় নি। এখান থেকে চিহ্ন ধরে সহজেই এগিয়ে গেলাম, এবং পঞ্চাশ গজ মত অগ্রসর হয়ে একটা ছোট গাছের নিচে চারদিকের ঘন ঝোপের মধ্যে দেখতে পেলাম একটা মৃত চিতল হরিণ,—তার মাথার শিংগুলো অনেক শিকারীর কাছেই স্মারক হিসেবে বহুমূল্য মনে হবে। শিকার নিয়ে বাঘটা কোনো ঝুঁকি নেয় নি—তার পিছনের দুটো পা-ই সে খেয়ে ফেলেছে, আর যাতে কোনো পাখি বা পশু তার সন্ধান না পায় সেজন্যে সে বেশ খানিকটা জায়গা থেকে কাঠি-কুটি আর শুকনো পাতা জড়ো করে এনে তার শিকারের উপর চাপা দিয়েছে। কোনো বাঘ যখন এমনটি করে থাকে তখন বুঝতে হবে যে সে ধারে-কাছে কোথাও থেকে শিকারের উপর লক্ষ রাখছে না।

ফ্রেড অ্যান্ডারসন আর হুইশ্ এডি-র কাছে আমি এই এলাকার একটা বড় বাঘের কথা শুনেছিলাম, শ্রীমতী (অধুনা লেডি) অ্যান্ডারসন যার নাম দিয়েছিলেন, 'পাওয়ালগড়ের কুমার'। বহুদিন থেকেই আমার এই বিখ্যাত বাঘটাকে দেখবার ইচ্ছে ছিল, এ প্রদেশের সমস্ত শিকারী যাকে মারবার চেষ্টা করছে। যে সম্বরের আড্ডার দিকে আমি যাচ্ছি, সেখান থেকে যে গভীর দরিপথের শুরু হয়েছে সেখানেই সে থাকত, আমার জানা ছিল। যে বাঘ চিতলটাকে মেরেছে তাকে সনাক্ত করতে পারি এমন কোনো থাবার ছাপ মড়ির কাছে না থাকায় আমার মনে হল মড়িটা হয়তো 'কুমারে'র সম্পত্তি, এবং তা যদি হয় তাহলে তার দর্শন পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে,—দেখতে পাব যেমনটি শুনেছি সত্যি সে ঠিক ততটা বড় কি না।

মড়ির কাছ থেকে একটা সরু ফাঁকা ফালি একশো গজ দূরের একটা ছোট ঝরনা পর্যন্ত চলে গেছে। এই ঝরনার ওপারে বুনো লেবু গাছের ঘন জঙ্গল। 'কুমার' যদি তার ডেরায় না ফিরে থাকে খুব সম্ভব তাহলে সে এই ঘন ঝোপে

ভরা জায়গাটার মধ্যেই আছে ; তাই আমি ঠিক করলাম বাঘটার মড়িতে ফেরার অপেক্ষায় থাকব। এই সিদ্ধান্তে এসে আমি রাস্তার দিকে অগ্রসর হলাম, প্রজাপতি-ধরা সাদা রঙের জালটা কতকগুলো শুকনো পাতার আড়ালে লুকিয়ে রাখলাম। ফাঁকা জায়গাটার উপরের দিকটা প্রায় দশ ফুট চওড়া, যে গাছটার নিচে মড়িটা পড়ে ছিল ফাঁকা জায়গাটার ডান দিকে সেটারও প্রায় সেরকম দূরত্ব। ফাঁকা জায়গাটার বাঁ দিকে, আর মড়িটার প্রায় বিপরীত দিকে ছিল লতার ছাদ দেওয়া একটা গাছের মরা কঙ্কাল। প্রথমে নিঃসন্দেহ হলাম যে মরা গাছের গুঁড়িটায় সাপের ডেরার মত কোনো গর্ত নেই, তারপর সেখান থেকে সমস্ত শুকনো পাতা সরিয়ে ফেললাম, পাছে কোনো বিছের উপর বসে পড়ি। তখন সেই গুঁড়ির উপর পিঠ দিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়লাম। সেখান থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরের মড়িটা যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি ফাঁকা ফালিটাও ঝরনা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এই ঝরনার অপর পারে একপাল লাল বানর একটা পিপল গাছের ফল খেয়ে চলেছে।

প্রস্তুতি-পর্ব শেষ হতে আমি চিতার ডাক ডেকে উঠলাম। নিরাপদ বিবেচনা করলে চিতা বাঘের মড়ি খেতে আসে। বাঘ স্বভাবতই তাতে প্রচণ্ড রুষ্ট হয়। বাঘটা যদি শুনতে পাবার মত কাছাকাছি দূরত্বে থাকে, আর আমার ডাক যদি তাকে ঠকাতে পারে, বাঘটা নিশ্চয়ই ফাঁকা ফালি ধরে এগিয়ে আসবে। একবার তাকে ভাল করে দেখে নিয়েই আমি তাকে জানিয়ে দেব, আমি এখানেই আছি। তারপর পালাব। এই রকম মনস্থ করলাম। আমার ডাক শুনে বানররা হুঁশিয়ারি ডাক ডেকে উঠল। তিনটে বানর একটা পিপল গাছের একটা ডালের উপর এসে বসল। ডালটা মাটি থেকে ৪০ ফুট উঁচুতে,—গাছ থেকে প্রায় সমকোণ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। বানরগুলো আমায় দেখতে পায় নি, তাতে ভালই হল, তাদের হুঁশিয়ারি ডাক এক মিনিটের বেশি চলেনি ; কারণ বাঘটা যদি কাছাকাছি কোথাও থেকে থাকে তাহলে তার এই ধারণাই বদ্ধমূল হবে যে কোনো চিতা তার মড়িতে হানা দিয়েছে। বানর তিনটির উপর লক্ষ রেখে চলেছি, হঠাৎ দেখলাম একটা বানর মুখ ফিরিয়ে তার পেছন দিকে উঁকি মারল, তারপর পর পর ক-বার মাথাটা তুলে আর নামিয়ে হুঁশিয়ারি ডাক ডেকে উঠল। মিনিটখানেকের মধ্যেই বাকি দুটো বানরও ডাকতে শুরু করল আর তারপরেই গাছের অনেক উঁচু থেকে আরও অনেক বানর সে ডাকে যোগ দিল। বুঝলাম বাঘটা আসছে। ক্যামেরাটা না আনার জন্যে খুব দুঃখ হল ;—চমৎকার উঠত ছবিটা—ফাঁকা ফালিটার উপর দিয়ে বাঘটা এগিয়ে আসবে। নদীর জলে রোদ পড়ে ঝলমল করে উঠবে ; আর উত্তেজিত বানরগুলোকে নিয়ে পিপল গাছটা চমৎকার পশ্চাৎপটের হবে।

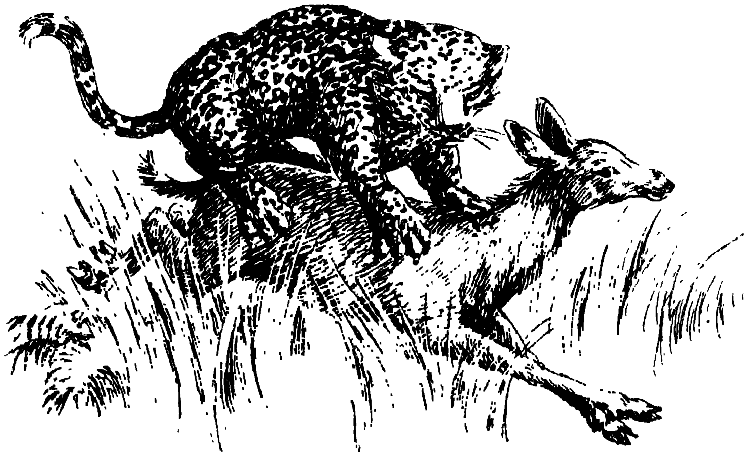
এহেন অবস্থায় যেমনটি হয়ে থাকে তাই হল। আমি যা ভাবছিলাম, বাঘটা

তা করল না। অনেকক্ষণ নীরবে কাটল, আমার মনে অস্বস্তি বাঘটা নিশ্চয়ই তার মড়ির দিকে আসছে আমার পেছন দিক থেকে। এক ঝলকের মত বাঘটা আমার চোখে পড়ল—দেখলাম, এক লাফে ঝরনাটা পার হয়ে সে ফাঁকা ফালিটার ডান দিকের ঘন ঝোপের মধ্যে অন্তর্হিত হল। বুঝলাম নদীর ওপারের ঝোপের আড়াল থেকে পর্যবেক্ষণ করে বাঘটা এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে ফাঁকা ফালিটা ধরে এগিয়ে গেলে চিতাটা তাকে দেখতে পাবে। তাই সে এমনভাবে মড়ির দিকে অগ্রসর হল যাতে সে চিতাটার সামনাসামনি এসে পড়তে পারে। আমার তাতে অসুবিধের কিছু ছিল না। কেবল আমি যতটা চেয়েছিলাম, বাঘটা তার চেয়ে একটু কাছে এসে পড়বে।

মাটিতে শুকনো পাতার আস্তরণ, অথচ বাঘটা এমন নিঃশব্দে অগ্রসর হল যে কোনো শব্দই আমার কানে আসে নি। হঠাৎ দেখি, সে তার মড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এ বাঘ তো সেই কুমার নয়, এ এক বড় বাঘিনী। দেখে অস্বস্তি হল। কারণ বাঘিনীকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না, ভাল মেজাজ থাকলেও নয়। আর এখন তো ভাল মেজাজ থাকবার কথাও নয়। আমি তার মড়ির বড় অস্বস্তিকর রকম কাছে বসে আছি। লেবু গাছের ঝোপটার আড়ালেই হয়তো তার বাচ্চারা রয়েছে, এবং সে ক্ষেত্রে তার মড়ির কাছে আমার উপস্থিতি তার পক্ষে বিরক্তিজনক হবারই সম্ভাবনা। যাই হ'ক যে-পথে সে এসেছে যদি সে-পথে ফিরে যায় তো কোনো হাঙ্গামা থাকে না। কিন্তু বাঘিনী তা করল না। চিতা তার মড়ি স্পর্শ করে নি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাঘিনী ফাঁকা ফালিটার দিকে অগ্রসর হল। আমাদের মধ্যে দূরত্ব অর্ধেক হয়ে গেল। দীর্ঘ এক মিনিট কাল বাঘিনী কিংকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল,—আমি দম বন্ধ করে আছি, আমার চোখ ছোট হতে হতে সরু একটা রেখার মত হয়ে উঠেছে, এমন সময় দেখলাম বাঘিনী ধীরে ধীরে ফাঁকা ফালিটা ধরে এগিয়ে গেল, নদীর ধারে এসে একটু জল খেল, তারপর এক লাফে নদী পার হয়ে ঘন ঝোপের আড়ালে অন্তর্হিত হল।

এই দুই ক্ষেত্রেই আমি প্রথমে জানতে পারি নি যে কোনো হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়েছে। কোন্ ছোট সূত্র যে কোথায় নিয়ে যাবে এ বিষয়ে এই অনিশ্চয়তার ফলেই জঙ্গলের গোয়েন্দা-কাহিনী এত চিত্তাকর্ষক ও উত্তেজক হয়ে ওঠে।

গোয়েন্দা-কাহিনী অতি অল্প লোকেই রচনা করতে পারে। কিন্তু জঙ্গলের গোয়েন্দা-কাহিনী যে কেউ রচনা করতে পারে. কেবল যদি পথ দিয়ে যাবার সময় পথটুকু ছাড়াও আরো কিছু দেখবার চোখ থাকে, আর কোনো কিছু জানবার আগেই সব জানা হয়ে গেছে, এমন ধারণা যদি না থাকে।



৯

আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আমাকে নৈনিতাল ভলান্টিয়ার রাইফেলসের স্কুল ক্যাডেট কম্পানিতে যোগদানের যোগ্য বলে বিবেচনা করা হল। ভলান্টিয়ার রাইফেলসে যোগ দেওয়ায় তখন ছেলেদের উৎসাহ ছিল, কদর ছিল। সুস্থদেহ ছেলেরা, বড়রা যোগ দিয়ে গর্ব ও আনন্দ বোধ করত। আমাদের বাহিনীতে ছিল চারটি ক্যাডেট দল আর পূর্ণবয়স্কদের একটি দল : বাহিনীর সভাসংখ্যা ছিল মোট ৫০০। মোট জনসংখ্যা যেখানে ৬,০০০ সেখানে এই সংখ্যার অর্থ এই হল যে, প্রতি বার জনের মধ্যে একজন করে ভলান্টিয়ার।

আমাদের স্কুলে ছিল সত্তরটি ছেলে। স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন আবার স্কুলের ক্যাডেট দলের ক্যাপ্টেনও। দলে ক্যাডেট ছিল পঞ্চাশ জন। এই অধ্যক্ষ ছিলেন সৈন্যবাহিনীর লোক, তাঁর প্রাণে এই মহৎ বাসনাই সর্বদা জ্বলজ্বল করত যে তাঁর ক্যাডেট কম্পানিই যেন সমস্ত বাহিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে, এবং এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার জন্যে দাম দিতে হত আমাদের, প্রচণ্ড দাম দিতে হত। সপ্তাহে দু-দিন স্কুলের মাঠে, আর একদিন অন্য চারটি দলের সঙ্গে নৈনিতাল হ্রদের উচ্চ প্রান্তের উপর দিকের ফাঁকা জায়গাটায় আমাদের কুচকাওয়াজ হত।

আমাদের ক্যাপ্টেনের চোখে কোনো ভুল এড়িয়ে যেত না এবং কুচকাওয়াজের সময়কার সমস্ত ভুলের খেসারত দিতে হত স্কুলের ছুটির পরে। লক্ষ্য থেকে চার ফুট তফাতে চার ফুট লম্বা একটা বেত হাতে দাঁড়িয়ে

থাকতেন ক্যাপ্টেন। নিশানায় তাঁর খ্যাতি ছিল ; তাঁর নাম হয়েছিল—অব্যর্থ-লক্ষ্য ডিক। নিজের সঙ্গে তিনি কোনো বাজি ধরতেন কি না জানি না, কিন্তু আমরা ছোটরা মার্বেল, লাট্টু, পেন্সিল-কাটা ছুরি, এমনকি আমাদের প্রাতরাশের বিস্কুট পর্যন্ত বাজি রাখতাম যে দশ বারের মধ্যে ন-বারই তিনি, গত দিনে বা গত সপ্তাহে ঠিক যেখানে বেত মেরে ব্যথায় ফুলিয়ে দিয়েছিলেন, অবিকল সেই জায়গাটায় বেত মারবেন। বাজি যে ধরত,—নতুন-আসা কোনো ছেলেই এ বাজি ধরত সাধারণত—প্রতিবারই হারত সে। অন্যান্য ক্যাডেট দলগুলি কিছুতেই আমাদের দলকে শৃঙ্খলায় সবচেয়ে সেরা বলে মানতে চাইত না, তাদের মানতেই হত যে সাজ-পোশাকে আমরা ছিলাম সবচেয়ে সেরা ; কারণ অন্যান্য ক্যাডেটদের সঙ্গে কুচকাওয়াজে যোগ দেবার আগে আমাদের পোশাক আর চেহারা খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হত,—নখের ভিতরে সামান্যমাত্র ময়লা, বা পোশাকে এতটুকু ধুলোর আভাসও চোখ এড়াত না।

আমাদের ইউনিফর্ম (ছোট হয়ে গেলে আমরা তা ছোটদের দিয়ে দিতাম) ছিল ঘোর নীল সার্জের, সে কাপড় কিছুতেই ছিঁড়বে না, নরম চামড়ায় একবার ঘষা লাগলেই চামড়া ছড়ে যাবে, ধুলোর সামান্য কণাটুকু লাগলেও স্পষ্ট দেখা যাবে। তবে, যতই গরম আর অস্বস্তিকর হ'ক সে ইউনিফর্ম, যে হেলমেট আমাদের সেইসঙ্গে পরতে হত, অস্বস্তিকর ব্যাপারে তার তুলনায় এ কিছুই নয়। ভারি নিরেট খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি নির্যাতনের এই অস্ত্রে থাকত একটা করে চার ইঞ্চি লম্বা কাঁটা, তার ভোঁতা দিকটার এক ইঞ্চি বা তারও বেশি হেলমেটের ভিতরে ঢুকে যেত, যেজন্যে হেলমেটের ভিতরটা কাগজ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত। তারপর হেলমেটটা মোক্ষমভাবে মাথায় আঁকড়ে বসলে তখন একটা খুব ভারি, শক্ত চামড়ায় মোড়া স্ট্র্যাপ দিয়ে সেটা থুতনির সঙ্গে এঁটে দেওয়া হত। প্রচণ্ড রোদে তিন ঘণ্টা কাটাবার পর আমাদের সকলেরই ভয়ংকর মাথা ধরত। ফলে গত রাতের পাঠের পুনরাবৃত্তি অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠত, এবং ফলে অন্য যে-কোনো দিনের থেকে কুচকাওয়াজের দিনে চার ফুট লম্বা সেই বেত আরো অবাধে চলত।

মাঠের কুচকাওয়াজে একদিন উচ্চপদস্থ এক অফিসার পরিদর্শনে এল। এক ঘণ্টা ধরে বন্দুক নিয়ে কুচকাওয়াজ চলল, মার্চ করে এগোনো পিছনো চলল। তারপর আমাদের পুরো ব্যাটেলিয়নকে মার্চ করিয়ে শুখা তালের রাইফেল রেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হল। পাহাড়ের ঢালে ক্যাডেটদের বসবার হুকুম হল। বড়রা পরিদর্শক অফিসারকে ৪৬০ মার্টিনি রাইফেল ব্যবহারে তাদের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা দিতে লাগল। ব্যাটেলিয়নের গর্ব ছিল, ভারতের সেরা লক্ষ্যভেদীদের মধ্যে কয়েকজন তাদের ব্যাটেলিয়নের অন্যতম। সেই গর্ব

প্রত্যেকের গর্ব হয়ে ধরা পড়ত। পাকা বাঁধানো স্তম্ভের উপর দাঁড় করানো ভারি লোহার পাত লক্ষ্যবস্তু। লোহার পাতের উপর বুলেট লেগে শব্দ হলেই বিশেষজ্ঞরা ধরতে পারেন, বুলেট কোথায় লেগেছে, পাতের মাঝখানে লক্ষ্যবিন্দুতে, না ধারে কোথায়ও।

প্রত্যেক ক্যাডেট দলেরই বড়দের মধ্যে একজন করে উপাস্য বীর ছিল, এবং এ-হেন কোনো বীরের লক্ষ্যভেদক্ষমতা সম্পর্কে সেদিন সকালে কেউ সংশয় প্রকাশ করলে রক্তারক্তি হয়ে যেত। তবে ইউনিফর্ম পরে লড়াই করা নিষিদ্ধ ; এই যা বাঁচোয়া। যাদের লক্ষ্য সবচেয়ে ভাল হয়েছে তাদের ফলাফল ঘোষিত হবার পর ক্যাডেটদের উপর হুকুম হল সারিবদ্ধ হয়ে পাঁচশো থেকে দুশো গজের রেঞ্জের সীমারেখা পর্যন্ত মার্চ করতে। এখানে এসে প্রতিটি দল থেকে চার জন করে সীনিয়র ক্যাডেট বেছে নেওয়া হল, আর আমরা যারা ছোট তাদের উপর হুকুম হল, অস্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে যেখান থেকে গুলি ছোড়া হবে তার পেছনে বসে থাকতে হবে।

যে-কোনো খেলায়, বিশেষ করে রাইফেল রেঞ্জে স্কুলে স্কুলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল অত্যন্ত তীব্র। সেদিন সকালে চার প্রতিযোগী দলের লক্ষ্যভেদ শত্রুমিত্র সকলেই গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছিল, উত্তেজিত মন্তব্য করছিল। স্কোর কাছাকাছিই এগোচ্ছিল, কারণ প্রত্যেক কম্পানির অধিনায়কই কম্পানির সেরা লক্ষ্যভেদীদের বেছে নিয়েছিলেন। খেলার শেষে যখন ঘোষণা করা হল যে আমাদের দল দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে, এবং আমরা হেরেছি এক পয়েন্টে এমন এক স্কুলের কাছে যার ছাত্রসংখ্যা হবে আমাদের তিনগুণের মত, তখন আমাদের আনন্দ আর ধরে না।

আমরা সাধারণ ক্যাডেটরা তখন প্রতিযোগীদের কৃতিত্ব বিষয়ে মন্তব্য করছি, এমন সময় দেখা গেল সার্জেন্ট মেজর ফায়ারিং পয়েন্টের কাছে জটলা বাঁধা অফিসার ও প্রশিক্ষকদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন, আর গাঁক গাঁক করে ডাকছেন (লোকে বলত সে গলা এক মাইল দূর থেকে শোনা যায়)—'করবেট! ক্যাডেট করবেট!' হা ভগবান! আবার কী করলাম যে শাস্তি পেতে হবে! আমি একবার বলেছিলাম বটে যে শেষ যে গুলিটায় প্রতিপক্ষেরা আমাদের এক পয়েন্টে হারিয়ে দেয় সেটা বরাতজোরে লেগে গেছল এবং তা শুনে একজন আমায় লড়ে যেতে চ্যালেঞ্জ করেছিল, কিন্তু লড়াইটা হয় নি, কারণ কে যে আহ্বান জানিয়েছে, আমি জানতেই পারি নি। এদিকে সার্জেণ্ট মেজর তেমনি চেঁচিয়ে চলছেন—'করবেট, ক্যাডেট করবেট!' চারদিক থেকে সবাই বলছে, 'যাও যাও, ডাকছেন তোমাকে' ; 'তাড়াতাড়ি কর, নইলে বিপদে পড়বে'। শেষ পর্যন্ত খুব ক্ষীণ গলায় আমি উত্তর দিলাম, 'ইয়েস, স্যার!' 'এতক্ষণ উত্তর দাও নি কেন? তোমার কার্বাইন

কোথায়? যাও নিয়ে এস এক্ষুনি!' এক নিশ্বাসে ধমকে উঠলেন সার্জেন্ট মেজর। এতগুলো হুকুমে আমার তখন মাথা ঘুরে গেছে, ভেবে পাচ্ছি না কী করব,—এমন সময় পেছন থেকে এক বন্ধু ঠেলা দিয়ে তাড়া লাগাল, 'যা না, গাধা কোথাকার!' তখন আমি আমার কার্বাইন আনতে ছুটলাম।

যেখান থেকে লক্ষ দুশো গজ সেখানে পৌঁছলাম। আমাদের মধ্যে যারা প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছিল না তাদের উপর অস্ত্রশস্ত্র স্তূপীকৃত রাখার হুকুম ছিল। তেমনি একটা স্তূপে ছিল আমার কার্বাইনটা দিয়ে আঁটা। আমার কার্বাইনটা বের করে নিতে যেতেই সমস্ত স্তূপটা মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। সেগুলো গুছিয়ে রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় সার্জেন্ট মেজর চিৎকার করে উঠলেন, 'কার্বাইনগুলো যা এলোমেলো করেছ, এমনিই থাক। কেবল তোমারটা নিয়ে এসো।' এর পরের হুকুম হল, 'শোল্ডার আর্মস, রাইট টার্ন, কুইক মার্চ!' আমাকে ফায়ারিং পয়েন্টে নিয়ে যাওয়া হল। বধ্যভূমিযাত্রী মেষশাবকের মত অবস্থা আমার। সার্জেন্ট মেজর ফিসফিস করে বললেন, 'খবরদার, আমার মাথা যেন হেঁট না হয়!'

সেখানে পৌঁছতে পরিদর্শক অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন আমিই আমাদের ক্যাডেটদের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক কি না। বলা হল, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তিনি আমার কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়া দেখতে চান। মুখে সস্নেহ হাসি নিয়ে যেভাবে তিনি এ-কথা বললেন তাতে আমার মনে হল যে যত কর্তা-ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র এই ভদ্রলোকই বুঝতে পেরেছিলেন আমি কত একা, কত অসহায়—কোনো ছোট ছেলের পক্ষে বড় বড় গুণীজন-সম্মেলনে গুণপনার পরিচয় দিতে ডাকলে যা হয় আর কি!

যে ৪৫০ মার্টিনি কার্বাইন ক্যাডেটদের দেওয়া হত, বন্দুক ছুড়তে গেলে তা থেকে যে ভয়ঙ্কর ধাক্কা আসে তা যে-কোনো ছোট বন্দুকের থেকে বেশি। তার উপর সম্প্রতি মাস্কেট চালনা শিক্ষাকালে আমার বাঁ কাঁধে অত্যন্ত ব্যথা হয়েছিল—বিশেষ মাংস তো আমার কাঁধে ছিল না! সেই কাঁধে আবার ব্যথা লাগবার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে আমি আরও নার্ভাস হয়ে পড়লাম। যাই হ'ক পরীক্ষা আমায় দিতেই হবে,—ক্যাডেটদের মধ্যে যখন আমিই সবচেয়ে ছোট। তাই সার্জেন্ট মেজরের নির্দেশে আমি নুয়ে পড়ে যে পাঁচটা গুলি আমার জন্যে ছিল তাদের একটা তুলে নিলাম, কার্বাইনে ভরলাম, তারপর খুব আস্তে আস্তে সেটা কাঁধে তুলে যথারীতি লক্ষ স্থির করে ঘোড়া টিপে দিলাম। কিন্তু লক্ষ্যভেদের কোনো শ্রবণরঞ্জন ঠঙ্ শব্দ লাহার লক্ষ্যস্থল থেকে এল না, কেবল একটা ভোঁতা শব্দ শোনা গেল, তারপরই একটা শান্ত স্বর আমার কানে এল : 'ঠিক আছে, সার্জেন্ট-মেজর, আমি দেখছি এবার।' এই বলে পরিদর্শক অফিসার—ঝকঝকে তাঁর পোশাক—আমার পাশে এসে তেল-

চিটচিটে শতরঞ্জির উপর শুয়ে পড়লেন। বললেন, 'দেখি তোমার কার্বাইনটা।' সেটা দিতেই তিনি শক্ত হাতে ধরে, খুব সাবধানে ব্যাক-সাইটটা দুশো গজ দূরত্বে লাগালেন—এটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর কার্বাইনটা আমার হাতে দিয়ে আদেশ করলেন যেন তাড়াহুড়ো না করে লক্ষ স্থির করে গুলি করি। ব্যাকে চারটে গুলিই ঠঙ্ ঠঙ্ করে লক্ষে লাগল। আমার পিঠ চাবড়ে দিয়ে পরিদর্শক অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন, আমার স্কোর হয়েছে। মোট কুড়ি পয়েন্টের মধ্যে আমার হয়েছে দশ, আর প্রথম গুলিটা ফস্কে গেছে শুনে তিনি বললেন, 'চমৎকার! খাসা হয়েছে!' অন্যান্য অফিসার আর শিক্ষকদের সঙ্গে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন, আর আমিও ফিরে গেলাম আমার সঙ্গীদের মধ্যে—গর্বে যেন মাটিতে পা পড়ছে না! কিন্তু আমার এ গর্ব দীর্ঘস্থায়ী হল না, কারণ আমায় শুনে যেতে হল : 'জঘন্য!' 'সমস্ত দলটার মুখে কালি দিয়েছে!' 'চোখ বুজেও এর চেয়ে ভাল ছোড়া যায়!' 'ছি ছি, দেখেছ প্রথম-বারেরটা? লাগল কিনা গিয়ে একশো গজের গুলি যেখানে ছোড়া হয় সেখানে!' ছেলেরা ওই রকমই হয়ে থাকে। খোলাখুলিভাবেই তারা মনের কথা প্রকাশ করে, কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্যও যেমন থাকে না, তেমনি কেউ আঘাত পেতে পারে, সেই ভাবনাও থাকে না।

শুখা তাল লক্ষ্যভূমিতে আমার যখন একান্তই অসহায় ও দুর্বল লাগছে, তখন যে পরিদর্শক অফিসার আমার সহায় হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি দেশের অন্যতম বীরপুরুষ বলে আখ্যাত হয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত ফীল্ড-মার্শাল আর্ল রবার্টস্ বলে খ্যাত হয়েছিলেন। যখনই কখনো গুলি ছোড়ার ব্যাপারে বা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে গেছি (এমনটি বহুবার হয়েছে), সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে তাঁর শান্ত স্বরে তাড়াহুড়ো না করার উপদেশ, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি, সেই বীর সৈনিকের উপদেশের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করেছি।

নৈনিতাল ভলান্টিয়ারদের দীর্ঘকাল শাসক, সার্জেন্ট-মেজর লৌহ-কঠিন হাতে শাসন করতেন বটে, কিন্তু তাঁর হৃদয়টি ছিল সোনার। মানুষটি বেঁটে-খাটো, মোটা-সোটা, বৃষস্কন্ধ। সে-বছরের শেষ দিনের কুচকাওয়াজের পর তিনি আমায় জিগ্যেস করেছিলেন আমার একটা রাইফেল চাই কিনা। বিস্ময়ে আনন্দে আমার মুখে কথা সরল না। তিনি অবশ্য উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন না। তিনি বললেন, 'ছুটিতে বাইরে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করো। একটা রাইফেল তোমাকে দেব, আর সেই সঙ্গে গুলি-গোলা যত তোমার দরকার,—কিন্তু এই শর্তে যে, রাইফেল পরিষ্কার রাখবে, আর গুলির খালি কার্তুজগুলো আমায় ফেরত দেবে।'

ফলে সেবারের শীতে আমি যখন কালাধুঙ্গি গেলাম, আমার হাতে একটা রাইফেল, আর প্রচুর গোলাগুলি। যে রাইফেলটা সার্জেন্ট-মেজর আমায় বেছে দিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ নির্ভুল লক্ষ্য। রাইফেলটা ৪৫০ নম্বরের, তার গুলিও ভারি; কাজেই ছোট ছেলের শেখার পক্ষে আদর্শ না হলেও আমার কাজ চলে গেল। গুলতি নিয়ে যতদূর পারা যায়, তীরধনুক নিয়ে তার চেয়ে বেশি বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়েছিল, আর গাদা বন্দুকটা আমায় তীর-ধনুকেরও চেয়ে বেশি বনের গভীরে প্রবেশের ক্ষমতা দিয়েছিল। আর এখন এই রাইফেলটা পেয়ে বনের যে-কোনো অঞ্চল আমার কাছে উন্মুক্ত হল।

ভয় জীবজন্তুর সমস্ত অনুভূতিকে জাগ্রত করে, তাদের সর্বদা সতর্ক করে রাখে ও জীবনের আনন্দ অনুভূতিতে উৎসাহের সঞ্চার করে। ভয় একই ভাবে মানুষকেও প্রভাবিত করে। ভয় আমায় শিখিয়েছে নিঃশব্দে চলাফেরা করতে, গাছে উঠতে আর শব্দ নিখুঁতভাবে শুনে তার উৎস আবিষ্কার করতে; জঙ্গলের গভীরতম অন্তস্তলে প্রবশে করে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে এখন শেখা দরকার দৃষ্টিশক্তির আর রাইফেলের প্রকৃত ব্যবহার।

মানুষের দৃষ্টিশক্তির পরিধি ১৮০ ডিগ্রি; তাই, জঙ্গলে যেখানে সব রকম প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলতে পারে—বিষাক্ত সাপ থেকে আরম্ভ করে অন্য কারুর হাতে আহত জন্তু পর্যন্ত—সেখানে প্রয়োজন দৃষ্টিশক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে সমস্ত পরিধিটার উপর তা ছড়িয়ে থাকে। যা কিছু সামনে নড়াচড়া করে তা লক্ষ করা সহজ; কিন্তু যা কিছু নড়াচড়া করে দৃষ্টি-সীমানার বাইরে তা অস্ফুট আর অস্পষ্ট; এইসব অস্ফুট আর অস্পষ্ট নড়াচড়াগুলিই হয়ে ওঠে মারাত্মক। এদের ভয়ই সবচেয়ে বেশি। জঙ্গলের কোনো প্রাণীই স্বভাবত মারমুখো নয়; তবে অবস্থার বিপাকে পড়ে কোনো-কোনো প্রাণী মারমুখো হয়ে উঠতে পারে; এ-হেন সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাবধান হবার জন্যে দৃষ্টিশক্তিকে যথাসাধ্য তীক্ষ্ন করা দরকার। একবার একটা গাছের খোপের থেকে একটা গোখরো সাপের চেরা জিভ মুখের ভিতর ঢুকছে আর বেরোচ্ছে দেখে, আর একবার একটা ঝোপের আড়ালে একটা আহত চিতার লেজের ডগার নড়াচড়া দেখে আমি একেবারে চরম মুহূর্তে সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম—সাপটা ছোবল দিতে, আর চিতাটা আমার উপর লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়ে ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই ওরা ছিল আমার দৃষ্টি-পরিধির দূরতম সীমান্তে।

গাদা বন্দুকটা আমায় বারুদের ব্যবহারে সঞ্চয়ের অভ্যাস শিখিয়েছিল, আর এখন আমার রাইফেল হতে আমি ভেবে দেখলাম যে কোনো বিশেষ নিশানায় লক্ষ্য অভ্যাস করে গুলি নষ্ট করার চাইতে বন-মোরগ আর ময়ূরের উপর অভ্যাস করাই ভাল। কেবলমাত্র একবারই মনে পড়ে যখন পাখি মারতে

গিয়ে বেকায়দায় লেগে পাখিটা খাবার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল। কোনো পাখির পিছু নিয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে তাকে বাগে পেয়ে গুলি করতে যে সময় লাগত বা যে হাঙ্গামা পোহাতে হত তাতে আমার কোনো বিরক্তি ছিল না ; আর যখন ৪৫০ নম্বর রাইফেলে যেখানে ইচ্ছে সেখানে লক্ষ্যভেদ করার মত হাত হল, যে-সব অঞ্চলে আগে আমি ভয়ে প্রবেশ করতাম না সেখানে গিয়ে শিকার করার মত আত্মবিশ্বাসও আমার জন্মাল।

এমনি একটা অঞ্চল আমাদের বাড়িতে 'গোলাবাড়ির চত্বর' নামে খ্যাত ছিল,—ঘনসন্নিবদ্ধ গাছে আর লতায় ছাওয়া বহু মাইল বিস্তৃত এই এলাকায় অসংখ্য মোরগ আর বাঘ গুড়ি মেরে বেড়াত। 'গুড়ি মারা' কথাটা অতিশয়োক্তি নয়, অন্তত বনমোরগের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ; কারণ সেই সময়ে যত পাখি আমি ওখানে দেখেছি এমনটি আর কোথাও দেখি নি। কোটাকালাধুঙ্গি রোডের খানিকটা এই অঞ্চলের উপর দিয়ে গেছে ; ক-বছর পরে বুড়ো ডাক-হরকরা আমায় বলেছিল যে সে এই পথে 'পাওয়ালগড়ের কুমার' বাঘের থাবার ছাপ দেখতে পেয়েছে।

এই অঞ্চলের আশে-পাশে আমি আমার গুলতি আর গাদা বন্দুক ব্যবহারের দিনে মাঝে-মাঝে ঘুরে ফিরেছি, কিন্তু যতদিন না এই ৪৫০টা হাতে আসে ততদিন ভিতরে ঢুকতে সাহস করি নি। জঙ্গলটার মধ্য দিয়ে একটা গভীর অপরিসর দরিপথ চলে গেছে। একদিন সন্ধ্যায় আমি এই দরিপথ ধরে বেরিয়েছি রান্নার জন্যে একটা পাখি কিংবা গ্রামবাসীদের জন্য একটা শুয়োর শিকার করতে, এমন সময় আমার কানে এল, কতগুলো বন-মোরগ আমার ডানদিকের জঙ্গলে শুকনো পাতা আঁচড়াচ্ছে। দরিপথের একটা পাথরের উপর উঠে বসে পড়লাম, তারপর সন্তর্পণে মাথা তুলে দেখলাম, তীরের উপর গোটা কুড়ি-তিরিশ বন-মোরগ খেতে খেতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে,—একটা বুড়ো মোরগ পুরো পেখম খুলে তাদের পুরোভাগে। মোরগটাকে বেছে নিয়ে আমি বন্দুকের ঘোড়ায় হাত দিয়ে অপেক্ষা করছি কখন সে কোনো একটা গাছের সঙ্গে এক লাইন হচ্ছে (পেছনে কোনো শক্ত জিনিস না রেখে আমি কখনো কোনো পাখিকে গুলি করি না), এমন সময় দরিপথের বাঁয়ে একটা ভারি জন্তুর সাড়া পেলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড চিতা আমায় লক্ষ করে লাফাতে লাফাতে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। কোটা রোডটা ওখানে পাহাড়টা অতিক্রম করে চলে গেছে আমার থেকে দুশো গজ-টাক উপরে। বোঝা গেল রাস্তায় কিছু একটা থেকে ভয় পেয়ে চিতাটা প্রাণপণে দৌড়ে কোথাও গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে। বন-মোরগগুলোও চিতাটাকে দেখতে পেয়েছিল, তাই তারা প্রচুর ডানা-ঝট-পট করতে করতে উপরে উঠে গেল আর আমি চুপিসারে তার মুখোমুখি হলাম। চারদিকের

বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমার নড়াচড়া লক্ষ করতে না পেরে চিতাটা সোজা দৌড়ে এল,—থামল একেবারে দরিপথটার ধারে এসে।

দরিপথটা এখানে প্রায় পনেরো ফুট চওড়া,—তার দু-দিকে খাড়াই পাড় : বাঁ দিকে বার ফুট আর ডান দিকে আট ফুট। ডান দিকের পাড়ের ফুট-দুয়েক নিচে হল আমার বসার পাথরটা। চিতাটা তাই ছিল আমার থেকে একটু উঁচুতে, আর দরিপথটা যতটা চওড়া ততটা তফাতে। দরিপথের ধারে এসে সে পেছনে ফিরে তাকাতে তার অলক্ষিতে রাইফেলটা কাঁধে তুলে নেবার সুযোগ হল। তার বুক লক্ষ্য করে নিশানা ঠিক করলাম, এবং যে-মুহূর্তে সে আবার আমার দিকে মুখ ফেরাচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করলাম। কালো বারুদের কার্তুজ থেকে ধোঁয়ার মেঘ উঠে আমার দৃষ্টি আড়াল করল। এক ঝলকের মত কেবল দেখলাম, চিতাটা আমার মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে আমার পেছন দিকে গিয়ে পড়ল, আর যে পাথরের উপর আমি বসে ছিলাম সেখানে আর আমার পোশাকে ছোপ ছোপ রক্ত রেখে গেল।

রাইফেলের উপর পূর্ণ আস্থা আর নির্ভুল নিশানা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও যখন দেখলাম যে চিতাটা মরে নি, আহত হয়েছে মাত্র, আমার অত্যন্ত অস্বস্তি হতে লাগল। আঘাতটা যে গুরুতর হয়েছে তা আমি রক্তের পরিমাণ দেখে বুঝলাম ; কিন্তু রক্ত দেখে ক্ষতের স্থানটা, আর তা মারাত্মক হয়েছে কি না তা বোঝবার মত অভিজ্ঞতা তখনও আমার হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ না করলে পাছে সে পালিয়ে গিয়ে কোনো অগম্য গুহায় বা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে পারে যেখানে আর তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না, তাই আমি রাইফেলে আবার গুলি ভরে নিয়ে রক্ত অনুসরণ করে অগ্রসর হলাম।

সামনে একশো গজের মত সমতল জমি, মাঝে-মাঝে ছড়ানো-ছিটানো দু-একটা গাছ বা ঝোপ, তার পরেই খাড়াই পঞ্চাশ গজ মত নেমে গিয়ে আবার সমতল জমি। এই খাড়াই পাহাড়ের ধারে অনেকগুলো ঝোপ-ঝাড় আর বড় বড় পাথর, তারই কোনো একটার পেছনে হয়ত চিতাটা আশ্রয় নিয়েছে। চূড়ান্ত সাবধানতার সঙ্গে প্রতি ফুট জমির উপর সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছি। অর্ধেকটার মত নেমেছি, এমন সময় প্রায় গজ-কুড়ি দূরে একটা পাথরের পিছনে দেখলাম চিতাটার ল্যাজটা, আর পিছনের একটা পা। চিতাটা জীবিত কি মৃত বোঝা যাচ্ছে না, আমি নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও সেই পা-টা সরিয়ে নিল। এখন কেবল তার ল্যাজটা দেখা যাচ্ছে। সুতরাং চিতাটা বেঁচে আছে, এবং তাকে গুলি করতে হলে আমার হয় ডাইনে নয় বাঁয়ে একটু সরে যাওয়া দরকার। গায়ে গুলি লেগে যখন ও মরে নি তখন ঠিক করলাম এবার ওর মাথায় গুলি করব। এই

ভেবে আমি এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে বাঁ দিকে সরতে লাগলাম যতক্ষণ না তার মাথাটা দেখা যায়। পাথরটার উপর পিঠ দিয়ে সে শুয়ে ছিল, অন্য দিকে তাকিয়ে। আমি কোনো শব্দ না করলেও চিতাটা আমার এগিয়ে আসা বুঝতে পেরেছিল। আমার দিকে মুখ ফেরাতে যাচ্ছে, এই সময় আমার গুলি তার কানে গিয়ে বিঁধল। গুলিটা অল্প দূর থেকে ছোড়া হয়েছিল, তা ছাড়া আমি ভালভাবে লক্ষ্য স্থির করে তবে গুলি ছুড়েছিলাম, সুতরাং নিশ্চিত ছিলাম যে চিতাটা মারা পড়েছে। তখন আমি তার কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে টানতে টানতে সেই রক্তের মধ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম।

এই আমার প্রথম চিতা শিকার—তাই সেটার দিকে তাকিয়ে আমার যা মনোভাব হল তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। খাড়াই পাহাড় বেয়ে তার নেমে আসা থেকে শুরু করে পাছে রক্ত লেগে তার চামড়া নষ্ট হয়ে যায় তাই তাকে টেনে সরিয়ে আনা—সমস্ত সময়টার মধ্যে আমার একবারও হাত কাঁপে নি। কিন্তু এখন আমার সর্বশরীর থরথর করে কেঁপে উঠল—এই ভেবে যে, চিতাটা যদি লাফিয়ে উঠে আমায় ডিঙিয়ে না গিয়ে আমার মাথার উপর পড়ত, কী সর্বনাশই না হত তাহলে! সুন্দর প্রাণীটি শিকার করার আনন্দে, এবং তার চেয়েও বেশি, বাড়ি গিয়ে এই সাফল্যের কথা বললে বাড়ির সকলে আমারই মত খুশি হবে ও গর্ব বোধ করবে এই ভেবে আবার আনন্দেও কাঁপতে লাগলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে উঠি, নাচ শুরু করি, গান গেয়ে উঠি। কিন্তু সে-সব কিছুই করলাম না, কারণ আমার সেই অনুভূতি এই নির্জন বনে প্রকাশ করবার নয়,—অপরের সঙ্গে তা ভাগ করে তবে আমার শান্তি।

চিতা যে কত ভারি হতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু তবু আমি চিতাটাকে বাড়ি নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই রাইফেলটা নামিয়ে দারিপথ থেকে কতকগুলো রক্তকাঞ্চনের লতা সংগ্রহ করে এনে ভাল করে ছাড়িয়ে সেই শক্ত দড়ি দিয়ে চিতাটার চারটে পা একসঙ্গে করে বাঁধলাম। তারপর উবু হয়ে বসে তার পা-গুলো কাঁধে ফেলে ওঠবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। তখন আমি চিতাটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম পাথরটা পর্যন্ত। সেখান থেকে আবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তুলতে পারলাম না। যখন দেখলাম যে চিতাটাকে ফেলেই যেতে হবে, তাড়াতাড়ি কিছু ডাল-পালা ভেঙে এনে সেটাকে চাপা দিয় দৌড়তে-দৌড়তে বাড়ির পথ ধরলাম,—বাড়ি ওখান থেকে তিন মাইলের পথ। সব শুনে বাড়িতে প্রচুর উত্তেজনা ও আনন্দের সৃষ্টি হল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি ম্যাগি আর দুটো জোয়ান চাকরের সঙ্গে আমার প্রথম চিতাটাকে নিয়ে আসতে গোলাবাড়ির চত্বরের পথ ধরলাম।

আমার কপাল ভাল যে নতুন শিকারীদের ভুলচুকের জন্যে প্রকৃতি দেবী

শাস্তিবিধান করেন না। নতুবা চিতার সঙ্গে এই প্রথম সংঘাতই আমার শেষ সংঘাত হত। আমার ভুল হয়েছিল, আমার চিতাটাকে লক্ষ্য করে আমি যখন গুলি ছুড়েছিলাম তখন সে আমার থেকে উঁচুতে, এমনই দূরত্বে যে স্বচ্ছন্দে আমার উপর লাফিয়ে পড়তে পারে, তাছাড়া কোথায় মারলে এক গুলিতেই মেরে ফেলা যায়, তাও আমার জানা ছিল না। তখন পর্যন্ত আমার মোট শিকার বলতে গাদা বন্দুকে শিকার করা একটা চিতল, আর ৪৫০ রাইফেলে নিহত তিনটে শুয়োর ও একটা কাকার হরিণ। শুয়োরগুলো আর কাকারটাকে আমি একবারেই মেরে ছিলাম, তাই আমার বিশ্বাস ছিল যে বুকে গুলি করলেই চিতাটাকেও মারতে পারব,—এবং এইখানেই আমার ভুল হয়েছিল। পরে জেনেছিলাম যে চিতাকেও এক গুলিতে মেরে ফেলা যায় বটে, কিন্তু তা বুকে গুলি করে নয়।

গুলি মারাত্মক না হলে বা তাতে নড়াচড়ার ক্ষমতা লোপ না পেলে চিতা খ্যাপার মত লাফিয়ে ওঠে, এবং যদিও আহত হওয়ামাত্র চিতা কখনো শিকারীকে আক্রমণ করে না তাহলেও শিকারীর সঙ্গে চিতার হঠাৎ যোগাযোগ ঘটে যাবার একটা ভয় থেকেই যায়, বিশেষত চিতা যখন শিকারীর থেকে উঁচুতে এবং শিকারী যখন তার লাফের পাল্লার মধ্যে। আহত প্রাণী যখন তার আক্রমণকারীর অবস্থান জানে না, তখন এই ভয় আরো বেশি। সে যে লাফিয়ে আমার মাথার উপর না পড়ে আমার পিছনে গিয়ে পড়েছিল এ আমার নিতান্ত সৌভাগ্য ছাড়া কিছু নয়, কারণ যদি আমার উপর পড়ত তাহলেও তা আক্রমণের চেয়ে কম মারাত্মক হত না।

বুকে গুলির ফলাফল কত অনিশ্চিত হতে পারে তার উদাহরণ স্বরূপ আর একটা ঘটনা বিবৃত করছি। কালাধুঙ্গির জঙ্গলে ঘাস কমে এলে আমাদের গ্রামের গরু-বাছুর মাঙ্গোলিয়া খাট্টায় চরতে যেত। একবার শীতকালে আমি আর ম্যাগি সেখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করছিলাম। একদিন প্রাতরাশের সময় একপাল চিতলের ডাক শুনে বুঝলাম যে একটা চিতল চিতার কবলে মারা পড়েছে। এখানে একটা চিতা আমাদের গরু-বাছুর মারছিল। তাকে মারবার চেষ্টা করতেই আমার আসা তাই মনে হল এই সেই সুযোগ। ম্যাগিকে প্রাতরাশে রেখে একটা ২৭৫ রাইফেল নিয়ে আমি অনুসন্ধানে বেরোলাম।

চিতলের ডাকটা আসছিল আমাদের পশ্চিম দিকে চারশো গজ দূরে থেকে : কিন্তু সেখানে যেতে খানিকটা অভেদ্য বেত-ঝোপ আর জলা জায়গা এড়াতে ঘুরে যেতে হল। দক্ষিণ দিক থেকে বাতাসের মুখোমুখি চিতলদের দিকে অগ্রসর হতে দেখলাম গোটা-পঞ্চাশেক চিতল হরিণ আর হরিণী খানিকটা পোড়া ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে বেত-ঝোপটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বেতের ঝোপ আর খোলা জমির মাঝামাঝি জলা জমির মধ্যেই দুশো গজ মত

চওড়া একটা ঘাসজমি,—দেখলাম আমার থেকে ষাট গজ মত তফাতে খোলা জমিতে একটা চিতা একটা পুরুষ-চিতলকে ঘাস-জমিটার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। চিতলগুলির অলক্ষ্যে থেকে চিতাটার আরো কাছাকাছি আসা, সম্ভব নয়, এবং তারা আমায় দেখতে পেলেই ডাকাডাকি করে চিতাটাকে সতর্ক করে দেবে। তাই আমি বসে পড়লাম এবং তারপর রাইফেলটা তুলে সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

চিতল হরিণটা যেমন বড় তেমনি ভারি, রুক্ষ মাটির উপর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চিতাটার বেগ পেতে হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাই সে চিতলটাকে ছেড়ে দাঁড়াল আমার দিকে মুখ করে। চিতার বুকে কালো কালো ছোপগুলো থাকায় নিখুঁত রাইফেল হলে ষাট গজ দূরে থেকেও লক্ষ্যভেদ করা সহজ, এবং ঘোড়াটা টিপবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝলাম আমি যেখানে চেয়েছি সেখানেই গুলিটা লেগেছে। গুলি লাগতেই চিতাটা শূন্যে লাফিয়ে উঠল, তারপর চার পায়ে মাটিতে পড়েই সবেগে ঘাস-জমি লক্ষ্য করে ছুটল। চিতাটা যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে দেখলাম, রক্তের দাগ ঘাস-জমির দিকে চলে গেছে,—এখানকার ঘাস কোমর পর্যন্ত উঁচু। একটা গাছ থেকে কিছু ডালপালা ভেঙে নিয়ে চিতলটাকে ঢেকে দিলাম যাতে শকুনের নজরে না পড়ে, কারণ চিতলটার গা ভেলভেটের মত, বয়সেও তাজা,—আমাদের লোকেরা চামড়াটা পেলে খুশি হবে। তারপর তাঁবুতে ফিরে এসে প্রথমে প্রাতরাশ সারলাম, তারপর আমাদের চারজন প্রজাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চিতলটা আনতে আর আহত চিতাকে অনুসরণ করতে। যেখান থেকে গুলি করেছিলাম তার কাছাকাছি যেতে একজন আমার কাঁধে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে, আমাদের সামনে ডানদিকে যেখানে পোড়া জমি শেষ হয়ে ঘাস-জমি শুরু হয়েছে সেই জায়গাটায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে আমায় যা দেখাতে চাইছিল কিছুক্ষণ পরে তা আমার চোখে পড়ল। দেখলাম একটা চিতা,—ঘাস-জমির কিনারায় আমাদের থেকে আড়াইশো গজ মত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমাদের প্রজারা যখন আমাদের সঙ্গে তাঁবুতে থাকত, কোনো কাজের জন্যে কিছুতেই কোনো পারিশ্রমিক নিত না, কিন্তু জঙ্গলে এলে তখন আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত, কে সবার আগে কোন্ শিকারের সন্ধান দিতে পারে, আর তাতে যখন আমি হারি, মহানন্দে তারা বাজির টাকাটা গ্রহণ করে। যে-দুজন চিতাটা একইসঙ্গে দেখেছে বলে দাবি করছিল, তাদের হাতে বাজির টাকাটা তুলে দিয়ে আমি তাদের বললাম বসে পড়তে: কারণ ইতিমধ্যে চিতাটা মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। বুঝলাম এ নিশ্চয় সেই আহত চিতাটার জোড়া, এবং এও আমারই মত আকৃষ্ট হয়ে

দেখতে এসেছে তার সঙ্গী কী শিকার করেছে। আমাদের থেকে একশো গজ দূরে ঘাসের কয়েকটা গুচ্ছ খোলা জায়গাটার দিকে কয়েক গজ এগিয়ে গেছে, সেখান থেকে মরা চিতলটা দেখা যায়। কয়েক মিনিট সে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। ইচ্ছে করলেই তার বুকে গুলি করতে পারতাম, কিন্তু একটা চিতাকে তো বুকে গুলি করে আহত করে রেখেছি, তাই আর তখন গুলি করলাম না।

মড়িটার উপর যে-সব ডালপালা চাপা দিয়েছি চিতাটা অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে সেগুলো লক্ষ করতে লাগল। যাই হ'ক, চারদিকে সাবধানী দৃষ্টিপাত করে সে সন্তর্পণে মড়িটার দিকে অগ্রসর হল, আর তা করতে গিয়ে যেই সে আমার দিকে পাশ করে দাঁড়াল, তার বাঁ কাঁধের দু-এক ইঞ্চি নিচে লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপে দিলাম। গুলি লাগতেই সে পড়ে গেল, আর নড়ল-চড়ল না। কাছে গিয়ে দেখলাম মারা গেছে সে। বাঁশে করে বেঁধে নিয়ে গিয়ে চিতাটাকে তাঁবুতে রেখে চিতলটার জন্যে আবার ফিরে আসবার নির্দেশ দিয়ে আমি সেই কোমর পর্যন্ত উঁচু ঘাস-জমির মধ্যে আহত চিতাটাকে অনুসরণের অত্যন্ত অপ্রীতিকর কাজে ব্যাপৃত হলাম।

আহত প্রাণীকে যেমন করে হ'ক বার করে মারতে হবে—এই অলিখিত আইন সমস্ত শিকারীই মেনে চলে। এবং মাংসাশী প্রাণীর ব্যাপারে বিভিন্ন শিকারীর এ বিষয়ে নিজ-নিজ পদ্ধতি আছে। যারা সঙ্গে হাতি নিয়ে আসে, এ কাজ তাদের পক্ষে সহজ; কিন্তু যারা আমার মত মাটিতে দাঁড়িয়ে শিকার করে, নিজ-নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই তাদের জানতে হবে কিভাবে কোনোরকম ঝুঁকি না নিয়ে সেই মাংসাশী প্রাণীর সমস্ত জ্বলা-যন্ত্রণা দূর করা সম্ভব। জঙ্গলে আগুন দিয়ে আহত জন্তুকে তাড়িয়ে আনার পদ্ধতিটা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ক্ষতিকর; কারণ যদি তার নড়াচড়ার শক্তি থাকে, সে হয়ত পালিয়ে অন্য কোথায়ও গিয়ে মরবে, অনেক দিন অনেক সপ্তাহ কষ্ট পেয়ে। আর তেমন মারাত্মক আহত হয়ে যদি তার চলৎশক্তি না থাকে তাহলে অতি অবশ্যই তাকে জীবন্ত পুড়ে মরতে হবে।

বড় বড় ঘাসে ছাওয়া জায়গায় মাংসাশী প্রাণীর রক্ত-চিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা। তাই এ-হেন ঘাস-জমিতে কোনো আহত প্রাণীকে অনুসরণ করতে হলে আমি রক্ত-চিহ্ন না দেখে লক্ষ করি কোন্ দিকে সে গেছে, তারপর এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে অগ্রসর হই সেদিকে—একই সঙ্গে বিপদের জন্যে তৈরি থাকি, আবার সাফল্যের আশা পোষণ করি। যে-কোনো আহত প্রাণী সামান্যতম শব্দ শুনলেও হয় আক্রমণ করে, কিংবা কোনোরকম নড়াচড়া ক'রে তার অবস্থিতি জানিয়ে দিয়ে থাকে। আক্রমণ যদি কার্যকরী না হয় এবং নড়াচড়ার ফলে তার অবস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে একটা ঢিল বা কাঠের টুকরো কিংবা একটা টুপি ছুড়েও কাজ হাসিল করা

যেতে পারে, কারণ যেই সে সেই নিক্ষিপ্ত বস্তুটিকে আক্রমণ করবে তক্ষুনি তাকে গুলি করলেই হল। এ ব্যবস্থা কার্যকরী হয় তখনই, যখন ঘাসকে আন্দোলিত করবার মত বাতাস না থাকে, এবং শিকারীর ঘাসের মধ্যে গুলি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকে। কারণ আহত মাংসাশী প্রাণী বিরক্ত হলে যতই গর্জন করুক তারা লুকিয়ে থাকে মাটির সঙ্গে মিশে, এবং পারতপক্ষে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে না।

মাঙ্গোলিয়া খাট্টা'য় সেদিন কিছুমাত্র বাতাস ছিল না, তাই আমি লোকজনদের ছেড়ে দিয়ে রক্ত-চিহ্ন ধরে পোড়া মাটি ধরে এগোতে-এগোতে ঘাস-জমির মধ্যে প্রবেশ করলাম। রাইফেল গুলি-ভরা আছে এবং ঠিক চালু আছে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে আমি অত্যন্ত সন্তর্পণে সেই ঘাস-জমির মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে একটা শিস্ শুনতে পেলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমার লোকজন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাদের কাছে ফিরে যেতে তারা আমায় মরা চিতাটা দেখালো। দেখলাম তার শরীরে তিনটে গুলির গর্ত রয়েছে। জন্তুটাকে বাঁশের সঙ্গে বাঁধতে গিয়ে এটা তাদের চোখে পড়ে। বাঁ কাঁধের ঠিক পিছনে এক গর্ত ; এই গুলিতেই চিতাটা মারা পড়েছে। বুকের ঠিক মাঝখানে একটা গর্ত। লেজের গোড়া থেকে দু'ইঞ্চি দূরে আরেকটা গর্ত—এই গর্ত দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে।

ভাবলে কষ্ট লাগে, চিতাটার মড়িতে ফিরে আসবার একটা কারণ ছিল এবং সে কারণ যখন জানতে পারলাম, অনুশোচনায় আমার মন ভরে উঠল। চিতার বাচচারা অতি অল্প বয়স থেকেই নিজেদের খাবার সংগ্রহ করতে শেখে—ছোট ছোট পাখি, ইঁদুর ব্যাঙ ইত্যাদি মারে ; আমি কেবল আশা করি যে, যে বীর-মাতা আহত হওয়া সত্ত্বেও সন্তানদের জন্যে খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে প্রাণহানির আশঙ্কা পর্যন্ত উপেক্ষা করল, তার সন্তানদের নিজেদের জন্যে খাদ্য সংগ্রহের বয়স হয়েছে ; কারণ অনেক সন্ধান করেও আমি তাদের দেখা পাই নি।

এই যে আমি বললাম আহত চিতাটার পিছু নেবার জন্যে ঘাস-জমিতে ঢোকার আগে আমি নিশ্চিত হয়ে নিলাম রাইফেলটা গুলি-ভরা আর চালু আছে, শিকারীদের কাছে এ ব্যপারটা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে, কারণ এর এক মিনিট আগেই যখন আমি একটা গুলি-বিদ্ধ চিতার কাছে গিয়েছিলাম তখন আমার রাইফেল নিশ্চয়ই খালি ছিল না, কারণ আমি তখনও জানি না, সে জীবিত কি মৃত। কাজেই রাইফেলে গুলি ভরা আছে কি না সে বিষয়ে নতুন করে নিশ্চয় হবার আর কী দরকার হতে পারে? বলছি। কেবল এই বিশেষ ক্ষেত্রে নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমি তা করেছি,—যখনই রাইফেলের গুলি ভরা থাকা না থাকার উপর আমার জীবন মরণ নির্ভর করেছে। সৌভাগ্যবশত এ

শিক্ষা আমার হয়েছিল অল্প বয়সেই, এবং আজও যে আমি বেঁচে থেকে এ কাহিনী শোনাতে পারছি, আমার ধারণা এই কারণেই তা সম্ভব হয়েছে।

মোকামা ঘাটে কাজ শুরু করার অল্পদিন পরেই ('আমার ভারত' বইয়ে আমি সে-কথার উল্লেখ করেছি) আমি শিকারের জন্যে দুই বন্ধুকে কালাধুঙ্গিতে নিমন্ত্রণ করে আনি। সিলভার আর ম্যান ভারতে নতুন এসেছে, জঙ্গলে গুলি ছোড়ার কোনো অভিজ্ঞতাই তাদের ছিল না। ওরা যেদিন আসে তার পরের দিন সকালে আমি ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। হলদোয়ানি রোড ধরে মাইল-দুই অগ্রসর হবার পর আমি সাড়া পেলাম, রাস্তার ঠিক ডান দিকেই একটা চিতা একটা হরিণ মারছে। ওদের পক্ষে চিতাটার পিছু নেওয়া সম্ভব নয় বুঝে আমি ঠিক করলাম ওদের একজনকে মড়ির উপরের একটা গাছে উঠতে বলব। আমি ওদের লটারি করে স্থির করতে বললাম, কে থাকবে। সিলভারের ছিল.৫০০ ডি. বি. রাইফেল, আর ম্যান-এর .৪০০ এস. বি. ব্ল্যাক পাউডার রাইফেল,—দুটোই পরের জিনিস, ধার করা। আর আমার ছিল ২৭৫ ম্যাগাজিন রাইফেল। সিলভারের বয়স একটু বেশি আর তার অস্ত্রও একটু বেশি ভাল বলে ম্যান প্রচুর খেলোয়াড়ি মনোভাবের পরিচয় দিয়ে লটারিতে রাজি হল না, এবং আমরা তিনজনেই একসঙ্গে মড়ির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। যখন সন্ধান পেলাম, চিতল হরিণটা তখনও ছটফট করছে—চমৎকার পুরুষ-চিতল একটা। সিলভারের জন্যে একটা গাছ ঠিক করে আর ম্যানকে তার সাহায্যের জন্যে রেখে আমি চিতাটাকে তাড়াতে উদ্যোগী হলাম, পাছে সে সিলভারের গাছে ওঠাটা দেখে ফেলে। চিতাটা ছিল অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, এখান থেকে তার নড়বার ইচ্ছে ছিল না। যাই হ'ক, সামনাসামনি ঘুরে ফিরে সবদিক থেকে তাড়া লাগিয়ে আমি ওকে তাড়াতে সমর্থ হলাম। তারপর ফিরে এলাম মড়িটার কাছে। সিলভার জীবনে কোনো গাছে ওঠে নি, তাই সে প্রচুর অস্বস্তি বোধ করছিল, এবং যখন তাকে বললাম যে চিতাটা একটা বিরাট পুরুষ-চিতা এবং খুব সাবধান হয়ে তাকে গুলি করা উচিত, সে নিশ্চয়ই তাতে খুব উৎফুল্ল হয় নি। মিনিট পাঁচেক মাত্র অপেক্ষা করতে হবে—তাকে এই আশ্বাস দিয়ে আমি ম্যানকে নিয়ে চলে গেলাম।

মড়ি থেকে একশো গজ দূরে একটা দাবানল-পথ হলদোয়ানি রোডকে সমকোণে কেটে চলে গেছে। এই পথ ধরে ম্যান আর আমি জঙ্গলের দিকে সামান্যমাত্র অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় সিলভার অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটো গুলি ছুড়ে ছিল। সেদিকে ফিরতেই দেখি, চিতাটা দাবানল-পথটা কেটে সবেগে ধেয়ে চলেছে। সিলভার বলতে পারল না চিতাটার গায়ে গুলি লেগেছে কি না, তবে, যেখানে আমরা ওকে দাবানল-পথটা কেটে চলে যেতে দেখেছিলাম সেখানে রক্তের চিহ্ন দেখা গেল। সঙ্গীদের সেখানে আমার প্রতীক্ষায় বসে

থাকতে বলে আমি একা চিতাটার পিছু নিলাম। এই ব্যাপারের মধ্যে বীরত্বের কিছু নেই, বরং তার উল্টোটাই, কারণ আহত মাংসাশী প্রাণীর পিছু নিতে হলে অনন্য-মনে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন ; সে ক্ষেত্রে সঙ্গীদের গুলি-ভরা বন্দুকের ঘোড়ায় হাত-থাকা অস্বস্তিকর। আমি খানিকটা এগোতে সিলভার এসে আমার সঙ্গী হতে চাইল। আমি রাজি না হওয়ায় সিলভার অনুরোধ করল অন্তত তার রাইফেলটা সঙ্গে নিতে,—কারণ যদি চিতাটা আমায় আক্রমণ করে আর আমার হাল্কা রাইফেল আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয় তাহলে তার অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। ওকে খুশি করবার জন্যে আমরা রাইফেল বদলা-বদলি করলাম। সিলভার ফিরে গেল, আর আমিও এগিয়ে চললাম ; কিন্তু তার আগে রাইফেলের ভাঁজটা খুলে দেখে নিশ্চয় হয়ে নিলাম যে চেম্বারে দুটি গুলি ভরা আছে।

শ-খানেক গজ মত জমি মোটামুটি ফাঁকা, তারপরই কিন্তু রক্তের দাগ আবার ঘন ঝোপের মধ্যে ঢুকেছে। সেখানে প্রবেশ করতে গিয়ে চিতাটার সাড়া মিলল—আমার সামনের দিকেই সে নড়ে উঠল। মুহূর্তের জন্যে মনে হল বুঝি সে আমায় আক্রমণ করবে, কিন্তু সে সাড়া আর দ্বিতীয় বার পেলাম না। তাই অত্যন্ত সন্তর্পণে আমি ঝোপটার মধ্যে প্রবেশ করলাম। কুড়ি গজ মত অগ্রসর হয়ে, যে জায়গায় সে শুয়ে ছিল আর যেখান থেকে তার সরে যাওয়ার শব্দ আমি শুনেছিলাম সে জায়গাটার সন্ধান পেলাম। এখন আমাকে এক পা এক পা করে অগ্রসর হতে হবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দেড়শো গজ এভাবে চিহ্ন ধরে অগ্রসর হবার পর বন অনেকটা ফাঁকা হয়ে এল। এখন আমার পক্ষে আর একটু দ্রুত চলা সম্ভব হল। আরও একশো গজের মত এগোবার পর একটা বড় হলদু গাছের কাছে এসেছি, এমন সময় গাছটার ডাইনে চিতাটার বেরিয়ে-থাকা লেজের আগাটা আমার চোখে পড়ল। বোঝা গেল তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে এ কথা বুঝতে পেরে সে আক্রমণের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধের বলে এই জায়গাটা বেছে নিয়েছে, এবং সে যে আক্রমণ করবেই সে বিষয়ে আমার সন্দেহ-মাত্র রইল না।

সোজাসুজি আক্রমণ প্রতিহত করাই আমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে এই স্থির করে আমি গাছটার বাঁ দিকে সরে গেলাম। চিতাটার মাথাটা আমার চোখে পড়ল,—আমার দিকে মুখ করে সে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, তার থুতনি সামনের দিকে প্রসারিত দুই থাবার উপরে। তার চোখ খোলা, তার দু-কানের ডগা আর জুলপি কাঁপছে। আমি যখন গাছটার বাঁ দিকে গেলাম তখনই তার আক্রমণ করার কথা, কিন্তু তা যখন করে নি তখন আমিও গুলি করলাম না কারণ, মাত্র কয়েক ফুট তফাত থেকে তার মাথাটা উড়িয়ে দেওয়া আমার ইচ্ছে ছিল না, আমার ইচ্ছে ছিল তার শরীরে কোথাও গুলি করব যাতে সিলভারের

শিকার নষ্ট না হয়। আমি একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তার চোখ বুজে এল। বুঝলাম মারা গেছে চিতাটা,—আমার চোখের সামনে। আরও নিশ্চয় হবার জন্যে আমি কাশলাম, কিন্তু তাতেও কোনো সাড়া না পেয়ে তখন একটা ঢিল তুলে তার মাথায় মারলাম।

আমার ডাক শুনে সিলভার ও তার ম্যান আমার কাছে এল। রাইফেলটা সিলভারের হাতে দেবার আগে আমি ভাঁজটা খুলে গুলিদুটো বার করলাম। মহা আতঙ্কের সঙ্গে দেখলাম, দুটো গুলিই খালি, শুধু খোলদুটো আছে। গুলি-না-ভরা রাইফেলের টোটা টিপে অনেক শিকারীই বিপদে পড়েছে,—আর রক্তের দাগ লক্ষ করে এগোতে এগোতে যদি আমার গতি মন্থর না হত তাহলে আমাকেও তাদের দলে পড়তে হত। এই যে শিক্ষা আমার হল, আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে সেজন্যে আমায় কোনো বিপদে পড়তে হয় নি ; এবং সেই থেকে আর কখনো আমি বন্দুক ঠিকমত গুলি ভরা আছে এ বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কোনো বিপজ্জনক কাজে অগ্রসর হই নি। দোনলা রাইফেল হলে গুলি একটা নল থেকে অপর নলটায় বদলে নিই, আর একনলা হলে আমি গুলিটা বার করে দেখি বোল্টটা ঠিকমত কাজ করছে কি না, তারপর আবার ভরে নিই গুলিটা।





১০

কুঁয়ার সিং, যার কথা আমি 'আমার ভারত' বইয়ে লিখেছি, কালাধুঙ্গির কাছাকাছি জঙ্গলে শিকারে তার ঘোরতর আপত্তি ছিল। কারণ সেখানে এত বেশি লতাপাতা মাটি ছেয়ে থাকত যে কর্তব্যপরায়ণ বনরক্ষক বা ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের কবল থেকে পালাতে খুব অসুবিধে হত। এই কারণে সে তার চোরাই শিকারের সমস্ত কার্যকলাপ গারুপ্পুর বনেই সীমাবদ্ধ রাখত। বনের নাড়িনক্ষত্র তার জানা, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী, তাকে সেইজন্য আমি শ্রদ্ধাও করি, কিন্তু শিকারী হিসেবে তাকে অতটা দাম দিতে পারি না, কারণ যে সব বনে সে শিকার করত, সেখানে শিকারের প্রাণী অসংখ্য। জীবজন্তুর প্রতিটি চলার পথ, আর হরিণ চরে এমন প্রত্যেকটি ফাঁকা জায়গা তার ভালভাবে জানা থাকার ফলে সে সোজা বনে প্রবেশ করত, চুপিসারে প্রবেশ করার প্রয়োজন বোধ করত না ; ভাবটা যেন এই যে, যদি বা একটা ফাঁকা জায়গায় হরিণগুলো চমকে পালিয়ে যায় তো আরেকটায় নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি হরিণ মিলবে। কিন্তু তবুও আমার অনেক শিক্ষাই কুঁয়ার সিং-এর হাতে হয়েছে যা আমি সর্বদাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে এসেছি ; অজানা সম্বন্ধে আমার মধ্যে যে আতঙ্ক ছিল তারও কিছুটা আমার দূর হয়েছে তারই কল্যাণে। এ-হেন একটা আতঙ্ক হল দাবানল। দাবানলের বিপদের কথা শুনে আর আমাদের জঙ্গলে তার পরিণতি লক্ষ করে এই ভয়ই আমার মনের অন্তরালে আশ্রয় করেছিল যে কোনোদিন আমি দাবানলের কবলে পড়ে জীবন্ত পুড়ে মরব। কুঁয়ার সিংই আমার মন থেকে এই ভয় দূর করে দেয়।

কুমায়ুনের পাদদেশীয় গ্রামাঞ্চলের মানুষরা সবাই পরস্পরের ব্যাপারে

কৌতূহলী, আর যে-সব মানুষ কখনো খবরের কাগজ চোখে দেখে না এবং যাদের জীবন তাদের গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি ঘিরে যে জঙ্গল তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ, যে-কোনো সামান্য খবরও সেখানে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি করে ও মুখে মুখে ফিরতে থাকে, বার-বার শুনেও তা পুরনো হতে চায় না। তাই যখন সে আমার প্রথম চিতা শিকারের খবর পেল তখনো চিতাটার শরীর ঠান্ডা হয়েছে কি না সন্দেহ, এবং খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তি নিয়ে এসে আমাকে অভিনন্দন জানাতেও তার দেরি হল না। সার্জেন্ট মেজরের দেওয়া রাইফেলটার কথা সে জানত বটে, কিন্তু চিতাটা না মারা পর্যন্ত সে বিশ্বাস করতে পারে নি যে তা ব্যবহার করার সামর্থ্য আমার আছে। এখন এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে সে আমার আর আমার রাইফেলের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। সেদিন সে চলে যাবার আগে কথা হল, পরদিন ভোর পাঁচটার সময় গারুপ্পু রোডের চার নম্বর মাইল-স্টোনের কাছে আমার তার সঙ্গে দেখা হবে।

ম্যাগি যখন এক কাপ চা তৈরি করে আমার হাতে দিল তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক ঘণ্টা সময় থাকতে আমি কুঁয়ার সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে বেরোলাম। এই নির্জন জংলা পথে আমি এইভাবে অনেকবার হেঁটেছি, তাই অন্ধকারের ভয় আমার ছিল না। চার নম্বর মাইল-স্টোনের কাছে পৌঁছতে রাস্তার ধারের একটা গাছের নিচে আগুন দেখতে পেলাম। কুঁয়ার সিং আমার আগেই এসে গেছে। আগুনে হাতদুটো গরম করব বলে তার পাশে বসতেই সে বললে, 'কি কাণ্ড, তাড়াতাড়িতে ট্রাউজার্স পরতেই ভুলে গেছ!' বৃথাই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমি ভুল করি নি, এই প্রথম আমি একটা নতুন ধরনের পোশাক পরেছি যাকে বলা হয় শর্টস্। কিন্তু তবুও সে বলে চলল যে আমি যা পরে আছি তা জাঙিগয়া মাত্র এবং বনে শিকারের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত,—এবং তার দৃষ্টি দিয়ে এটাই সে বলতে চায় যে আমার পোশাক যে-রকম অভব্য তাতে আমার সঙ্গে তাকে দেখা গেলে তার মাথা কাটা যাবে। শুরুতেই এই বাগড়া পড়ার ফলে সহজে আবহাওয়া পরিষ্কার হল না যতক্ষণ না কাছের একটা গাছে একটা মোরগ ডেকে উঠল। শুনেই কুঁয়ার সিং তক্ষুনি খাড়া হয়ে উঠল, তারপর আগুনটা নিবিয়ে দিয়ে বললে, 'এবার বেরিয়ে পড়া দরকার, কারণ অনেকটা যেতে হবে।'

সেখান থেকে বেরোতেই জঙ্গলে প্রাণের সাড়া জেগে উঠতে লাগল। যে বনমোরগটা আমাদর আগুনের সাড়ায় জেগে উঠে নতুন দিনকে স্বাগত করে ডেকে উঠেছিল, সে যেন একটা শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করে প্রতিটি পাখি ছোট-বড় নির্বিশেষে ঘুম ভেঙে উঠে এই ক্রমবর্ধমান শব্দ-সমষ্টিতে কণ্ঠ মেলাচ্ছে। বনমোরগটা সর্বপ্রথম চোখ থেকে ঘুম তাড়ালেও সবার আগে কিন্তু সে মাটিতে নামল না। ভোরবেলার প্রথম পতঙ্গ-শিকারের অধিকার হিমালয়ের হুইস্‌লিং

প্রাণের। যার আরেক নাম হুইস্‌লিং স্কুলবয়। কুমায়ুনের বনে বনে দিন আর রাত্রির মধ্যে আধো-আলো-আঁধারির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দেখা যাবে কোনো পাখি হয়ত নিঃশব্দ পাখায় ভর করে গানের সোনালি ঝরনা বইয়ে দিল,—সে গান একবার শুনলে আর কোনোদিন ভোলবার নয়। এই গায়ক পাখির নামই হুইস্‌লিং স্কুলবয়। একটা দিনকে বিদায়ী শুভরাত্রি জানিয়ে সে আরেকটা নতুন দিনকে স্বাগত জানায়। সকাল-সন্ধ্যা সে উড়তে উড়তে গান গাইতে থাকে, আর দিনের বেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনো পত্রবহুল গাছে বসে মিষ্টি সুরে নিচু গলায় এমন এক গান গেয়ে যায় যার না আছে শুরু না আছে সমাপ্তি। তার পরে দিনের আলোকে স্বাগত জানায় কোনো ভিমরাজ, আর তার মিনিটখানেক পরেই কোনো ময়ূর। বিরাট শিমুল গাছটার সবচেয়ে উঁচু ডাল থেকে এই তীক্ষ্ন ডাক ওঠে, এবং তার পরে আর কোনো পাখির পক্ষেই ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব হয় না। আর এই সময়ে, যখন রাত চলে যাচ্ছে আর ভোর হচ্ছে, শত-শত প্রাণময় কণ্ঠস্বর প্রকৃতির ঐকতানে যোগ দেয়, ধ্বনি ক্রমবর্ধমান আন্দোলনে জঙ্গল মুখর করে তোলে।

আর শুধু পাখিই নয়, জীবজন্তুরাও এখন বেরোতে শুরু করেছে। চিতল হরিণের ছোট-খাট একটা দল আমাদের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। তারও দুশো গজ তফাতে একটা স্ত্রী-সম্বর আর তার বাচ্চা রাস্তার ধারের ছোট ছোট ঘাস খেয়ে চলেছে। এবার পুব দিক থেকে একটা বাঘ ডেকে উঠল, ময়ূরেরা শুনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। কুঁয়ার সিং-এর ধারণা বাঘটার দূরত্ব বন্দুকের গুলির পাল্লার চার গুণ,—বাঘটা আছে সেই বালিভরা নালায় যেখানে সে আর হর সিং মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পড়েছিল। বোঝা গেল বাঘটা কোনো মড়ি থেকে ফিরছে, তাই সে পরোয়া করে না কে তাকে দেখল বা না দেখল। প্রথমে একটা কাকার হরিণ, তারপর দুটো সম্বর, আর এখন একপাল চিতল বনের বাসিন্দাদের তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে লাগল। আমরা যখন গারুপ্পু পৌঁছলাম রোদ তখন গাছের আগায়। তারপর কাঠের সাঁকোটা পার হয়ে, ঘাটের বিধ্বস্ত বাড়িটার পাশে খোলা জমিতে গোটা পঞ্চাশ ষাট বন-মোরগ চরছিল তাদের চমকে দিয়ে আমরা একটা পায়ে-চলা পথ ধরে অগ্রসর হলাম—একটা সরু ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। এ পথ সেই শুকনো জলপথে গিয়ে পড়েছে যেটার উপরকার সাঁকো আমরা এইমাত্র পার হয়ে এলাম। এই জলপথে প্রবল বর্ষার সময়ে ছাড়া কোনো ঋতুতেই জল থাকে না। বনের সকল প্রাণীর এটা রাজপথ ;—তিন মাইল নিচে যেখানে স্বচ্ছ জলের ঝরনাটার উৎস সেখানে সকল প্রাণীই যায় এই পথে তৃষ্ণা দূর করতে। পরবর্তীকালে এই জলপথ আমার রাইফেল ও ক্যামেরার একটি প্রিয় শিকার-স্থল হয়ে উঠেছিল,—কারণ যে অঞ্চল দিয়ে এটা চলে গেছে সেখানে শিকার অজস্র :

সেখানে বালির উপর মানুষের পায়ের চিহ্ন রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপে ফ্রাইডের পায়ের ছাপের মতই রহস্যময় হয়ে ওঠে।

আধ-মাইলটাক ঝোপ-জঙ্গল দিয়ে চলে যাবার পর এই জলপথ সিকি মাইল চওড়া আর মাইলের পর মাইল লম্বা একখানি নলবনের মধ্যে প্রবেশ করে। নলঘাস ফাঁপা, বাঁশের মত গাঁট গাঁট, চোদ্দ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। যেখানে এ বস্তু গ্রামের ধারে-কাছে পাওয়া যায় সে অঞ্চলে গ্রামবাসীরা কুটির নির্মাণের কাজে এর প্রচুর ব্যবহার করে। গরু-ভেড়ার চারণভূমির জন্যে যখন গ্রামবাসীরা গারুস্পুর আশে-পাশের জঙ্গল পুড়িয়ে দেয়, এ অঞ্চলের সমস্ত প্রাণী তখন গিয়ে নল-ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, কারণ জায়গাটা স্যাঁত-সেঁতে বলে এখানকার নল-ঘাস সারা বছর সবুজ থাকে। কোনো-কোনো বছরে অবশ্য বর্ষা যখন অত্যন্ত কম হয় তখন এই নল-বনে আগুন ধরে, এবং তা থেকে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়, কারণ ঘাসের সঙ্গে এখানে লতা-পাতা জড়িয়ে-মড়িয়ে থাকে। আর নল-ঘাসের প্রতিটি গাঁট যখন আগুন লেগে ফেটে পড়ে তখন আওয়াজ হয় বন্দুকের গুলির মত, এবং যখন কোনো-কোনো গাঁট একসঙ্গে ফাটতে শুরু করে তখন যে শব্দের সৃষ্টি হয় তা কানে তালা ধরিয়ে দেবার মত ; সে শব্দ শোনা যায় এক মাইলেরও বেশি দূর থেকে।

সেদিন সকালে কুঁয়ার সিং-এর সঙ্গে জলপথটা ধরে এগোতে এগোতে দেখি, কালো ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দূর থেকে আগুনের শব্দ আর নল-বন থেকে গাঁট ফাটার শব্দ আমার কানে এল। জলপথটা চলে গেছে দক্ষিণ দিকে, আর পুব বা বাঁ পাড় থেকে আগুনটা, জোর বাতাসে সেদিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কুঁয়ার সিং আগে আগে যাচ্ছিল, সে বললে দশ বছর পরে আজ নল-বনে আগুন লাগল। সিধে এগিয়ে চলল সে। একটা বাঁকে মোড় ফিরতে আমাদের আগুনের দেখা মিলল—জল-পথের থেকে শ-খানেক গজ দূরে। আগুনের বিরাট বিরাট শিখা কালো ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে ; যে সব উড়ন্ত পোকা গরম হাওয়ার তাপে পাক খেতে-খেতে উপরে উঠে যাচ্ছে, অসংখ্য ময়না, নীলকণ্ঠ আর ফিঙে তাদের খেয়ে চলেছে। যে-সব পোকা পাখিদের কবল থেকে রক্ষা পেল তাদের অনেকে জলপথের বালিভরা গর্ভে বসল, আর সঙ্গে সঙ্গে ময়ূর আর বনমোগর আর কালো তিতির তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এইসব শিকারের পাখিদের মধ্যে গোটা-কুড়ি চিতলের একটা পাল বিরাট শিমুল গাছটার ঝরে-পড়া শাঁসালো ফুলগুলো খেতে লাগল।

দাবানলের অভিজ্ঞতা জীবনে এই আমার প্রথম, এবং এ থেকে যে ভয় আমি পেলাম সে ভয় অজানার ভয়, অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই তা বর্তমান। তারপর যখন মোড় ফিরে দেখলাম কত পাখি পশু এই আগুনের কাছেই চরে

বেড়াচ্ছে এবং কিছুমাত্র ভয় পাচ্ছে না, তখন বুঝলাম যে একমাত্র আমিই ভয় পেয়েছি, এবং সে ভয়ের একমাত্র কারণ, অভিজ্ঞতার অভাব। কুঁয়ার সিং-এর সঙ্গে জলপথের পাশ দিয়ে এগোতে এগোতে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল পিছু ফিরে দৌড়ে পালাই, কিন্তু পাছে সে আমায় কাপুরুষ মনে করে এই ভয়ে তা থেকে বিরত হলাম। আর এখন এই পঞ্চাশ গজ চওড়া শুকনো জলপথের বালিভরা বুকে দাঁড়িয়ে এগিয়ে-আসা আগুনের ক্রমবর্ধমান গর্জন আর মাথার উপরে ধোঁয়ার কালো মেঘ লক্ষ করতে করতে, নল-ঘাসের ওদিক থেকে কোনো শিকারের প্রাণীর আসার প্রতীক্ষায় থেকে সেই যে আমার ভয় দূর হল, আর তা ফিরে আসে নি। জলপথের যেখানে আমরা আছি আগুনের তাপ সেখান পর্যন্ত আসছে। দেখলাম হরিণ, ময়ূর, বন-মোরগ আর কালো তিতির জলপথের ডান পাড় বেয়ে উঠে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

পরবর্তী জীবনে দাবানল থেকে আমার প্রচুর রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হয়। তার একটার বর্ণনা দেবার আগে জানানো দরকার যে আমরা যারা হিমালয়ের পাদদেশে চাষবাসের কাজ করি, অসংরক্ষিত বনের ঘাসে আগুন দিয়ে তাকে চারণভূমিতে পরিণত করার অধিকার আমরা সরকার থেকে পেয়েছি। এসব বনে অনেক রকম ঘাস আছে, এবং সব রকম ঘাসই সমান শুকনো না হওয়ায় এক এক রকম ঘাস এক এক সময়ে পোড়ানো হয়। এই ঘাস পোড়ানো চলে ফেব্রুআরি থেকে জুন পর্যন্ত। এই পুরো সময়টা ঘাসের বনে এখানে ওখানে আগুন দেখা যায়। কোনো ঘাস জমির পাশ দিয়ে যেতে যেতে যদি কারো মনে হয়, ঘাসটা বেশ শুকনো, সহজে জ্বলে উঠতে পারে, সে স্বচ্ছন্দে দেশলাই জ্বালিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।

তখন আমি উইন্ডহ্যামের সঙ্গে তরাইয়ের বিন্দুখেরায় কালো তিতির শিকার করছি। একদিন খুব সকালে আমি আর বাহাদুর পঁচিশ মাইল হাঁটা-পথ ধরে কালাধুঙ্গিতে আমাদের বাড়ির দিকে চললাম। এই বাহাদুর হচ্ছে আমাদের বহু দিনের বন্ধু,—ত্রিশ বছর ধরে সে আমাদের গ্রামের মোড়ল। আমরা তখন প্রায় দশ মাইল এসেছি। এই পথের দুধারে বেশির ভাগ ঘাসই পুড়ে গেছে, মাঝে মাঝে কেবল কোথাও কোথাও খানিকটা করে রয়ে গেছে। এইরকম একটা ঘাসের ঝোপ থেকে একটা প্রাণী বেরিয়ে এল. যে গরুর গাড়ির পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম তারই উপর এসে দীর্ঘ এক মিনিট কাল আমাদের দিকে পাশ করে দাঁড়াল। সকালের রোদে তার গায়ের রঙ আর আকৃতি দেখে তাকে বাঘ বলেই মনে হল। কিন্তু পথটা পেরিয়ে ঘাস-জমিতে প্রবেশ করতে তার ল্যাজের দৈর্ঘ্য থেকে বোঝা গেল যে সে একটা চিতা। বাহাদুরের দুঃখ, 'সাহেব, বড়ই আপসোসের কথা যে কমিশনার সাহেব এখন তাঁর হাতিদের

নিয়ে দশ মাইল দূরে ; কারণ তরাই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় চিতা হল এটা,—শিকারের যোগ্য প্রাণী!' শিকারের যে যোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উইণ্ডহ্যাম আর তাঁর দলবল দশ মাইল দূরে থাকলেও আমি ঠিক করলাম আমিই একবার চেষ্টা করে দেখব, কারণ চিতাটা এক গোশালার দিক থেকে আসছে আর এ সময়ে যখন সে এই ফাঁকা জায়গাটায় ঘুরছে ফিরছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে গতরাত্রে সে সেখানে কোনো প্রাণী মেরেছে। ঘাস-বনে আগুন লাগিয়ে চিতাটাকে তাড়িয়ে আনবার মতলব বাহাদুরকে জানাতে সে বললে সে আমায় সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার সাফল্য সম্বন্ধে সে সন্দিহান রইল। প্রথমে দেখতে হবে ঘাস-জমিটা কত বড় ; তাই রাস্তা থেকে নেমে আমরা খানিকটা ঘুরে গেলাম। দেখলাম, জমিটার দশ একরের মত আয়তন, একটা দিক শঙ্কু আকৃতির,—গরুর গাড়ির পথটা শঙ্কুর ভূমি ধরে গেছে।

বাতাস ছিল আমার অনুকূলে ; তাই পথ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে ঘাস-জমির অপর প্রান্তে পেঁছে আমি দু-গোছা ঘাস কেটে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে বাহাদুরের হাতে দিয়ে বললাম ডান দিকের ঘাস-বনে আগুন দিতে, আর আমি নিজে বাঁ দিকের হোগলা-বনে আগুন লাগালাম। এই ঘাস বার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, আর জ্বালানী কাঠের মত শুকনো খটখটে হয়ে থাকে। ফলে আগুন লাগাবার এক মিনিটের মধ্যেই ভয়ঙ্করভাবে জ্বলতে শুরু করল। দৌড়ে গিয়ে পথের উপর শুয়ে পড়লাম, তারপর ২৭৫ রিগ্‌বি রাইফেলটা কাঁধে নিয়ে রাস্তাটার ওপারে একটা সুবিধেমত উঁচু জায়গা বেছে নিলাম যেখান থেকে গুলি করলে রাস্তার দিকে ধেয়ে আসা চিতাটার গায়ে লাগতে পারে। ঘাস-বন থেকে আমার দূরত্ব দশ গজের মত, আর চিতাটা যেখানে ঢুকেছে সে জায়গাটা আমার থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। রাস্তাটা দশ ফুট চওড়া। চিতাটাকে গুলি করার একমাত্র সুযোগটা আসবে যে মুহূর্তে আমি সেটাকে দেখতে পাব, কারণ আমি জানি একেবারে শেষ মুহূর্তে সে রাস্তাটা পার হবে, প্রচণ্ড বেগে। বাহাদুরের কোনো আঘাতের আশঙ্কা নেই, কারণ তাকে নির্দেশ দিয়েছি ঘাসে আগুন দিয়েই রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরের একটা গাছে উঠে পড়তে।

অর্ধেকটা ঘাস-বন পুড়ে গেল,—আগুনের গর্জন যেন কোনো সেতুর উপর দিয়ে ধাবমান এক্সপ্রেস ট্রেনের গর্জন। হঠাৎ দেখি আমার ডান কাঁধের কাছে মানুষের একটা খালি পা। তাকিয়ে দেখি একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে,—পোশাক দেখে বুঝলাম সে এক মুসলমান গাড়োয়ান, হয়তো কোনো হারানো গরুর খোঁজ করছে। আমি তাকে টেনে আমার কাছে নামিয়ে আনলাম, তারপর তার কানে চিৎকার করে বললাম একেবারে চুপচাপ আমার কাছে শুয়ে পড়তে,

আর পাছে সে আমার কথা না শোনে তাই আমার একটা পা তুলে দিলাম তার শরীরের উপর। এগিয়ে আসছে আগুন। যখন ঘাস-বন আর মাত্র পঁচিশ গজের মত অবশিষ্ট, এমন সময় চিতাটা তীরবেগে রাস্তাটা পার হল। আমি ঘোড়া টিপতেই তার ল্যাজটা উঁচু হয়ে উঠল। পথের বাঁ দিকে ঘাস ক'দিন আগেই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। পোড়া ভাঁটির যে বনে চিতাটা অদৃশ্য হয়ে গেল, তাতে আমার গুলির পরিনাম বুঝলাম সুযোগ পেলাম না। অবশ্য যেভাবে তার ল্যাজটা উপর দিকে উঠে গেল তাতে আঘাত যে মারাত্মক হয়েছে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে আমি লাফিয়ে উঠলাম, শক্ত করে লোকটার হাত ধরে এক ঝটকায় তাকে দাঁড় করিয়ে দিলাম, তারপর তাকে নিয়ে সেই রাস্তা ধরে ধোঁয়ার ঘন মেঘের ভিতর দিয়ে দৌড়তে লাগলাম ; ধাবমান আগুনের শিখা আমাদের মাথার উপর ভয়ঙ্কর হয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। চিতাটা যখন আমার চোখে পড়ল তখন আমরা প্রায় তার উপর গিয়ে পড়েছি। অসহ্য উত্তাপে একটুও সময় নষ্ট না করে আমি ঝুঁকে পড়লাম, তারপর লোকটার একটা হাত চিতাটার ল্যাজের উপর দিয়ে আমার নিজের হাত দিয়ে সে হাতটা চেপে ধরলাম। তারপর আগুনের কাছ থেকে সেটাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে যেই টানতে শুরু করেছি অমনি মহা আতঙ্কের সঙ্গে শুনলাম, চিতাটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল। ভাগ্য ভাল যে আমার গুলি তার কাঁধ ভেদ করে বেরিয়ে গিয়ে তাকে অবশ করে দিয়েছিল। পঞ্চাশ গজের মত টেনে আনতে আনতে মারা পড়ল চিতাটা। হাতটা ছেড়ে দিতেই লোকটা এক লাফে এমনভাবে আমার কাছ থেকে পালাল, যেন আমি তাকে কামড়ে দিয়েছি! তারপর পাগড়িটা মাথা থেকে খুলে যে দৌড় সে দৌড়ল কোনো গাড়োয়ান কখনো তেমন দৌড়য় নি। পাগড়িটা তার পেছনে লুটোতে লুটোতে চলল।

আমার বন্ধুটি যখন ওর গন্তব্য স্থানে পেঁছয় (জানি না সে কোথায়) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম না বলে আমার আপসোস হচ্ছে। গল্প বলায় ভারতীয়েরা অত্যন্ত ওস্তাদ, সুতরাং, এক পাগল ইংরেজের কবল থেকে তার উদ্ধার পাওয়ার এই কাহিনী নিশ্চয়ই রীতিমত উপভোগ্য হয়েছিল। গাছের উপর থেকে বাহাদুর সমস্ত ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছিল। আমার কাছে এসে সে বললে, 'বহু বছর ধরে লোকটা এখন গল্পের আসর জমিয়ে রাখবে। কিন্তু ওর গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না।'

এ-হেন ভয়ঙ্কর প্রাণীর কাছে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে গুলি করার মত পরিস্থিতি না থাকলে সাধারণত হাতির, না হয় লোকজনের সাহায্যে কিংবা এই দুই উপায়েই একসঙ্গে অবলম্বন করে তাকে বন থেকে তাড়িয়ে বার করা হয়ে থাকে। এ-হেন উপায়ে শিকার তাড়িয়ে আনার তিনটি অভিজ্ঞতা আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে যা লিপিবদ্ধ করার যোগ্য। আর কিছু না হ'ক শুধু

এই কারণে যে, দুটি ক্ষেত্রে মানুষের সংখ্যা ছিল যথাসম্ভব অল্প, আর তৃতীয় অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করলে আজও আমার হৃদ্‌স্পন্দন আটকে আসে।

প্রথম বীট

আমাদের শিকারী কুকুর রবিনকে নিয়ে আমি একদিন সকালে দাবানল-পথ ধরে বোর নদীর পুলের পশ্চিমে আধমাইলটাক অগ্রসর হয়েছি, রবিন চলেছে আমার আগে-আগে। এই চলা-পথে খানিকটা এগোতে এক জায়গায় ঘাস ছোট-ছোট হয়ে গেছে, সেখানে পৌঁছে সে থেমে দাঁড়াল ; ঘাস শুঁকল, তারপর মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। তার কাছে গিয়ে কোনো থাবার ছাপ পেলাম না : তাই আমি তাকে ইঙ্গিতে বললাম গন্ধ অনুসরণ করে এগোতে। তখন সে দৃঢ়ভাবে বাঁ দিকে ফিরল, তারপর পথের ধারে যেখানে একটুকরো ঘাস-জমি আছে সেখানে পৌঁছে একটা ঘাসের কাছে নাকটা একবার উপরে আর একবার নিচে করে শুঁকে নিয়ে চকিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল,—যেন বলতে চায়, সে ঠিকই ধরেছে, তার ভুল হয় নি। তারপর সেখানকার আঠার ইঞ্চি উঁচু ঘাস-বনের মধ্যে ঢুকল। গন্ধ অনুসরণ করে এক ফুট এক ফুট করে সে এগোতে লাগল। এভাবে একশো গজ মত অগ্রসর হবার পর একটা স্যাঁতসেঁতে নিচু জায়গায় পৌঁছে দেখলাম যে সে একটা বাঘের পিছু নিয়েছে। এই জায়গাটার ওপারে পৌঁছে রবিন খুব মনোযোগের সঙ্গে একটুকরো ঘাস পরীক্ষা করে দেখল। ঝুঁকে পড়ে দেখলাম খানিকটা রক্ত সে আবিষ্কার করেছে। অন্য শিকারীর গুলিতে আহত প্রাণী দেখে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে কোনো বাঘের চলা-পথে রক্ত দেখলেই আমি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ি। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা অনেকটা সহজ, কারণ এ রক্ত খুব টাটকা, এবং আজ সকালে যখন এ অঞ্চলে কোনো বন্দুকের শব্দ শোনা যায় নি তখন আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে বাঘটা নিশ্চয় তার কোনো শিকারকে বয়ে নিয়ে চলেছে —হয়তো কোনো চিতল, কিংবা কোনো বড় শুয়োর হয়তো। আর কয়েক গজ এগোতে লম্বায় চওড়ায় পঞ্চাশ গজ একটা ঘন ক্লেরোডেনড্রনের ঘন ঝোপ দেখা গেল ; সেখানে পৌঁছে রবিন থেমে দাঁড়িয়ে এবার আমার নির্দেশের অপেক্ষায় রইল।

নরম মাটিতে থাবার ছাপ থেকে আমি বাঘটাকে চিনতে পেরেছিলাম। এই প্রকাণ্ড বাঘটি বোর নদীর ওপারের ঘন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে বাস করছিল। তিন মাস আগে যখন আমরা পাহাড় থেকে নেমে আসি বাঘটা তখন থেকেই আমার প্রচুর দুর্ভাবনার কারণ হয়েছে। যে দুটো রাস্তা আর দাবানল-পথ ধরে ম্যাগি আর আমি সকালে বিকেলে বেড়াতাম এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে

সেগুলো চলে গেছে। আমার অনুপস্থিতিতে বেড়াতে বেরিয়ে ম্যাগি আর রবিন বহুবার এই বাঘের সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং ক্রমেই যেন বাঘটা ওদের পথ ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে নারাজ হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হয়েছে যে রবিন আর ম্যাগির পক্ষে এ-সব পথ নিরাপদ মনে হয় নি ; তাই সে পুলের ওপারে যেতে সরাসরি আপত্তি করে। পাছে কোনোদিন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাই আমি ঠিক করেছিলাম প্রথম সুযোগেই বাঘটাকে গুলি করব, এবং এখন সে সুযোগ উপস্থিত। (যদি অবশ্য বাঘটা এখন তার মড়িকে নিয়ে ক্লেরোডেনড্রন ঝোপের মধ্যে শুয়ে থাকে)। রবিন বাঘটার পিছু নিয়েছিল যেদিক থেকে বাতাস বইছিল সেদিক থেকে অগ্রসর হয়ে ; তাই অনেকটা ঘুরে আমি তার উল্টো দিক থেকে ক্লেরোডেনড্রন ঝোপটার দিকে অগ্রসর হলাম। যখন আর ত্রিশ গজ বাকি তখন রবিন থেমে দাঁড়াল। বাতাসে মুখ তুলল, মাথাটা কয়েকবার হেঁচকা দিয়ে উঁচু আর নিচু করল, তারপর ফিরল আমার দিকে। হুঁ! বাঘটা তাহলে ওখানেই আছে ঠিক। তখন আমরা আবার দাবানল-পথে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে বাড়ির পথ ধরলাম।

প্রাতরাশের পর আমি বাহাদুরকে ডেকে পাঠালাম। তাকে বাঘটার কথা সমস্ত বলে আমি আমাদের দুই প্রজা, ধনবান ও ধর্মানন্দকে ডাকতে পাঠালাম। হুকুম তামিল করায় তারা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, গাছে ওঠার ব্যাপারে তারা বাহাদুরের আর আমার মতই পারদর্শী। বেলা দুপুর নাগাদ ওরা তিনজন খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের কুটিরের সামনে এসে হাজির। প্রথমে পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চয় হলাম যে ওদের পকেটে এমন কিছু নেই যাতে শব্দ হতে পারে, তারপর ওদের জুতো খুলতে বললাম। একটা ৪৫০।400 রাইফেল নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম ওদের সঙ্গে। কিভাবে জঙ্গল পেটা হবে সে সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনা আমি ওদের বুঝিয়ে বললাম। এ জঙ্গল সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান আমার চেয়ে কম নয় ; তাই যখন বললাম বাঘটা কোথায় শুয়ে আছে আর আমি ওদের কি কাজের ভার দিচ্ছি, ওরা উৎসাহিত হয়ে উঠল। আমার মতলব হল ক্লেরোডেনড্রন ঝোপের তিন দিকে ওদের তিন জনকে তিনটে গাছে তুলে দেওয়া ; যে যার জায়গায় থেকে তারা বাঘটাকে উত্তেজিত করবে আর আমি থাকব আর এক দিকে। বাহাদুর থাকবে মাঝের গাছটাতে, আর আমার ইঙ্গিত পেলে (ইঙ্গিতটা হবে চিতার ডাকের নকল) সে একটা গাছের ডালে শব্দ করতে থাকবে, আর বাঘটা যদি কোনো দিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে তাহলে তার নিকটবর্তী গাছের লোক হাততালি দিতে থাকবে। সমস্ত ব্যাপারটার সাফল্যের জন্যে সবচেয়ে বেশি দরকার চরম নিস্তব্ধতা পালন করা কারণ প্রত্যেকের থেকেই বাঘটার দূরত্ব হবে ত্রিশ থেকে চল্লিশ গজ পর্যন্ত : সুতরাং গাছের কাছে যাবার সময়ে, গাছে ওঠবার সময়ে বা সঙ্কেতের

প্রতীক্ষায় থাকবার সময়ে, সামান্যতম শব্দেও মতলবটা পণ্ড হয়ে যাবে।

রবিন যে জায়গায় বাঘটার গন্ধ পেয়েছিল সেখানে পৌঁছে আমি ধনবান আর ধর্মানন্দকে সেখানে বসতে বললাম, আর বাহাদুরকে নিয়ে গিয়ে একটা গাছে উঠতে বললাম। এ গাছটা হল ক্লেরোডেনড্রন ঝোপ থেকে কুড়ি গজ দূরে, আর যেখানে আমি নিজে দাঁড়াব ঠিক করেছিলাম তার উল্টোদিকে। তারপর আমি ওই দু-জনকে বাহাদুরের ডাইনে আর বাঁয়ে দুটো গাছে উঠতে বললাম। ওরা তিনজন যেমন পরস্পরের দৃষ্টিগোচর রইল তেমনি ক্লেরোডেনড্রনের ঝোপটাও ওদের প্রত্যেকেরই চোখে রইল এবং সেখানে বাঘটার যে-কোনোরকম নড়াচড়া ওদের চোখে পড়বে। কিন্তু লম্বা লম্বা ঘাসের একটা ঝোপ মাঝখানে থাকায় তারা তিনজনেই ছিল আমার দৃষ্টির অগোচরে। সবাই নিরাপদে এবং সম্পূর্ণ নিঃশব্দে গাছে ওঠার পর আমি দাবানল-পথে ফিরে গেলাম। সেখান থেকে একশো গজ মত এগোবার পর আর-একটা দাবানল-পথ এই দাবানল-পথটাকে কেটে গেছে ; এই পথটি একটা দিক দীর্ঘ অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে চলে গেছে, ক্লেরোডেনড্রন ঝোপটার পাশ দিয়ে। বাহাদুর যে গাছটায় ছিল তার পেছনে একটা সরু অগভীর দরিপথ পাহাড়টার পাশ দিয়ে চলে গেছে। এই দরিপথে শিকারী প্রাণীদের প্রচুর যাওয়া আসা ছিল এবং আমার স্থির বিশ্বাস যে বাঘটা তাড়া খেলে এই পথেই চলে যাবে। দরিপথের ডানদিকে, পাহাড়টার উপরে দশ গজ মত দূরে একটা বড় জামগাছ। বীট-এর (তাড়া করে জঙ্গলের প্রাণীকে বার করে আনা) পরিকল্পনাটা ঠিক করবার সময় আমি ভেবেছিলাম এই গাছটার উপর বসব, আর বাঘটা আমার পাশ দিয়ে দরিপথ ধরে যেতে গেলেই তাকে গুলি করব। কিন্তু এখন গাছটার কাছে এসে আমি দেখলাম যে এই ভারি রাইফেল হাতে করে আমি গাছে উঠতে পারব না। আশেপাশে তেমন আর কোনো গাছ না থাকায় আমি ঠিক করলাম মাটিতেই বসব। এই ঠিক করে আমি গাছটার গুঁড়ি থেকে শুকনো পাতাগুলো সরিয়ে সেখানে হেলান দিয়ে বসলাম।

চিতার ডাক ডাকার আমার উদ্দেশ্য ছিল দুটো। একটা হল, বাহাদুরকে যে শুকনো লাঠিটা দিয়েছি ইঙ্গিতটা পেয়ে সে সেটা দিয়ে গাছটার ডালে ঘা মেরে শব্দ করতে থাকবে, আর একটা উদ্দেশ্য, বাঘটার পক্ষে যে দাবানল-পথটা পেরিয়ে যাওয়া নিরাপদ এ বিষয়ে তাকে আরও নিশ্চিন্ত করা, আর যদি বা তার মনে কোনো সন্দেহ থাকে যে তাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তাও দূর করা। মাটিতে আরাম করে বসবার পর আমি সেফটি ক্যাচটা ঠেলে রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিলাম, তারপর চিতার ডাক ডেকে উঠলাম। কয়েক সেকেণ্ড পর বাহাদুর শব্দ করতে লাগল। কয়েকবার মাত্র শব্দ করেছে, এমন সময় ঝোপটা ফাঁক হয়ে গেল, আর চমৎকার একটা বাঘ সেখান থেকে বেরিয়ে

দাবানল-পথের উপর এসে দাঁড়াল। দশ বছর ধরে আমি সিনেমার ক্যামেরায় একটা বাঘের ছবি তোলার চেষ্টা করে আসছি, এবং বাঘের দেখা বহুবার পেলেও মনের মত ছবি কিন্তু একবারও তুলতে পারি নি। আর এখন এই ফাঁকা জায়গায়, আমার থেকে মাত্র কুড়ি গজ তফাতে বাঘটা, মাঝখানে একটা গাছের পাতায় বা এতটুকু ঘাসে পর্যন্ত কোনো কাঁপন নেই। বাঘের চমৎকার শীতের চামড়া রোদে ঝলমল করছে। এ-হেন একটা বাঘের ছবি তোলার জন্যে আমি যে-কোনো জায়গায় যেতে বা আমার যা কিছু তাই দিতে প্রস্তুত। অনেক-বার এমন হয়েছে যে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনো বা দিনের পর দিন কোনো জন্তুর পিছু নিয়ে চলেছি, তার পরে সুযোগ পেয়ে বন্দুক তুলেছি, ভাল করে লক্ষ্য স্থির করে বন্দুক নামিয়েছি, তারপর প্রাণীটির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে হ্যাটটা তুলে ধরেছি, আর গভীর তৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ করেছি তার লাফাতে লাফাতে পালিয়ে যাওয়া। এ বাঘটাকেও অমনি ছেড়ে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমার মনে হল তা করলে অন্যায় হবে। ম্যাগি বা শের সিং বা যে সব ছোট ছোট ছেলে জঙ্গলে গরু ভেড়া চরাত বা গ্রামের যে সব স্ত্রীলোক আর ছেলেমেয়েরা শুকনো কাঠ কুড়োতে আসত কেবলমাত্র তাদের কথা চিন্তা করেই নয়, যেরকম ভয়ংকরভাবে বাঘটা চলা-ফেরা করত, তাতে যদিও সে তখন পর্যন্ত কোনো মানুষ মারে নি, যে-কোনো সময়ে তেমন বিপদ ঘটে যাবার সম্ভাবনা ছিল।

দাবানল-পথের উপর এসে পৌঁছে বাঘটা দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে একবার ডাইনে আর একবার বাঁয়ে তাকাল, তারপর কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল যেদিকে বাহাদুর ছিল সেদিকটায়। তারপর সে অলসভাবে রাস্তাটা পার হয়ে দরিপথের বাঁ দিক দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। ক্লেবোডেনড্রন ঝোপের ফাঁক দিয়ে সে যখন বেরোয় তখন থেকেই আমার চোখ তার উপর ছিল ; যে মুহূর্তে সে আমার সঙ্গে এক লাইন হল, আমি ঘোড়া টিপে দিলাম। আমার মনে হয় না সে গুলির শব্দটা পর্যন্ত শুনতে পেয়েছে,—তার পাগুলো পেটের নিচে কুঁকড়ে গেল, পেছন দিকে হটে সে আমার পায়ের কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় বীট

জিন্দের মহামান্য মহারাজা মারা গেলেন। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল, সকলের ভালবাসা তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারত তার একজন শ্রেষ্ঠ শিকারীকে হারাল। তাঁর রাজত্বের বিস্তার ছিল ১,২৯৯ বর্গ-মাইল আর তার লোকসংখ্যা ৩২৪,৭০০। রাজস্বও উঠত চমৎকার। মহারাজার মত অমন সাদা-সিধে মানুষ আমি আর দেখি নি। তাঁর শখ হল শিকারী কুকুরদের শিক্ষা

দেওয়া আর বাঘ শিকার করা, এবং এই দুটি ব্যাপারেই তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল কি না সন্দেহ। প্রথম যখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় তখন তাঁর চারশো কুকুর। বাচ্চা কুকুরগুলোকে শিক্ষা দেওয়ার সময়ে কিংবা পরে মাঠে খেলাবার সময়ে তাঁর ধৈর্য ও যত্ন দেখে শিখবার মত, আমি মুগ্ধ হয়ে তাই দেখতাম। কেবলমাত্র একবার আমি মহারাজাকে গলার স্বর তুলতে বা কোনো কুকুরকে শাস্তি দিতে চাবুকের ব্যবহার করতে দেখেছি। সেদিন রাত্রে নৈশাহারের সময় মহারানী যখন জিজ্ঞাসা করলেন কুকুরগুলো ভালভাবে চলেছিল কি না, মহারাজা উত্তরে বললেন, 'না, স্যাণ্ডি বড় অবাধ্য হয়েছিল, তাই তাকে একটু উত্তম-মধ্যম লাগাতে হয়েছিল।'

মহারাজা আর আমি সেদিন পাখি শিকারে বেরিয়েছি। একটা প্রশস্ত ঘাসজমি আর ঝোপ জঙ্গল বীট করে মানুষ আর হাতি একসার হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এটার পরে প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া খানিকটা জমি। মহারাজা আর আমি এই জমিটার অপর পারে কয়েক গজ তফাতে দাঁড়িয়ে,—আমাদের পিছনে ছোট ছোট ঘাসের জঙ্গল। মহারাজার বাঁ দিকে লাইনে বসে তিনটে অল্পবয়স্ক ল্যাব্রেডর কুকুর—তাদের মধ্যে স্যাণ্ডি সোনালী রঙের, বাকি দুটো কালো। একটা কালো তিতির ওরা তাড়িয়ে আনতে মহারাজা সেটাকে গুলি করে ফাঁকা জায়গাটার উপর নামালেন আর ওই কালো কুকুরদুটোর একটাকে পাঠালেন সেটাকে আনবার জন্যে। এরপর একটা বন-মোরগ আমার মাথার নিচ দিয়ে যাচ্ছিল, আমি গুলি করতে সেটা পিছনদিকের ঘাসজমিতে পড়ে গেল। এটাকে নিয়ে এল দ্বিতীয় কালো কুকুরটা। কয়েকটা বনমোরগ উপরে উঠতে শুরু করেছিল, কিন্তু সামনের দিক থেকে দুটো গুলির আওয়াজ শুনে বাঁ দিকে মোড় ফিরে রাইফেলের পাল্লার বাইরে চলে গেল। তারপর একটা খরগোশ ঝোপ থেকে বেরোল, কিন্তু মহারাজাকে দেখেই নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা ডানদিকে ফিরে আমার সামনে এসে পড়ল—মহারাজা তখন পিছন ফিরে একজন ভৃত্যের সঙ্গে কথা কইছিলেন। যখন খরগোশটা একেবারে নাগালের সীমানার কাছে চলে গেল তখন গুলি করলাম, কারণ অল্পবয়স্ক কুকুরের সামনে যেটুকু নিতান্ত দরকার তার বেশি শিকার করা উচিত নয়। গুলি খেয়েই প্রথমে উল্টে পড়ল খরগোশটা, তারপর আমাদের দু-জনের সামনে দিয়ে মহারাজার ডানদিকে ত্রিশ গজটাক গিয়ে পড়ে গেল। সে পড়ে যেতেই স্যাণ্ডি তীরবেগে ছুটল। 'স্যাণ্ডি, স্যা-ন্ডি!' চিৎকার করলেন মহারাজা। কিন্তু স্যাণ্ডি কারুর কোনো কথাই শুনতে রাজী নয়। তার দুই সঙ্গী দুটো পাখি এনেছে, সুতরাং এবার নিশ্চয় তার পালা, কোনো বাধাই মানতে রাজী নয় সে। ছুটতে ছুটতেই সে খরগোশটাকে ধরল আর তেমনি ছুটতে ছুটতে এসে সেটা আমার হাতে দিল। তারপর মনিবের কাছে ফিরে গিয়ে বসল নিজের

জায়গায়। তখন খরগোশটা নিয়ে আসার হুকুম পেতে, যেখানে আমি খরগোশটা রেখেছিলাম সেখান থেকে সেটাকে তুলে নিয়ে উঁচু করে ধরে স্যাণ্ডি মহারাজার কাছে গেল। কিন্তু মহারাজা তাকে দূরে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন—আরো—আরো দূরে, ডানদিকে আরো দূরে,—যতক্ষণ না যেখান থেকে সে খরগোশটা নিয়ে এসেছিল সেখানে পৌঁছচ্ছে। এখানে খরগোশটা রেখে তাকে ফিরে আসতে ইঙ্গিত করা হল। আবার স্যাণ্ডি তার মনিবের কাছে ফিরে এল,—তার ল্যাজ নিচু হয়ে গেছে, দু-কান ঝুলে পড়েছে। তখন আর-একটা কুকুরকে পাঠানো হল খরগোশটা নিয়ে আসতে। খরগোশটা আনা হলে মহারাজা বন্দুকটা একজন চাকরের হাতে দিলেন, তারপর তার হাত থেকে চাবুকটা নিয়ে এক হাতে স্যাণ্ডির ঘাড়ের পিছনটা ধরে প্রচুর 'প্রহার' করলেন। প্রহারটা প্রচুর হল সন্দেহ নেই, কিন্তু স্যাণ্ডির উপর নয়,—কারণ তার উপর আঘাত পড়ল না, দু-দিকে মাটির উপর। মহারাজা যখন স্যাণ্ডির অপরাধ আর তার শাস্তির কথা মহারানীকে বলছিলেন সেই সময় আমি এক ভৃত্যের কাছ থেকে কাগজ নিয়ে তাতে লিখলাম (কারণ মহারাজা ছিলেন একেবারে বধির), 'স্যাণ্ডি বাহাদুর আজ আপনাকে অমান্য করেছে বটে, কিন্তু তবুও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কুকুর সে : দেখবেন শিকারী কুকুরদের পরবর্তী প্রতিযোগিতাতেই সে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে।' সেই বছরেই পরবর্তীকালে আমি একটা টেলিগ্রাম পাই, তাতে লেখা—'আপনি ঠিকই বলেছিলেন। স্যাণ্ডি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে।'

ক্রমেই দিন বড় হতে থাকল, রোদের তেজও বাড়তে লাগল, তাই একদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ে আমি দশ মাইল পথ হেঁটে যখন মোহনে মহারাজার তাঁবুতে এসে পৌঁছলাম ওঁরা তখন প্রাতরাশে বসেছেন। 'বড় ভাল সময়ে এসেছেন' আমি টেবিলে বসতে তিনি বললেন, 'কারণ আজই আমরা সেই বুড়ো বাঘটাকে মারতে চলেছি, তিন বছর ধরে যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে আসছে।' এই বাঘের কথা আমি অনেকবার শুনেছি, তাই আমি জানতাম একে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে গুলি করার ব্যাপারে মহারাজার কত উৎসাহ। তাই যখন মহারাজা তিনটে মাচানের সবচেয়ে ভালটায় আমায় বসতে বললেন এবং একটা রাইফেলও ধার দিলেন, আমি রাজি হলাম না, বললাম, তার চেয়ে বরং আমি দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করব। দশটার সময় মহারাজা, মহারানী, তাঁদের দুই মেয়ে আর এক বান্ধবী আর আমি গাড়ি করে, যে পথে আমি হেঁটে এসেছি সেই পথে চললাম যেখানে বন বীট করার জন্যে লোকজন আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

যে জমিটা বীট করা হবে সেটা একটা উপত্যকা—পাহাড়ের পাদদেশে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে, আর একটা ছোট নদী তার ভিতর দিয়ে এঁকে-

বেঁকে গেছে, তার দুই তীরে তিনশো ফুট উঁচু পাহাড়। এর নিচের দিকের সীমানায় যেখানে রাস্তাটা এটাকে কেটে চলে গেছে উপত্যকাটা সেখানে প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া, তারপর আধ মাইল দূরে গিয়ে আবার সরু হয়ে পঞ্চাশ গজে দাঁড়িয়েছে। এই দুই জায়গার মাঝামাঝি নদী চওড়ায় তিনশো থেকে চারশো গজ পর্যন্ত, আর এখানে একরের পর একর এলাকা জুড়ে যে ঘন জঙ্গল, তারই আড়ালে, আগের দিন যে মোষটা মেরেছে সেটা নিয়ে বাঘটা লুকিয়ে আছে বলে আন্দাজ করা যাচ্ছে। এই উপত্যকার অন্য প্রান্তে পর্বত-মালা থেকে একটা ছোট শৃঙ্গ বেরিয়ে ডান দিকে চলে গেছে, এই শৃঙ্গের উপরের একটা গাছে যেখানে মাচান বাঁধা হয়েছে সেখান থেকে উপত্যকাটা আর পাহাড়গুলোর দু-দিকের নিচু ঢালটা দেখা যায়। এই শৃঙ্গের ওপারে আর নদীটার পরপারে (নদীটা এখানে সোজা ডানদিকে মোড় ফিরেছে) ত্রিশ গজ তফাতে আরো দুটো মাচান তৈরি হয়েছে।

রাস্তার উপর গাড়ি রেখে আমরা পায়ে হেঁটে উপত্যকা ধরে অগ্রসর হলাম। সর্দার-শিকারী, আর যে সেক্রেটারিটি যারা বন বীট করছিল তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল, এদেরই নির্দেশে বাঘটাকে যেখানে আন্দাজ করা হয়েছে সেই জায়গাটার বাঁ দিকের জঙ্গল ধরে অগ্রসর হলাম আমরা। মহারাজা আর তাঁর বন্দুকবাহক শৃঙ্গের মাচানটায় বসলে চারজন মহিলা আর আমি নদী পার হয়ে ওদিকের দুটো মাচানে আশ্রয় করলাম। সর্দার-শিকারী আর সেক্রেটারি তখন আমাদের ছেড়ে রাস্তায় গেলেন বন ঠেঙানো শুরু করতে।

যে মাচানে আমি আর দুই রাজকন্যা ছিলাম বেশ মজবুত করে বানানো সেটা,—পুরু কার্পেট আর সিল্কের কুশন তাতে। গাছের শক্ত ডালে বসতেই আমি অভ্যস্ত ; তার জায়গায় ভোরে উঠে দীর্ঘ পথ চলা আর তারপরে মাচানের এই বিলাসিতা—আমার ঘুম এসে গেল। ঘুমিয়েই পড়তাম, এমন সময় দূর থেকে বিউগলের শব্দ শুনে আমি একেবারে সজাগ হয়ে উঠলাম। বুঝলাম বীট শুরু হয়েছে। বীটের জন্যে আছে দশটা হাতি, সেক্রেটারিরা, এ ডি. সি.-রা, মহারাজার বাড়ির কর্মচারীরা, সর্দার-শিকারী আর তাঁর সহকারীরা, আর আশেপাশের গ্রাম থেকে সংগৃহীত শ-দুই লোক। উপত্যকার ঘন গাছপালায় ছাওয়া মাটি হাতিরা পায়ে দলে আসবে ; তাদের পিঠে রয়েছেন সেক্রেটারিরা ও আরো অনেকে, আর ওই দুশো লোক দু-দিকের ঢাল ধরে ঠেঙাতে ঠেঙাতে এগিয়ে আসছে। দুই শৈলশিরায় লাইন করে যারা বন ঠেঙাবে এদের কয়েকজন তাদের আগে-আগে যাবে, যাতে বাঘটা বেরিয়ে পড়তে না পারে।

সমস্ত ব্যবস্থা, আর এই বন ঠেঙানোর ব্যাপারটাও আমার কাছে অত্যন্ত কৌতূহলজনক হয়ে উঠেছিল, কারণ এমন একটা ব্যাপারে আমি আজ দর্শক

যেখানে আমি এ পর্যন্ত সর্বদাই অভিনেতার ভূমিকা নিয়ে এসেছি। ব্যবস্থাপনার বা ঠেঙানোর কাজে কোথাও কোনো ত্রুটি হল না, সময়-নির্বাচনও হয়েছিল চমৎকার ; মাচান পর্যন্ত আমাদের যাওয়াটাও হয়েছিল পরম নিঃশব্দে, আর ঠেঙানোর কাজ যে ভালভাবেই হচ্ছিল তার প্রমাণ, অসংখ্য পাখি, কালিজ, বন-মোরগ, ময়ূর সব উড়তে শুরু করেছিল। ঠেঙানো ব্যাপারটায় সব সময়েই প্রচুর উত্তেজনার খোরাক থাকে, কারণ যখনই দূর থেকে লোকজনের ডাকা-ডাকি শোনা যায়, ধরে নেওয়া যায় তখনই বাঘও চলতে শুরু করেছে। মহারাজা বধির বলে খানিকটা অসুবিধে ছিল বটে, কিন্তু তাঁর পাশে একজন ওস্তাদ রয়েছে, দেখলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লোকটি ইঙ্গিত করে ডানদিকে কি দেখিয়ে দিচ্ছে। দু-এক মুহূর্ত সেইদিকে তাকিয়ে থেকে মহারাজা ঘাড় নাড়লেন। একটু পরেই একটা পুরুষ-সম্বর নদী পেরিয়ে এল, আর মহারাজার গন্ধ পেয়েই আমাদের পাশ দিয়ে সবেগে উপত্যকা ধরে পালিয়ে গেল।

শৈলশিরার বাঁদিকে যারা লাইন করে অগ্রসর হচ্ছিল এখন তারা দৃষ্টি-গোচর হল, বাঘটার বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে এবার। এগিয়ে এল ঠেঙিয়ের দল, চেঁচিয়ে, হাততালি দিয়ে সবাই যোগ দিল তাতে। এক গজ এক গজ করে যতই তারা অগ্রসর হতে লাগল, আমার মনে হল যে মহারাজার গুলি করার সম্ভাবনা ততই কমে যাচ্ছে, কারণ কোনো পাখির বা কোনো পশুর কোনো সতর্কতাসূচক আওয়াজ আমার কানে এল না। আমার মাচানের সঙ্গিনীরা নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে, মহারাজা রাইফেল উদ্যত করে রয়েছেন কারণ বাঘটা এখন বেরিয়ে এলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গুলি করতে হবে। কিন্তু দেখা গেল রাইফেল আজ কোনো কাজেই লাগবে না, কারণ বাঘটাই নেই এ অঞ্চলে। মই লাগানো হল, অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে সবাই নেমে এলেন মাচান থেকে। নেমে এসে যাদের সঙ্গে মিলিত হলেন তাদের হতাশা আরও বেশি। ঠেঙিয়েদের মধ্যে কেউ বাঘের দেখা পায় নি, তারা বুঝল না কোথায় কী গলদ হয়েছে। তবে, কোথায়ও যে একটা কিছু ভুল হয়েছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে, কারণ গাড়ি করে এসে পেঁছবার অল্প আগেই উপত্যকা থেকে বাঘের আওয়াজ শোনা গেছে। আমার মনে হচ্ছে আমি আন্দাজ করতে পারছি কেন আমাদের ব্যর্থ হতে হল ; কিন্তু আমি আজ দর্শক মাত্র, তাই আমি কোনো কথাই বললাম না। বনভোজন সেরে তাঁবুতে ফিরলাম আমরা। সবাই যখন বিশ্রাম করছে আমি তখন কোশী নদীতে গিয়ে মাছ ধরলাম। সন্ধ্যাটা চমৎকার কাটল, কারণ এপ্রিলের শেষ, মাছ ধরার সেরা সময়।

নৈশভোজে বসে এবং নৈশভোজের পরেও, সেদিনকার ব্যর্থতার আর ওই বাঘের জন্যই আগের পাঁচটা বীটের ব্যর্থতার খুঁটিনাটি আলোচনা করা হল এবং তার কারণ অনুসন্ধান করা হল। প্রথমবার যখন এই বাঘটারই সন্ধানে

বীটের ব্যবস্থা হয় বাঘটা তখন মহারাজার মাচানের ডান দিকে দেখা দেয় এবং মোটেও না নড়তে পারার ফলে মহারাজা যে গুলি করেন তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এর পরের বীটগুলি অনুষ্ঠিত হয় পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে। কোনোবারই দেখা যায় নি বাঘটাকে, যদিও বীট শুরু হবার সময় সে সেখানে ছিল বলে জানা গেছে। আর সকলে তখন কথাবার্তা বলছে, কাগজে লিখে মহারাজাকে দেখাচ্ছে। আমি কেবল ভাবছি। মহারাজা ভাল শিকারী, সুতরাং যদি আমি বাঘটা মারার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে পারি তো সে চেষ্টা আমার করা উচিত। ভুল হয়েছে সেদিন, যেখানে বাঘটা আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে সে-জায়গার সামনে দিয়ে মহারাজার সদলবলে যাওয়া ; কিন্তু বীটের অসাফল্যের কারণ সেটা হতে পারে না, কারণ বীট যে সময়ে শুরু হয় প্রায় সেই সময়েই বাঘটা চলে যায় ওখান থেকে। মোটর গাড়ি থেকে নামবার কিছুক্ষণ পরে কাকার হরিণটার যে সাবধান-বাণী শোনা গিয়েছিল, তা থেকেই এই সন্দেহটা আমার মনে জেগে ওঠে। পরে যখন জানা গেল যে বীটের জঙ্গলে বাঘ নেই তখন আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম জঙ্গল থেকে বেরোতে হলে বাঘটার মাচানের সামনে দিয়ে ছাড়া পালাবার আর কোনো পথ ছিল কি না। মাচানগুলোর পিছনদিককার শৈলশিরা থেকে শুরু হয়ে একটা ধস একেবারে উপত্যকার নিচে পর্যন্ত চলে গেছে। এই ধসের উপরটা থেকে ডেকে উঠেছিল কাকারটা, বাঘটা সেখানে তার মড়ি রেখেছিল এখান থেকে সেই জায়গা পর্যন্ত যদি কোনো পশু-চলার পথ থাকে তাহলে হয়তো প্রতিবারেই বীটের ব্যবস্থার সাড়া পেয়ে বাঘটা এই পথ ধরে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকবে।

সবাই যখন কথাবার্তায় ব্যস্ত সে সময়ে এই মতলবটা আমার মাথায় ঘুরছিল যে কাকারটা যেখানে ডেকে উঠেছিল মহারাজাকে শৈলশিরার উপর সেখানে থাকতে বলা, আর বাঘটাকে তাড়িয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া। ঠিক পরের দিনই আবার বাঘটার জন্যে বীটের ব্যবস্থা করার কথায় সবাই আপত্তি করে উঠল, এই যুক্তিতে যে, টাটকা টোপেই যখন বাঘটা এল না তখন বাসি টোপে তাকে পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তবে, আমার মতলব যদি ব্যর্থও হয় তাহলেও ক্ষতি নেই, কারণ সেদিনের জন্যে কোনো ব্যবস্থাই করতে হবে না। এক সেক্রেটারির কাছ থেকে কাগজ নিয়ে আমি লিখলাম, 'কাল যদি ভোর পাঁচটার সময় আপনি প্রস্তুত থাকতে পারেন তাহলে এই বাঘটার জন্যে একটা একক বীটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' চিঠিটা মহারাজাকে দিতে তিনি সেটা পড়ে তাঁর সেক্রেটারিকে দিলেন, তারপর সেটা হাতে হাতে সমস্ত ঘরে ঘুরতে লাগল। আমি আপত্তির আশঙ্কা করেছিলাম, এখন উঠল সে আপত্তি। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন মহারাজা মতলব-মত কাজ করতে রাজী তখন

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমস্ত কেতার কথা ভুলে রাজী হলেন এবং মাত্র দু-জন বন্দুকবাহকের সঙ্গে মহারাজার শিকার-যাত্রায়ও আপত্তি করলেন না।

ঠিক পাঁচটার সময় মহারাজা, দু-জন বন্দুকবাহক আর আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মোটরে করে গেলাম যেখানে হাতিটা একটা ছোট মাচান নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মহারাজাকে আর বন্দুকবাহকদের হাতিতে তুলে দিয়ে আমি পায়ে হেঁটে সেই সম্পূর্ণ অজানা বনপথ ধরে মাইলের পর মাইল পথ দেখিয়ে নিয়ে চললাম। সৌভাগ্যবশত আমার দিক-জ্ঞানটা ছিল ভাল, তাই অন্ধকারের মধ্যে বেরোলেও আমি মোটামুটি সিধে পথ ধরেই নিয়ে গেলাম। সূর্য যখন উঠছে আমরা তখন শৈলশিরায় যথাস্থানে পৌঁছে গেছি। এখান থেকে উপত্যকা পর্যন্ত একটা প্রাণী-চলার পথ দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম,—বোঝা গেল এ-পথে বেশ পশুর যাতায়াত আছে। এই পথের কাছে একটা গাছের উপর মাচান বাঁধলাম। মহারাজা আর একজন বন্দুকবাহক মাচানে উঠলে আমি হাতিটাকে ফেরত পাঠালাম, তারপর অপর বন্দুকবাহকটাকে নিয়ে গিয়ে শৈলশিরা বরাবর খানিক দূরের একটা গাছে তুলে দিলাম। তখন আমি গেলাম একাই বাঘটাকে বীট করতে।

উপত্যকাটা ওখান থেকে অত্যন্ত খাড়া নেমে গেছে,—যেমন খাড়া তেমনি রুক্ষ। কিন্তু সঙ্গে রাইফেলের বালাই না থাকায় নিরাপদে নেমে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল। গতদিনের মাচানগুলো নিঃশব্দ পায়ে অতিক্রম করে, যে ঘন ঝোপটার আড়ালে বাঘটাকে আন্দাজ করা হয়েছিল সেটাও পার হয়ে আরও দুশো গজ এগিয়ে গেলাম। এবার আমি ফেরার পথ ধরলাম, আর যেতে যেতে নিচু গলায় নিজের সঙ্গে কথা কইতে লাগলাম। যে জায়গাটায় বাঘটা মোষটাকে টেনে নিয়ে আসে সেখানে একটা বড় কাটা গাছ রয়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি এই গাছটার উপর বসলাম,—এই আশায়, যদি জঙ্গল থেকে কোনো খবর মেলে। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দই মিলল না। তখন কয়েকবার কেশে আর কয়েকবার গাছের ফাঁকা গুঁড়িতে জুতো দিয়ে শব্দ করে আমি গেলাম মড়িটার সন্ধানে, বাঘটা সেখানে ফিরে এসেছে কি না দেখতে। দেখলাম বাঘটা মড়িটাকে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে আর মাত্র কয়েক মিনিট আগে তা থেকে খানিকটা খেয়ে ফেলেছে, আর যেখানে সে শুয়ে ছিল সে জায়গাটা তখনও গরম হয় রয়েছে। দৌড়ে গাছটার কাছে ফিরে গিয়ে আমি একটা পাথর নিয়ে সেটাকে ঠুকতে লাগলাম আর প্রাণপণে চিৎকার করতে করলাম, যাতে মহারাজার সঙ্গী বন্দুকবাহক বুঝতে পারে যে বাঘ আসছে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই একটা বন্দুকের আওয়াজ আমার কানে এল। শৈলশিরায় পৌঁছে দেখলাম, মহারাজা পশু-চলার পথটার উপর দাঁড়িয়ে—আর যে চমৎকার বাঘটা তিনি মেরেছেন সেটার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ।

জিন্দের প্রাসাদে, এখন সেটা মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের দখলে, একটা চামড়া আছে তার নিচে লেখা—'জিমের বাঘ', আর স্বর্গত মহারাজার শিকারের বইয়ে একটা উদ্ধৃতি আছে যাতে এই বৃদ্ধ বাঘ শিকারের তারিখ, স্থান আর যেভাবে তাকে মারা হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া আছে।

তৃতীয় খণ্ড

এক স্মরণীয় শিকার-অভিযানের শেষ দিন সেটা। স্মরণীয় কেবল আমরা যারা এতে যুক্ত ছিলাম তাদের পক্ষেই নয়, দেশের শাসকদের পক্ষ থেকেও বটে, কারণ একজন বড়লাট ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম চিরাচরিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কালাধুঙ্গির জঙ্গলে কয়েকটা দিন কাটাবার জন্যে এসেছিলেন।

ভারতের বড়লাটের সমস্ত চলাফেরাই সাবেকী প্রথার কড়া নিয়মে বাঁধা। নিয়মের এমন শক্ত আঁটুনি মেনে আর কোনো ব্যক্তিকেই চলাফেরা করতে হয় না। এই নিয়মে কোনোদিন বিচ্যুতি ঘটতে পারে, এমন কথা কেউ কোনোদিন ভাবে নি, তাই কোনো বিকল্প নীতির প্রয়োজনও কখনও অনুভূত হয় নি। ফলে এদেশের বড়লাটের দায়িত্বভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই লর্ড লিনলিথগো যখন পূর্বসূরীদের বাঁধা পথ ছেড়ে নিজে নতুন পথ বেছে নিলেন, তখন স্বভাবতই সারা দেশে বিস্ময়ের সীমা রইল না। দিল্লীতে আইন-দপ্তর বন্ধ হয়ে সিমলায় দপ্তর খোলার মাঝে যে দশ দিন, এ সময়টা ভারতের বড়লাট দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায় কাটাতেন। বহু বছরের এই রেওয়াজে ব্যতিক্রম ঘটায় সরকারী দপ্তরে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় তা দীর্ঘকাল মানুষের মনে থাকবে।

আমি সাধারণ মানুষ, সরকারের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগই ছিল না ; প্রশাসনের কল কেমন করে প্যাঁচে প্যাঁচে ঘোরে, সে বিষয়ে বিপুল অজ্ঞতা নিয়ে দিব্যি ছিলাম। এহেন অবস্থায় মার্চ মাসের শেষের দিকে একদিন আমি আমাদের কালাধুঙ্গির কুটির থেকে রাত্রের রান্নার জন্যে মাছ ধরতে বেরোচ্ছি, এমন সময় পিয়ন রাম সিং একটা টেলিগ্রাম নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে হাজির। দু মাইল দূরে ডাকঘর থেকে আমাদের দৈনিক ডাক নিয়ে আসা ছিল তার কাজ। পোস্টমাস্টার তাকে বলে দিয়েছেন এটা নাকি খুব জরুরী। নৈনিতাল ঘুরে টেলিগ্রামটা কালাধুঙ্গিতে এসেছে, পাঠিয়েছেন বড়লাটের সামরিক সচিব হিউ স্টেব্‌ল্‌। সচিব লিখেছেন বড়লাটের দক্ষিণ ভারত সফর বাতিল হয়ে গেছে, তিনি জানতে চেয়েছেন এমন কোনো জায়গার আমি নাম করতে পারি কি না যেখানে বড়লাট গ্রীষ্মের জন্য সিমলা যাবার আগে এই দশ দিন কিছু শিকার পেতে পারেন। তাড়াতাড়ি উত্তর দেবার অনুরোধ জানিয়ে

টেলিগ্রামটা শেষ হয়েছে—সময় যেমন কম, ব্যাপারটাও তেমনি জরুরী। রাম সিং ইংরেজি বলতে পারত না, কিন্তু ত্রিশ বছর আমাদের কাজ করে করে সে এখন ইংরেজি বুঝতে পারত। আমি টেলিগ্রামটা ম্যাগিকে পড়ে শোনালাম, আশেপাশে টুকিটাকি কাজ করতে করতে রাম সিং ব্যাপারটা বুঝে নিল। তারপর বললে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে খাওয়া সেরে এসে আমার উত্তর নিয়ে হলদোয়ানি চলে যাবে। হলদোয়ানি হল আমাদের সবচেয়ে কাছের তার ও টেলিফোন দপ্তর,—কালাধুঙ্গি থেকে চোদ্দ মাইল দূরে। যে ডাক-হরকরা নিয়মিত ডাক নিয়ে যায় তাকে দিয়ে না পাঠিয়ে আমি রাম সিংকে দিয়ে আমার উত্তর পাঠিয়ে দিলাম,—এতে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা সময় বাঁচল। আমি হিউ স্টেব্‌ল্‌কে বার্তা পাঠালাম—কাল বেলা এগারোটায় হলদোয়ানিতে আমায় টেলিফোন করুন। রাম সিং চলে যাবার পর আমি আবার ছিপটা হাতে তুলে নিলাম, মাছ ধরতে ধরতেই ভাবা যাবে, আর ভাবনাও অনেক। তা ছাড়া রাত্রের জন্যে মাছ ধরাও দরকার। হিউ স্টেব্‌লের টেলিগ্রামটা স্পষ্টই গুরুতর বিপদ-সংকেতের সামিল,—আমার সামনে এখন প্রশ্ন—তাঁকে সাহায্য করতে আমি কী করতে পারি?

কোটা রোড ধরে মাইল-দুই অগ্রসর হয়ে আমি পেঁছিলাম আমাদের গোলাবাড়ির সীমানার কাছে যেখানে আমি নিতান্ত ছেলেবেলায় আমার প্রথম চিতা শিকার করি। সেখান থেকে বাঁক নিয়ে নদীর বুকে একটা জলাশয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম,—এখানে একটা দেড়সেরী মহাশোল মাছ ছিল বলে জানতাম। জলাশয়ের কাছে আসতে একটা বাঘের থাবার ছাপ আমার চোখে পড়ল,—বাঘটা সেদিন সকালে নদী পার হয়ে চলে গেছে। এই জলাশয়ের মাথায় যেখানে স্রোত প্রবল আর জল গভীর, তিনটে বড়-বড় পাথর সেখানে জল থেকে এক ফুট উঁচু হয়ে রয়েছে। এই পাথরগুলি জল-কাদায় সর্বদা সিক্ত, এবং তার ফলে বরফের মত পিচ্ছিল। এই পাথরগুলোর উপর দিয়ে চিতারা নদী পার হয়। যে বাঘটার থাবার ছাপ এখন বালিতে দেখা যাচ্ছে একদিন সেই বাঘটাও সেইভাবে নদী পার হবার চেষ্টা করেছিল আমি দেখেছিলাম। সেদিন আমি এক মাইল পথ ওই বাঘটার পিছু পিছু গিয়েছিলাম, তার অজানতেই দু-দুবার আমি তাকে রাইফেলের পাল্লার মধ্যে পেয়েছিলাম, কিন্তু দু-বারই গুলি করতে নিবৃত্ত হয়েছিলাম, কারণ তাকে যে একেবারে মেরে ফেলতে পারব এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি নি। তারপর যখন দেখলাম সে নদীর দিকে চলেছে, আমি কেবল তাকে চোখে চোখে রেখেছিলাম, কারণ আমি জানতাম যে পার হবার সময় তাকে ঠিকভাবে গুলি করার সুযোগ পাব। কিন্তু আমি দেখলাম সে জলে না নেমে পাথর থেকে পাথরে পা দিয়ে দিয়ে শুকনো পায়ে নদীটা পার হতে চাইছে। এতে আমার সুবিধেই

হল, কারণ নদীতে পেঁছতে হলে কুড়ি ফুট নিচু একটা ঢাল আছে, সেখান দিয়েই ওকে নেমে যেতে হবে। তাই যখন সে নিচে নেমে যাবার জন্যে ঢালের উপরটায় পেঁছল আমি দৌড়ে গিয়ে পাড়ের উপরে পেঁছে শুয়ে পড়লাম।

পাথর তিনটের মধ্যে যা দূরত্ব তা কোনো অলিম্পিকের প্রতিযোগী অনেকটা দৌড়ে আসার জায়গা পেলে হপ্-স্টেপ-জাম্প করে পার হতে পারে। চিতাদের আমি দেখেছি কমনীয় তিনটি লাফে এই দূরত্ব পেরিয়ে যেতে। পাড়ের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে আমি দেখলাম, প্রথম লাফটা ঠিকভাবে নিয়ে দ্বিতীয়টার বেলায় কিন্তু বাঘটা গোলমাল করে ফেলল,—পিছল পাথরে পা পিছলে যেতে ডিগবাজি খেয়ে গভীর জলে গিয়ে পড়ে গেল। জলের শব্দে আমি শুনতে পেলাম না কী সে বললে, তবে আমি আন্দাজ করতে পারি তা কী ; কারণ ওভাবে পার হতে গিয়ে আমি নিজেও একবার অমনি পা পিছলে পড়েছিলাম। কাছেই খানিকটা শুকনো বালির জমি,—কোনোরকমে সেখানে পেঁছে বাঘটা গা-ঝাড়া দিল, তারপর শুয়ে পড়ে কেবলই গড়াতে লাগল যাতে গরম বালিতে তার চমৎকার চামড়াটা শুকিয়ে যেতে পারে, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে আর একবার গা ঝাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে তার গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হল। আমার তরফ থেকে সে কোনো বাধাই পেল না, কারণ যে বস্তু প্রকৃতির আনন্দের খোরাক যোগায় তাকে আঘাত করা জঙ্গলের নীতিতে খেলোয়াড়-সুলভ কাজ নয়। এখন আবার বালিতে বাঘটার থাবার ছাপ দেখা যেতে লাগল কিন্তু এবার পাথরগুলোয় পা দিয়ে দিয়ে পার হয়ে যেতে তার অসুবিধে হল না, কারণ বালিটা পার হবার সময় তার পা শুকিয়ে গিয়েছিল।

এই পাথরগুলোর নিচে ওদিকের তীরের কাছে একটা বড় পাথর মাথা উঁচু করে একটা বন্ধ জলার সৃষ্টি করেছে, আমার বন্ধু সেই দেড়সেরী মহাশোল মাছটা থাকত সেখানে। বঁড়শিতে গেঁথে একটা জক স্কট (মাছ ধরার জন্য নির্মিত নকল পোকা) এই ঢালু পাথরের উপর ফেলে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিতেই দু-দুবার মহাশোলটা বেগে বেরিয়ে এসেছিল। ছিপটা ফেলতে হচ্ছিল অনেকটা দূর থেকে, এবং তাও খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল, কারণ, প্রথমত, গাছের একটা ডাল ওদিকে ঝুঁকে পড়েছিল, আর দ্বিতীয়ত, অনেকটা ঝুঁকে পড়ে ছিপটা ফেলতে হচ্ছিল, কারণ জলে স্থলে শূন্যে সর্বত্র শত্রু থাকায় মহাশোল মাছের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ন, তাই আমাকে বিশেষ সাবধানে অগ্রসর হতে হত। বালিভরা তীর আর তার উপর পায়ের দাগগুলো ছেড়ে আমি নদীটার গতিপথ ধরে খানিকটা অগ্রসর হলাম। যে দশ ফুট সুতোটা আমি সেদিন সকালে অনেক যত্নে তৈরি করেছিলাম একটা পাথরের নিচে সেটাকে ভিজতে দিয়ে আমি ছিপটা রেখে ধূমপান শুরু করলাম। প্রস্তুতিপর্ব শেষ হতে আমি হুইল থেকে দরকার-মত সুতো খুলে নিলাম।

তারপর খুব সাবধানে সেটা বাঁ হাতে ধরে গুড়ি মেরে সেই একমাত্র জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলাম যেখান থেকে সুতোটা কোনো-রকমে পাশ করে ফেলা যায়—চিরাচরিত প্রথায় ফেলা সম্ভব নয় এখানে। আমার তিন-সেরী বন্ধুটির জন্য সেদিন বঁড়শিতে যে নতুন আট নম্বরী জক স্কট লাগিয়েছিলাম্ সেটি গিয়ে পড়ল ঠিক যেখানটায় চেয়েছিলাম সেখানেই। সুতোর টানে পাথর থেকে গভীর জলে যেই সেটি পড়েছে, অমনি জলে পাক দিয়ে একটা ছলাৎ শব্দ! আমার বন্ধুটি আবার বঁড়শিতে গাঁথা পড়েছে—এই নিয়ে তৃতীয়বার। পাতলা সুতোয় মহাশোল মাছের প্রথম টান সরাসরি রোধ করা অসম্ভব ; তবে টানটা ঠিক হিসেব-মত রাখতে পারলে, যে পাথরের আড়ালে সে লুকিয়ে পড়তে চায় সেখান থেকে তাকে ঠেকিয় রাখা অসম্ভব নয়, যদি অবশ্য শিকারী যেদিকে আছে পাথরটা সেদিকে না হয়। আমি ছিপ ফেলেছিলাম নদীর ডান তীর থেকে, আর মাছটাকে যেখানে গেঁথেছিলাম তার ত্রিশ গজ নিচে একটা বাঁকা শেকড় জলের মধ্যে বেরিয়ে এসেছিল। দু-দুবার মাছটা এই শেকড়ের সাহায্যে আমায় ফাঁকি দিয়েছিল। এবার আমি তাকে কোনোমতে আটকাতে পেরেছি—মাত্র দু-এক ইঞ্চি থাকতে। জলাশয়ের মধ্যে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সে নিরাপদ, তাই আমি ইচ্ছে-মত খেলায় তাকে বাধা দিলাম না। তারপর সে ক্লান্ত হয়ে এলে তাকে বালির তীরের কাছে এনে হাতে করে তুলে নিলাম, কারণ মাছ তোলার কোনো জাল আমার সঙ্গে ছিল না। আমার দেড় সের হিসেবটায় এক পোয়াটাক ভুল ছিল—সেটা অবশ্য বেশির দিকেই। সুতরাং আমাদের রাত্রের ভোজ তো হবেই, তা ছাড়াও গ্রামের যে অসুস্থ ছেলেটিকে ম্যাগি সেবা-শুশ্রূষা করছিল, তাকেও একটু ভাগ দেওয়া যাবে,—মাছই তার সবচেয়ে প্রিয় আহার্য।

ছেলেবেলায় বন্দুক ছোড়া শিক্ষার সময়ে যে উপদেশ পেয়েছিলাম সেই অনুসারে আমি হিউ স্টেব্‌ল্‌কে যে টেলিগ্রাম পাঠালাম তাতে নিশ্চয় করে কিছু জানালাম না, এবং এই সুযোগে চিন্তা করার যথেষ্ট সময় পেলাম। বাঘটার থাবার ছাপ দেখতে পাওয়ার ফলেই হ'ক বা মহাশোল শিকারে সাফল্যের ফলেই হ'ক, বাড়ি যখন ফিরলাম ততক্ষণে আমি মনস্থির করেছি হিউ স্টেব্‌ল্‌কে জানিয়ে দেব যে বড়লাটের ছুটি কাটাবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গা কালাধুঙ্গি। ম্যাগি চা তৈরি করে বারান্দায় এনে রেখেছিল, আর এই নিয়ে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় বাহাদুর এসে হাজির। আমি জানি যে দরকার হলে বাহাদুর পেটের কথা চেপে রাখতে পারে ; তাই দিল্লী থেকে আসা টেলিগ্রামটার কথা তাকে বললাম। উত্তেজনা হলে বাহাদুরের চোখ একেবারে নাচতে শুরু করে. কিন্তু সেদিনের মত অমন নাচতে আর কখনো দেখি নি। স্বয়ং বড়লাট কালাধুঙ্গি আসবেন, কে কবে ভাবতে পেরেছে! তবে

তো তার জন্যে জবর বন্দোবস্ত করতে হবে! আর সময়টাও বেশ জুতসই হয়েছে,—ধান কাটা শেষ, গ্রামের সকলেরই সাহায্য মিলবে। পরে যখন খবরটা ছড়িয়ে পড়ল যে বড়লাট আমাদের জঙ্গল অঞ্চলে আসছেন, তখন কেবল আমাদের প্রজারাই নয়, কালাধুঙ্গির প্রত্যেকেই বাহাদুরের মতই উৎসাহিত হয়ে উঠল। এ থেকে কোনো লাভ বা সুযোগ-সুবিধের চিন্তায় নয়,—এই আগমনকে তারা কি করে অতিথির পক্ষে সুখকর করে তুলবে, তাদের স্বল্প সাধ্য নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করে, কেবল এই কথা ভেবেই।

পরদিন সকালে আমি অন্ধকার থাকতে চোদ্দ মাইল হাঁটা-পথ ধরে হলদোয়ানির পথে বেরিয়ে পড়লাম, কারণ হিউ স্টেব্‌লের সঙ্গে কথা কইবার আগে আমি জেফ্‌ হপকিন্সের সঙ্গে দেখা করব ঠিক করলাম—তিনি তখন ফতেপুরে তাঁবু ফেলেছেন। এ-পথের প্রথম সাত মাইল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে,—আর এই ভোরে সে পথে বনের প্রাণী আর আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কালাধুঙ্গির বাজার থেকে এক মাইল এগোতে অন্ধকার ফিকে হয়ে এল, রাস্তার ধুলোর উপর একটা পুরুষ-চিতার টাটকা থাবার ছাপ আমার চোখে পড়ল—এ দাগ চলে গেছে যেদিকে আমি চলেছি সেই দিকেই। কিছুক্ষণ পরে একটা মোড় ঘুরতেই সামনে দুশো গজ তফাতে একটা চিতা আমার চোখে পড়ল। মনে হল সে আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে, কারণ মোড়টা ভাল করে ফিরতে না ফিরতেই সে মাথা ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। যাই হ'ক তবুও সে সেইভাবেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল আর থেকে-থেকে পিছন ফিরে আমায় দেখতে লাগল। দূরত্বটা যখন আমি কমিয়ে পঞ্চাশ গজে এনেছি তখন সে পথ ছেড়ে একটা হালকা ঘাস-জমিতে নেমে গেল। তেমনি একভাবে সামনে তাকিয়ে এগোতে এগোতে আমি চোখ ঘুরিয়ে দেখলাম, রাস্তা থেকে কয়েক ফুট তফাতে সে ঘাসের উপর গুঁড়ি মেরে রয়েছে। আরও একশো গজ মত এগোবার পর আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। দেখলাম, আবার সে রাস্তার উপর উঠেছে যেন একজন সাধারণ পথচারীকে যাবার পথ করে দিয়ে আবার চলতে শুরু করেছে। কয়েকশো গজ অগ্রসর হবার পর তাকে পথ থেকে নেমে একটা গভীর দরির মধ্যে প্রবেশ করতে দেখলাম। মাইল-খানেকের মত পথে আমি একাই চলছিলাম তারপর ডানদিকের জঙ্গল থেকে পাচটা লাল কুকুর লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। যেমন নির্ভীক, তেমনি দ্রুতগতি তারা ; প্রজাপতির মত নিঃশব্দে ও নিঃসঙ্কোচে তারা বনে দৌড়ে বেড়ায়, আর খিদে পেলে খায় যা সবচেয়ে সেরা। প্রাণীদের মধ্যে ভারতীয় বনকুত্তাদের মত অত উন্নত ধরনের জীবনযাত্রা আর কারুর নয়।

আমি যখন বন-বাংলোয় পৌঁছলাম তখন জেফ্‌ আর জিলা হপকিন্স প্রাতরাশে বসেছেন,—একটু সকাল-সকালই। আমি কী কাজে হলদোয়ানি

যাচ্ছি তা শুনে তাঁরা যেমন খুশি তেমনি উৎসাহিত হলেন। জেফ্ তখন তরাই আর ভাবর গভর্মেন্ট এস্টেটের বিশেষ বন-রক্ষক, তাই তাঁর সাহায্য ভিন্ন হিউ স্টেব্‌লের কাছে কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাতলানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জেফ্ উৎসাহের সঙ্গেই সাড়া দিলেন। শিকারের অভিযান সফল করতে হলে বনের মধ্যে দুটো শিকারের আস্তানা দরকার। যে দুটো আস্তানা আমার পছন্দ দুটোই সৌভাগ্যবশত তখন খালি ছিল, জেফ্ বললেন তিনি সে দুটো আমার জন্যে রেখে দেবেন। পার্শ্ববর্তী সংরক্ষিত অঞ্চল দাচাউরির যে আস্তানা তিনি নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন সেটাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ব্যবহারের জন্যে দিলেন। বাঘের থাবার ছাপ লক্ষ করা আর মহাশোল মাছ ধরা থেকে আরম্ভ করে জেফের সঙ্গে এই সুফলপ্রসূ সাক্ষাৎকার—সবই বেশ চলছিল। হলদোয়ানির পথের মাইলের পর মাইল কখন যে অতিক্রম করে গেলাম তা যেন টেরই পেলাম না।

ঠিক এগারোটার সময় হিউ স্টেব্‌লের টেলিফোন এল। তিনশো মাইল ব্যবধান থেকে আমাদের এই কথাবার্তা অব্যাহত চলল এক ঘন্টা ধরে। এই এক ঘন্টায় হিউ জানলেন যে হিমালয়ের পাদদেশে কালাধুঙ্গি নামে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে যার চারদিকে জঙ্গল আর সেই জঙ্গলে অনেক রকম শিকারের প্রাণী আছে, এবং ছুটি কাটাবার পক্ষে তার চেয়ে ভাল কোনো জায়গা আমার জানা নেই। হিউয়ের কাছে শুনলাম বড়লাটের দল বলতে মাহামান্য লর্ড লিনলিথগো ও তাঁর স্ত্রী, আর তাঁদের তিন কন্যা—লেডি অ্যান, জোন ও ডোরীন (বান্টি) হোপ। আর সেই দলে আসবেন বড়লাটের ব্যক্তিগত কর্মচারিবৃন্দ, কারণ ছুটির মধ্যেও বড়লাটকে পুরো দিনের কাজ করতে হয়। শেষে শুনলাম, শিকারের প্রস্তুতির জন্যে আমি সময় পাব পনের দিন। বড়লাটের গৃহস্থালির তত্ত্বাবধায়ক মাউজ ম্যাক্সওয়েল পরদিনই দিল্লী থেকে মোটরে এসে পৌঁছলেন। তাঁর পরে এলেন পুলিসের প্রধান, সি আই ডি-র প্রধান, নাগরিক প্রশাসনের প্রধান, বন-বিভাগের প্রধান, আরও অনেক অনেক বিভাগীয় প্রধান। আর, সবচেয়ে ভীতিপ্রদ, একজন রক্ষী—তার কাছে শুনলাম বড়লাটের দেহরক্ষক হিসেবে সে একদল সৈন্যও কালাধুঙ্গিতে নিয়ে আসছে।

বাহাদুর যে বলেছিল জবর বন্দোবস্ত করতে হবে, ঠিকই বলেছিল। কিন্তু সে বন্দোবস্ত যে কত জবর হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা তার বা আমার স্বপ্নেও কখনো ছিল না। যাই হ'ক, সকলের আপ্রাণ সহযোগিতা ও সাহায্যের ফলে কাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হল, কোথায়ও কোনো অসুবিধা হয় নি বা বাধা পড়ে নি। চারটি বীট সম্পন্ন হল, চারটি বাঘ মারা পড়ল,—যাঁরা শিকার করলেন আগে তাঁরা কখনো জঙ্গলে বাঘ দেখেন নি,—অথচ গোলা গুলির খরচও হল যতটা কম সম্ভব। বীট করে বাঘকে বার করার অভিজ্ঞতা যাদের আছে

একমাত্র তারাই ঠিকমত বুঝতে পারবে এটা কত বড় সাফল্য। এই স্মরণীয় শিকার অভিযানের শেষ দিন,—দলের যে কনিষ্ঠতমা কেবল তারই এখন বাঘ শিকার বাকি। সেদিনের বীটটার ব্যবস্থা হল একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি এলাকা ঘিরে, প্রাচীন যুগে যেটা ছিল বোর নদীর গর্ভ কিন্তু এখন ছোট-বড় গাছ-গাছড়ার ঝোপে-জঙ্গলে আর নল-ঘাসে আর বুনো কমলালেবু ঝোপে নিবিড়। এক কালে যেটা ছিল নদীর তীর সেখানে বড় বড় পাঁচটা গাছে পাঁচটা মাচান বাঁধা হয়েছে—নিচের জমি থেকে বাঘটাকে তাড়িয়ে এদিকে আনা হবে।

অনেকটা ঘুরিয়ে আমি সবাইকে মাচানের পেছন দিয়ে নিয়ে গেলাম কারণ অনেক বীট পণ্ড হয়ে যেতে দেখেছি বাঘ যেখানে থাকার সম্ভাবনা তার সামনে দিয়ে বন্দুক হাতে চলে যাবার ফলে। যারা বাঘের গতি রোধ করবে তারাও সঙ্গে ছিল, তারাও আমার ডাইনে বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে যে-সব গাছ আমি তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম সেইসব গাছে গিয়ে উঠল ; আর পিটার বরউইক (বড়লাটের এক এ ডি সি), বাহাদুর আর আমি বন্দুকধারীদের যথাস্থানে বসিয়ে দিলাম। এক নম্বর মাচানে বসালাম অ্যানকে, আর দু-নম্বরে বড়লাটকে। তিন নম্বরটা হল বড় গাছের অভাবে একটা বেঁটেখাটো কুল-জাতীয় গাছ, আমার মতলব ছিল বাহাদুরকে সেই গাছে বসিয়ে বাঘটাকে তাড়া দেওয়া। তাড়া খেয়ে বাঘটা বাঁ দিকে মোড় ফিরবে, এই কারণে বার্ণিকে বসালাম চার নম্বর মাচানে, দলের মধ্যে একমাত্র সে-ই এ পর্যন্ত কোনো বাঘ মারে নি।

যে ঝোপটার মধ্যে বাঘটা ছিল সেদিক থেকে বেরিয়ে একটা পশু-চলার পথ নদীর তীর ধরে এসে সোজা তিন নম্বর মাচানের তলা দিয়ে চলে গেছে। আমি নিশ্চয় জানতাম যে বাঘটা এই পথ ধরে আসবে, এবং মাচানটা মাটি থেকে ছ-ফুট উঁচু হওয়ায় আমি ভেবে দেখলাম যে যদিও কোনো অভিজ্ঞ মানুষকে তাড়া দেবার জন্যে এখানে বসানো যেতে পারে, কোনো বন্দুকধারী শিকারীকে এখানে বসানো অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে। মেয়েদুটি, পিটার, বাহাদুর আর আমি মাচানের কাছে গিয়েছি, বাহাদুর মাচানে উঠতে যাচ্ছে, ঠিক এ-হেন মুহূর্তে আমি আমার মতলব পালটালাম। মাচানটা ছিল ঠিক আমার মাথা-বরাবর। সেখানে হাত দিয়ে আমি ফিসফিস করে বার্ণিকে বললাম যে আমি চাই সে সেখানে বসুক,—তার সঙ্গী হবে পিটার। বিপদের সম্ভাবনাটা তাকে বুঝিয়ে দেবার পর সে কিছুমাত্র ইতস্তত না করেই সেখানে বসতে রাজী হল। তখন আমি তাকে অনুরোধ করলাম যেন আমার চিহ্নিত একটা জায়গা পর্যন্ত বাঘটা না এলে কোনোমতেই গুলি না করে, আর গুলি যেন করে খুব ভাল করে তার গলা লক্ষ্য করে। বার্ণি আমায় কথা দিল তাই করবে। তখন পিটার আর আমি তাকে ধরে মাচানে তুলে দিলাম।

তারপর পিটারকেও ওঠবার ব্যাপারে সাহায্য করবার পর আমি তাঁকে আমার ৪৫০।৪00 ডি. বি. রাইফেলটা দিলাম,—বাণ্টির হাতেও একই রাইফেল। (পিটারের কোন অস্ত্র ছিল না, কারণ কথা ছিল তিনি আমার সঙ্গে বীটে থাকবেন।) তারপর নদীর তীর ছেড়ে আমরা এগিয়ে গেলাম পশু-চলা পথ ধরে। মাচান থেকে কুড়ি গজ মত দূরে এসে আমি একটা শুকনো কাঠি রাস্তার উপর আড়াআড়ি করে রাখলাম আর সেইসঙ্গে মুখ তুলে বাণ্টির দিকে তাকালাম। সেও মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল যে সে বুঝেছে।

লেডি জোন, বাহাদুর আর আমি এবার গেলাম যে গাছে চার নম্বর মাচান তৈরি হয়েছে সেখানে। মাটি থেকে মাচানটার উচ্চতা কুড়ি ফুট, কোনো আড়াল না থাকায় ত্রিশ গজ দূরের তিন নম্বর মাচানটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। রাইফেলটা তাঁকে দেবার জন্যে জোনের পিছু-পিছু আমি মই বেয়ে উঠে ওঁকে অনুরোধ করলাম লক্ষ রাখতে, যদি বাণ্টি আর পিটার বাঘটাকে থামাতে না পারে, কোনোমতেই যেন তিনি বাঘটাকে তিন নম্বর মাচান পর্যন্ত পৌঁছতে না দেন। তিনি আমায় নিশ্চিন্ত হতে বললেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। নদীতীরের এদিকটায় ঝোপ-টোপ নেই, কেবল ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কিছু গাছ আছে। কাজেই বাঘটা যখন ষাট গজ দূরের ঝোপ থেকে বেরোবে তখন দুটো মাচান থেকেই তাকে স্পষ্ট দেখা যাবে, যতক্ষণ না সে, আমার পরিকল্পনা মত বাণ্টির গুলিতে মারা পড়ছে। বাহাদুরকে পাঁচ নম্বর মাচানে রেখে দিলাম যাতে দরকার হলে বাঘটাকে আটকাতে পারে, তারপর আমি বীটের বাইরে দিয়ে ঘুরে বোর নদীতে এসে পৌঁছলাম।

যে ষোলটা হাতি দিয়ে বীট করানো হবে, যেখানে আমি মহাশোলটা ধরেছিলাম তার কাছে—অর্থাৎ ওখান থেকে সিকি মাইলটাক দূরে তাদের একত্র করা হল। আমার বহুদিনের পুরনো বন্ধু বুড়ো মোহনের নেতৃত্বে তারা চলবে। মোহন ত্রিশ বছর উইন্ডহ্যামের প্রধান শিকারী ছিল,—বাঘ সম্বন্ধে তার মত জ্ঞান ভারতে আর কারো নেই। মোহন আমার খোঁজ করছিল, তাই জঙ্গলের ভিতর থেকে আমায় আসতে আর টুপি দোলাতে দেখে সে নদীর খাত ধরে হাতিগুলোকে রওনা করে দিল। নুড়ি-বিছানো পথে ষোলটা হাতির একটার পেছনে একটা করে সিকি মাইল পথ অতিক্রম করতে সময় লাগবে খানিকটা। তাই একটা পাথরের উপর বসে ধূমপান করতে করতে চিন্তার অবসর হল। যতই চিন্তা করলাম ততই অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। জীবনে এই প্রথম আমি একজনের—কিংবা হয়তো দু-জনের জীবন বিপন্ন করে তুললাম, এবং এটা যে প্রথমবার, এ কথাতেও মনে কোনো সান্ত্বনা মিলল না। কালাধুঙ্গিতে এসে পৌঁছবার আগে লর্ড লিনলিথ্‌গো আমায় বলেছিলেন সকলের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিতে। এই কর্তব্য সবাই খুব নিখুঁতভাবে

পালন করে আসছিল ; তিনশোর বেশি লোক তাঁবু করে রয়েছে, প্রতিদিন শিকার করছে, মাছ ধরছে, কারুর গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি। কিন্তু আজ এই শেষের দিনে সবার বিশ্বাসভাজন আমি নিজেই বুঝি এমন একটা কাজ করে বসলাম যে জন্যে আমায় অত্যন্ত অনুতাপ করতে হচ্ছে। মাটি থেকে মাত্র ছ'ফুট উঁচু ওই পলকা মাচানে ভরসা করে আমার পরিচিত কাউকেই আমি বসাতে পারতাম না। অথচ সেখানেই আমি বসিয়েছি বাচ্চা একটা মেয়েকে। তাকে বলেছি, বাঘটা সোজা ওর দিকে এগিয়ে এলে তাকে মারতে—বাঘ শিকারের সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রক্রিয়া। বাণ্টি আর পিটার দু-জনেই অবশ্য বাঘের মতই দুঃসাহসী, কারণ বিপদের সম্ভাবনাটা ভাল করে জেনে নিয়েও তারা বিনা দ্বিধায় মাচানে উঠেছে। কিন্তু বন্দুকে লক্ষ নিখুঁত না হলে কেবলমাত্র সাহসই তো আর যথেষ্ট নয়। তারা এমনকি বন্দুক সিধে করে ধরতে পারে কি না তাও আমার সঠিক জানা নেই। মোহন যখন তার হাতিদের নিয়ে এসে পৌঁছল তখনও আমি বীট চালাব না বন্ধ করে দেব সে বিষয়ে মনস্থির করতে পারি নি। সমস্ত ব্যাপারটা তাকে খুলে বলতে মোহন প্রথমে জোরে শ্বাস টানল (পশ্চিমীরা শিস দিয়ে উঠত) ; তারপর শক্ত করে চোখ বন্ধ করল, তারপর আবার বন্ধ চোখ খুলল। তারপর বললে, 'ঘাবড়াবেন না সাহেব, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সমস্ত মাহুতদের একত্র করে আমি তাদের বুঝিয়ে দিলাম যে বাঘটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু ভয় পাওয়ালে চলবে না। হাতিগুলোকে নদীর তীরে লাইন করে সাজাবার পর ওরা আমার নির্দেশ গ্রহণ করবে। যখন দেখবে আমি মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে দোলাচ্ছি তারা একবার চিৎকার করে উঠবে, তারপর হাততালি দিতে শুরু করবে এবং হাততালি দিয়ে চলবে যতক্ষণ না আমি হ্যাটটা আবার মাথায় পরছি। এই ব্যাপার চলবে কিছুক্ষণ পরে পরে। এতেও যদি বাঘটা না নড়ে তখন আমি ওদের অগ্রসর হবার সংকেত করব এবং সে অগ্রগমন হবে নিঃশব্দে ও অত্যন্ত মন্থর গতিতে। প্রথম চিৎকারটায় দুটো কাজ হবে : এক, এতে করে বাঘের ঘুম ভাঙবে, আর দুই, বন্দুকধারীরা সতর্ক হবে।

যে জঙ্গলটা বীট করতে হবে সেটার আয়তন চওড়ায় তিনশো গজ আর লম্বায় পাঁচশো গজ। হাতিগুলো আমার দু-দিকে লাইন করে দাঁড়ালে আমি হ্যাটটা খুলে নিয়ে দোলাতে লাগলাম। তখন ওরা খুব জোরে একটা চিৎকার করে হাততালি দিতে শুরু করল। তিন-চার মিনিট হাততালি দেওয়া হয়ে গেলে আমি টুপিটা আবার মাথায় পরলাম। এই অঞ্চলটায় ছিল সম্বর, চিতল, কাকার হরিণ, ময়ূর আর বন-মোরগ, তাই কোনো সংকেত-সূচক শব্দের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু কিছুই আমার কানে এল না। পাঁচ মিনিট পরে

আমি আবার টুপিটা খুলে নিয়ে দোলাতে লাগলাম। এক মিনিট কি দু-মিনিট পরেই একটা রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেল। আমি মুহূর্তগুলো গুনতে লাগলাম, কারণ বাঘের বীটের সময়ে পর-পর গুলির আওয়াজের মধ্যবর্তী বিরতির সময় হিসেব করলে অনেক কিছুই জানতে পারা যায়।—এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ পর্যন্ত গুনলাম। তারপর আবার শ্বাস নিচ্ছি, এমন সময় অল্প সময়ের ব্যবধানে বন্দুকের দুটো আওয়াজ আমার কানে এল। তারপর আবার : এক—দুই—তিন—চার, চতুর্থ একটা গুলির আওয়াজ হল। প্রথম আর চতুর্থ এই দুটো গুলি নিক্ষিপ্ত হয় বন্দুকের মুখ আমাদের দিকে ফিরিয়ে, আর বাকি দুটো হয় অন্য দিকে ফিরিয়ে। এর মাত্র একটাই অর্থ হতে পারে : সেটা হল, নিশ্চয় কোনো গণ্ডগোল হয়েছে, এবং জোনকে সাহায্যে আসতে হয়েছে, কারণ বড়লাট যে-মাচানে ছিলেন সেখান থেকে বান্টির মাচান দৃশ্যমান নয়।

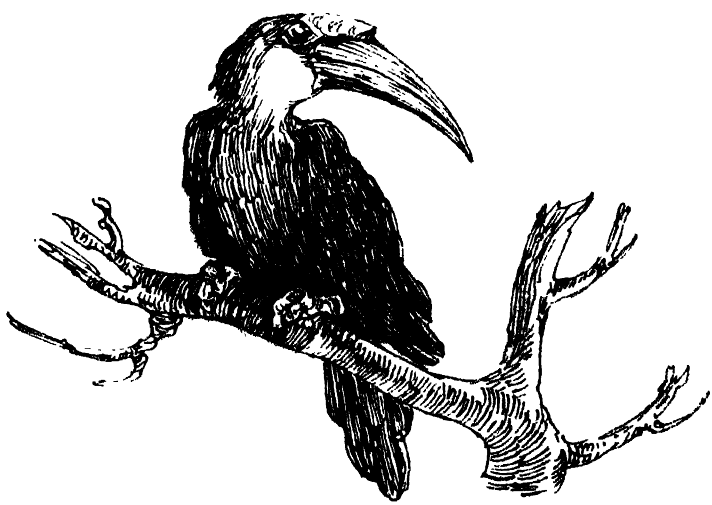
আমার হৃদ্স্পন্দন তখন অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে, অবর্ণনীয় আতঙ্কে আমার মন ভরে উঠেছে। হাতিদের চালাবার ভার মোহনের উপর দিয়ে আমি আমার হাতির মাহুত আজমতকে বললাম যত বেগে সম্ভব গুলির আওয়াজ অনুসরণ করে যেতে। আজমতের শিক্ষা হয়েছিল উইণ্ডহ্যামের কাছে,—সম্পূর্ণ অকুতোভয় সে, তার মত মাহুত আমি আর একটি দেখি নি। আর তার হাতিও শিক্ষায় সহবতে তারই উপযুক্ত। কাঁটা-ঝোপ ভেঙে, বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে ভাঙা পথ মাড়িয়ে, মাথার উপরের ঝুলে-পড়া ডালপালার তলা দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম—আমার দুশ্চিন্তা তখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। তারপর একফালি বারো ফুট লম্বা নল-ঘাসের বনের মধ্যে প্রবেশ করার পর হাতিটা ইতস্তত করতে লাগল। আজমত পেছন ফিরে ফিসফিস করে আমায় বললে, 'ও বাঘের গন্ধ পেয়েছে সাহেব ; ভাল করে ধরে থাকুন, কারণ আপনি নিরস্ত্র।'

আর মাত্র একশো গজ পথ বাকি, অথচ এখনো বন্দুকধারীর কাছ থেকে কোনো সংকেত নেই, যদিও প্রত্যেককেই একটা করে রেলের হুইস্ল্ দেওয়া আছে দরকার হলে বাজাবার জন্যে। হুইস্ল্ শোনা যায় নি এ কথা ভেবেও আমার মনে কোনো স্বস্তি এল না, কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে উত্তেজনার মুহূর্তে হুইস্লের চেয়ে অনেক বড় বস্তুও মাচান থেকে পড়ে যেতে পারে। তখনই গাছের ফাঁক দিয়ে আমি জোনকে দেখতে পেলাম। স্বস্তিতে, আনন্দে আমি চিৎকার করে উঠতে পারতাম, কারণ দেখলাম রাইফেলটা দুই হাঁটুর উপর রেখে সে নির্বিকার মাচানে বসে আছে। আমায় দেখতে পেয়ে সে দু-হাত প্রসারিত করে দেখাল, যার অর্থ—বাঘটা বেশ বড়, তারপর বান্টির মাচানের সামনে অঙ্গুলি-নির্দেশ করল।

এর পরের ঘটনা, কিন্তু পনের বছর পরেও সে কাহিনী বলতে আমার ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসে। তিন তরুণ তরুণীর অসীম সাহস ও অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ না থাকলে সেদিনের ঘটনার মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত।

বীট শুরুর সময় আমাদের চিৎকার বন্দুকধারীরা শুনতে পেয়েছিল স্পস্ট, তারপর হাততালির ক্ষীণ আওয়াজ। তারপর বিরতির সময়টায় বাঘটা বেরিয়ে যেখানে আসে সে জায়গাটা হল তিন নম্বর মাচান থেকে ষাট গজেরও বেশি দূরে। তারপর বাঘটা পশু-চলা পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। হাতির পিঠে বসে আমাদের দ্বিতীয় বারের চিৎকার যখন শুরু হল বাঘটা তখন নদীর পাড় পর্যন্ত পেঁৗছেছে। চিৎকারটা কানে যেতে সে থেমে পড়ে মাথা ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকায়, তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই স্থির করে, দু-এক মিনিট কান পেতে শুনে সে নদীর তীর ধরে উঠতে শুরু করে। রাস্তার উপরে যেখানে আমি শুকনো কাঠিটা রেখেছিলাম বাঘটা সেখানে পেঁৗছতে বান্টি গুলি করে। গুলি করে কিন্তু তার বুকে, কারণ মাথা নিচু করে অগ্রসর হওয়ার ফলে গলাটা লক্ষ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। গুলিটা লেগেছিল ঠিকই ; সেটা খেয়ে বাঘটা, বান্টি বা পিটারের মাচান থেকে দ্বিতীয় কোনো গুলি খাওয়ার আগে সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ে, তারপর গর্জন করতে করতে মাচানটার তলায় এসে সেখান থেকে সেটাকে আক্রমণ করে। বেঁটে গাছটার উপরে পলকা মাচানটা যখন দুলছে আর বাঘটার আক্রমণে যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে মনে হচ্ছে আর বান্টি আর পিটার উন্মত্তের মত মাচানের ফাঁক দিয়ে বন্দুকের নল গলিয়ে দেবার চেষ্টা করে চলেছে, ত্রিশ গজ দূরের মাচান থেকে জোন তখন একটা গুলিতে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেললেন, তারপর দ্বিতীয় গুলিটাও ছুড়লেন। এই দ্বিতীয় গুলিটা খেয়ে বাঘটা নদীর তীর ধরে নেমে যাচ্ছিল—যে ঘন ঝোপ থেকে এসেছিল সেখানে যাবার উদ্দেশ্যেই মনে হয়—এমন সময় বান্টি তার মাথার পিছনে আর একটা গুলি করে।

এই আমাদের বড়লাটের প্রথম কালাধুঙ্গি সফর, কিন্তু শেষ সফর নয়। এরপরে আরও অনেকবার তাঁর আগমনে আমাদের ছোট তরাইয়ের গ্রাম সম্মানিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর বা তাঁর দলের কোনো ব্যক্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে আর কখনো মুহূর্তের জন্যেও আমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে নি, কারণ সেই স্মরণীয় সফরের শেষ দিনের মত ঝুঁকি ভুলেও আর কখনো আমি গ্রহণ করি নি।



১১

নভেম্বর থেকে মার্চ—হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের এই সময়ের জল-বায়ুর কোনো তুলনা নেই। আর এর মধ্যে আবার সবচেয়ে ভাল সময় হল ফেব্রুআরি। বাতাস তখন স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর, আর যে অসংখ্য পাখি উঁচু পাহাড়-অঞ্চল থেকে খাদ্য ও উষ্ণ আশ্রয়ের সন্ধানে নভেম্বরে নেমে এসেছিল তখনও তারা চলে যায় না। যে-সব পত্রমোচী গাছ সমস্ত শরৎকাল ও শীতের সময় পত্রহীন ছিল এই সময় তাদের কোনোটায় ফুল ফুটতে শুরু করে, কোনোটা বা ছেয়ে যায় সবুজ আর গোলাপি কচি-কচি পাতায়। বসন্তের ছোঁয়া তখন বাতাস ছেয়ে, প্রতিটি গাছের রসে, প্রতিটি প্রাণীর রক্তে পরিব্যাপ্ত। উত্তরের পাহাড়-অঞ্চলে হ'ক, দক্ষিণের সমতল অঞ্চলে হ'ক বা তরাই অঞ্চলেই হ'ক, বসন্তের আর্বিভাব কিন্তু হয় রাতারাতি। এক শীতের রাত্রে হয়তো আপনি শুতে গেছেন, পরদিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলেন, দেখলেন যে বসন্তকাল শুরু হয়ে গেছে। সারা প্রকৃতি আপনাকে ঘিরে বসন্তের আসন্ন আনন্দের কল্পনায় উদ্বেল—প্রচুর খাদ্যসামগ্রী, গরমের আরাম, প্রাণের পুনঃপ্রকাশ। যাযাবর পাখিরা ছোট-ছোট ঝাঁকে ঘুরছে ফিরছে,—অন্যান্য দলের সঙ্গে তারা একত্র হবে কোনো নির্দিষ্ট দিনে, পায়রা বা তোতাপাখি বা দোয়েল বা আর-আর ফলহারী পাখিরা আপন-আপন সর্দারের নির্দেশে উপত্যকা থেকে উঠে এসে যে

যার নির্দিষ্ট অঞ্চলে চলে যাবে, আর যারা পতঙ্গভুক তারা গাছ থেকে গাছে বেগে যেতে যেতে সেই একই উদ্দেশ্যে একই অভিমুখে অগ্রসর হয়ে দিনে মাত্র কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করবে। যাযাবর পাখিরা বেরিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি আছে, আর যে-সব পাখি এ অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা তারা যে যার সঙ্গী বেছে নিয়ে খোঁজ করে কোথায় বাসা বাঁধবে। এদিকে বনের সমস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে যেন স্বরক্ষেপের প্রতিযোগিতা শুরু হল,—তাদের ডাক শুরু হয় দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আর নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় সর্বভুক পাখিরা পর্যন্ত, আর তাদের মধ্যে গলার জোর যার সবার বেশি, সেই তিলিয়া বাজ অনেক উঁচুতে উঠে এতটুকু হয়ে গিয়েও তার তীক্ষ্ন স্বর পাঠিয়ে দেয় মাটির পৃথিবীতে।

জঙ্গলের লড়াইয়ের শিক্ষাদানের সময় একদিন আমি মধ্যভারতের এক জঙ্গলে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল একদল পক্ষি-বিশারদ। মাথার উপরে, অনেক—অনেক উঁচুতে একটা তিলিয়া বাজ ঘুরছিল আর চিৎকার করে চলছিল। আমার সঙ্গের দলটা এসেছে ব্রিটেনের নানা অঞ্চল থেকে, নতুন এসেছে বাহিনীতে, যাবে ব্রহ্মদেশ। কিন্তু ওদের মধ্যে কেউই ইতিপূর্বে তিলিয়া বাজ দেখে নি। একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে আমি আকাশে একটা ছোট্ট চিহ্ন ওদের দেখালাম। দূরবীন বার করা হল, কিন্তু হতাশ হল সবাই, কারণ পাখিটা এত উঁচুতে, যে তাকে সনাক্ত করা বা স্পষ্ট করে দেখা সম্ভব হল না। সঙ্গীদের চুপ করে থাকতে বলে আমি পকেট থেকে একটা তিন ইঞ্চি ভেঁপু বার করলাম, তারপর খুব জোরে ফুঁ দিলাম তাতে। ভেঁপুটার একটা দিক খোলা আর একটা দিক বন্ধ,—অত্যন্ত নিপুণভাবে তাতে বিপন্ন হরিণ-শিশুর তীক্ষ্ন চিৎকারের নকল করা যেত। সংকেতের শিক্ষা গ্রহণের সময়ে এটার ব্যবহার হত, কারণ দিনে বা রাত্রে এটাই হল বনের একমাত্র স্বাভাবিক আওয়াজ; সুতরাং কোনো শত্রুকে আকর্ষণ করবার মত নয়। শুনেই তিলিয়া বাজটা চিৎকার বন্ধ করল, কারণ সাপ প্রধান খাদ্য হলেও অন্য খাদ্যে তার অরুচি ছিল না। ডানা বন্ধ করে সে কয়েকশো ফুট নেমে এল, তারপর আবার পাক খেতে খেতে ঘুরতে লাগল। তারপর প্রতিটি ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই নেমে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বড় বড় গাছগুলো বরাবর এসে ঘুরতে লাগল। এখন আর তাকে স্পষ্ট দেখতে আমাদের অসুবিধে হল না। পঞ্চাশ জনের সেই দলের যাঁরা ব্রহ্মের যুদ্ধের পর জীবিত আছেন তাঁদের কি চিন্দোয়ারার সেই দিনের কথা মনে আছে যখন কিছুতেই আমি বাজটাকে ফোটো তোলার উদ্দেশ্যে কাছাকাছি কোনো ডালে বসাতে পারি নি? মন খারাপ করবেন না। এই বসন্তের সকালে আসুন আমার সঙ্গে তিলিয়া বাজের মত অনেক চমকদার প্রাণীরই দেখা পাবেন।

চিন্দোয়ারার সেই দিনের পরে আপনি আরো অনেক কিছু জেনেছেন। আত্মরক্ষার তাগিদে আপনি শিখেছেন যে মানুষের দৃষ্টির পরিধি ১৮০ ডিগ্রি। শব্দের উৎপত্তি সঠিক নির্ণয় করা, যা তখন আপনার কাছে এত কঠিন মনে হত, এখন তা আপনার স্বভাবের অংগীভূত হয়ে পড়েছে। ছেলেবেলায় গোলাপ আর ভায়োলেট ফুলের গন্ধের পার্থক্য বুঝতে পারতেন, কিন্তু এখন যে-কোনো ফুলের গন্ধ থেকে গাছটাকে চিনতে পারবেন। গাছের মগডালেও যদি সেই ফুল ফুটে থাকে, কিংবা গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে, তবুও সেই ফুলের গন্ধ আপনি চিনতে পারবেন। এতদিনে আপনি অনেক কিছু শিখেছেন, আর তার ফলে আপনার আত্মবিশ্বাস নিরাপত্তাবোধ, সুখ, সবই অনেকটা বেড়েছে। তবুও এখনও অনেক শিখবার আছে। আসুন, এই সুন্দর বসন্তের সকালে আমরা আরো খানিকটা জেনে শুনে নিই।

আমাদের এলাকার উত্তর সীমানা-স্বরূপ যে খালটিতে আমাদের মেয়েরা স্নান করত, তাতে জল নিয়ে আসা হত পূর্বোক্ত পাহাড়ী নদীটি থেকে, একটি নালা কেটে। এই নালার নাম ছিল 'বিজলী দন্ত' অর্থাৎ বিদ্যুৎ জলধারা। প্রথম যে নালাটি স্যার হেনরি র‍্যামজে তৈরি করিয়েছিলেন বহু বছর আগেই সেটা বাজ পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। লৌকিক কুসংস্কারে বলে যে কোনো অপদেবতার আকর্ষণেই কোনো বিশেষ জায়গায় বজ্রপাত হয়ে থাকে। এই অপদেবতা সাধারণত সাপের রূপ নিয়ে থাকে। তাই সেই পুরনো ভিত ভেঙে দিয়ে অন্য জায়গায় সেইরকমই আর একটা নালা কাটা হয় এবং আজ পঞ্চাশ বছর ধরে তা দিয়ে জল বয়ে আসছে। উত্তরের জঙ্গল থেকে যে-সব বন্য জন্তু রাত্রে গ্রামে আসে এবং যারা ওই দশ ফুট চওড়া খাল সাঁতরাতে বা লাফিয়ে পার হতে চায় না তারা এই নালা ব্যবহার করে। তাই এই বসন্তের সকালে আমরা এই জায়গাটা থেকে যাত্রা শুরু করব।

নালাখিলানের নিচের বালি-ছাওয়া পথে খরগোশ, কাকার হরিণ, শুয়োর, শজারু, হায়েনা আর শেয়ালের চলা-ফেরার চিহ্ন রয়েছে। এ-সবের মধ্যে কেবলমাত্র শজারুর চিহ্নগুলোই আমরা ভাল করে লক্ষ করব, কারণ রাতের বাতাস নেমে যাওয়ার পর আর তার চলা-পথে উড়ো বালি এসে জমে না। পাঁচটা আঙুল আর পায়ের পাতার ছাপ দেখা যায়,—প্রতিটি পদক্ষেপ স্পষ্ট; কারণ শজারুর গুড়ি মেরে চলবার দরকার হয় না এবং তার একটা পা আরেকটা পায়ের দাগের উপর পড়ে না। প্রত্যেকটা পায়ের দাগের সামনে বালির উপর একটা গর্ত-মত দেখা যায় (শজারুর শক্ত নখের দাগ), খাদ্য আহরণে এই নখই তার অস্ত্র। শজারুর পিছনের পায়ের পাতাগুলো হয় লম্বাটে ধরনের, এই লম্বাটে অংশটার বা গোড়ালিটার ছাপ অবশ্য ভাল্লুকের মত অতটা স্পষ্ট হয় না, তাহলেও অন্য যে-কোনো প্রাণীর

পায়ের দাগের থেকে একে আলাদা করে চিনে নেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। আরও নিশ্চিত হতে হলে খুব ভাল করে তাকালে দেখা যাবে, এই চিহ্নের মাঝ দিয়ে বা এর সমান্তরাল হয়ে কতকগুলো সূক্ষ্ম রেখা চলে গেছে। শজারুর চলার সময়ে তার ঝুলে পড়া দীর্ঘ কাঁটাগুলো মাটিতে লেগে এই রেখাগুলি টেনে দিয়ে গেছে। শজারুর কাঁটা মসৃণ নয়, তাতে আবার ছোট-ছোট কাঁটার মত থাকে। শজারু তার কাঁটা ছুড়তে বা ফোলাতে পারে না, আত্মরক্ষা বা আক্রমণে তার একমাত্র পদ্ধতি হল কাঁটাগুলো খাড়া করে পিছন দিকে ছুটে যাওয়া। তার ল্যাজের শেষে থাকে কতকগুলো ফাঁপা কাঁটা, দেখতে সরু-বোঁটাওলা লম্বা মদের গেলাসের মত কতকটা। এই কাঁটাগুলো তারা কাজে লাগায় শব্দ করে শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্যে আর তার ডেরায় জল বহন করবার জন্যে। ডোবালে এগুলো সহজেই জলে ভরে ওঠে, আর এই জল শজারু ব্যবহার করে তার ডেরা ঠান্ডা বা পরিষ্কার রাখবার জন্যে। শজারুরা নিরামিষাশী, ফলমূল আর শস্য হল তাদের খাদ্য। হরিণের খসে-পড়া শিং বা চিতার বা বনকুত্তার বা বাঘের কবলে মরা হরিণের শিংও তাদের খাদ্য, তাদের স্বাভাবিক খাদ্যে ক্যালসিয়াম বা অন্য কোনো খাদ্যপ্রাণের যে অভাব তা পূরণ করবার জন্যেই হয়তো। অপেক্ষাকৃত ছোট্ট প্রাণী হলেও শজারুর মনে সাহসের অভাব নেই,—অনেক বড় বড় শত্রুরও সে মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।

নালাটির কয়েক শো গজ উপর পর্যন্ত জল-পথটির গর্ভ পাথরে পাথরে ছাওয়া : জায়গায় জায়গায় পশুদের পায়ে-চলা পথ জলপথের উপর দিয়ে গেছে। এগুলির কথা বাদ দিলে পাহাড়ের পাদদেশ ধুয়ে আসা সূক্ষ্ম বালিতে ছাওয়া এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে না পৌঁছনো পর্যন্ত আর কোথায়ও বন্যপ্রাণীর পায়ের ছাপ দেখা যাবে না। যত প্রাণী এখানে জল-পথ ধরে আসে তাদের সকলেরই চিহ্ন এখানে স্পষ্ট। এই বিস্তীর্ণ এলাকার দু-দিকে ঘন ল্যান্টানার ঝোপ,—এর মধ্যে হরিণ, শুয়োর, ময়ূর আর বন-মোরগ দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে আর কেবলমাত্র চিতা, বাঘ আর শজারু রাত্রে প্রবেশের সাহস রাখে। সেই ল্যান্টানার ঝোপে এখন বন-মোরগের শুকনো পাতায় পা আঁচড়ানোর শব্দ পাওয়া যাবে। এখান থেকে একশো গজ দূরে একটা নেড়া শিমুল গাছের মগডালে বসে রয়েছে ওদের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু শা-বাজ। কেবল বন-মোরগের নয়, ময়ূরেরও মারাত্মক শত্রু সে। এরাই হল তার স্বাভাবিক শিকার। তবুও কিন্তু এই বনে বয়স্ক পাখি ও অল্পবয়সী পাখির সংখ্যা প্রায় সমান সমান। তাতেই প্রমাণ হয় যে পাখিরা নিজেরাই নিজেদের সামলাতে পারে। আমি তাই কোনোদিন শা-বাজদের পিছনে লাগি নি। কেবল একদিন একটা বিপন্ন হরিণশিশুর ডাক শুনে আমি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখি, একটা শা-বাজ একটা একমাস-বয়স্ক চিতল হরিণকে ধরে তার মাথাটা ছিঁড়ে ফেলবার

চেষ্টা করছে, আর চিতল-শিশুর মা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে পাখিটাকে ঘিরে ঘুরছে আর সামনের পা দিয়ে তাকে মারবার চেষ্টা করছে। বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্যে বীর মায়ের এই প্রাণপাত চেষ্টা সত্ত্বেও (যার প্রমাণ তার মুখে আঁচড়ের আর রক্তের দাগ) সে শা-বাজের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না। তার শত্রুকে আমি ঘায়েল করলাম, কিন্তু তার বাচ্চাটাকে কেবল সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কারণ, যদি-বা তার ঘাগুলো সারাতে পারতাম, তার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হত না। এই ঘটনার পর বহু শা-বাজ আমার গুলিতে মারা পড়েছে, শট-গানে গুলি করাব মত অতটা নিকটে না পেলেও, নির্ভুল রাইফেলে সহজেই তাদের গুলি করা সম্ভব। শিমুল গাছের এই পাখিটার অবশ্য আমাদের থেকে কোনো ভয় নেই, কারণ আমরা এখন এসেছি দেখতে ; হরিণ-শিশুর শত্রুদের শাস্তি দিতে নয়। যখন আমি গুলতি দিয়ে শিকার করতাম, শা-বাজের সবচেয়ে সাংঘাতিক লড়াই তখন আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। লড়াইটা ঘটেছিল বোর পুলের একটু নিচে, নদীর গর্ভে একফালি বালির মধ্যে। খরগোশ-ভ্রমে একটা মেছো বেড়ালকে লক্ষ করে ঈগলটা নেমে এসেছিল। ঈগলটা ডানা ছাড়িয়ে নিতে পারে নি বলেই হ'ক কিংবা মেজাজ বিগড়ে যাবার ফলেই হ'ক, দুটির মধ্যে এক জীবন-মরণ লড়াই শুরু হয়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই সশস্ত্র : বেড়ালটার অস্ত্র হল দাঁত আর থাবা, আর শা-বাজটার ঠোঁট আর নখ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তখনকার দিনে ফোটোগ্রাফি ছিল কেবলমাত্র স্টুডিয়োর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মুভি ক্যামেরারও চল হয় নি, এই দীর্ঘকালব্যাপী মরণপণ লড়াইয়ের কোনো বৃত্তান্ত ধরে রাখা তাই সম্ভব হয় নি। শোনা যায় বেড়ালের নটা প্রাণ আছে, তা যদি হয় ঈগলের তাহলে আছে দশটা প্রাণ। আর এ-হেন লড়াইয়ের মীমাংসা শেষ পর্যন্ত প্রাণের সংখ্যা দিয়েই হয়ে থাকে। একটা মাত্র প্রাণ কোনোরকমে বজায় রেখে ঈগলটা তার মৃত শত্রুকে বালিতে রেখে একটা ভাঙা ডানা টানতে টানতে একটা জলাশয়ে নেমে গেল। তারপর তৃষ্ণা নিবারণ করে তার দশ নম্বর প্রাণটাও ত্যাগ করল।

ল্যান্টানার ঝোপ থেকে অনেকগুলো পশু-চলা পথ ফাঁকা জায়গাটার দিকে চলে গেছে। আমরা যখন ঈগলটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম তখন, একটা বাচ্চা রুরু হরিণ ল্যান্টানার ঝোপ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পঞ্চাশ গজ দূরের জল-পথের কাছে পৌঁছেছে,—পার হবে বলেই বোধ হয়। আমরা যদি একেবারে নিশ্চল হয়ে থাকি তাহলে আমাদের লক্ষ করবে না। বনের সমস্ত জন্তুর মধ্যে রুরুই সবচেয়ে বেশি সতর্ক, এখানে এই ফাঁকাতেও সে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলেছে। পিছনের পা দুটো পেটের তলায় সেঁধিয়ে রয়েছে, বিপদের কোনো সংকেত চোখে পড়লেই বা ঘ্রাণে এলেই সে দ্রুতবেগে ছুটে পালাবে।

কখনো কখনো তাকে নীচ ও ভীরু প্রকৃতির বলে বর্ণনা করা হয়েছে; বলা হয়েছে সে জঙ্গলের প্রহরী হিসেবে নির্ভরযোগ্য নয়। এ বর্ণনার সঙ্গে আমি একমত নই। কোনো প্রাণীকেই নীচ প্রকৃতির বলা চলে না,—নীচতা হল কেবলমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। এবং রুরুর মত যে-সব প্রাণী জঙ্গলের গহনে বাঘের সঙ্গে বাস করে তাদের ভীরু অপবাদ দেওয়া যায় না। আর, নির্ভর-যোগ্যতার কথায় বলি, যে মানুষ মাটিতে থেকে শিকার করে, রুরুর চেয়ে বড় বন্ধু তার আর কেউ হতে পারে না। রুরু ছোট-খাট প্রাণী, আত্মরক্ষার ক্ষমতা তার অল্প; তার উপর শত্রু তার অসংখ্য। সুতরাং বীটের সময় যদি সে কেবলমাত্র বাঘ দেখে ডেকে না উঠে কোনো ময়াল সাপ দেখেও ডেকে ওঠে তাহলে তাকে অনির্ভরযোগ্যতার অপবাদ না দিয়ে বরং করুণা করাই উচিত, কারণ তার বা তার মত অন্যান্য প্রাণীর কাছে এই দুই নির্মম শত্রুই অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং তাদের সাড়া পেয়ে ডেকে উঠে প্রহরী হিসেবে সে তার কর্তব্যই করছে—জঙ্গলকে সাবধান করে দিচ্ছে তাদের উপস্থিতির খবর দিয়ে।

রুরু হরিণের উপরের চোয়ালে দুটো লম্বা কুকুরে দাঁত থাকে। এ দুটো অত্যন্ত ধারালো,—তার আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র; কারণ তার মাথার ছোট ছোট শিঙের অগ্রভাগ থাকে ভিতর দিকে বাঁকানো, ফলে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কয়েক বছর আগে ভারতীয় সংবাদপত্রে এক দীর্ঘ পত্রালাপ প্রকাশিত হচ্ছিল, যদিও তার কোনো সমাধান হয় নি। রুরু হরিণ মাঝে-মাঝে যে অদ্ভুত খট্-খট্ শব্দ করে থাকে তাই নিয়েই বিতণ্ডা। কেউ কেউ বলেন, শব্দটা যখন কেবলমাত্র রুরুর দৌড়ের সময়েই শোনা যায় তখন বুঝতে হবে যে তার কারণ, তার পায়ের দুটো কবে জোড়া। আবার কেউ কেউ বলেন, এর কারণ হল, কুকুরে দাঁতদুটোর কোনো অজ্ঞাত কারণে ঠোকাঠুকি। এই যে দুটি কারণ দেখানো হয়েছে তাদের কোনোটাই ঠিক নয়। শব্দটা আসে রুরুর মুখ থেকে, ঠিক যেভাবে অন্য যে-কোনো প্রাণী শব্দ করে সেভাবেই, এবং অনেক রকম পরিস্থিতিতেই এ শব্দ শোনা যায়; যেমন দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকলে, বা কোনো শিকারী কুকুরের সাড়া পেলে, কিংবা কোনো সঙ্গীর পিছু-পিছু চলার সময়ে। রুরুর সাবধানী ডাক এক স্পষ্ট ঝঙ্কৃত শব্দ, মাঝারি আকারের কোনো কুকুরের ডাকের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।

রুরুটা যখন জল-পথটা পার হচ্ছে, তখন কীট-পতঙ্গভুক আর ফল-ভুক বিরাট একঝাঁক পাখি ডানদিক দিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। এই ঝাঁকে আছে স্থানীয় পাখির সঙ্গে যাযাবর পাখিও। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দেখতে পাব পাখিগুলো আমাদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে,—ওরা যখন জলপথের দু-দিকের গাছগুলোর উপর বসবে কিংবা যখন উড়তে

থাকবে তখন ওদের ভাল করে দেখবার সুযোগ হবে। পাখি যখন এমন জায়গায় বসে যেখানে পশ্চাৎপট বলে কিছু নেই বা আকাশই একমাত্র পশ্চাৎপট, তখন খুব কাছে না হলে রঙ দেখে তাদের সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু আকার ও ডানার ঝাপটানি লক্ষ করে যে-কোনো প্রজাতির উড়ন্ত পাখিকে সনাক্ত করা যায়। এইবার যে পাখির ঝাঁক আমাদের দিকে উড়ে আসছে, তাতে প্রতিটি পাখিই কিচির-মিচির করছে, নয়তো শিস দিচ্ছে। এই ঝাঁকে আছে দু-জাতের সাতসতী, এদের এক জাতের ঠোঁট ছোট, রঙ টকটকে লাল। অন্য জাত আকারে ছোট, গলায় গোলাপী ছোপ। ছোট ঠোঁট শয়ালি ও ছোট্ট বুলালচশম। এরা থাকে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মগডালের সবচেয়ে উঁচু পাতায় আর গাছ বা ঝোপের কচি কচি ডালে, আর সেই জায়গা থেকে আকাশে লাফিয়ে উঠে পতঙ্গ ধরে। তাদেরই জাতের বা অন্য জাতের উড়ন্ত পাখিদের ঝাঁকের সামনে পড়ে এই পতঙ্গরা ভয়ে উড়ে বেড়ায়। সাত-সতীদের সঙ্গে থাকে চার রকম কটকটে,—সাদা-ভুরু চোখদয়াল, হলদে চোখ-দয়াল ইত্যাদি ; ছ-রকম কাঠঠোকরা ; হরবোলা প্রভৃতি চার রকম বুলবুল ; দুর্গাটুনটুনি প্রভৃতি তিন রকম টুনটুনি ; তা ছাড়াও আরও অনেক রকম পাখি।

এইসব পাখির সংখ্যা দুই থেকে তিনশো। এছাড়াও একজোড়া কালোমুড়ী সোনালি-হলদে পাখি, গাছ থেকে গাছে তারা পরস্পরকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, আর আছে একটা ছোটখাট ভিমরাজ ; বড় ভিমরাজের মত অতটা মারমুখো না হলেও সে তার প্রহরার এলাকা থেকে প্রচুর রসালো পতঙ্গ গ্রাস করেছে। এই তো সবে ধরেছে একটা মোটাসোটা শুককীট, একটা বেঁটেখাটো কাঠঠোকরা অনেক খেটে সেটাকে শুকনো গাছের ডাল থেকে বার করে এনেছিল। পাখির ঝাঁকটা এতক্ষণে আমাদের মাথার উপর দিয়ে উঠে বাঁদিকের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে ;—এখন একমাত্র শব্দ ল্যান্টানার ঝোপের থেকে বন-মোরগের আঁচড়ানোর শব্দ, আর একমাত্র পাখি যা চোখে পড়ছে সে হল শা-বাজ—শান্ত হয়ে শিমুল গাছের মগডালে বসে শিকারের প্রতীক্ষা করছে।

ডানদিকে ল্যান্টানার ঝোপের পেছনে বাগানের মত খানিকটা ফাঁকা জায়গা, অনেক বড় বড় প্লাম গাছ সেখানে। ওইদিক থেকে শোনা গেল একটা লাল বানরের সাবধানী ধ্বনি আর তার কয়েক মুহূর্ত পরেই গোটা-পঞ্চাশ বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন আকৃতির বানরের উত্তেজিত কিচির-মিচির, গর্জন। বোঝা যাচ্ছে চিতা বেরিয়েছে, এবং যেহেতু সে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গা ধরে চলেছে তাই মনে হয় না সে শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছে। মনে হয় সে চলেছে পাহাড়ের পাদদেশের কোনো গভীর দরিপথে, দিনের গরম সময়টা চিতারা প্রায়ই এমনি জায়গায় গিয়ে কাটায়। প্লাম-গাছগুলো ঘুরে একটা পথ আছে যেটা মানুষ

ও পশু উভয়েরই চলার পথ। আরও দুশো গজ এগিয়ে এই পথটা আমাদের জলপথকে কেটে চলে গেছে। চিতাটার যখন এই পথে আসা একরকম নিশ্চিতই বলা চলে, তখন চলুন আমরা তাড়াতাড়ি শ-দেড়েক গজ এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের উঁচু তীরটায় হেলান দিয়ে বসি। জলপথটা এখানে চওড়ায় পঞ্চাশ ফুট,—এর বাঁ তীরের গাছগুলোয় হনুমানের একটা বিরাট পাল থাকে। লাল বানরের সতর্কধ্বনি তারা শুনেছে, শুনে দলের সব মা-ই তাদের বাচ্চাদের ধরে রেখেছে। সকলের চোখ এখন যে দিক থেকে সাবধানী ডাকটা এসেছে সেদিকে।

এ পথের দিকে আপনার তাকিয়ে থাকবার দরকার নেই, কারণ পথের সবচেয়ে কাছে যে গাছ তার শেষের ডালে যে বাচ্চা হনুমানটা বসে আছে চিতাটা এলে সে-ই আপনাকে সতর্ক করে দেবে। চিতা দেখলে বানররা একরকম আচরণ করে, হনুমানরা আরেক রকম। হয় হনুমানরা আরো সঙ্ঘবদ্ধ বলে, নয়তো তাদের আত্মীয় লাল বানরদের মত অতটা সাহসী নয় বলে। চিতার দেখা পেলে দলের সব বানর একসঙ্গে চেঁচামেচি শুরু করে, পরপর সারি বাঁধা গাছ থাকলে গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে তাকে অনুসরণ করে চলে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত। হনুমানরা কিন্তু তা করে না। প্রহরী হনুমান চিতার দেখা পেলেই 'খক্ খক্ খক্' করে সাবধান করে দেয়, আর যখন দলের সর্দার প্রহরীর নির্দেশ অনুসরণ করে চিতার দেখা পেয়ে নিজেই ডাক শুরু করে, প্রহরী তখন থামে। তখন থেকে সাবধানী ডাক দেবে কেবল দলের সর্দার আর সবচেয়ে বুড়ী-হনুমান,— স্ত্রী-হনুমানের ডাকটা কতকটা হাঁচির শব্দের মত। কিন্তু কেউই চিতাটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে না। এবার প্রহরী হনুমানটা চার পায়ে দাঁড়িয়ে উঠবে। তারপর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে এপাশে ওপাশে বাঁকাবে। এইবার সে নিশ্চিত, সে চিতাটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তাই সে আবার ডেকে উঠবে। পিছন থেকে তার আরো দু'এক সন্ত্রস্ত সঙ্গীও ডেকে উঠবে। এতক্ষণে সর্দারও ভয়ঙ্কর শত্রুর দেখা পেয়েছে। সেও ডেকে উঠবে, এবং মুহূর্ত-পরেই দলের বৃদ্ধাও ডেকে উঠবে হাঁচির মত শব্দ তুলে। বাচ্চারা এখন সবাই চুপচাপ, থেকে-থেকে কেবল মাথা তুলছে আর নামাচ্ছে, আর মুখভঙ্গি করছে। পুরো দলটা কেমন করে যেন জেনে গেছে, আজ এই বসন্তের সকালে চিতা তাদের কোনো ক্ষতি করবে না কারণ খিদে পেয়ে থাকলে চিতা এভাবে ফাঁকায় বেরিয়ে না এসে হয় আরও উপরে নয় আরও নিচে কোথাও জল-পথটা পার হয়ে অদৃশ্য থেকে অগ্রসর হত। চিতা হনুমানের মতই ক্ষিপ্র, ওজনে হনুমানের চেয়ে একটু ভারি, তাই হনুমান ধরতে তার কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু লাল বানরদের ব্যাপারটা আলাদা, তারা সরু ডালের প্রান্তে চলে যায়, সেখানে চিতা তার ভারি শরীর নিয়ে

উঠতে সাহস করে না।

চিতাটা এখন মাথা উঁচু করে পঞ্চাশ গজ ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে চলেছে, অপূর্ব ফুটকি দেওয়া তার শরীরে সকালের সূর্যের আলো এসে পড়েছে। যে বৃক্ষশ্রেণীর দিকে সে চলেছে সেখানকার ডালে ডালে যে সব হনুমান ভিড় করে রয়েছে তাদের দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে না। একবার সে থামল, তারপর জলপথের দুদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার তেমনি ধীরভাবে এগিয়ে গেল। তীরে পিঠ দিয়ে আমরা নিস্পন্দ বসে আছি, আমাদের সে দেখতে পায় নি। খাড়াই তীর বেয়ে উঠে সে আমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ হনুমান-সর্দার আর বুড়ী হনুমানটা তাকে দেখতে পাবে ততক্ষণ তারা জঙ্গলের প্রাণীদের সতর্ক করতে থাকবে।

এবার চিতাটার থাবার ছাপ পরীক্ষা করে দেখা যাক। পথটা যেখানে জল-পথটাকে কেটে গেছে সেখানকার মাটি লাল, মানুষের খালি পায়ের চাপে চাপে শক্ত হয়ে গেছে। এই মাটির উপর সূক্ষ্ম সাদা ধুলোর আস্তরণ থাকায় আমাদের সুবিধে হয়েছে। ধরে নেওয়া যাক যে আমরা চিতাটাকে দেখি নি, হঠাৎ এই থাবার ছাপ আবিষ্কার করেছি। প্রথমেই যা আমাদের চোখে পড়ে তা হল, থাবার ছাপগুলো দিব্যি টাটকা বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং বেশিক্ষণ হয় নি ওগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। এ ধারণা আমাদের হয়েছে এই থেকে যে, এই ধুলোর আস্তরণের উপর যেখানে চিতাটার থাবার ছাপ পড়েছে সেখানটা চ্যাপ্টা আর মসৃণ হয়ে বসে গেছে আর পায়ের পাতার আর আঙুলের ছাপ ঘিরে যে দেওয়াল তৈরি হয়েছে তা স্পষ্ট, আর মোটামুটি সিধে। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাওয়া আর রোদ লেগে আবার ধুলোর স্তূপটা উঁচু হতে থাকবে, দেওয়াল-গুলো ভেঙে পড়বে। পিঁপড়ে এবং অন্যান্য অনেক কীটপতঙ্গ এই পথ অতিক্রম করে যাবে, ধুলো জমতে থাকবে। ঘাস আর শুকনো পাতার টুকরো হাওয়ায় উড়ে বা অন্যভাবে এখানে এসে পড়বে ; কালক্রমে দাগটা অদৃশ্য হয়ে যাবে একেবারে। কোনো দাগ দেখে সেটা কত পুরনো তা বিচার করার কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, সে দাগ বাঘের বা চিতারই হ'ক কিংবা সাপের বা হরিণেরই হ'ক। কখন প্রাণীবিশেষ এই দাগ এঁকে রেখে চলে গেছে তা মোটা-মুটি নির্ভুল নির্ণয় করতে গেলে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটা ব্যাপার ভেবে নিতে হয় : যেমন ধরা যাক, থাবার ছাপ পড়েছে কোথায়, ছায়ায় না ফাঁকা জমিতে ; পড়েছে কখন, দিনে না রাত্রে যখন অনেক পোকামাকড় চলাফেরা করে ; যখন সাধারণত বাতাস বয় ; কিংবা যখন শিশির ঝরে নয়তো গাছ থেকে টুপ টুপ করে পড়ে। এইসব মিলিয়ে একটা মোটামুটি ঠিক সময় আঁচ করে নেওয়া যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত যে দাগটা টাটকা, কিন্তু এইটুকু জানলেই তো চলবে না। এখন আবার দেখতে হবে

চিতাটা পুরুষ না স্ত্রী, যুবক না বৃদ্ধ, বড় না ছোট। থাবার ছাপ যে-রকম গোল তাতে বোঝা যাচ্ছে, এ হল পুরুষ চিতা। পায়ের পাতায় কোনো ফাটল বা ভাঁজ না-থাকায়, পায়ের আঙুলগুলো গোল-গোল হওয়ায়, আর সমস্ত ছাপটার মধ্যে একটা নিটোল ভাব থাকায় বোঝা যায় যে চিতাটা অল্পবয়স্ক। অনেক দিন ধরে লক্ষ করে দেখে থাকলে পায়ের ছাপ থেকে জন্তু-জানোয়ারের আয়তন অনুমান করা যায়। এ ব্যাপারে খানিকটা অভিজ্ঞতা হলেই চিতা বা বাঘের দৈর্ঘ্য বলে দেওয়া যায়, বড় জোর ইঞ্চি দুয়েক এদিক ওদিক হতে পারে। মির্জাপুরের কোলদের বাঘের মাপের কথা জিজ্ঞাসা করলে একটা ঘাসের শিস নিয়ে তারা থাবার ছাপটা মেপে নেয়, তারপর ঘাসটা মাটিতে রেখে হাতের আঙুল দিয়ে মেপে দেখে। এই উপায়ে ওরা কতটা নির্ভুল হতে পারে জানি না, তবে থাবার ছাপের মোটামুটি আকৃতি দেখে আমি কোনো জন্তুর দৈর্ঘ্য ও আকৃতি সম্বন্ধে একটা ধরাণা করে নিই ; কারণ যে উপায়ই গ্রহণ করা হ'ক তা আন্দাজ বই তো আর কিছু নয়।

একটু এগিয়ে গেলেই, পথটা যেখানে জলধারা পার হয়ে এগিয়ে গেছে, সেখানে খানিকটা শক্ত বালিভরা জমি, তার এক দিকে পাথরের স্তূপ আর অপর দিকে উঁচু তীর। এই বালির উপর দিয়ে একপাল চিতল হরিণ চলে গেছে। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে চিতল বা সম্বরের পালে কটা হরিণ আছে গুণতে সব সময়ই বেশ মজা লাগে। আর সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে প্রত্যেকটি হরিণকে লক্ষ করে দেখে নিলে পরবর্তীকালে দেখা পেলে পালটাকে চেনা যায়, দলের কোনা ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে কি না বোঝা যায়। তা ছাড়া দলটার সঙ্গে যেন একটা চেনাপরিচয় গড়ে ওঠে। ফাঁকায় থাকলে দলে কটা পুরুষ তা গণনা করা, তাদের শিঙের দৈর্ঘ্য বা আকৃতি লক্ষ করা, কিংবা কটা হরিণী বা বাচ্চা আছে তা গণনা করা কঠিন নয়। কিন্তু যখন একটামাত্র হরিণ দেখা যায় আর অন্যগুলো আড়ালে থাকে, তাদের আড়াল থেকে বার করে আনার একটা পদ্ধতি দশ বারের মধ্যে ন-বারই সফল হতে দেখা গেছে। তার পিছু নিয়ে যতটা কাছাকাছি আসা সম্ভব এসে কোনো গাছ বা ঝোপের পেছনে লুকিয়ে পড়ে চিতার ডাক ডেকে উঠুন। সব জন্তুই শব্দের উৎস নিখুঁত আন্দাজ করতে পারে : তাই যেই দেখবেন হরিণটা আপনার দিকে ফিরেছে গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে কাঁধটা একটুখানি বার করে আস্তে দু-একবার উপরে নিচে দোলান কিংবা ঝোপ হলে তার কয়েকটা পাতা নাড়িয়ে দিন। নড়াচড়াটা লক্ষ করলেই হরিণটা ডাকতে শুরু করবে, তার দলের সকলে বেরিয়ে এসে তার দু-দিকে সার বেঁধে দাঁড়াবে। একবার দলের পঞ্চাশটা চিতলই সার বেঁধে আমায় দেখা দিয়েছে, আমি নিশ্চিন্তে তাদের ছবি তুলেছি। তবে একটু সাবধান করে দিচ্ছি। যতক্ষণ না একেবারে নিশ্চিত হচ্ছেন যে বনের ওই অঞ্চলে

আপনি ছাড়া আর কেউ নেই ততক্ষণ পর্যন্ত কখনো চিতার ডাক ডাকবেন না ; এবং সে ক্ষেত্রেও চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। কারণ বলছি। একদিন রাত্রে আমি শুনি, একটা চিতা ক্রমাগত ডেকে চলেছে। তার আওয়াজ শুনে ভাবলাম সে বিপন্ন। পরদিন আলো ফোটার আগেই আমি বেরিয়ে পড়লাম কী তার হয়েছে খোঁজ করতে। সে যেদিক থেকে ডাকছিল রাত্রের মধ্যে কখন চলে গেছে সেদিক থেকে। সকালে ডাক শুনে মনে হল, খানিকটা দূরের একটা পাহাড়ে সরে গেছে। পশুদের পায়ে-চলা পথ ধরে একটা ফাঁকা-মত জায়গায় পেঁছলাম। এখান থেকে চিতাটাকে দেখতে পাব সে আমায় দেখতে পাবার আগে। সেখানে একটা বেড়ার থামের আড়ালে শুয়ে পড়ে আমি তার ডাকের সাড়া দিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলল এই ডাকা আর সাড়া। এগিয়ে আসছে চিতাটা, কিন্তু আস্তে আস্তে, এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে। শেষ পর্যন্ত যখন সে আমার একশো গজের মধ্যে এসে গেল তখন আমি ডাক বন্ধ করলাম। যে কোনো মুহূর্তে চিতাটার প্রতীক্ষায় আমি উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম হাতের উপর থুতনি রেখে, এমন সময় পেছনে পাতার খস-খস শব্দ শুনে মাথা ফিরিয়ে তাকাতেই একটা বন্দুকের নল সোজা আমার চোখে পড়ল।

আগের দিন রাত্রে নৈনিতালের ডেপুটি কমিশনার ক্যাসেলস্ আর কর্নেল ওয়ার্ড বন-বাংলায় এসেছেন এবং আমার অজান্তেই তাঁরা এক চিতার বাচ্চাকে গুলি করেছেন। রাত্রে তার মায়ের ডাক শোনা যায়। ঠিক ভোরবেলায় ওয়ার্ড একটা হাতি করে তাকে মারতে বেরিয়ে পড়েন। মাটিতে শিশির আর ওস্তাদ মাহুত। নিঃশব্দে সে হাতি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তার আর আমার মধ্যে তখন কেবলমাত্র একসারি গাছের ব্যবধান। ওয়ার্ড আমাকে সেখানে হয়তো দেখতে পেতেন, কিন্তু প্রথমত তাঁর বয়স হয়েছে, তার উপর আবার ভোরের আলোও খুব স্পষ্ট ছিল না ; ফলে যখন তিনি তাঁর রাইফেলের সাইটটা ঠিক করে আমার কাঁধে লক্ষ স্থির করতে পারলেন না তখন ইঙ্গিতে হাতিটাকে এগিয়ে যেতে বললেন। আমাদের ভাগ্য ভাল যে গাছপালা ডিঙিয়ে হাতিটা যখন মাত্র দশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে আর মাহুতের ইঙ্গিতে (সেও বৃদ্ধ) ওয়ার্ড দ্বিতীয়বার বন্দুকটা বাগিয়ে ধরবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় হাতিটা একটা নোয়ানো ডালে পা দিয়ে শব্দ করতে আমি মাথা ফেরাতেই একটা ভারি বন্দুকের নল আমার একেবারে চোখের সামনে ঝলকে উঠল।

চিতল হরিণের যে পালটার পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমরা চলেছি, আগের দিন সন্ধ্যায় তারা বালি-ভরা জমিটার উপর দিয়ে চলে গেছে। এটা বোঝা যায় রাতের যে-সব কীটপতঙ্গ তাদের পদরেখা অতিক্রম করে গেছে তা থেকে, আর ঝলে পড়া একটা গাছ থেকে যে শিশির পড়েছে তা থেকে। দলটা এখন এক মাইল কি পাঁচ মাইল দূরে,—হয়তো কোনো ফাঁকা জায়গায়, কিংবা কোনো

ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে। তবুও আমরা গুণে দেখব কটা ছিল,—বলছি কিভাবে। ধরা যাক, কোনো চিতল হরিণের দাঁড়ানো অবস্থায় সামনের আর পেছনের পায়ের খুরের দূরত্ব ত্রিশ ইঞ্চি। এবার একটা কাঠ দিয়ে বালির উপর এই চিহ্নের সমকোণে একটা রেখা টানুন। এই রেখা থেকে ত্রিশ ইঞ্চি মেপে নিন,—মাপা সহজ, কারণ আপনার জুতো দশ ইঞ্চি লম্বা। এবার এই রেখা থেকে প্রথম রেখাটার সমান্তরালে আর একটা রেখা টানুন। এবার কাঠিটা নিয়ে গুণে দেখুন এই দুই রেখার মধ্যে কতগুলো খুরের চিহ্ন আছে, আর সেইসঙ্গে প্রতিটি দাগ বরাবর কাঠিটা দিয়ে একটা করে চিহ্ন করে যান। ধরুন, গুণে দেখলেন, ত্রিশ। এই সংখ্যাটাকে দুই দিয়ে ভাগ করুন, তাহলেই আপনি একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারবেন যে আগের দিন সন্ধ্যায় পনেরটা চিতলের একটা দল এখান দিয়ে চলে গেছে। বন্য বা গৃহপালিত যে-কোনো জন্তুর সংখ্যা স্থির করতে এ পদ্ধতি কার্যকরী হবে, তবে, খুব বেশি সংখ্যায় হলে হয়তো নিখুঁত হবে না,—ধরুন দশটা পর্যন্ত ; তার বেশি হলে নিখুঁত না হলেও তার কাছাকাছি হবে—যদি অবশ্য সামনের পা আর পেছনের পায়ের দূরত্বটা জানা থাকে। ছোট ছোট প্রাণী—যথা বনকুত্তা, শুয়োর বা ভেড়ার ক্ষেত্রে এই দূরত্ব ত্রিশ ইঞ্চির কম, আর সম্বর বা গৃহপালিত গরু-মোষের ত্রিশ ইঞ্চির বেশি।

আমি যখন জঙ্গলে যুদ্ধের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলাম তখন যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন না তাঁদের অবগতির জন্যে বলছি, জঙ্গলে মানুষের পায়ের চিহ্ন থেকেও অনেক খবরই সংগ্রহ করা সম্ভব,—সে চিহ্ন রাস্তার উপরে পশু-চলা পথে বা অন্য যেখানেই হ'ক না কেন। ধরা যাক আমরা কোনো শত্রুর এলাকায়, কোনো পশু-চলা পথের উপরে এসে পড়েছি যেখানে পায়ের চিহ্ন আছে। পদ-চিহ্নগুলো দেখে তাদের পরিমাপ, তাদের আকৃতি, কাঁটা আছে কি না, গোড়ালিতে লোহা আছে কি নেই, জুতোর সোল চামড়ার না রবারের ইত্যাদি জেনে নিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি যে এই চিহ্ন আমাদের লোকদের জুতোর নয়, শত্রুপক্ষের। এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার পর আমাদের দেখতে হবে তারা কখন এখান দিয়ে গেছে, এবং দলে ক-জন ছিল। সময়টা কিভাবে হিসেব করতে হবে তা আপনারা জানেন। এবার সংখ্যাটা নির্ণয় করতে হলে আমাদের এই চিহ্ন কেটে একটা রেখা টানতে হবে, আর এই রেখার উপর এক পায়ের আঙুল-গুলো রেখে ত্রিশ ইঞ্চি তফাতে পা ফেলতে হবে। তারপর সেই চিহ্নের উপর দিয়ে আর-একটা রেখা টানতে হবে। এই দুই রেখার মধ্যবর্তী গোড়ালির ছাপ-গুলো থেকে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব। যেমন ধরুন, কত বেগে তারা চলছিল। স্বাভাবিক পদক্ষেপে চলবার সময় মানুষের শরীরের ওজন সমভাবে তার পদচিহ্নের উপর পড়ে, এবং পদক্ষেপের দূরত্বটা হয় মানুষের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ত্রিশ থেকে বত্রিশ ইঞ্চি। গতি যত বাড়িয়ে দেওয়া হয়

গোড়ালির চাপ তত কম পড়ে আর আঙুলের চাপ তত বাড়তে থাকে, এবং পদক্ষেপের দূরত্ব তত দীর্ঘ হতে থাকে। গোড়ালি কম চাপ, আঙুলে বেশি ক্রমেই আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণ বেগে দৌড়ের সময়ে কেবলমাত্র গোড়ালির সামান্য ছোঁয়া, আর আঙুলের ছাপ মাটিতে ফুটে ওঠে। দলে অল্পসংখ্যক লোক থাকলে অর্থাৎ একশো কুড়ি থেকে দেড়শোর মধ্যে হলে হিসেব করা সম্ভব তার মধ্যে কেউ খুঁড়িয়ে চলছে কি না, এবং কেউ আহত হয়েছে কি না তাও আন্দাজ করা যায় রক্তের দাগ থেকে।

জঙ্গলে কখনো কেটে-কুটে গেলে একটা ছোট, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর চারা-গাছের খবর আপনাদের দিতে পারি যা শুধু রক্ত বন্ধ করবে না, আমার জানা যে-কোনো ওষুধের চেয়ে ভালভাবে সারিয়ে তুলবে। সব জঙ্গলেই এ গাছ পাওয়া যায়, লম্বায় বার ইঞ্চির মত, আর এর লম্বা সরু বোঁটায় যে ফুল ফোটে তা দেখতে কতকটা ডেজি ফুলের মত। এর পাতাগুলো শাঁসালো, আর ক্রিসান্থিমামের পাতা যেমন, তেমনি করাতের মত আকৃতির। কয়েকটা পাতা নিয়ে প্রথমে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে যাতে ধুলো না থাকে, তারপর আঙুলের চাপ দিলেই ক্ষতস্থানে রস পড়বে। প্রচুর রস লাগাবেন, ব্যস আর কোনো চিকিৎসার দরকার হবে না ; এবং ক্ষতটা বিশেষ গভীর না হলে দু-একদিনেই সেরে যাবে। নামটাও সার্থক, 'ব্রহ্ম বুটি' অর্থাৎ 'ঈশ্বরের ফুল'।

যুদ্ধের ক-বছর আপনাদের অনেকেই ভারত ও ব্রহ্মের জঙ্গলে আমার সঙ্গে ছিলেন। যদি আমি তখন সময়ের অভাবে আপনাদের বেশি খাটিয়ে থাকি তো নিশ্চয় এতদিনে আপনারা আমাকে ক্ষমা করেছেন। এবং তখন যা আমরা একসঙ্গে শিখেছি নিশ্চয় সে সব ভুলে যান নি। যেমন ধরুন, কোন্ কোন্ ফুল আর ফল খাওয়া নিরাপদ, খাবার যোগ্য শেকড় কোথায় মিলতে পারে, চা আর কফির অভাবে কী খাওয়া যেতে পারে,—জ্বর-জারিতে, ঘায়ে বা গলার ব্যথায় কোন্ চারা গাছ বা কোন্ গাছের ছাল খেতে হবে, স্ট্রেচার হিসেবে কোন্ লতার ব্যবহার চলবে, ভারি মালপত্র বা বন্দুক কোন্ লতায় বেঁধে নদী বা দরি পার হতে হবে, কিভাবে চললে পায়ে ফোস্কা পড়বে না ঘামাচি হবে না, কিভাবে আগুন জ্বালাতে হবে, ভিজে বনে কিভাবে শুকনো কাঠ মিলবে, বন্দুক না নিয়ে কিভাবে শিকার করা সম্ভব, উপযুক্ত পাত্র না থাকলেও কিভাবে চা করা যাবে, নুনের অভাব কিসে মিটবে, কী করে সাপের কামড়ের, ঘায়ের বা পেটের অসুখের চিকিৎসা হবে, এবং শেষ পর্যন্ত, কিভাবে জঙ্গলের মধ্যে শরীর ঠিক রাখা যাবে আর সমস্ত বন্য প্রাণীর সঙ্গে শান্তিতে বাস করা যাবে। এ সমস্ত, এবং এইরকম আরও অনেক কিছুই আপনারা আর আমি একসঙ্গে শিখেছি। আমরা জড় হয়েছিলাম কত জায়গা থেকে, ভারতের পার্বত্য ও সমতল অঞ্চল থেকে, ব্রিটেনের নগর গ্রাম থেকে, আমেরিকার

যুক্তরাষ্ট্র থেকে, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ড ও অন্য দেশ থেকে। বাকি জীবনটা জঙ্গলে জঙ্গলে কাটাব এ উদ্দেশ্যে নয়, নিজেদের আর পরস্পরের মধ্যে সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে, অজানার ভয়কে জয় করতে আর শত্রুকে দেখাতে যে তাদের চেয়ে মানুষ হিসেবে আমরা উচ্চস্তরের। তবে, যা কিছু শিখেছি সে সবই অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ; কারণ প্রকৃতির জ্ঞানভান্ডারের না আছে শুরু না আছে সমাপ্তি।

বসন্তপ্রভাতের অনেকটা সময়ই এখনো আমাদের হাতে রয়েছে। আমরা এসে পৌঁছেছি পাদশৈল অঞ্চলে, সমতল ভূমি পার হয়ে। এখানকার উদ্ভিদ আলাদা। এখানকার বহুতর বট আর প্লাম গাছে ফলের লোভে অনেক রকমের পাখির আড্ডা বসে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ে বড়-বড় ধনেশ পাখি। এদের অদ্ভুত অভ্যাস মেয়ে-পাখিদের বাসায় আটকে রাখা। এর ফলে পুরুষ-পাখিদের উপর একটা ভীষণ চাপ পড়ে, কারণ যত দিন পেটে ডিম থাকে মাদিরা ভয়ঙ্কর মোটা হতে থাকে এবং ডিম পাড়ার পর—সচরাচর তারা দুটো ডিম পাড়ে—তাদের ওড়ার ক্ষমতা থাকে না। পুরুষকে তখন সমস্ত পরিবারের খাদ্য সংস্থানের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়। বেঢপ চেহারা, শব্দযন্ত্র-লাগানো প্রকান্ড ঠোঁট আর ভারি শরীর নিয়ে কষ্ট করে ওড়া—এসব দেখে মনে হয় যেন বিবর্তনের ইতিহাসে তাদের কথা কেউ ভাবে নি। বাসার মুখ এঁটে দিয়ে ছোট্ট একটা ফাঁক রাখা, যেখান দিয়ে মাদি ধনেশ ঠোঁটের আগাটা মাত্র গলিয়ে দিয়ে মদ্দার নিয়ে আসা খাবার খেতে পারে—এ অভ্যাস সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলে আসছে যখন আজকের দিনের চেয়ে তার শত্রু ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। ফাঁপা গাছের ভিতরে বা গাছে ফোকর তৈরি করে যে-সব পাখি বাসা বাঁধে তাদের সকলের শত্রু এক। এদের মধ্যে কয়েক জাতের পাখি একেবারেই অসহায় ও নিরস্ত্র ; তাই প্রশ্ন ওঠে, কেন তাহলে কেবলমাত্র ধনেশ পাখি, শক্তিশালী একজোড়া ঠোঁট থাকায় যার আত্মরক্ষার শক্তি বরং সকলের চেয়ে বেশি, এভাবে তার বাসা বন্ধ করে থাকে? ওর আর একটা অভ্যাস যা অন্য কোনো পাখির মধ্যে আমি দেখি নি, রঙ দিয়ে পালক সাজানো। রঙটা হলদে, এবং রুমাল দিয়ে মুছলেই উঠে যায় ; এটা থাকে ল্যাজের উপরের একটা ছোট থলেতে। দুই ডানার প্রস্থের উপর সে এটা ঠোঁটে করে মাখিয়ে দেয়। বৃষ্টি হলেই যা ধুয়ে যায় এমন জিনিস কেন ধনেশ তার পিঠে লাগায় জানি না,—একমাত্র যুক্তি যা আমার মনে হয়, শত্রুর আক্রমণ এড়াবার জনো আত্মগোপনের চেষ্টা,—কোন সুদূর অতীতে যার প্রয়োজন হয়েছিল। আজকের দিনে তার একমাত্র শত্রু হল চিতা,—এবং যে চিতা রাত্রে শিকার করে এ-হেন আত্মগোপন-প্রচেষ্টা তার বিপক্ষে কার্যকরী হয় না।

ধনেশ ছাড়া আরও অনেক ফলাহারী পাখি এইসব বট আর প্লাম গাছে

বাসা বাঁধে। এদের মধ্যে আছে দু-রকম হরিয়াল, দু-রকম বসন্তবাউরি, চার রকম বুলবুল প্রভৃতি। সাদামুড়ি ছোট পেঙারা তাদের সু-উচ্চ বাসা ছেড়ে যায় সব পাখির শেষে, আবার ফিরেও আসে সব পাখির আগে।

বটগাছগুলোর কাছে আছে একটা দাবানল-পথ,—এটাকে কেটে গেছে সেই বহু-ব্যবহৃত পশু-চলা পথ যেটা সিধে পাহাড় বেয়ে সেই ভোল পর্যন্ত গেছে যেটার কাছে ঝরনার জল জমে একটা জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ভোল আর এই জলাশয়ের মাঝামাঝি জায়গায় আছে একটা গাছের গুঁড়ি। একটা বেঁটে-খাটো কুসুম গাছ এখানে ছিল, চোরা শিকারীরা এর ডালে বার-বার মাচান বাঁধত। ভোলে বা জলাশয়ে গুলি করা নিষেধ, কিন্তু চোরা-শিকারীরা শিকারের নিয়ম মেনে চলে না ; তাই যখন বার-বার মাচান ভেঙে দিয়েও কোনো কাজ হল না তখন আমি কেটেই দিলাম গাছটা। শুনেছি নাকি মাংসাশী প্রাণীরা ভোলে কিংবা জলাশয়ে প্রাণ বধ করে না। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মাংসাশী প্রাণীদের যতই বিচার-বিবেচনা থাকুক, ভারতে কিন্তু ভোলে হত্যা করায় তাদের বিবেকে বাধে না। বলতে কি, তারা এইসব জায়গাতেই হত্যা করে বেশি দেখবেন, এই ভোলের কাছে অনেক হাড় আর শিঙ ছড়িয়ে রয়েছে। শজারুরা তার কিছু কিছু খেয়ে গেছে। হরিণ আর বানররা থাকে এমন যে কোনো বনের মধ্যে ভোল থাকলেই তার ধারে এই দৃশ্য দেখবেন।

চলুন এবার ভোলের উপরকার পাহাড় বেয়ে উঠি সেইখানটায় যেখান থেকে পাদশৈল আর তার চারপাশের জঙ্গল দেখা যেতে পারে। আমাদের সামনেই সেই বিস্তীর্ণ জঙ্গল যার মধ্য দিয়ে আমরা এইমাত্র সেই জলাশয়টার কাছে এসে পড়েছি যেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এ বন প্রকৃতির হাতে গড়া,—এখানকার কাঠের বাজার নেই বলে মানুষের সর্বধ্বংসী হাত এ বনকে স্পর্শ করে নি। সামনে হালকা সবুজ ঝোপ দেখা যাচ্ছে, শিশু গাছের চারার কোপ,—এর জন্ম হয়েছে পাদশৈল থেকে বন্যার জলে ধুয়ে আসা বীজ থেকে। এই চারা পরবর্তীকালে পরিণত আকার লাভ করে গরুর গাড়ির চাকা বা আসবাবপত্র তৈরির প্রয়োজনে সেরা কাঠ হিসেবে গণ্য হয়। ঘন সবুজ যে ঝোপগুলির মধ্যে লাল ফলের কাঁদি দেখছেন ওগুলো হল রুনি গাছ। ওইগাছ থেকে আসে সেই মসৃণ রেণু, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যার নাম কমলা। গরিব মানুষরা যখন পাখিদের মত খাবারের আশায় আর শীতের ভয়ে উঁচু পাহাড় থেকে পাদশৈলে নেমে আসে, তখন তারা কাজ থেকে একটি দিন ছুটি নিয়ে ছেলে-বুড়ো সবাই কমলার সন্ধানে জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে। কমলা হল এক ধরনের লাল রেণু—এই রেণু রুনি ফলের গায়ে লেগে থাকে। কমলা সংগ্রহ করতে হলে প্রথমে গাছের ডাল কেটে নিতে হয়, তারপর ফলগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে একটা বড় সরু ঝুড়িতে রেখে ঝুড়ির গায়ে ফলগুলোকে ঘষে নিতে হয়। রেণুগুলো তখন ঝুড়ির

ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পড়ে কোনো চিতল হরিণের চামড়া বা একফালি কাপড়ের উপর। যখন প্রচুর ফলন হয়, সংসারের পাঁচ জন—স্বামী-স্ত্রী আর তিন ছেলেমেয়ে—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত কাজ করে দু-সেরের মত কমলা সংগ্রহ করতে পারে বাজারে তার দাম এক টাকা থেকে দু-টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভারতে ও মধ্য-প্রাচ্যে এই রেণুর ব্যবহার হয় পশম রঙ করতে, এবং অসৎ ব্যবসায়ীরা এর সঙ্গে ইঁটের গুঁড়ো মেশানো শুরু করবার আগে মাখন রঙ করার জন্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও এর বহুল প্রচলন ছিল। ওষুধের কাজেও এর ব্যবহার আছে,—সরষের তেলে রুনির ফল সেদ্ধ করে বাতের যন্ত্রণায় উপকার পাওয়া যায়।

শিশু আর রুনি গাছের মধ্যে-মধ্যে আছে খয়ের গাছ,—পালকের মত হালকা তার পাতা। শুধু লাঙলের ফলা তৈরির কাজেই নয়, উত্তরপ্রদেশের হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ খয়েরের এক কুটিরশিল্প গড়ে তুলেছে। এই শিল্প শীতকালীন, চার মাস ধরে দিনরাত্রি মানুষ পরিশ্রম করে চলে। এ থেকে হয় পানে খাওয়ার খয়ের, আর সেইসঙ্গে ফাউ হিসেবে পাওয়া যায় খাকি রঙ—পোশাক বা মাছ-ধরা জাল রাঙানোর কাজে যার ব্যবহার। আমার বিশ্বাস মীর্জা নামে আমার এক বন্ধুই প্রথম এর এই গুণ আবিষ্কার করে এবং তাও নিতান্ত ঘটনাচক্রেই। একদিন লোহার পাত্রে খয়ের সেদ্ধ হচ্ছিল, মীর্জা ঝুঁকে পড়ে দেখছিল, এমন সময় তার সাদা রুমালটা পড়ে যায় খয়েরের মধ্যে। একটা কাঠ দিয়ে রুমালটা তুলে নিয়ে মীর্জা কাচতে দেয় সেটা। কিন্তু কেচে আসার পর যখন মীর্জা দেখল রুমালের দাগ একটুও ওঠে নি, তখন সে ধোপাকে ধমক দিয়ে আবার সেটা কাচতে দিল। কিন্তু ধোপা ফিরে এসে বললে যে দাগ ওঠাবার যত পদ্ধতি তার জানা আছে সব প্রয়োগ করেও সে এ দাগ ওঠাতে পারে নি। মীর্জা তখন বুঝল যে সে একটা পাকা রঙ আবিষ্কার করেছে। ইজ্জতনগরে তার তৈরি ফ্যাক্টরিতে এখন দিব্যি এই রঙ তৈরির কাজ চলছে।

সবুজের অনেক রকম-ফেরের সঙ্গে (কারণ প্রত্যেক গাছেরই একটা নিজস্ব রঙ আছে) দেখা যায় উজ্জ্বল কমলা, সোনালি, গোলাপি, লাল ইত্যাদি রঙের সমারোহ। যে গাছের কমলা রঙের ফুল তার নাম ঢাঁক, এ থেকে যে পদ্মরাগ রঙের আঠা বেরোয় তা দিয়ে সবার সেরা রেশম রঙ করা হয়। এখানে আছে তিন ফুট দীর্ঘ ডাল ভর্তি সোনালি ফুল অমলতাস, এর দু-ফুট লম্বা বেলনাকৃতি বীজাধারের মিষ্টি রসে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়,—কুমায়ুনের সবত্রই এর ব্যাপক ব্যবহার আছে। আর আছে রক্তকাঞ্চন, হালকা বেগুনি রঙের ফুল। গোলাপি ফুলগুলো কুসুম গাছের,—আর হালকা থেকে ঘন-গোলাপি যেগুলো স্তূপীকৃত দেখা যাচ্ছে সেগুলো কোনো ফুল নয়, কচি-কচি পাতা। লাল ফুলগুলো শিমুল গাছের,—ফুলের মধুপায়ী সব রকম পাখির, আর যত

বানর আর হরিণ আর শুয়োর এই শাঁসালো ফল খায় তাদের অত্যন্ত প্রিয়। কিছুকাল পরে ফলগুলি খসে গিয়ে শুধু শক্ত বীজাধারটা রয়ে যায়। এপ্রিল মাসে যখন গরম বাতাস বইতে থাকে তখন এগুলো ফেটে উড়ে যায় মেঘের মত সাদা তুলো,—এর প্রত্যেকটি ভাগে থাকে একটা করে বীজ ; প্রকৃতির উদ্যানকে আবার এরা উদ্ভিদে ভরে তোলে। পাখি বা পশু যে সব বীজ স্থানান্তরে নিয়ে যায় না সেগুলো আবার এমনভাবে তৈরি যাতে বাতাসে উড়ে দিগ্‌বিদিক ছড়িয়ে পড়তে পারে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। নারকেল ; তার শক্ত খোসাটাই সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে ভেসে দেশ-দেশান্তরে গিয়ে ঠেকে।

খালটার ওপারে আমাদের গ্রাম, ওখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। উজ্জ্বল সবুজ আর সোনালি ছোপ থেকে বোঝা যাবে কোথায় গমের অংকুর বেরোচ্ছে আর কোথায় সরষে খেত ফুলে ভরে উঠেছে। গ্রামের পাদদেশের সাদা রেখাটা হল সীমান্তের প্রাচীর, ওটা তৈরি করতে দশ বছর লেগেছিল,—দেওয়ালটার ওপারে বনের বিস্তার শেষ পর্যন্ত দিগন্তরেখায় গিয়ে মিশেছে। পূর্বে আর পশ্চিমে যতদূর চোখ যায় সীমাহীন বনের পর বন, আর আমাদের পেছনে শৈলশিরার পর শৈলশিরা শেষ পর্যন্ত চিরতুষার রাজ্যে পৌঁছেছে।

বিরাট হিমালয়ের ছায়ায় এই শান্ত সুন্দর পরিবেশে আমরা বসে আছি, আমাদের ঘিরে বন বসন্তের নতুন সাজে সেজেছে। বাতাসের প্রতি তরঙ্গে ভেসে আসছে ফুলের সুগন্ধ। বহুতর পাখির গানের খুশিতে বাতাস স্পন্দমান। এখানে বসলে আমরা কিছুকালের জন্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্লেদ ভুলে প্রাণিজগতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি। কারণ এখানে জঙ্গলের আইন বিরাজমান,—সে আইন মানুষের তৈরি আইনের থেকে শুধু পুরনোই নয়, অনেক ভালও। এ আইনে প্রত্যেকের নিজের মত জীবন ধারণের অধিকার,—ভবিষ্যতের চিন্তায় সেখানে কোনো দুশ্চিন্তা, কোনো উদ্বেগ, কোনো দুঃখের অবকাশ নেই। বিপদ সেখানে সকলেরই আছে ; কিন্তু তাতে জীবন আরো প্রাণময় হয়ে ওঠে, এবং প্রতিটি প্রাণী সর্বদা সতর্ক থাকলেও জীবন উপভোগে বাধা ঘটে না। আপনার চারদিকে যে আনন্দের পরিব্যাপ্তি আপনি তা এখন ধরতে পারবেন, কারণ এখন আপনি শব্দের উৎস নির্ণয় করতে শিখেছেন, ডাক শুনে প্রত্যেকটি পশু-পাখিকে আলাদা করে চিনতে শিখেছেন এবং সে ডাকের কারণ জানতে পেরেছেন। বাঁ দিকে দূরে একটা ময়ূর জোড় বাঁধবে বলে ডেকে উঠল,—ডাকটা শুনে আপনি বুঝতে পারলেন যে সে পুচ্ছ মেলে নাচছে ময়ূরীর ঝাঁকটাকে আকৃষ্ট করবার জন্যে। আরও কাছে আছে এক বন-মোরগ,—আশেপাশের সবকিছুকে অবজ্ঞা করে সে ডেকে চলেছে, আর সে ডাকের সাড়া যারা দিচ্ছে তাদের আওয়াজেও অবজ্ঞার ভাব সমান স্পষ্ট। লড়াই কিন্তু পারতপক্ষে ঘটে

না, কারণ বনের মধ্যে লড়াই করা মানেই বিপদকে ডেকে আনা। দূরে ডানদিকে একটা পুরুষ-সম্বর জঙ্গলকে সাবধান করে দিচ্ছে—সে দেখেছে একটা চিতা শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। এই চিতাটাকে আমরা ঘণ্টাখানেক আগে দেখেছি। সমানে ডেকে যাবে সম্বরটা যতক্ষণ না চিতাটা সেদিনের মত ঘন ঝোপের মধ্যে চলে গিয়ে এইসব প্রহরীর দৃষ্টির অগোচর হয়ে যাচ্ছে। আমাদের নিচের একটা ঝোপ থেকে অনেকগুলো পাখি পত্রবহুল কুঞ্জের আড়ালে একটা ঘুমন্ত ফুটকি পেঁচাকে আবিষ্কার করে সেই আবিষ্কার বন্ধুদের দেখাবার জন্যে ডাকছে। তারা জানে যে এই জ্ঞানী জ্ঞানী দেখতে জীবটির কাছে এগোনো, এমনকি তার কানের কাছে চিৎকার করা পর্যন্ত এখন নিরাপদ, কারণ বাচ্চা কাছে থাকলেই সে ক্বচিৎ কখনো দিনের আলোয় হত্যা করে, নয়তো নয়। আর পেঁচাটাও জানে যে ওরা তাকে যতই ভয় বা ঘৃণা করুক তাদের থেকে তার কোনো ভয় নেই এবং খেলা শেষ হলেই নিজে থেকেই ক্লান্ত হয়ে ওরা চলে যাবে, পেঁচা আবার ঘুমোতে পারবে। বাতাসে কেবলই শব্দ আর শব্দ, কিন্তু প্রতিটি শব্দই অর্থপূর্ণ। ওই যে চমৎকার নরম সুরটা কানে আসছে, ওটা হল শ্যামার ডাক, —লাজুক সঙ্গীকে প্রেম নিবেদন করছে। ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাপ শব্দটা হল একটা সোনালি-পিঠ কাঠঠোকরার,—নতুন ডেরা গড়বে বলে একটা মরা গাছে গর্ত করে চলেছে। আর কর্কশ চিৎকারটা হল একটা পুরুষ-চিতলের আওয়াজ,—প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংগ্রামে আহ্বান করছে। আকাশে অনেক উঁচুতে একটা তিলিয়া বাজ চিৎকার করে চলেছে, তারও উপরে এক ঝাঁক শকুনি স্থির হয়ে আকাশ পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছে। গতকাল একজোড়া কাক শকুনিদের দেখিয়ে দেয় কোথায় একটা বাঘ তার মড়ি লুকিয়ে রেখেছিল—জায়গাটা হল একটা ঝোপ, সেই ঝোপটার কাছে আজ একটা ময়ূর নেচে চলেছে। আজও এখন উড়তে উড়তে, ঘুরতে ঘুরতে তারা সেইরকম সৌভাগ্যের প্রত্যাশায় রয়েছে।

এখানে সদলে বা একা বসে আপনি পুরোমাত্রায় অনুভব করতে পারবেন জঙ্গলের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য আপনার কাছে কতটা এবং সে অভিজ্ঞতার ফলে অন্যের আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ কী পরিমাণে বর্ধিত হয়েছে। জঙ্গলকে আর আপনি ভয় করেন না, কারণ আপনি জেনেছেন যে জঙ্গলে ভয় করবার মত কিছু নেই। প্রয়োজন হলে আপনি জঙ্গলে বাস করতেও পারেন, কিছুমাত্র অস্বস্তিবোধ না করেই ঘুমিয়েও থাকতে পারেন যেখানে খুশি। দিক নির্ণয় করতেও শিখেছেন, বাতাসের গতি সম্বন্ধেও সজাগ হয়েছেন,—কাজেই দিনে বা রাতে কোনো সময়েই জঙ্গলে পথ হারাবার ভয় আর আপনার রইল না। দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করাটা প্রথমে খুব কঠিন হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আপনি জানেন যে আপনার দৃষ্টির পরিধি ১৮০ ডিগ্রি, এবং সেই পরিধির মধ্যে যে-কোনো নড়াচড়া আপনার দৃষ্টিগোচর হবে। জঙ্গলের যে-কোনো প্রাণীর

জীবনযাত্রার মধ্যেই আপনি অংশগ্রহণ করতে পারেন, কারণ তাদের ভাষা আপনি শিখেছেন, এবং শব্দের উৎস নির্ণয় করার ফলে তাদের প্রতিটি চলাফেরাও এখন আপনার আয়ত্তে। নিঃশব্দে চলাফেরা বা নির্ভুল গুলি করা এখন আপনি শিখেছেন ; এবং যদি-বা কখনো কোনো প্রাণীকে গুলি করতে হয় তাহলেও কোনোরকম হীনমন্যতা আপনার মধ্যে থাকবে না, কারণ আপনি জানেন যে যত সুনামের অধিকারীই সে হ'ক না কেন তার চেয়ে আপনার জ্ঞান বেশি ; তার কাছ থেকে কিছুই আপনার শেখবার নেই বা তাকে ভয় করবারও কিছু নেই।

এবার ফেরার পথ ধরতে হবে, কারণ অনেকটা পথ আমাদের সামনে, ম্যাগি প্রাতরাশ নিয়ে বসে থাকবে। ফিরে যে-পথে এসেছি সেই পথে, এবং যেখানে আমরা বালির উপর চিতলের পায়ের চিহ্নের হিসেব নিচ্ছিলাম সে জায়গা পার হয়ে, যে পথে চিতাটা জল-স্থল পার হয়েছিল সেটা পার হয়ে, পাদশৈল থেকে যে পলিমাটি ধুয়ে এসেছিল, তাও পার হয়ে এসে এবার আমরা একটা গাছের ডাল টানতে-টানতে নিয়ে যাব যাতে আমাদের কোনো চিহ্ন না থেকে যায়, কারণ তাহলেই, কাল বা পরশু বা যেদিনই আমরা আবার শিকারে যাব, বুঝতে পারব যে যা কিছু চিহ্ন আমাদের চোখে পড়ছে সে সমস্তই এই ক-দিনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।





১২

জঙ্গলের জ্ঞান সঞ্চয় করতে করতে এমন একটা বোধ গড়ে উঠতে পারে যা আমাদের আদিম পুরুষ থেকে বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আসছে, যাকে আমরা বলব, জঙ্গল-অনুভূতি। এই অনুভূতি, যা আসে জঙ্গলে বহুকাল বন্য জন্তুর নিবিড় সান্নিধ্যের ফলে, এ হল অবচেতন মনের বিকাশ, জঙ্গলের বিপদ সম্বন্ধে যা আমাদের সাবধান করে দেয়।

অনেকেই সাক্ষ্য দেবেন, অনির্দেশ্য এক আবেগের বশে কাজ করে অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা পেয়ে গেছেন,—কোনো আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে তা তাঁদের অবচেতন মনকে সাবধান করে দিয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে তা হয়তো কোনো পথে অগ্রসর হতে বরাণ করেছে,—দেখা গেছে মুহূর্তকাল পরেই সেখানে একটা বোমা ফেটেছে,—কোনো ক্ষেত্রে আবার কোনো বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চল থেকে সরে যেতে বলেছে পরমুহূর্তেই যেটা একটা গোলার আঘাতে ভেঙে পড়েছে, আবার কখনো কোনো গাছের তলা থেকে সরে যেতে বলেছে, পরমুহূর্তেই যে গাছে বাজ পড়েছে। এতে করে যে বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে, সে বিপদ ছিল জানা, এবং আন্দাজ করা হয়েছিল। 'চৌগড়-মানুষ-খেকো'র কাহিনীতে আমি অবচেতন মনের এই সাবধান করে দেবার দুটো উদাহরণ দিয়েছি। মানুষ-খেকোর আক্রমণ থেকে যে সময়ে আমায় বিরত করা হয় আমার সমস্ত মন তখন এই চিন্তায় একাগ্র হয়ে ছিল—কিভাবে মানুষখেকোটার কবল থেকে রক্ষা পেতে পারি। প্রথম বার বিরত করা হয়েছে একত্র জড় করা পাথরের ঢিবিটা থেকে, আর দ্বিতীয়বার একটা ঝুঁকে-পড়া পাথরের থেকে যেটার তলা দিয়ে আমার চলে যাবার কথা ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই তা ছিল যেমন স্বাভাবিক তেমনি সুবোধ্য। এবার আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যেখানে বিপদের সম্ভাবনা ছিল

অজানা তবুও অবচেতন মন থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে,—এর একমাত্র ব্যাখ্যা যা আমার মনে আসে সে হল জঙ্গল-অনুভূতির চরম বিকাশ।

শীতের ক-মাস কালাধুঙ্গিতে থাকতে মাঝে মাঝে আমি আমাদের প্রজাদের জন্যে একটা সম্বর বা চিতল হরিণ শিকার করতাম। একবার তাদের ক-জন এসে আমায় মনে করিয়ে দিল যে অনেকদিন আমি তাদের জন্যে কিছু শিকার করি নি। পরদিন একটা গ্রাম্য উৎসব ছিল, সেই উপলক্ষে তারা আমায় একটা চিতল মেরে দিতে অনুরোধ করল। এই সময় জঙ্গল অত্যন্ত শুকনো হওয়ায় শিকারের পিছু নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে, ফলে সূর্যাস্তের আগে কোনো শিকার করা গেল না, কেবল একটা হরিণ ছাড়া। অন্ধকারে হরিণটাকে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না ভেবে আমি চিতার ভয়ে সেটা ঢাকাঢাকি দিয়ে রেখে ফিরে এলাম, ঠিক করলাম পরদিন ভোরে দল-বল নিয়ে গিয়ে ওটাকে আনব।

আমার বন্দুকের আওয়াজ গ্রাম থেকে শোনা গিয়েছিল। বাড়ি ফিরতে দেখলাম, জন দশ-বার লোক দড়ি আর একটা মজবুত বাঁশ নিয়ে আমাদের কুটিরের সিঁড়িতে আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওদের কথার উত্তরে জানালাম আমি হরিণ মেরেছি, আর বললাম পরদিন সূর্যাস্তের সময় গ্রামের গেটে আমার সঙ্গে দেখা করলে ওদের হরিণটার কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু ওরা সেদিন রাত্রেই হরিণটা নিয়ে আসবে বলে তৈরি হয়ে এসেছিল, তাই বললে যে আমি যদি বলে দিই কোথায় সেটা রয়েছে তাহলে ওরা গিয়ে খুঁজে নিয়ে আসতে পারবে। আগে যখন আমি গ্রামবাসীদের জন্যে হরিণ মেরেছি, একটা চিহ্ন রেখে এসেছি। জঙ্গলটার সঙ্গে তারাও আমার মতই পরিচিত, তাদের এখন শুধু বলে দিলেই হবে কোন্ দাবানল-পথের, বা বন্য জন্তুর বা গরুর চলার পথের কাছে সে চিহ্ন। সেই চিহ্ন থেকে তারা আমার নিশানা অনুসরণ করে যাবে। শিকার-করা জীবজন্তু আবিষ্কারে এই পন্থা কখনো বিফল হয় নি। কিন্তু এক্ষেত্রে হরিণটা মেরেছি সন্ধ্যার পরে, অন্ধকার রাত্রে। ফলে কোনো চিহ্ন রেখে আসা সম্ভব হয় নি। ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে-রাত্রেই হরিণটা ভাগ করে নিয়ে পরদিনের ভোজের ব্যবস্থা করতে। তাই ওদের হতাশ করতে আমার ইচ্ছে হল না। ওদের বললাম পাওয়ালগড়ের দাবানল-পথ ধরে আড়াই মাইল পর্যন্ত গিয়ে সুপরিচিত হলদু গাছটার নিচে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে। ওরা বেরিয়ে চলে যেতে, ম্যাগি আমার জন্যে যে চা তৈরি করে এনেছিল তা খেতে বসলাম।

একজনের পিছনে একজন এইভাবে একদল মানুষের জঙ্গলের পথে চলতে যা সময় লাগে একা মানুষের সময় লাগে তার চেয়ে অনেক কম, তাই আমি তাড়াহুড়ো করি নি। বন্দুক নিয়ে যখন আমি বেরিয়ে পড়লাম তখন একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। সেদিন আমাকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনেক মাইল হাঁটতে হয়েছে, কিন্তু আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকায় তার উপর আর

পাঁচ মাইল বা ছ-মাইল বিশেষ কিছু অসুবিধের ছিল না। অনেকটা আগে বেরিয়ে পড়া সত্ত্বেও যখন আমি তাদের নাগাল ধরে ফেললাম, হলদু গাছটা তখনও খানিকটা দূরে। হরিণটা সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। তারপর সেটাকে বাঁশের সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেলে আমি একটা সংক্ষিপ্ত পথ ধরে যাত্রা করলাম,—এতে করে পথ আধ-মাইল কম হল। বাড়ি যখন ফিরলাম তখন রাত্রের খাওয়ার সময় হয়েছে। শুতে যাবার আগে স্নান করব, এই বলে আমি ম্যাগিকে খাবারের ব্যবস্থা করতে বলে হাত-পা ধুতে গেলাম।

সেদিন রাতে হাত-পা ধোবার জন্যে জামাকাপড় খুলতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখি, আমার হালকা রবারের জুতো লাল ধুলোয় ভরে গেছে ; দু-পায়েও লেগেছে ধুলো। পায়ের ব্যাপারে আমি অত্যন্ত সাবধানী, যে কারণে পায়ের জন্যে আমায় কখনো ভুগতে হয় না। তাই বুঝলাম না এত অসাবধানী আমি কী করে হলাম। ছোটখাট এক একটা ব্যাপার মন থেকে কিছুতেই যেতে চায় না। আর মনে এলেই আমাদের মস্তিষ্কে যেখানে সংবাদ জমা হয়, সেখানকার স্নায়ুতে পেঁৗছে যায়, তারপর হঠাৎ রহস্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ে—হয়তো কোনো মানুষের বা কোনো জায়গার নাম, অথবা বর্তমান ক্ষেত্রে যেমন, আমার পায়ের এই দুরবস্থার কারণ।

কাঠগুদামে রেল-পথ তৈরি হবার আগে যে বড় রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের দিকে যানবাহন চলাচল হত, সেই রাস্তা আমাদের গেট থেকে বোর পুল পর্যন্ত এক সরল রেখা। পুল ছাড়িয়ে তিনশো গজ এগিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে বাঁ দিকে। এই মোড়ের ডান দিকের রাস্তাটা, সেই সময়ে, পাওয়ালগড়ের দাবানল-পথের সঙ্গে মিশেছিল। কয়েকশো গজ পর্যন্ত সেটা পাওয়ালগড়ের বর্তমান মোটর-চলা পথের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে চলেছে। বোর পুল থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে কোটা রোড ডান দিক থেকে এসে বড় রাস্তায় মিশেছে। এই দুই রাস্তার সংযোগ-স্থল আর মোড়টার মাঝামাঝি রাস্তাটা একটা অগভীর নিচু জায়গা দিয়ে চলে গেছে। ভারি ভারি গরুর গাড়ি চলার ফলে এই নিচু জায়গাটা লাল ধুলোয় ভরে উঠেছে, ফলে ধুলো এখানে ছ-ইঞ্চি পুরু। এই ধুলো এড়াবার জন্যে এই ধুলোমাখা পথ আর বাঁ দিকের জঙ্গলের মাঝামাঝি জায়গার উপর দিয়ে একটা সরু পায়ে-চলা পথের সৃষ্টি হয়েছে। মোড়টার কাছের দিকে ত্রিশ গজের মধ্যে রাস্তাটা, আর সরু পায়ে-চলা পথটা একটা ছোট পুলের উপর দিয়ে চলে গেছে—এই পুলের দেওয়াল এক ফুট পুরু, আঠার ইঞ্চি উঁচু, যাতে গরুর গাড়ি এখান থেকে নিচে পড়ে যেতে না পারে। বহু বছর হল এই পুলটা অকেজো হয়ে রয়েছে। এই পুলের নিচের দিকে, অর্থাৎ সরু পায়ে-চলা পথটার দিকে রাস্তার সমান উঁচু লম্বায় চওড়ায় আট-দশ ফুট বালি ভরা জমি।

আমার পায়ে এত ধুলো লাগল কেন ভাবতে গিয়ে আমার মনে পড়ল, চা সেরে ওদের পিছন-পিছন চলতে চলতে আমি পুলটার কয়েক গজ আগে পর্যন্ত এসে রাস্তাটা বাঁ দিক থেকে অতিক্রম করে ডান দিকে ছ-ইঞ্চি পুরু ধুলোর উপর দিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর রাস্তাটার ডান দিকের ধার ঘেঁষে পুলটা পার হয়ে আবার রাস্তা অতিক্রম করে পায়ে-চলা পথটা ধরে চলেছিলাম। কিন্তু কেন করেছিলাম? বাড়ি থেকে বেরোনো থেকে হলদু গাছটার কাছে আমার লোকজনদের ধরে ফেলা পর্যন্ত আমি এমন একটা শব্দও পাই নি যাতে বিপদের আশঙ্কা হতে পারে, আর সেই অন্ধকার রাত্রে আমি চোখেও দেখি নি কিছু। কেন তবে আমি রাস্তাটা পার হলাম, আর কেনই বা আবার রাস্তাটা পেরিয়ে গেলাম ওদিকে?

এই বইয়ের গোড়ার দিকে বলেছি যে, যেদিন আমি ড্যান্সির বন্‌শীর কারণ নির্ণয় করে জানলাম যে দুটো মসৃণ গাছের ঘর্ষণে এর সৃষ্টি, সেই থেকে জঙ্গলের যে-কোনো অস্বাভাবিক শব্দ বা দৃশ্যের কারণ নির্ণয় করা আমার একটা নেশায় দাঁড়িয়েছে। এই তো আর-একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। এর রহস্য উদ্ধার করতে হবে। তাই পরদিন ভোরে কোনো গাড়ি চলার আগে আমি রহস্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

আগের দিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি থেকে ওরা সবাই দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে এবং গ্রামের গেটের কাছে আরও তিনজন ওদের দলে যোগ দেওয়ায় সে সংখ্যা দাঁড়ায় চোদ্দয়। বোর পুল পার হবার পর ওরা পায়ে-চলা পথটা ধরে একজনের পিছনে একজন এইভাবে এগিয়ে পুলটা পার হয়। তারপর মোড়ে পৌঁছে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে গিয়ে দাবানল-পথ ধরে এগিয়ে চলে। এর কিছুক্ষণ পরে একটা বাঘ কোটা রোড ধরে এগিয়ে আসে, দুই রাস্তার সঙ্গমের সন্নিকটে একটা ঝোপের কাছে মাটিতে আঁচড় কাটে, তারপর বড় রাস্তাটা অতিক্রম করে পায়ে-চলা পথ ধরে এগিয়ে চলে। এখানে আমার লোকজনের পায়ের দাগের উপর বাঘটার থাবার ছাপ স্পষ্ট। বাঘটা এই পায়ে-চলা পথে ত্রিশ গজ পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর আমি পুলটার উপর গিয়ে পৌঁছই।

পুলটা লোহার; স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আমি যখন পুল পার হয়েছি, বাঘটা শব্দ পেয়েছে। কারণ আমি জোরে পা ফেলে চলছিলাম, নিঃশব্দে চলার কোনো চেষ্টাই করি নি। শব্দ শুনেই বাঘটা বুঝতে পারে, আমি কোটার রাস্তা ধরে এগোব না, বরং তার দিকেই এগিয়ে আসছি। তাতেই সে দ্রুত পায়ে-চলা পথটা দিয়ে এগিয়ে যায়, পুলের কাছে এসে পথটা ছেড়ে দিয়ে রাস্তার দিকে মুখ করে বালি-ভরা জমিটার উপর শুয়ে ছিল,—পথটা থেকে তার মাথাটার দূরত্ব তখন এক গজ মাত্র। পায়ে-চলা পথটা ধরে আমি বাঘটার

পিছু-পিছু চলেছিলাম, আর পুলটার পাঁচ গজের মধ্যে এসে আমি ডাইনে মোড় ফিরেছিলাম ; তারপর ছ-ইঞ্চি পুরু ধুলো-ভরা রাস্তাটা পার হয়ে রাস্তার ডান কিনার ধরে এগিয়ে চলে আবার রাস্তাটা পার হয়ে পায়ে-চলা পথটায় গিয়ে পড়েছিলাম। এ সমস্তই আমি করেছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, যাতে আমায় বাঘটার এক গজের মধ্য দিয়ে না যেতে হয়।

আমার ধারণা, যদি আমি পায়ে-চলা পথটা ধরেই চলতাম তাহলেও সম্পূর্ণ নিরাপদে বাঘটার সামনে দিয়ে চলে যেতে পারতাম, যদি (ক) স্থির পায়ে হেঁটে চলে যেতাম, (খ) কোনোরকম কথা না বলতাম, এবং (গ) হঠাৎ খুব বেশিরকম নড়াচড়া না করতাম। বাঘটার আমাকে হত্যা করবার কোনো মতলব ছিল না বটে, কিন্তু তার সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় যদি আমি জঙ্গলের কোনো শব্দ শোনবার জন্যে থামতাম, কিংবা কাশতাম বা হাঁচতাম বা নাক ঝাড়তাম, হয়তো তাহলে বাঘটা ঘাবড়ে গিয়ে আমায় আক্রমণ করতে পারত। আমার অবচেতন মন এই ঝুঁকিটা নিতে প্রস্তুত ছিল না। জঙ্গল-অনুভূতি এবার আমার সহায় হয়ে এই সম্ভাব্য বিপদের সান্নিধ্য থেকে আমায় সরিয়ে নিয়ে গেল।

এই জঙ্গল-অনুভূতি যে কতবার আমায় বিপদ এড়িয়ে যেতে সাহায্য করেছে তার হিসেব নেই। কিন্তু এতদিন জঙ্গলে বাসের মধ্যে মাত্র একবার আমি এক বন্য জন্তুর একেবারে সান্নিধ্যে এসে পড়েছিলাম। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, এই জঙ্গল-অনুভূতিই হ'ক বা আমার রক্ষী কোনো দেবদূতই হ'ক, বার-বার চরম মুহূর্তে এ আমার নিরাপত্তা বিধান করে এসেছে।

রুদ্রপ্রয়াগের চিতা বিষয়ে সমসাময়িক সংবাদ॥

দি পায়োনীয়র : ২৫. ১২. ১৯২৫.

ইউ, পি, কাউন্‌সিল

নরখাদক চিতা

গাড়োয়াল জেলার রুদ্রপ্রয়াগ অঞ্চলে একটি নরখাদক চিতা প্রচণ্ড দৌরাত্ম্য শুরু করেছে। এই ব্যাপারটির বিশেষ কিছু খুঁটিনাটি শ্রী মুকুন্দীলাল জানতে চান। উত্তরে মিঃ বার্ন এই বিবৃতিটি দেন :—"মনে হয় যে একটি জানোয়ারই এই সব কিছুর জন্য দায়ী, এবং দেখা যায় যে এ-পর্যন্ত চিতাটি ১১৪ জন মানুষ মেরেছে। এই আপদ-নিধনে সব রকম চেষ্টাই করা হয়েছে। ষোল জন পেশাদার শিকারী নিয়োগ করা হয়েছে, বিষেরও বহুল-ব্যবহার হয়েছে। জেলা-কর্তৃপক্ষের সৌভাগ্য, যে এই চিতা নিধনে, তাঁদের প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে অক্টোবর থেকে, শিকারে বহু-অভিজ্ঞ ও সাহসী একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক নিজের থেকে এগিয়ে এসেছেন। ভদ্রলোক তাঁর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতার একটি রোমাঞ্চকর বিবরণী সরকারের কাছে আছে। সেটি শীঘ্রই খবরের কাগজগুলিতে পাঠানো হবে, এবং একটি অনুলিপি মাননীয় সদস্যের কাছে যাবে। কৃতকার্যতার জন্য যে-বিরতি প্রয়োজন, তারপর আবার শুরু হবে ওই একই ধরনের প্রচেষ্টা। এ-পর্যন্ত যে-সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার ফলে অনেকগুলি চিতা প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু বিশ্বাস করার কারণ আছে যে নরখাদক-চিতাটি এখনও জীবিত। এখন পর্যন্ত খরচ হয়েছে মোট ১'৫১৮ টাকা আট আনা।

দি পায়োনীয়ার : ২৬. ১২. ১৯২৫.

ইউ. পি. কাউন্‌সিল

নরখাদক চিতা।

শতাধিক ব্যক্তি বলি।

গাড়োয়ালের আপদ-নিধনে শিকারীর প্রচেষ্টা।

ব্যর্থ প্রথম-প্রয়াস।

বুধবার ইউ. পি, কাউন্সিলে গাড়োয়াল জেলার রুদ্রপ্রয়াগে একটি নরখাদক চিতার দৌরাত্ম্যের উপর একটি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বার্ন জানান যে, মনে হয় একটি জানোয়ারই এই সব কিছুর জন্য দায়ী, এবং দেখা যায় যে এ পর্যন্ত চিতাটি ১১৪ জন মানুষ মেরেছে। এই আপদ-নিধনে সব রকম চেষ্টাই করা হয়েছে। ষোলজন পেশাদার শিকারী নিয়োগ করা হয়েছে, বিষের বহুল-ব্যবহার হয়েছে, এবং জেলা-কর্তৃপক্ষের সৌভাগ্য যে এই চিতা নিধনে তাঁদের প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে, অক্টোবর থেকে শিকারে বহু-অভিজ্ঞ ও সাহসী একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক নিজের থেকে এগিয়ে এসেছেন। ভদ্রলোক তাঁর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতার একটি রোমাঞ্চকর বিবরণী সরকারের কাছে আছে। সেটি শীঘ্রই খবরের কাগজগুলিতে পঠানো হবে।

রুদ্রপ্রয়াগের চিতাটিকে মারার প্রচেষ্টার বিবরণী-সংবলিত একটি চিঠির এই অংশগুলি সংযুক্ত-প্রদেশ সরকার পাঠিয়েছেন : —

"পৌঁছেই আমি পাটোয়ারীর সঙ্গে কথা বলে যখনি শুনি যে শেষ মানুষটি মারা পড়েছে কেতরিতে, বাকি দিনটা আমি নদীর পশ্চিম-পাড় তল্লাসীতে কাটাই। ওই জায়গাটার নাম ঝুলা রোড। সেখানে দেখলাম একটি চিতার দুদিনের পুরনো আঁচড়ের দাগ। পরদিন সকালের মধ্যে আমি চারটে ছাগল যোগাড় করলাম। বিকেলে ঝুলা রোড বরাবর জায়গা বুঝে ওগুলোকে বেঁধে দিলাম। যেখানে জঙ্গলের পথ ঝুলা রোডে এসে মিলেছে, সেখানে বাঁধা ছাগলটিই ছিল আমার আশার কেন্দ্রস্থল। জায়গাটি সেতুর থেকে একটু দূরে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল, ওর কাছাকাছি একটা গাছের ওপর আমি বসে রইলাম। পরদিন সকালে (১৩ই) ফিরে গিয়ে দেখি ছাগলটি নিহত এবং তার অর্ধেকেরও বেশি খেয়ে গেছে। দেখলাম যে সুতোর দড়িটাকে ছিঁড়ে ছাগলটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিস্তর চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু শেষ অবধি চিতাটি দড়ি ছিঁড়তে পারেনি। দড়ি ছিঁড়ে মড়িটাকে নিয়ে যেতে পারে, আমি

তা চাইনি। অন্য তিনটি ছাগলকে চিতাটা স্পর্শও করেনি। নরখাদক চিতাটিই ছাগলটাকে মেরেছে এই আমার বিশ্বাস। বিশ্বাস ছাড়া আমার কাছে অন্য কোনো প্রমাণ ছিল না। আমার বিশ্বাসের যাথার্থ্য প্রমাণ করার একটি মাত্র উপায় চিতাটির জন্যে বসে থাকা।

প্রস্তুতি।

মড়িটার ওপরে আর নিচে ঘন জঙ্গল। সাধারণ একটি চিতা হলে, নিয়ম মত সূর্যাস্তের সম-সম কালে আসবে। নরখাদক চিতাটি হলে হয় দেরি করে আসবে, নয়ত আসবেই না। রাত ৯-টা অবধি কিছুই ঘটল না। তখন, ৯-টার সময়ে, কি একটা জানোয়ার মড়ির কাছের রাস্তার ওপর লাফ দিয়ে পড়ল আর তার ধাক্কায়, আমি যে-গাছটার ওপর বসেছিলাম, সে-দিকে একটা পাথর গড়িয়ে এল। জানোয়ারটা কয়েক মিনিট মড়িটার কাছে রইল। মনে হল শূকল। তারপর সাঁকোর দিকে চলে গেল। তখন বেশ অন্ধকার, কিছু দেখতে পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে, তা হবে জেনেই মড়িটার কাছে বেমার গাছ ছড়িয়ে দিয়েছিলাম বলে, জানোয়ারটার গতিবিধি টের পাচ্ছিলাম। ('বেমার' এক জাতীয় ছোট গাছ। তাতে শিমের মত দানা হয়। বছরের এই সময়ে গাছগুলো শুকিয়ে যায়। ফলে সামান্য ছুঁলেই খড়খড় করে শব্দ হয়।) সে-রাতে নরখাদকটা সাঁকো পেরিয়ে ও-পারে চলে যায়। যেখানে আগের ছাগলটা মারা পড়েছিল, সেখানে ১৪ তারিখ একটা ছাগল বাঁধা হয়। সেটাকে ও ছোঁয়নি।

বন্দুকের ফাঁদ।

১৫ তারিখ আমি কেতারি যাবার, এবং ফিরতি-পথে শেতানন্দের ঝুলো-পুলটি সরজমিনে দেখার জন্যে বেরোলাম। কিন্তু মাঝ রাস্তা অবধি যাবার পর মত পালটিয়ে রুদ্রপ্রয়াগ যাব বলে ফিরলাম। পুলটি থেকে মাইল খানেক দূরে পাটোয়ারীর পাঠানো একজন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। পাটোয়ারী ওকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, চুটিতে একজন মারা পড়েছে। প্রাতরাশের পর পাটোয়ারী আর কানুনগোর সঙ্গে চার মাইল চড়াই-পথে চুট্টি রওনা হলাম। গ্রাম থেকে একশো গজ দূরে খেতের বুকে বয়ে-যাওয়া একটি ছোট্ট নালার মধ্যে পড়েছিল মড়িটা। বার-বার মড়িটার কাছে এসে, চিতাটা নালার ডান পাড়ে থাবার ছাপে একটা রাস্তাই করে ফেলেছে। এই পথের ওপর আড়াআড়ি

আমার .২৭৫ আর .২৮ বোরের বন্দুক দিয়ে একটা ফাঁদ পাতব বলে ঠিক করলাম। ফাঁদটা পাতার পর দেখলাম, বন্দুকের ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা সুতোয় যত জোরে চাপ দিলে ঘোড়া ছুটে ফায়ার হবে, চিতাটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তত জোরে চাপ দিয়ে থাবা ফেলবে না। কিন্তু ও যদি ডান দিকে মুখ করে থাকে, তখন যদি ওকে ভয় খাওয়াতে পারি, তাহলে ও তাড়া খেয়ে হুড়মুড়িয়ে ফাঁদের ওপর এসে পড়বে সে-সম্ভাবনা আছে। সেই সম্ভাবনার ওপরই ভরসা করে রইলাম। আমার .৪৫০-বোর বন্দুকটি নিশানা করার জন্যে একটা কিছু দরকার। তাই নালার যে-দিকটা আমার কাছাকাছি, সে-দিকে মড়ি বরাবর একটি সাদা পাথর বসালাম। নালার যে-দিকটি নিরাপদ, সে-দিকে, মড়ি থেকে তিরিশ গজ দূরে একটি আখরোট গাছ। তার ডালের ওপর খড়ের গাদা। সেই গাদার মধ্যিখানে বসার জায়গা করে নিলাম।

সন্ধে ৬-টার মধ্যে সব তোড়জোড় শেষ হল। সেফটিক্যাচ-খোলা বন্দুকগুলো উলটোদিক থেকে চোখে পড়বে না এমনি ভাবে চিতার পথে আড়াআড়ি করে রাখা। শেষ বারের মত দেখে নিলাম কিছু ভুলে যাইনি তো। তারপর গাছে উঠে জায়গায় বসলাম। ৬-৩০টার সময়ে ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। এক মিনিটে ভিজে জাব হয়ে গেলাম। অবশ্য তাতে খুব একটা এসে গেল না, কেন না চার মাইল চড়াই ভেঙেই আমি ভিজে গিয়েছিলাম। সাতটার সময়ে বৃষ্টি ধরল। দশ মিনিট বাদে মড়ির একটু নিচে একটা পাথর গড়িয়ে নালায় পড়ার শব্দ পেলাম, সঙ্গে-সঙ্গে আবার শুরু হল বৃষ্টি। বৃষ্টি এসেছে উত্তর দিক থেকে। আমার আগেই চিতাটার গায়ে বৃষ্টি লেগেছে। আমার খড়ের গাদার নিচে আশ্রয় নিতে আসার সময়ে তাড়াহুড়োয়, নালাটা যেখানে একটু চওড়া, সেখান দিয়ে এসেছে আর পাথরটা ওর থাবা লেগে গড়িয়ে পড়েছে। আমি গাছে ওঠার সময়ে নিচে কিছু খড় পড়ে গিয়েছিল। সেই খড়ের ওপর ও আরাম করে বসল।

চিতাটি ছ-ফুটের মধ্যে।

তারপর প্রায় এক ঘন্টা বা তারও বেশি সময় আমরা দুজনে পরস্পরের মাত্র ছ-ফুটের মধ্যে ছিলাম। সুবিধেটা ওর তরফেই, কেননা ও চলতে-ফিরতে পারছিল। ভিজতেও হয়নি ওকে, গরম-সরমে ছিল। আমাকে নিশ্চুপে থাকতে হচ্ছিল। পুরো ভিজে গিয়েছিলাম। আর যা ঠান্ডা বাতাস বইছিল, জমিয়ে দিচ্ছিল আমাকে। সারা সময়টা ধরে এত সুন্দর উজ্জ্বল বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল যে তেমনটি আমি কখনো দেখিনি। একাধিক বার ভয় হয়েছিল গাছটার ওপর

না বাজ পড়ে। ঝড় চলার মাঝামাঝি সময়ে শব্দ শুনে বুঝলাম আমাদের পঞ্চাশ গজ ওপর-পথ দিয়ে দু-জন লোক যাচ্ছে। অমন সময়ে বেরিয়েছে বলে ওদের সাহসের তারিফ করলাম। (পরে শুনেছিলাম ওদের মধ্যে একজন, ইলেকট্রিক টর্চ-সহ আপনার লোক)।

আটটার সময়ে ঝড় একদম থেমে গেল। তার একটু পরে চিতাটা লাফিয়ে নিচের মাঠে নেমে আবার নালাটা পেরোল এবং গত রাতের পথ ধরে মড়িটার দিকে এগোল। ও যাতে ফাঁদে পা দিয়ে গুলি খায় সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে আমি বন্দুকের ঘোড়ার সঙ্গে দুটো করে সুতো বেঁধেছিলাম। নিশ্চয় ওর মাথাটা দুটো সুতোর ফাঁকে ঢুকে যায়, ও নির্ঘাত ভয় পায় কেন না মড়ি ছেড়ে ও ছুটে পালাল আর ষাট-সত্তর গজ দূরে গিয়ে গর্জাতে লাগল। জানতাম কিছুক্ষণের মধ্যেই ও ভয় কাটিয়ে উঠবে। আধঘণ্টা বাদে সাদা পাথরটা হঠাৎ ঢাকা পড়ল। এ-রকমটা ঘটবে বলে আমি ভাবিনি। ভেবেছিলাম যখন ওর খাওয়ার শব্দ পাব, তখন নিশানা ঠিক করার জন্যে সাদা পাথরটার সহায়তা পাব। ওটা ঢাকা পড়লে, আমি যেখানে গুলি ছুঁড়তে চাই, তাক ঠিক করে তার কয়েক গজের মধ্যেও গুলি ছোঁড়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

"কিসমৎ"

সাদা পাথরটা যে-রকম আচমকা ঢাকা পড়েছিল, তেমনি হঠাৎ আবার নজরে এল। তার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি শব্দে বুঝলাম, চোখেও দেখলাম চিতাটা সোজা আমার দিকে আসছে। এখন মনে হল, ও যখন মড়ির কাছে ফিরবে, ওকে গুলি করার ভাল সুযোগ পাব একটা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ও যে-পথে এসেছিল, সে-পথ দিয়ে ফিরল না। এর কুড়ি বা তিরিশ মিনিট বাদে পাথরটা যখন আবার ঢাকা পড়ল, ফের নজরে এল, আমি ঠিক করলাম একটা গুলি ছোড়ার ঝুঁকি আমি নেব। তৃতীয়বার ও যখন আমার নিচে দিয়ে যাচ্ছে, আমি ঝুঁকে পড়ে গুলি করলাম। ও যেখানে ছিল, সে জমিটা হয়তো দু-ফুট চওড়া। আমি গুলি করি ঠিক মাঝ-বরাবর। ওর ঘাড় থেকে কয়েক গাছা লোম খসে পড়ে, ওর এটুকু ক্ষতিই আমি করতে পারলাম—কিসমৎ! আপনার লোকটি যদি দু-ঘণ্টা আগে এসেও পৌঁছতো!—ওই টর্চটা যেমন চেয়েছিলাম, তেমন করে কোনোদিন কিছু চাইনি, হয়তো আমি ওকে ঘায়েল করতে পারতাম—আবার সেই কিসমৎ।

রহস্যময় শব্দ।

আমি আগেই বলেছি যে চিতাটাকে আমি দেখেছি, ওর শব্দও শুনেছি। তাই, জানোয়ারটা বিষয়ে আমার কি মনে হয়েছে, তা বলা উচিত। ওকে যে মেঘঢাকা আকাশ ও অন্ধকার রাতেও দেখা গিয়েছিল, তা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, জানোয়ারটার গায়ের রং খুবই হালকা। ওকে খুব লম্বাটে বলে আমার মনে হয়নি, কিন্তু দেখে মনে হল বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা আর শক্তিশালী গড়ন। ওর শব্দটাই হচ্ছে আমার এ-পর্যন্ত যত অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার মধ্যে আশ্চর্যতম। কোনো জানোয়ারের শরীরের শব্দ আমি এ-পর্যন্ত শুনিনি ; কোনো মতেই ও-শব্দটা হিসেবে মেলাতে পারব না। তিরিশ গজ দূর থেকে শোনা গিয়েছিল, আওয়াজটা এত জোর। ঠিক যেন ঠাসবুনোটের রেশমী পোশাক পরে একটি মেয়ে হাঁটছে। খেতে কিছুদিন আগেই গম বোনা হয়েছে। একটি ঘাসের শিষ বা একটি পাতাও খেতে নেই। না, চিতাটা পা ফেলার জন্যে শব্দটা হয়নি। শব্দটা এসেছিল ওর শরীর থেকে।

আরো একটি প্রচেষ্টার পরিকল্পনা।

চিতাটা যতক্ষণ নদীর এ-পারে আছে, ততক্ষণ তবু সুযোগ পাব বলে মনে হয়। কিন্তু নদী পেরোতে পারলে ও উধাও হয়ে যাবে। সেইজন্যে আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে পাটোয়ারীদের নির্দেশ দিয়েছি চাতুপিপল পুল আর শেভানন্দ ঝোলা-পুল রাতে বন্ধ রাখতে। আশা করি এ জন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি নিজে যে পুলটি আগলাচ্ছি, সেটা বন্ধ রাখার জন্যে কাঁটাঝোপ আর একটি লণ্ঠন ব্যবহার করছি। এ অতি বাজে ব্যাপার হচ্ছে, কিন্তু কিছু একটা তো করা দরকার। আমি পুলের মুখে বসি, আর লম্বা দড়ি-লাগানো একটা শিকার-ধরা জাল পুলের মাঝ-বরাবর আটকানো থাকে। মতলবটা হল, চিতাটা যখন পুলের ওপরে, তখন তাকে গুলি ছুঁড়ে যদি লক্ষভ্রষ্ট হই, তা হয়তো হবও, তখন ওকে তাড়িয়ে জালের মধ্যে নিয়ে ফেলব। চিতাটা জালে পড়ার পর শুরু হবে আসল ঝামেলা। রাইফেল হাতে লোহার আড়াআড়ি পাটাগুলো বেয়ে নামা সম্ভব হবে না। অন্ধকারে ছুরি দিয়ে কাজ সারতে হবে। গণ্ডগোল বেধে দুজনেই পুল টপকে পড়ে যাবার একটা সম্ভাবনা আছে। অবশ্য এ-রকম ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা খুবই কম।

দি পায়োনীয়র : ১৫. ৫. ১৯২৬.

'রুদ্রপ্রয়াগের ভয়ংকর' বলে ইদানীং বহুখ্যাত নরখাদক চিতাটি শেষ অবধি নৈনিতালের গার্ষি হাউসের ক্যাপটেন জে করবেটের গুলিতে নিহত হয়েছে। গত সাত বছরে গাড়োয়ালের পশ্চিমাংশে ১২৫-জন মানুষ এই চিতাটির হাতে প্রাণ হারিয়েছে।

হিমালয় সম্বন্ধে যত আশ্চর্য কাহিনী শোনা যায়, এই চিতাটির জীবন-কথা তার মধ্যেও এক আশ্চর্যতম কাহিনী। এ কাহিনীর বিভিন্ন খুঁটিনাটির অনেক কিছুই ভয়াবহ এবং করুণ। সে কাহিনী যদি এমন তথ্যপ্রতিষ্ঠ না হত, তাহলে এর সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ করা চলত। কাহিনীটির প্রথম কয়েকটি পর্যায় গত ডিসেম্বর মাসের 'দি পায়োনীয়র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে গত শরতে জানোয়ারটিকে মারার জন্য মিঃ এক্‌স্‌ (X)-এর (যাঁকে এখন ক্যাপ্‌টেন করবেট বলে প্রকাশ করা চলে) প্রচেষ্টার বর্ণনা ছিল। অন্তিম অধ্যায়টি এখন লেখা যায়। গাড়োয়ালের যে পশ্চিমাংশে চিতাটি তার দৌরাত্ম্য চালায়, সেখানে লোকবসতি তুলনামূলক ভাবে ঘন। প্রায় তিনশো পঞ্চাশ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চলে এই তাণ্ডব চলে। সেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ বাস করে। যে-জায়গাটির নামে চিতাটির নামকরণ হয়েছে, সেই রুদ্রপ্রয়াগ তেহ্‌রি রাজ্যের সীমান্তবর্তী একটি ছোট্ট জায়গা। অলকনন্দা ও মন্দাকিনী নদীর সঙ্গমে রুদ্রপ্রয়াগের অবস্থিতি। এই মিলিত নদী ধারা হরিদ্বারের সমতলে পেঁছে গঙ্গায় পরিণত হয়েছে। কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের পবিত্র দেবপীঠে যাবার তীর্থপথের সংযুক্তিস্থলও এই রুদ্রপ্রয়াগ। জায়গাটিতে ঝোপজঙ্গল অনেক, আর রাস্তা কেটে সমতলে নামার পথে অলকনন্দার খরস্রোতা জল পাথরের গায়ে মৌচাকের খোপের মত অনেকগুলি গুহা এখানে সৃষ্টি করেছে। রুদ্রপ্রয়াগকে কেন্দ্র করেই চিতাটিকে মারার জন্য তৎপরতা চালানো হয়। অলকনন্দার পুব পাড়ে প্রায় বাইশ মাইল লম্বা ও আঠার মাইল চওড়া, এবং পশ্চিম পাড়েও অনুরূপ আয়তনের এলাকায় চিতাটি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।

১৯১৮ সাল থেকে চিতাটি মানুষ মারতে শুরু করে এবং উপদ্রুত এলাকায় তার হত্যালীলা নিয়মিত চলতেই থাকে। অবশেষে ১লা মে-তে চিতাটি নিহত হয়। সাধারণত চিতাটি বাড়ির ভেতর থেকে, বা বাড়ির দোরগোড়া থেকে শিকার ধরে নিয়ে যেত। গরম কালে তার তৎপরতা বেশি বেড়ে যেত, কারণ সেই সময়ে মানুষ রাতে ঘরের দরজা খুলেই রাখতে ভালবাসে। গত কয়েক বছরে চিতাটি সম্পর্কে এমনই বিভীষিকার সৃষ্টি হয়, যে দমবন্ধ ভ্যাপসা গরমেও মানুষ দরজা বন্ধ করে, প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে রাত কাটাত।

গত দু-বছরে অন্তত তিনজন তীর্থযাত্রী চিতাটির হাতে প্রাণ হারিয়েছে। তবে চিতাটি সচবাচর তীর্থযাত্রীদের এড়িয়ে চলত। কারণ, প্রথমত এরা বেশ বড় দল বেঁধে চলে, আর আলোর ব্যবস্থা থাকার ফলে এদের আশ্রয়স্থলগুলি রাতে নিরাপদ।

রুদ্রপ্রয়াগের আপদটি বিষয়ে 'দি পায়োনীয়রে' পূর্ব-প্রকাশিত লেখা-গুলিতে, উপদ্রুত অঞ্চলটিকে এই ভয়ংকর বিভীষিকা থেকে মুক্ত করার জন্য যে অসংখ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, যার সবই বিফল হয়, তার কিছু-কিছু খুঁটিনাটি জানানো হয়েছে। ষোল জন শিকারীকে সরকার টাকা দিয়ে নিয়োগ করেন। তাঁরা চিতাটিকে মারার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন। জেলাতে ঢালাও বন্দুকের লাইসেন্স্ দেওয়া হয়। চিতাটির জীবনলীলা শেষ হবে এই আশায় সরকার বিশেষ ভাবে তৈরি একটি ফাঁদ এবং বিষও সরবরাহ করেন। দু-বার চিতাটি ধরা পড়ে—একবার ফাঁদে, একবার একটি গুহায়। ঘটনাস্থলে হাজির ভয়বিহ্বল লোকেরা, চিতাটিকে গুলি করে মারতে পারে এ-রকম বাছাই-করা লোকদের নিয়ে আসার জন্যে পাহাড় পেরিয়ে বহু মাইল দূরে-দূরে যখন লোক পাঠায়, তখন চিতাটা প্রতিবারই পালায়। ভারতের সমস্ত অন্যায়-অশুভর জন্যে সরকারকে দোষ দেওয়ার দিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট মহলের বিশেষ প্রবণতা আছে। তাই, রুদ্রপ্রয়াগের চিতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সরকারকে দোষারোপ করা হয়েছে। কিন্তু এ-ব্যাপারে যা-কিছু করা সম্ভব সরকার সবই করেছিলেন এবং পূর্ব বর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণে এই খাতে ১,৫১৮ টাকা খরচ করা হয়েছিল। এই ভয়ংকর শ্বাপদের কবল থেকে গাড়োয়ালকে মুক্ত করার কাজে সরকারের অক্ষমতায় যে সংসদ-সদস্যরা মেজাজ দেখান, রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে জানোয়ারটিকে খতম করার জন্যে তাঁদের নিজেদের আহ্বান জানানো হয়। বলাই বাহুল্য তাঁরা সে-আহ্বানে সাড়া দেন নি। কম বক্তিয়ার লোকেরা কিন্তু বার-বার এ কাজের ঝুঁকি নিয়েছেন।

প্রায় বছর তিনেক আগে দু জন সামরিক অফিসার চিতাটিকে মারার চেষ্টা করেন। এবং বিভিন্ন ধরনের শিকারে বহুঅভিজ্ঞ ক্যাপটেন করবেট গত বছর ১৬ই সেপ্টেম্বব থেকে ১৬ই অক্টোবর অবধি এক নাগাড়ে চেষ্টা চালান। গাড়োয়ালের ডেপুটি-কমিশনার এ. ডব্লু, ইবটসন যোগ্যতা ও উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে এ-ব্যাপারে সহায়তা করেন। মিঃ ইবটসন, সরকারী কাজের বাইরে যতটা সময় পেয়েছেন, সবই এ-ব্যাপারে দিয়েছেন। কিন্তু আগেই যা বলা হয়েছে, চিতাটির সাবধানতা অনন্যসাধারণ। বন্দুকের ফাঁদ, জাঁতিকল, থাবার ছাপ অনুসরণ করে সযত্ন কড়া তল্লাশী, নিহত মানুষের মড়ি রেখে বসে থাকা, মড়িতে স্ট্রিকনিন-আর্সেনিক-সায়ানাইড বিষ-প্রয়োগ, এর কিছুতেই কিছু ফল হয় না। জানোয়ারটির অত্যদ্ভুত সতর্কতা, তার

বিপদ আঁচ করার ক্ষমতা, আশ্চর্যভাবে পালিয়ে যাওয়ার কয়েকটি ঘটনা বার-বার দেখা গেছে। তা থেকে ও-অঞ্চলের সরলচিত্ত অধিবাসীরা এই সিদ্ধান্তে আসে, যে চিতাটির আলৌকিক ক্ষমতা আছে। তারা বিশ্বাস করে, এমন এক ভয়াল অপদেবতা চিতাটির ওপর ভর করে আছে, যাকে তাড়ানো মানুষের সাধ্য নয়।

আগেই বলা হয়েছে, যে ১৬ই অক্টোবরের পর কয়েক মাসের জন্যে চিতাটিকে ধাওয়া-করা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার কারণ হল, ক্রমাগত তাড়া খেতে খেতে জানোয়ারটি আরো সতর্ক হয়ে উঠেছিল। আর, শীতকালে সে সাধারণত অধিক সংখ্যক লোকও মারত না। এই পরিকল্পনাই গৃহীত হয়। তারপর, গত ১৬-ই মার্চ মিঃ ইবটসন এবং ক্যাপটেন করবেট আবার রুদ্রপ্রয়াগের ছোট্ট রেস্টহাউসটিতে ফিরে এলেন এবং নরখাদকটির বিরুদ্ধে আবার অভিযান শুরু করলেন। ইতিমধ্যে তাঁরা মামুলী মাচা, বন্দুকের ফাঁদ এবং ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। যখন তাঁরা রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছল, তখন নদীর ওপরের প্রতিটি পুল রাতে বন্ধ করা থাকছে, আরও বিভিন্ন সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ে চলছে। এ-বছর ১৬ই মার্চের আগেই নরখাদকটি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আবার জানুয়ারীতে সে মানুষ মারতে শুরু করে। তখন থেকে ১৬-ই মার্চের মধ্যে, তার হাতে পূর্বে নিহত একশো চোদ্দর সঙ্গে আরো আটজন নিহতের সংখ্যা যুক্ত হয়। ১৬-ই মার্চ থেকে শুরু করে ১-লা মে অবধি ক্যাপটেন করবেট এক নাগাড়ে জানোয়ারটির পেছনে ফিরতে থাকেন। আবার তাঁকে সহায়তা করেন মিঃ ইবটসন। সরকারী কাজ থেকে যখনি ফুরসত পেয়েছেন, তখনি, সর্বদাই তিনি রুদ্রপ্রয়াগের কাছাকাছি অঞ্চলে হাজির থেকেছেন।

নরখাদকটির ভয়াবহ সন্ত্রাস চলতেই থাকে। ১-লা এপ্রিল রাতে জানোয়ারটি একটি লোককে তার বাড়ির ভেতর থেকে ধরে নিয়ে যায়। ৭-ই এপ্রিল প্রত্যূষে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আড়াই মাইল দূরে একটি গ্রামে, বাড়ি থেকে বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গে একজন ৮৫ বছরের বৃদ্ধাকে চিতাটি ধরে নিয়ে যায়। বৃদ্ধাটিকে সে আধমাইল বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ১৪-ই এপ্রিল, রুদ্রপ্রয়াগের আঠারো মাইল পূবে একটি গ্রামের একটি ১৫ বছরের ছেলে চিতাটির পরবর্তী শিকার।

ইতিমধ্যে মিঃ ইবটসন এবং ক্যাপটেন করবেটও তৎপরতা চালিয়ে যান। ১-লা এপ্রিলে নিহত মানুষটির দেহের কিয়দংশে বিষ প্রয়োগ করা হয়। চিতাটি মড়ির কাছে ফিরে আসে এবং দেহের যে-অংশে বিষ দেওয়া হয়নি, সেখান থেকে খায়। ৩-রা এপ্রিল মড়ি-দেহের বিষ মাখানো অংশের খানিকটা খায়, কিন্তু কোনো ক্ষতি হয় বলে মনে হয় না। ৭-ই এপ্রিল মানুষ মারার পর দুটি অভিনব ফাঁদ পাতা হয়। মড়ির দিকে নলের মুখ রেখে দুটি রাইফেল গাছের

সঙ্গে বাঁধা হয়। মাছধরার শক্ত সুতো দিয়ে মড়ির সঙ্গে বন্দুকের ঘোড়া বাঁধা থাকে। আশা করা গিয়েছিল, আট তারিখ মড়ির কাছে যখন ফিরে আসবে, তখন চিতাটি সুতোয় টান দেবে ও বন্দুকের গুলি ছুটে যাবে। গত রাতে শিকারটি যে-দিকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আজ রাইফেল থেকে দূরে সরিয়ে মড়িটাকে সেই একই দিকে নিয়ে যাবে এও সম্ভব বলে মনে করা হয়েছিল। চিতাটি যাতে তাই করে সে-বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্যে মড়ি ও রাইফেলগুলির মাঝামাঝি অকেনগুলো ঝোপ পুঁতে দেওয়া হয়। ৮ তারিখ রাত ৭-৪৫-এ চিতাটি এল, ঝোপগুলো উপড়ে ফেলল এবং সেগুলোকে একটা খাদে ফেলে দিল। তারপর মড়িটি টেনে রাইফেলগুলোর দিকে নিয়ে গেল। এর ফলে সুতো গুলোয় ঢিলে পড়ল, গুলি ছুটল না। জানোয়ারটি ব্যাঘাত বোধ করে, এবং লাফিয়ে পালাতে গিয়ে প্রায় ছয়-সাত ফুট লম্বা একটা বিশাল জাঁতিকলের ওপর গিয়ে পড়ে। মিঃ ইবটসন ও ক্যাপটেন করবেট জাঁতিকলটি কাছেই লুকিয়ে রেখেছিলেন। ওঁরা শ-খানেক গজ দূরে নিকটতম গাছটির ওপরে ছিলেন। চিতাটি সচরাচর শিকার এমন জায়গায় টেনে নিয়ে যেত, যার কাছ-পাল্লার ভেতর কোনো গাছ নেই। ওঁরা দুজন তৎক্ষণাৎ জাঁতিকলটার দিকে ছোটেন। জাঁতিকলে কোনো জানোয়ার ছিল না। তবে কলের দাঁতে এক গোছা লোম আটকে ছিল।

২০-শে এপ্রিল ক্যাপটেন করবেট স্থির করেন, অন্তত দশ রাত্তির গোলাব্‌রাই চটির কাছে তিনি চিতাটির জন্য বসে থাকবেন। গোলাব্‌রাই চটি হল রুদ্রপ্রয়াগ রেস্টহাউস থেকে আধ মাইল দূরে তীর্থপথের ওপর তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি ঘাস-ছাউনি। ১০-ই থেকে ২০-শে এপ্রিলের মধ্যে চটিটির কাছে চিতাটির থাবার ছাপ দেখা গিয়েছিল, এবং গত বছর এখানেই ও তিনটি মানুষ মারে। ক্যাপটেন করবেট ভেবেছিলেন, পরবর্তী দশ রাতের মধ্যে ওখানে চিতাটির অন্তত আরেকবার দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে। চটি থেকে উঁচুতে রাস্তার ধারে একটি গাছের ওপর মাচা বেঁধে তিনি বসে থাকেন। গলায় ঘন্টা-বাঁধা একটা ছাগল তিনি নিচে রাস্তার ওপর বেঁধে রেখেছিলেন। ক্যাপটেন করবেট দশ রাত এই মাচায় বসেন কিন্তু চিতাটির কোন চিহ্ন বা সাড়া, দেখতে বা শুনতে পান না। তখন তিনি ঠিক করেন আর একটা রাত, অর্থাৎ ১-লা মে-র রাতটা বসে দেখা যাক। এবং তাইই করেন। নরখাদকটির সে-রাতে শিকার ধরার কথা। ওর শেষ আহার ও খেয়েছিল, মনে করা হয়, চারদিন আগে। একটা বাড়ি থেকে ছাগল চুরি করে। এপ্রিলের শেষদিনটিতে চিতাটি একজন মানুষকে ধরবার চেষ্টা করে ও বিফল হয়।

১-লা মে, রাত ১০টায় ক্যাপটেন করবেট হঠাৎ শুনতে পান রাস্তা দিয়ে কি যেন একটা ছুটে গেল, ছাগলের গলার ঘন্টা বাজল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে

তিনি অস্পষ্ট একটি অবয়ব দেখতে পেলেন এবং সে দিকে রাইফেল তাক করলেন। ইলেকট্রিক টর্চ জ্বালতেই তিনি দেখলেন, তাঁর রাইফেলের মাছি-বরাবর একটি চিতার শরীর। রাইফেল গর্জে উঠল। চিতাটি একটা লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এক সেকেণ্ডের সামান্য বেশি সময়ের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটি ঘটে গেল। চিতাটি এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়, যে যখন টর্চটি জ্বালেন, তখন যদি ক্যাপটেন করবেট সৌভাগ্যক্রমে না দেখতেন যে তিনি রাইফেলটি চিতাটির দিকে তাক করে ধরে আছেন, তাহলে আর চিতাটি পালাবার আগে নিশানা ঠিক করার সুযোগই পেতেন না। দারুণ উৎকণ্ঠায় ক্যাপটেন করবেটের রাত কাটে, কারণ চিতাটিকে মারতে পারলেন কি না, তা তিনি জানেন না। রাত তিনটের সময়ে চাঁদ উঠল বটে, কিন্তু চিতাটির চিহ্নও দেখা গেল না। ভোর হতে ক্যাপটেন করবেট চিতাটির খোঁজে বেরোলেন। রক্তের নিশানা ধরে গিয়ে দেখলেন, খাদের পঞ্চাশ ফুট নিচে একটা গর্তের মধ্যে চিতাটি মরে পড়ে আছে। এখানে বলা যেতে পারে, সে-রাতে একশো তীর্থযাত্রী গোলাবরাই চটিতে ছিল।

সেই নরখাদক বলে এই চিতাটিকে শনাক্ত করার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে। রুদ্রপ্রয়াগের চিতার হাতে নিহত প্রত্যেকটি মানুষের মাড়িতে তিনটে শ্ব-দাঁতের দাগ পাওয়া যায়, যার মানে হল চিতাটির দাঁতের পাটিতে একটি শ্ব-দন্ত নেই। ক্যাপটেন করবেট যে চিতাটিকে মারেন, তার একটি শ্ব-দাঁত ভাঙা ছিল। আগেই যে-দুজন সামরিক অফিসারের কথা বলা হয়েছে, তাঁরা তিন বছর আগে নরখাদকটিকে গুলি করেন ও রক্তের দাগ দেখে বোঝা গিয়েছিল, গুলিটা তার পায়ে লেগেছে। ক্যাপটেন করবেটের মারা চিতাটির পায়ে একটি পুরনো বুলেট-ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায়। এ ছাড়াও চিতাটির ডান-দিকের পেছনের পায়ে একটা জায়গায় লোম ছিল না। সেখানকার ঘা-টা সদ্য শুকিয়েছে। ৮-ই এপ্রিলে ফাঁদের মধ্যে যে এক গোছা লোম পাওয়া গিয়েছিল। সেটা ওখানকার সঙ্গে খাপে-খাপে মেলে। জানোয়ারটার গায়ে অনেকগুলো পুরনো ও নতুন ক্ষতচিহ্ন ছিল। ওর মৃত্যুর দু-সপ্তাহ আগে ক্যাপটেন করবেট দুটি চিতাকে লড়াই করতে শোনেন। নরখাদকটির ক্ষতচিহ্নগুলির কারণ তাতে বুঝতে পারা যায়। নরখাদক জানোয়ার সম্পর্কে যে-সব থিওরি সাধারণ্যে স্বীকৃত, এই চিতাটির চেহারায় নানা দিক থেকে মিল দেখা যায়। হাল্‌কা রঙের বেশ বুড়ো জানোয়ার। গায়ের চামড়ায় চিকন ভাব নেই। গোঁফও প্রায় নেই। দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ১০ ইঞ্চি, অস্বাভাবিক রকম বড় আকার বিশেষ, পাহাড়ী চিতার পক্ষে। পুরো এক রাত একটা গর্তের মধ্যে মরে পড়ে থাকার পর এই মাপ নেওয়া হয়। এর মধ্যে দেহটা শুকিয়ে খানিকটা ছোট হয়ে গিয়ে থাকবে।

জানোয়ারটা মারা পড়ার খবর উপদ্রুত এলাকায় দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। চিতাটাকে ১-লা মে রুদ্রপ্রয়াগ রেস্ট হাউসের সামনে রাখা হয় এবং তাকে দেখার জন্য নিকটবর্তী গ্রামগুলি থেকে শত-শত লোক আসে। চিতাটিকে দেখে এবং জানোয়ারটির বর্ণনায় উল্লিখিত কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ করে তারা একবাক্যে ঘোষণা করে এই হচ্ছে সেই "আদমখোর" (নরখাদক) এবং মানুষের যা অসাধ্য তাই করে তাদের এই ভয়ংকর দুশমনকে খতম করার জন্যে তারা মিঃ ইবটসন ও ক্যাপটেন করবেটকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানায়।

এই নরখাদকটির পেছনে অক্লান্তভাবে লেগে থাকার কাজে মিঃ ইবটসন ও ক্যাপটেন করবেট যে সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা দেখান, তা অমন অসাধারণ পর্যায়ের না হলে পরে আজকেও মানুষ অসহায় হয়ে ভাবত, এরপর নরখাদকের হাতে প্রাণ কে খোয়াবে? এর পরে কার পালা?

Contemporary newspaper report on the Man-eating Leopard of Rudraprayag.

The Pioneer 25.12.1925
U. P. Council.
Man Eating Leopard.

Mr. Mukundilal asked for certain details regarding the depredation of a man-eating leopard at a place called Rudraprayag, in the Garhwal district.

Mr. Burn made the following statement in reply:—"The Rudraprayag Leopard, assuming then only one animal is concerned, has killed 114 human beings. Every endeavour has been made to destroy this pest. Sixteen paid shikaris have been employed, poison has been freely used, and since October the district authorities have been fortunate in securing the voluntary assistance of a European gentleman of considerable experience and proved courage in their attempts to run this leopard down. He does not wish his name to be disclosed, but the Government are in possession of an account of his adventures, which will be communicated to the Press and of which a copy will be sent to the Honourable Member. This account will show conclusively that determined and courageous efforts have been made. They will be repeated after an interval which is held to be necessary in order that successful results may be secured. The measures taken have caused the destruction of a number of leopards, but there is reason to believe that the man-eater is still at large. The amount spent so far is Rs. 1.518-8-0.

The Pioneer : 26.12.1925
U. P. Council.

MAN-EATING LEOPARD.

OVER 100 VICTIMS.

SHIKARI'S EFFORTS TO DESTROY GARHWAL PEST.

Unsuccessful first Attempt.

Replying to a question in the U. P. Council on Wednesday, regarding the depredation of a man-eating leopard at a place called Rudraprayag in the Garhwal district, Mr. Burn said the Rudraprayag leopard, assuming that only one was concerned, had killed 114 human beings. Every endeavour had been made to destroy the pest. Sixteen paid shikaris had been employed, poison had been freely used, and since October the district authorities had been fortunate in securing the voluntary assistance of a European gentleman of considerable experience and proved courage in their attempts to run the leopard down. He did not wish his name to be disclosed, but the Government were in possession of an account of his adventures, which would be communicated to the Press.

The following extracts from a letter describing the efforts to destroy the Rudraprayag leopord have now been received from the United Provinces Government :—

"I interviewed the patwari on my arrival and hearing from him that the last kill had taken place at Ketri I spent the rest of the day in prospecting the west bank of the river. On this track, called the Jhula Road, I found the two-day old scratch marks of a leopard. I got four goats by the next morning, and in the afternoon I served them out in likely places along the Jhula Road. The goat I hoped most from, was tied where the forest track joins the Jhula Road, a short-distance from the bridge. I sat on a tree near it as long as I could see, and when I went back the next morning (13th) I found it had been killed and more than half of it eaten. Great efforts had been made to break the cotton rope, but it had held, as it was not my intention that the goat should be taken off the track. The other three goats had not been touched. There was nothing but my own conviction to show that the killing had been done by the man-eater, and those convictions could be proved by a sit-up.

There was thick jungle above and below the kill and if it was an ordinary leopard it would come out at the usual time, about sun-down, and if the man-eater, it would come late or not at all. Nothing happened until about 9 p.m., when some animal jumped down on to the road near the kill, and dislodged a stone that rolled down towards the tree I was sitting in. The animal stayed near the kill for a few minutes and appeared to nose it and then went off in the direction of the bridge. It was quite dark and impossible for me to see anything, but I could follow the animal's movements by the bemar plants I had strewn near the kill for that object. (BEMAR is a small plant with long seed pods, dry at this time of the year, that rattle at the slightest touch.) That night the man-eater crossed the bridge. A goat tied upon the 14th where the previous one had been killed, had not been touched.

A GUN TRAP.

On the 15th I set out to visit Kétri and inspect the Jhula at Shevanand on my way back, but half way there I changed my mind and made back for Rudraprayag. A mile from the bridge I met a man sent by the patwari to tell me a kill had taken place at Chutti. After breakfast, accompanied by the patwari and the qanungo, I started on the four mile climb to Chutti. The kill was in a little nala running through fields a hundred yards from the village. In repeated visits to the kill the leopard had made a track on the right bank of the nala. Across this track I decided to put up a gun trap using my .275 and .28 bore for the purpose. When the trap was ready I found that the pressure required on the trigger strings to discharge the guns, was greater than the leopard under normal conditions was likely to exert; however there was the possibility of driving him into the trap if I could frighten him when he was facing in the right direction, and on this chance I banked. To give me something to aim at with my .450 I placed a white stone on the near side of the nala and in line with the kill. On the safe bank of the nala and thirty

yards from the kill there was a walnut tree with a hay stack in its branches. In the middle of the stack I made a place to sit in.

By 6 p.m. everything was ready, guns nicely masked from the off-side, safety catches off and with a final look round to see nothing had been forgotten I climbed into my nest. At 6.30 a thunderstorm burst right overhead and in a minute I was wet to the skin; however that didn't matter much for I was already wet from the four mile climb. At seven the rain stopped and ten minutes later, I heard a stone drop in the nala a little below the kill and at the same moment it came on to rain again. The rain coming from the north had caught him before it had reached me, and in hurrying for shelter to my hay stack he had taken the nala where it was a bit wide and had dislodged the stone. Some hay had drifted off the stack, when I was climbing up and in this he made himself comfortable.

WITHIN SIX FEET OF THE LEOPARD

Then for an hour or more we sat within six feet of each other with the advantage in his favour for while he could move about and was quite dry and warm, I had to sit tight, was wet to the skin and was freezing in the cold wind that was blowing. All this time there was the most brilliant display of lighting I have ever seen, and more than once the tree appeared to be in danger of being struck. About the middle of the storm I heard two man passing fifty yards above us and admired their courage at being out at that hour (I learnt afterwards that one of them was your man with the electric light).

At eight the storm ceased for good and a little later the leopard jumped down into the lower field, re-crossed the nala and approached the kill by the path he had made the previous night. To make sure of his firing the trap, I had put up two trigger strings, he evidently got his head between the strings and took fright for he dashed off the kill and growled when he pulled up sixty or seventy yards away. I knew he would get over his fright in time, and half an hour later the

white stone suddenly disappeared. I had not counted on this move in the game, the white stone was there to give me something to lay the sights on when I heard him eating and with it gone it would be impossible for me to plant a bullet within yards up where I wanted to.

"KISMAT"

The stone appeared in sight as suddenly as it had disappeared and a second later I saw and heard the leopard coming straight towards me. I now thought I had a good chance of shooting him as he returned to the kill, but unfortunately he did not go back the way he had come, and when after interval of twenty to thirty minutes, the stone disappeared and reappeared for the third time I made up my mind to risk a shot, and as he passed under me for the third time I bent down and fired. The field he was in, was possibly two feet wide and I put a bullet in the middle of it and all the injury I did the leopard was to clip a few hairs from his neck—— Kismat. If your man had arrived only two hours earlier—— I have never wanted anything so much as I wanted the light, I think I could have hit him——again KISMAT.

MYSTERIOUS SOUNDS

I must give you my impression of the leopard for I have told you I both saw and heard him. From the fact that he was visible on a dark night and overcast sky I conclude that he is a very light coloured animal. He did not appear to be very long but he looked thickest and powerfully built. Hearing him was the strangest experience I have ever had, I never heard any animal's body before and cannot in any way account for the sound. It was loud enough to be heard at thirty yards and was exactly like a woman walking in a stiff silk dress. The field had been lately planted with wheat and there was not a leaf or blade of grass in it. No, the sound did not come from his feet but from his body.

PLANS FOR ANOTHER ATTEMPT

As long as the leopard is on this bank I feel I have a chance but once he crosses the river, he is gone. I have there-

fore, taken the liberty, and hope you won't mind, of issuing instructions to your patwaris up river to close the Chattupipal bridge and Shevanand jhula at night, using thorn bushes and a lantern for the purpose, the bridge here I am looking after myself. It's a cold and poor game but one must do something. I sit on the bridgehead and have a game-net with running line fixed half-way down the bridge. The idea is that if I get a shot at the leopard on the bridge and miss, as I probably will, if he is moving, I will drive him into the net. The trouble will begin when he is in the net. I cannot swarm down the iron jugs with a rifle in my hand, so the job will have to be finished in the dark with a knife. There is a chance of us both going over the bridge in a mix up. However that after all is a very small chance."

The Pioneer : 15.5.1926

The man-eating leopard, which has lately been widely known as the Rudraprayag pest, and has, during the past seven years, killed one hundred and twentyfive human beings in the western part of the Garhwal district, has at last been shot, having fallen to the rifle of Captain J. Corbett, of Gurney House, Nainital.

The career of the animal makes one of the strangest of the many strange stories told of the Himalaya, so strange, indeed, that it might be doubted if the details, many of them tragic and gruesome, were not so wellestablished. The first instalments of the stoty were published in The Pioneer in December when the efforts of Mr. X (who may now be identified as Captain Corbett) to bag the animal last autumn were described. The final chapter can now be written. The western part of Garhwal, in which the animal had committed its depredations, is comparatively well-populated and there are some fifty thousand people in the area of some three hundred and fifty square miles which it roamed. Rudraprayag, from which the animal has been called, is a hamlet close to the borders of Tehri State. It is at the junction of the Alaknanda River, which, when it reaches the plains at Hardwár, becomes the Ganges, and the Mandagini River. Here, also, is the junction of

the pilgrim routes to the holy shrines of Kidarnath and Badrinath. The area comprises a considerable amount of scrub jungle and parts of it are honeycombed with caves formed by the waters of Alaknanda cutting their way to the plains. Rudraprayag was the centre from which operations against the leopard were conducted. The leopard had been the terror of an area about twentytwo miles long and eighteen miles broad on the east bank of the Alaknanda and an area of about equal extent on the west bank.

It started killing human beings in 1918 and took a regular toll of the people of the affected area until it was finally disposed of on the 1st May, Its victims were generally snatched from inside houses or from the entrances to the houses at night. It was particularly active during the summer months, when people desire to have their doors open at night. In recent years the fear of the leopard has been such that even in the stifling hot weather houses have been closed up and barricaded at night. At least three pilgrims have been among the beast's victims during the past two years, but the pilgrims were usually avoided by the man-eater because they were, as a rule, in bands of considerable size, and their shelters at night were well protected by light. In the previous articles in The Pioneer on the subject of the Rudraprayag pest, details were given of some of the many devices which were unsuccessfully resorted to in order to rid the area of the dreaded scourge. Sixteen shikaris, paid by the Government, had vainly endeavoured to dispose of the animal. Gun licences had been freely issued in the district and the Government had supplied a specially constructed trap as well as poison, in the hopes of ending the beast's career. The leopard had been caught twice, once in the trap and once in a cave, but it had got away on each occasion, while the frightened people on the spot were sending miles away across the hills for specially chosen men, they hoped would shoot it. As there is inclination in certain quarters to blame the Government for all the evils from which India suffers, the Government has been blamed for permitting the existence of the Rudraprayag leopard. The Government had done what they could do in the matter and had spent Rs. 1,518 in the measures already described. Legislative Coun-

cillors who had been inclined to be indignant at Government's inability to rid Garhwal of its scourge had ignored the invitation given to go to Rudraprayag themselves to try and lay the animal low. Less talkative people had on various occasions essayed the task.

Some three years ago two military officers made an effort, and Captain Corbett, who has had considerable experience of various kinds of shikar, concentrated on the task for a whole month from the 16th September to the 16th October last year. He was ably and enthusiastically assisted by Mr. A. W. Ibbotson, the Deputy Commissioner of Garhwal, who spent on the work as much time as he could spare from his official duties. But, as already recorded, the animal was so extraordinarily cautious that gun traps, gin traps, the most careful tracking, the sitting up over human kills, the poisoning of the kills with strychnine, arsenic and cyanide were of no avail. The uncanny wariness displayed by the animal on many occasions, its ability to sense when there was danger about, and its various wonderful escapes had led the simple inhabitants of those parts to the conclusion that the man-eater had supernatural powers; they believed the brute was possessed of an evil spirit which no human agency could exercise.

It has already been explained that it was considered advisable after the 16th October to leave the animal alone for a few months as the more it was harried the warier it became, and during the winter its human victims were not generally numerous. This plan was adopted, and it was not until the 16th March last that Mr. Ibbotson and Captain Corbett returned to the little rest-house at Rudraprayag and re-opened their campaign against the man-eater. In the meantime they had been carrying out experiments with patent machans, gun-traps and flash-lights. When they arrived at Rudraprayag the bridges over the river were closed at night and various other precautions were taken. The man-eater had been busy this year before the 16th March. He started killing human beings again in January, and between then and the 16th March eight victims had been added to his previous total of one hundred

and fourteen. From the 16th March until the 1st May Captain Corbett was continually on the animal's tracks and he was again assisted by Mr. Ibbotson, who was always in the neighbourhood of Rudraprayag when his duties permitted.

The frightful activities of the man-eater continued. On the night of the 1st April the animal snatched a man from inside a house. At dawn on the 7th April an old woman of 85 in a village two and a half miles from Rudraprayag was seized when near her house, which she had just left, and was carried half a mile away. A boy of 15 at a village eighteen miles due east of Rudraprayag was the next victim on the 14th April.

Meanwhile Mr. Ibbotson and Captain Corbett had also been active. Part of the body of the man killed on the 1st April was poisoned. The leopard returned to the kill and ate part of the body which was not poisoned. On the 3rd it ate a part of the body which had been treated with poison, but seemed to suffer no ill effects. After the kill on the 7th April two ingenious traps were set. Two rifles with the muzzles on the kill were secured to a tree; lines of fishing tackle joined their triggers to the kill. It had been hoped that the leopard would pull the lines and thus let off the rifles when it returned to the kill on the night of the eighth. It was thought probable that it would endeavour to move the kill away from the rifles in the same direction that it had carried its victim on the previous night. With the object of ensuring that it should do this a number of bushes were stuck in the ground near the kill and the rifles. The leopard came at 7.45 p.m. on the 8th, pulled up the bushes, dropped them down a khud and then moved the kill in the direction of the rifles. The fishing lines were thus slackened and the rifles did not go off. The animal was disturbed and in springing away landed on a huge gin trap some six or seven feet in length, which had been hidden near by Mr. Ibbotson and Captain Corbett, who were in the nearest tree—the leopard usually conveyed its victims to a spot where there were no trees within easy range —about one hundred yards away, immediately rushed to the

trap. There was no animal in the trap but a tuft of hair was sticking to its jaws.

On the 20th April Captain Corbett decided that he would sit up for the leopard for at least ten nights, near Golabrai Chatti, a grass shelter for pilgrims, half a mile from the Rudraprayag rest-house on the pilgrim road. Between the tenth and twentieth April the pug marks of the leopard had been seen near this Chatti, where last year it had killed three people. Captain Corbett believed there was a probability of it appearing there again at any rate once during the following ten nights. He sat up in a machan in a tree by the Chatti and above the road. On the road below he had a goat secured with a bell round its neck. Captain Corbett sat up for ten nights on this machan without seeing or hearing any sign of the leopard. He then thought it would be well to persevere in sitting up for one more night, that of the 1st May, and he did so. The man-eater was due to kill that night. Four days earlier the animal had had what was believed to have been his last feed, this being from a goat which had been taken from a house. On the last day of April the beast had made an unsuccessful attempt to secure a human kill.

It was at 10 p.m. on the 1st May that Captain Corbett heard from his machan something rush down the road and the bell on the goat tinkle. Captain Corbett looked down on the road and saw an indistinct blur in the direction of which he pointed his rifle. He switched on his electric torch and found that the bead of his rifle was drawn on the body of a leopard and fired. The leopard made a spring and disappeared. All this had happened in little more than a second, and the leopard got away so quickly that, had Captain Corbett not very luckily found, when he switched on the light, that he was already covering the leopard with his rifle he would have had no opportunity of adjusting his aim before the leopard had been away. Captain Corbett spent a very anxious night, not knowing whether he had killed the leopard or not. The moon, which appeared at three o' clock in the morning, did not reveal any sign of it. At daybreak Captain Corbett set out to look for the animal. He found blood tracks which led to the leopard lying dead in a hole into which it

had fallen fifty yards down the khud. It may be mentioned that one hundred pilgrims had spent the night in the Golabrai Chatti.

There are sufficient good reasons for identifying this leopard with the man-eater. In all the human kills by the Rudraprayag leopard there have been three teeth-marks showing that the leopard was one short of its full complement of teeth. The leopard shot by Captain Corbett had one tooth broken. The man-eater had been shot at three yards ago, by the two military officers already referred to and had left behind on that occasion smears of blood which indicated that it had been hit in the foot. The leopard of Captain Corbett had the mark of an old bullet wound in the foot. Moreover, a piece of hair was missing from its right hind leg where there was apparently a recently healed scar: this evidently corresponded with the tuft of hair found in the trap on the 8th April. About the animal's body were a number of old scars and some more recent ones. Two weeks before its death Captain Corbett had heard two leopards fighting. This suggests how the man-eater had received its scars. In various ways the leopard in appearance fulfilled the generally accepted theories concerning man-eaters. It was a light-coloured and evidently very old animal with an indifferent coat and practically no whiskers. It length was 7 feet 10 inches, an exceptional size, particularly for a hill leopard. This measurement was taken after it had been in a hole lying out all night, during which it had probably shrunk to some extent.

News of shooting of the animal spread rapidly in the affected area and hundreds of people from the neighbouring hamlets went to see the body as it lay in front of the Rudraprayag rest-house on the 1st May. Upon catching sight of it and noticing some of the peculiar details mentioned in the description of the beast, they were unanimous in declaring it to be the "adam khwar" (man-eater) and expressed delight at being at last rid of their terrible enemy and great gratitude to Mr. Ibbotson and Captain Corbett for persevering until they had completed what had seemed to them a superhuman task

If the courage and determination displayed by Mr. Ibbotson and Captain Corbett in their relentless pursuit of the man-eater had not been of an exceptional order, the people would still be wondering whose turn it was next to be carried away and suffer a horrible death.